উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয় কলিকাতা ৩

৭৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
মাঘ ১৩৮০ –৬০

বার্ষিক মূল্য ৬
প্রতি সংখ্যা ৬০

ভক্তের প্রার্থনা

ত্বৎপাদপদ্মার্পিতচিত্তবৃত্তি-
ত্বন্নামসংগীতকথাসু বাণী।
ত্বদ্ভক্তসেবানিরতৌ করৌ মে
ত্বদংগসংগো লভতাং মদঙ্গম্॥

ত্বন্মূর্তিভক্তান্ স্বগুরুং চ চক্ষুঃ
পশ্যত্বজস্রং স শৃণোতু কর্ণঃ।
ত্বজ্জন্মকর্মাণি চ পাদযুগ্মং
ব্রজত্বজস্রং তব মন্দিরাণি॥

অঙ্গানি তে পাদরজোবিমিশ্র-
তীর্থানি বিভ্রত্বহিশত্রুকেতো।
শিরস্ত্বদীয়ং ভবপদ্মজাদ্যৈ-
জুষ্টং পদং রাম নমত্বজস্রম্॥

(অধ্যাত্মরামায়ণ, ৪।১।৯১-৯৩)

হে রাম! আমার মনের যত চিন্তা, যত কল্পনা, যত আকাঙ্ক্ষা, আবেগ—সকলই যেন তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারি। আমার জিহ্বা যেন রত হয় তোমার নামগানে—তোমার মহিমা-কীর্তনে, হাত দুটি যেন ব্যাপৃত থাকে তোমার ভক্তগণের সেবায় আর আমার সারা অঙ্গে যেন লাভ করি তোমার দিব্য স্পর্শ।

চক্ষু অবিরাম দেখুক তোমার পাবন মূর্তিনিচয়, তোমার ভক্তবৃন্দকে, তোমার কৃপাবিগ্রহ শ্রীগুরুকে; কর্ণ শ্রবণ করুক তোমার পুণ্য-জন্ম-কর্ম-কাহিনী; পদদ্বয় অনবরত নিযুক্ত থাকুক তোমার মন্দিরসমূহ-পরিভ্রমণে।

হে গরুড়ধ্বজ নারায়ণ! তোমার শ্রীচরণধূলি-মিশ্রিত তীর্থসমূহে অবগাহন দ্বারা দেহ যেন আমার পবিত্র হয়, আমার মস্তক যেন শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের সেবিত তোমার পদকমলে বার বার প্রণাম করিবার সৌভাগ্য লাভ করে।

কথাপ্রসঙ্গে

নববর্ষে

শ্রীভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় 'উদ্বোধন' তাহার লোকহিতব্রতী জীবনের চুয়াল্লটি বৎসর অতিক্রম করিল। নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা 'উদ্বোধনে'র পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা এবং হিতৈষি-মণ্ডলীকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। বহুতর সমস্যা-সঙ্কুল আজিকার পৃথিবীতে মানবের যথার্থ কল্যাণকর উচ্চাদর্শের নির্ণয় ও অনুশীলন একপ্রকার দুরূহ ব্যাপারই বলিতে হইবে। তবুও আমরা সাহস হারাইব না—কেননা, আদর্শের প্রতি স্থির দৃষ্টি এবং উহার লাভের জন্য অকুণ্ঠিত চেষ্টাই লক্ষ্যবিভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ মানবগোষ্ঠীকে তাহার বহুকাম্য সত্য ও শান্তির পথে লইয়া আসিতে পারে। 'অরণ্যে রোদন' মনে হইলেও আমরা তাই নির্ভীক-ভাবে মানবকে সত্য-শিব-সুন্দরের বাণী শুনাইয়া চলিব, তাহার শাশ্বত স্বরূপের কথা মনে করাইয়া দিব, জাতিগত ধর্মগত সংস্কৃতিগত পার্থক্যের অন্তরালে বিশ্বের সকল নবনারীর মধ্যে যে নিবিড় ঐক্য সর্বকালে অনুস্যূত রহিয়াছে উহারই আবিষ্কারে ও উপলব্ধিতে উৎসাহিত করিব। 'উদ্বোধনের' প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'প্রস্তাবনা'য় যেমন বলিয়াছেন—"দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য-প্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্য আপনার শরীর অর্পণ" করিব।

উপনিষদে আছে (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১৪) প্রজাপতি সমস্ত মানবমণ্ডলীকে গুণ এবং কর্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভাগ করিয়া ভাবিলেন, কাজ তো শেষ হইল না; এই চারিবর্ণের বিবিধ প্রবৃত্তি, ব্যবহার এবং প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে কে? তখন—তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্মম্—মঙ্গলের পরম নিদান 'ধর্ম'কে সৃষ্টি করিলেন, উহাই চারিবর্ণের জীবনকে বিক্ষেপ হইতে, বিশ্লেষ হইতে, বৈক্লব্য হইতে ধরিয়া রাখিবে বলিয়া। 'ধর্ম' কি? উপনিষদের ঐ মন্ত্রেই ঘোষিত হইল—যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ—যাহাকে 'ধর্ম' বলি তাহার প্রকৃত রূপ হইতেছে 'সত্য'। মানুষ তাহার চিন্তায়, আকাঙ্ক্ষায়, আবেগে, আচরণে সর্বতোভাবে যেন সত্যকে অবলম্বন করে—সে যাহা নয় তাহা যেন কখনও সাজিতে না যায়, তাহার যাহা কাজ নয় উহা যেন কদাপি করিতে উৎসাহী না হয়। যে সংস্কার, রুচি ও শক্তি লইয়া মানুষ যেখানে দাঁড়াইয়া আছে উহাকেই সানন্দে মানিয়া লইয়া সেখানে দাঁড়াইয়াই সে যেন উহাদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে—ধীরে ধীরে উহাদিগকে বাড়াইয়া যায়, মহত্তর উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করে। ইহাই তাহার পক্ষে সত্য—ইহাই তাহার ধর্ম। নিজের অনন্ত শুভ সম্ভাবনায় দৃঢ় আস্থা রাখিয়া অপরের মঙ্গলে বাধা না জন্মাইয়া সেই সম্ভাবনাগুলিকে বিকাশ করিয়া তোলার নাম ধর্ম। নিজের সত্যকে ভুলিয়া বিশৃঙ্খলতায় গা ভাসাইয়া দেওয়ার নাম অধর্ম। অধর্মের প্রাদুর্ভাবে মানুষের জীবন, তথা সমাজের জীবন আর সামঞ্জস্যে বিধৃত থাকে না—টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া বিনষ্ট হয়।

ধর্মের উপরোক্ত শাশ্বত রূপ ও কার্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই। মানবের ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে ধর্মের সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টি যেন সতত আমাদের লক্ষ্য হয়। আজিকার পৃথিবীর বহু-বিস্তৃত সংঘর্ষ ও দুর্দশার কারণ সত্যের নির্লজ্জ অমর্যাদা—অর্থাৎ ধর্মের অনাদর। মানুষ যাহা নয় তাহাই দেখাইবার জন্য

সে ব্যাকুল—যাহাতে তাহার ন্যায্য অধিকার নাই তাহাই গ্রাস করিতে সে অধীর। নিজে কেন্দ্রহারা হইয়া সে কেবলই অপরের কেন্দ্রে আঘাত হানিতেছে। তাহার নিজের গতি লক্ষ্যশূন্য—অপরের গতিকেও সে করিতেছে ব্যাহত। অতএব মানুষকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের প্রথম কর্তব্য মানুষকে তাহার এই বিভ্রান্তি হইতে রক্ষা করা—তাহার দৃষ্টি সত্যে নিবদ্ধ করিতে সাহায্য করা—তাহার জীবন ধর্মে কেন্দ্রীভূত করিতে বলা। তবেই মানুষ ঠিক ঠিক বাঁচিয়া থাকিবে—তবেই সে নিজের এবং সকলের যথার্থ সুখ আনিতে পারিবে।

বিশ্বপটভূমিতে ভারতীয় সভ্যতা

প্রায় ষাট্ বৎসর আগে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত-প্রচার করিয়া দেশে ফিরিয়া একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"পূর্বে যাহা হয়ত হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম এখন উহা আমার কাছে প্রমাণ-সিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম—ভারত পুণ্যভূমি—কর্মভূমি। আজ আমি সকলের সমক্ষে দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—ইহা সত্য সত্য! অতি সত্য! * * * যদি এমন কোন স্থান থাকে যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি, ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতভূমি। * * * অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবতরঙ্গ ভারত হইতে প্রসৃত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটিই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরাই কখন অপর জাতিকে যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা জয় করি নাই। * * * আমরা কখন বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাবপ্রচার করি নাই। * * * লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ, উষাকালীন ধীর শিশির-সম্পাতের ন্যায় এই শান্ত 'সর্বংসহ' ধর্মপ্রাণ জাতি চিন্তা-জগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।"

১৮৯৭ সালে—ইংরেজরাজ যখন ভারতের বুকে অটল পাহাড়ের মত জাঁকিয়া বসিয়া আছে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখ যখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিভবের দিকে প্রায় ষোল আনাই ফিরিয়া রহিয়াছে, তখন ভারতবাসীকে জোর গলায় নিজেদের জাতীয় গৌরবের দিকে নিঃসঙ্কোচে তাকাইতে আহ্বান করা নিশ্চিতই দীপ্ত আত্মবিশ্বাস ও অনমনীয় সাহসের পরিচায়ক ছিল। স্বামিজীর পূর্বে বাংলাদেশে রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি এবং অন্যান্য প্রদেশেও কেহ কেহ জাতীয়-ঐতিহ্যবিস্মারক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার মাঝখানে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমা-কীর্তন ও প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু স্বামিজীই বোধ করি প্রথম বর্তমান কালের পটভূমিকায় ঐ সভ্যতার দূরপ্রসারী প্রভাবের কথা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। শুধু অতীতের মহিমার উপলব্ধি নয়—ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীর মানব-সমাজের ঐ সভ্যতার উপর অপ্রতিরোধ্য মঙ্গল অবদান-সম্বন্ধে নিজেদের সচেতনতা ও প্রস্তুতি—বিশেষতঃ এই শেষেরটির প্রতি স্বামিজী বার বার আমাদিগকে অবহিত করিয়াছিলেন। ঐ একই বক্তৃতায় স্বামিজী বলিতেছেন—

"আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপরদেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে অমৃতসলিলের প্রয়োজন, তাহা এখানেই বর্তমান। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।"

স্বামিজী বিশ্বাস করিতেন, ভবিষ্যতের ঐ

বৃহৎ ঘটনার জন্য ভারতবাসীকে সক্রিয় ভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। 'যখন হয় হইবে' 'যদি হয় তো ভালই' এইরূপ মনোভাব তিনি চাহেন নাই। যেমন দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পরাধীনতা দূর করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন, তেমনই ভারতসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজও গভীর উৎসাহের সহিত সঙ্গে সঙ্গে শুরু করিয়া দিতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়।

ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন বিজেতা জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি দেশের লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া রাখিত—নিজেদের ঘরের অমূল্য সম্পদের দিকে তাকাইবার রুচিও ছিল না, উহার মর্যাদা উপলব্ধি ও রক্ষা করিবার সৎসাহসও হইত না। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বার বার জাতিকে এই যে আত্মচেতনার কথা শুনাইয়া গেলেন বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ দেশের লোকের নিকট হইতে তাহার আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। বরং দেশের অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি, অনেক প্রসিদ্ধ নেতা 'ধর্ম', 'আধ্যাত্মিকতা' এ সকল কথা শুনিলে এত দিন প্রকাশ্যে কটাক্ষ করাটাই ফ্যাসান্ মনে করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের জাতীয় উন্নতির লক্ষ্য ভাবিবার সময় অনেকের নিকট সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের অভ্যুদয়ের চিত্রই মনে পড়িয়াছে।

আজ কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। দেশের মনীষিবৃন্দ এবং রাষ্ট্রনায়কগণের চিন্তাধারায় এবং বাক্যে স্বামিজীর পূর্বোদ্ধৃত কথাগুলির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সেদিন কলিকাতায় একটি বক্তৃতায় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিলেন—

"ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অপরের উপর প্রভুত্ব-বিস্তারের জন্য ভারত কখনও বলপ্রয়োগ করে নাই, কিন্তু সকলের অন্তর অধিকার করিয়াছে। * * * ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা অতীতে তাঁহাদের সাধনার দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির যে অপূর্ব অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে পড়িয়া ভারতবাসী তাহা ভুলিতে বসিয়াছে। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতের সেই অতীত সত্য ও সুন্দরের ভাণ্ডার আজ আমাদের আহরণ করিবার সময় আসিয়াছে। আজ সারা পৃথিবী ভারতবাসীর সেই বাণী শুনিবার জন্য মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে। ভারতের প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শ ও বাণী সারা বিশ্বে পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব আজ আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।"

১৪ই ডিসেম্বর এলাহাবাদে একটি বক্তৃতায় ভারতবর্ষের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ ঘোষণা করিলেন—

"যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ভারতের জগতকে অনেক কিছু দিবার আছে, আমি তাঁহাদের একজন। ভারতের এই অবদান যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পোন্নতি অথবা যুদ্ধ-বিজয় দ্বারা ঘটিবে ইহা আমার মনে হয় না। ভারতবর্ষ চিরকাল আধ্যাত্মিক সংপ্রাপ্তির উপরই জোর দিয়া আসিয়াছে। আমাদের ঋষিগণ কখনও ঐহিক বিভব, ক্ষমতা এবং মানযশের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই—তাঁহারা সমাদর দিয়াছিলেন দুঃখ, ত্যাগ এবং সেবাকে।"

১৫ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে সেন্ট টমাস শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারতের ধর্ম এবং 'সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে'র প্রভাব-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পড়িয়া আনন্দ হয়।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম ও নীতি

ডিসেম্বর মাসে ভারতের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-উৎসব হইয়া গেল। বিশিষ্ট দেশনায়ক এবং শিক্ষাব্রতিগণ এই উপলক্ষে যে সব ভাষণ দিয়াছেন তাহাদের অনেকগুলিতে একটি বিষয় খুব সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—বর্তমান কালে ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিক

উচ্চাদর্শ-অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা-বোধ। বিদ্যার বিশুদ্ধ প্রাঙ্গণে আজকাল যে অশ্রদ্ধা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিক শৈথিল্য ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ যাহারা গড়িয়া তুলিবে, তাহাদের সম্বন্ধে সত্যই আশঙ্কা জাগে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য সুনিয়ত দৃঢ় চরিত্রগঠন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইহার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিক আদর্শের অন্তর্ভুক্তি ঘটিলে বিদ্যার্থিগণের চরিত্র-গঠনে প্রচুর সহায়তা করা যাইবে, সন্দেহ নাই। তাই এই দিকে জোর দিবার কথা শিক্ষা-নায়কগণ বুঝিতে পারিতেছেন ও বলিতেছেন। আমাদের রাষ্ট্র 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলিয়া এই আশু গুরুতর কর্তব্যটি হইতে সঙ্কুচিত হইবার কারণ আমরা দেখি না। কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতের আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাসসমূহ শিখাইবার প্রশ্ন উঠিতেছে না; ধর্মের যাহা সর্বজনীন, সার্বকালিক, সকলের পক্ষে কল্যাণকর চিরন্তন সত্য—যে চরিত্রনীতিগুলি উদার সত্য ও নিঃস্বার্থ বিশ্বহিতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি সহজ করিয়া শিক্ষার্থি-শিক্ষার্থিনীগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে বাধা কি? সেগুলি হিন্দুর যেমন দরকার, মুসলমান-খ্রীষ্টান-পার্শীদেরও তেমনই দরকার। মনু বলিয়াছেন—

> ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥
>
> (মনু, ৫।৯২)

"সন্তোষ, ক্ষমা, চিত্তস্থৈর্য, অন্যায়পূর্বক পরধন গ্রহণ না করা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, বুদ্ধির নির্মলতা, আত্মজ্ঞান, সত্য, অক্রোধ—এই দশটি হইতেছে ধর্মের লক্ষণ।" ধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আছে কি?

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হইতেছে। (৫ই পৌষ) নয়াদিল্লীতে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী শ্রীশান্তিস্বরূপ ভাটনাগর তাঁহার সাম্প্রতিক রাশিয়া-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাবর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রাশিয়ায় সাধারণ জনগণের জীবনেও একটি উচ্চস্তরের নিয়মশৃঙ্খলা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, যদিও অধিকাংশ লোকে ভগবান বা তথাকথিত ধর্মের বেশী ধার ধারে না। আমাদের মনে হয় সম্প্রদায়গত ধর্মের ধার না ধারিলেও ঐ দেশের নায়কগণ তাঁহাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন একটি আদর্শের সন্নিবেশ করিয়াছেন, যাহাতে মানুষের চরিত্রে মনুকথিত উপরোক্ত 'দশকং ধর্মলক্ষণম্'-এর অন্ততঃ কতকগুলি বিকশিত হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য

কিছুকাল পূর্বে কাশীতে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদ প্রায় দুই শত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে নিজহস্তে পা ধোয়াইয়া, কপালে চন্দন মাখাইয়া, মালা পরাইয়া মিষ্ট এবং ১১্ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজাদিগের ব্রাহ্মণকে পূজা ও মান দিবার কথা মনে পড়ে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই বা উপবীত-ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না—ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্ম জীবনে যিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এই গুণ ও কর্মের বর্ণনা গীতায় দেখিতে পাই—

> শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
> জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥
>
> (গীতা, ১৮।৪২)

প্রাচীন ভারত এই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা লক্ষিত একটি মহান আদর্শের 'ব্রাহ্মণ্যে'রই পূজা করিয়াছে, জন্মগত অধিকারের দাবী-বিঘোষক কোন শ্রেণী-বিশেষের পূজা করে নাই। আমাদের মনে হয়, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও তাঁহার উপরোক্ত আচরণে এই 'ব্রাহ্মণ্যে'রই মর্যাদা দিয়াছেন। ভারত জাতিভেদ তুলিয়া দিতে পারে, কিন্তু

'ব্রাহ্মণ্য'কে ভুলিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ বার বার ব্রাহ্মণের উচ্চাদর্শের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সকলকেই ধীরে ধীরে ঐ আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে; ইহাই ভারতীয় সমাজের লক্ষ্য।

ভারতীয় নারীর আদর্শ

ডিসেম্বরের শেষে কটকে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে মহিলা-শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী লীলা মজুমদার যে ভাষণ দিয়াছেন, তাহা আমাদের বর্তমান আদর্শ-সংঘাতের দিনে বিশেষ অনুধাবনীয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, আমাদের স্ত্রীজাতির সমস্যা তাঁহারা নিজেরাই সমাধান করিবেন। পুরুষরা যেন জোর করিয়া কোন আদর্শ, মত বা আচরণধারা তাঁহাদের উপর চাপাইতে না যান। পুরুষদের কাজ হইবে তাঁহাদিগের শিক্ষা ও স্বাবলম্বনে সহায়তা করা। বর্তমান বিশ্বের পটভূমিতে সমস্ত দেশেই নারীগণ স্বকীয় আদর্শ, চরিত্রনীতি, কর্মপ্রণালী এবং পুরুষদের সহিত পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন এবং আপন আপন পন্থা বাছিয়া লইতেছেন। সকল দেশের পন্থা কখনও এক হইতে পারে না। তাই ভারতীয় নারীসমাজের প্রগতি যে হুবহু আমেরিকা, রাশিয়া, চীন বা তুরস্কের নারীগণের অগ্রগতির অনুরূপ হইবে এরূপ চিন্তা করা অন্যায়। তাহাতে বরং অমঙ্গলই। শ্রীযুক্তা মজুমদার বলিয়াছেন—

"নারী-স্বাধীনতা মানে নয় শুধু ট্রামে-বাসে সিনেমায় গিয়ে পরে দোকানে-বাজারে অভিভাবক-শূন্য হয়ে বিচরণ করা। নারী-স্বাধীনতার মানে নয় শুধু স্কুলে কলেজে আপিসে আদালতে পুরুষদের সঙ্গে সমান আসনে বসবার অধিকার-লাভ করা। নারী-স্বাধীনতার মানে নয় শুধু পৈতৃক সম্পত্তির অংশ দাবী করা বা অযোগ্য স্বামীকে ত্যাগ করবার অধিকার পাওয়া। সহস্র নতুন আইন আমাদের নারী-স্বাধীনতা এনে দেবে না, যদি না আমরা সেই সঙ্গে পুরুষদের সঙ্গে সমান অংশে দায়িত্বের ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকি; যদি না আমাদের নারীত্বের কর্তব্যগুলি স্বীকার করি।

* * * *

"পরমহংসদেব প্রায়ই 'অ-বিদ্যার' কথা বলতেন। সে মূর্খতার চেয়েও সাংঘাতিক। আমরা আপাততঃ অ-বিদ্যার কবলে পড়েছি। শূন্য ভাণ্ডকে শীতল জল দিয়ে ভরা যায়, অমৃত দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ ক'রে দেওয়া যায়। কিন্তু যে আধার আবর্জনা দিয়ে পূর্ণ থাকে তাকে নিয়েই গোলযোগ বাধে। আমাদের অ-বিদ্যা দূর না করলে বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করব কোথায়?

* * * *

"আমাদের শিক্ষা তখনই ঠিক পথে প্রবাহিত হবে যখন তাদের সঙ্গে পরিচিত হবামাত্র তাদের ভারতবর্ষের কন্যা বলে চেনা যাবে; তখন তাদের চলাফেরায় কথা-বার্তায় কাজকর্মে ভারতবর্ষের নিজস্ব পরিচয়টুকু পাওয়া যাবে। নইলে আধুনিকা বলে যে গৃহকর্মে অনভ্যস্তা, বাক্‌চতুরা, প্রসাধনসুনিপুণা এক জাতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাদের হাবভাবে, আকৃতি-ইঙ্গিতে, কথাবার্তায়, পরস্পরের মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, তারা আমাদের নবতম সম্পদ নয়। তারা প্লাষ্টিকের অলঙ্কারের মত সুশ্রী, বিদেশী আমদানী। আমাদের দেশের সত্যিকারের যে আধুনিকা সে বিলেত থেকে আমদানী হবে না, সে আমাদের চিরন্তন গাছটির নবতম শুভ্র কুসুমের মত আমাদের পুরোন রসে সঞ্জীবিত হয়ে নতুন আলোতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। সেই হবে আমাদের দেশের নবতম শ্রেষ্ঠতম পরিচয়।

গুরু গোবিন্দসিংহ

গত মাসে গুরু গোবিন্দসিংহের জন্মদিন শিখসমাজ নানাস্থানে পালন করিয়াছেন। এই অসামান্য হৃদয়বত্তা, প্রতিভা ও তেজস্বিতা-সম্পন্ন পুরুষপ্রবরের জীবন, কর্ম ও বাণী শুধু শিখ-সমাজের নয়, হিন্দুসমাজেরও বিশেষভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। গোবিন্দসিংহ ছিলেন ধর্মগুরু, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম ছিল বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, দুর্জয় সাহস, জ্বলন্ত বিশ্বাস ও পবিত্রতা এবং উদার একতার ধর্ম। ঐ ধর্ম মানুষকে মেরুদণ্ডহীন মিথ্যাচারী কাপুরুষ হইতে যথার্থ নির্ভীক সত্যসন্ধ খাঁটি মানুষে পরিণত করিত। আজ ভারতীয় জাতির ধর্মানুশীলনে এইরূপই শক্তিসঞ্চারের কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

স্বামিজীর সান্নিধ্যে

৺শচীন্দ্রনাথ বসু

(মহিষাদলের রাজার ম্যানেজার ৺শচীন্দ্রনাথ বসু কাশীতে তাঁহার বাল্যবন্ধু স্বামিজীর অন্যতম শিষ্য চারুবাবু (পরে স্বামী শুভানন্দ)কে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে এই স্মৃতিকণাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। শচীন বাবু স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। —উঃ সঃ।

বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী, নভেম্বর, ১৮৯৮।

স্বামিজী উপর হইতে নামিলেন। কিছু দিন আগে কাশ্মীর হইতে ফিরিয়াছেন। চেহারা অনেক কাল হইয়া গিয়াছে। প্রণাম করিলাম।

সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি শচীন, ভাল আছ তো?" কর্ণে যেন বীণাধ্বনি হইল। ঠাকুরঘরে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে তাঁহার এক খুড়ী দেখিতে আসিয়াছেন ও এক জন বুড়ী ঝি—যে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল। অনেকক্ষণ কথা কহিয়া হলঘরে আসিলেন। আসিয়া কথায় কথায় কাশীর কথা উঠিল। আমাকে স্বামিজী খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পূর্ববঙ্গে যাইবার খুব ইচ্ছা। কামাখ্যা যাইবেন। ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য দেখিবার ইচ্ছা। দুই তীরে কিরূপ পর্ব্বতশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হয়—তাহা দেখিতে সাধ হইয়াছে। আমি কতক কতক বর্ণনা দিলাম। স্বামিজী আমার সহিত বেশ সহৃদয় ব্যবহার করিলেন। বলিলেন—"আর লেক্‌চার ফেকচার দেব না। আর গোলমালে কাজ নেই বাবা, চুপ চাপ স্থিরধীর ভাবে কাজ চলুক।"

তাহার পর হরি মহারাজ আসাতে কাশ্মীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি (স্বামিজী) মাঝে মাঝে খুব আবেগপূর্ণ বর্ণনা দিতে লাগিলেন। হিমবাহের (glacier) বর্ণনা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। পরে অমরনাথের কথা বলিতে তাঁহার বিশাল চক্ষু আরক্তিম হইয়া গেল। লর্ড ল্যান্সডাউন্ কাশ্মীর-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলাতে বলিলেন—"খুবই ঠিক। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যা' সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক দৃশ্য তা' দেখবার জন্য আলমোড়া ছাড়িয়ে যাবার দরকার হয় না। আলমোড়াতেই তা মিলবে। কাশ্মীরের তুলনা নেই।" তাহার পর অমরনাথে তাঁহার কিরূপে স্তবের ভাব আসিতে লাগিল তাহা বলিতে লাগিলেন। তুষাররাজি দেখিয়া কিরূপ অভূতপূর্ব আনন্দ হইয়াছিল তাহাও বলিলেন। কহিলেন—"ঈশ্বর আছেন কিনা বলতে পারি না; কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম আছেন, আর দেবদেবী আছেন, তা সম্পূর্ণ জেনেছি।"

একজন বৃদ্ধ চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল—স্বামিজীকে সে স্কুলে লইয়া যাইত। তাঁহাকে ৪৲ টাকা দেওয়া হইল।

অপরাহ্ণে নূতন মঠের বাড়ীতে বেড়াইতে যাওয়া হইল। জমির পশ্চিম দিকে বরাবর লোহার বেড়া দেওয়া হইয়াছে। ২।৩টা চালা বাঁধা হইয়াছে। কাঠের কাজ চলিতেছে। বেগুন গাছ, ঢেঁড়স গাছ, কুমড়া গাছ প্রভৃতি স্বামী অদ্বৈতানন্দজী লাগাইয়া গিয়াছেন। যে বাড়ী তৈরী হইয়াছে, তাহা মোটামুটি বেশ হইয়াছে। ঠাকুরঘর ও রান্নাঘরের জন্য একটা আলাদা দোতলা বাটী পশ্চিম দিকে প্রস্তুত হইতেছে। হরিপ্রসন্ন মহারাজ দিনরাত

পড়িয়া আছেন। স্বামিজী সহ বাটীর উপরে উঠিলাম। স্বামিজী গঙ্গার পানে তাকাইয়া একটু বাদে "বাচামগোচরমনেকগুণস্বরূপং···বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথং" গান গাহিলেন। এইরূপে সন্ধ্যা হইল। শরৎ চক্রবর্তীর সহিত নৌকায় ফিরিলাম।

একদিন বাগবাজারে গেলাম। স্বামিজী বলরাম বাবুর বাড়ীর ছাদের উপর হাবুলের সহিত বেড়াইতেছিলেন—যে হাবুল খুব ভাল বাঁশী বাজাইতে পারে—ঠাকুরের ভক্ত, কাঁকুড়গাছির উৎসবে বাঁশী বাজায়। ও নাকি দূর সম্পর্কে স্বামিজীর দাদা হয়।··· স্বামিজী ছাদ হইতে নামিয়া হলে তাহাকে লইয়া গেলেন। প্রায় আড়াই ঘন্টা অতীত হইয়া গেল। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

রাস্তায় যাইতে যাইতে হাবুলের সহিত অনেক কথা হইল। বলিল, স্বামিজী তাহার জীবনের অনেক পরিবর্তন করিয়া দিলেন। ···স্বামিজী বলিয়াছেন, "দাদা, বাঙ্গালীর বৈরাগ্য হবে কি? ভোগ করতেই পেলে না; তুলাখ, চার লাখ টাকার উপর বসতেই পেলে না।··· বৈরাগ্য হবে কি করে? জার্মাণীর ভোগ শেষ হয়েছে; এইবার জার্মাণীর বৈরাগ্য হবে; তারপর আমেরিকা, ইংলণ্ডের পালা।"···

হাবুল বলিতে লাগিল, স্বামিজী তাহাকে তারপর বলিলেন, "দাদা, পরমহংস মশায় যা তোকে বলে গেছেন, তাই করে যা; যোগ-টোগের জন্য ঘুরিস নি (হাবুল নাকি যোগের চেষ্টায় ছিল); প্রাণায়ামের ক্রিয়া আপনি হয়ে যাবে।" স্বামিজীকে হাবুল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভাই স্বামিজী, তুমি অমরনাথের রাস্তায় কেমন আনন্দ পেলে?" স্বামিজী বলিলেন, "দাদা, অতি grand! সেখান থেকে যাওয়া আসা অবধি আমার প্রাণ বড় শান্তির প্রয়াসী হয়েছে। আর work ভাল লাগছে না—একেবারে চুপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে—একটা গুফার ভিতর থাকতে পারলেই বাঁচি। অমরনাথের মহাদেব আমার মাথায় ৮ দিন ৮ রাত্রি চড়ে বসেছিলেন। মাথায় বসে খুব হাসতেন। আমি বললাম, 'বাবা, আমার শরীরে রোগ-ভোগ হচ্ছে, আর তুমি হাসবে বই কি?' গুরু মহারাজের যে মূর্তি আমায় আমেরিকা যাবার আগে দেখা দিয়ে আমায় আমেরিকা যেতে আদেশ করেছিল, এবারেও সেই মূর্তি এসে আমাকে অমরনাথ যাবার আদেশ করেছিল। তাই গিয়েছিল।"···

মৃত ও জীবিত

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

লক্ষ লক্ষ হেরি নর-নারী,
তাহাদের ক'জন জীবিত?
প্রাণময় জীবদেহধারী
ঘুরে ফিরে তবু তারা মৃত।

শির যার ভেদি জনতারে
উর্ধ্বে উঠে জীবিত ত সেই।
ডুবে যারা জনপারাবারে
মৃত তারা কিংবা মরিবেই।

মরিয়া গিয়াছে কত লোক
জীবিত রয়েছে তবু তারা।
চিরজীব তারা পুণ্যশ্লোক
নহে কাল-পারাবারে হারা।

জনতার উর্ধ্বে যারা রাজে
তাদেরো অনেকে যাবে মরি,
কেহ কেহ তাহাদের মাঝে
বেঁচে রবে চির দিন ধরি।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

(এক)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯১৫ খৃঃ ৺জগদ্ধাত্রী-পূজার সময় আমরা বাকুড়া দুর্ভিক্ষকেন্দ্র থেকে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের জন্য জয়রামবাটী যাই। একদিন মা বসে বসে আমাদের খাওয়াচ্ছেন, এক জন পরিবেশন করছেন। মা হাসতে হাসতে বলছেন, দেখ ঠাকুর এসেছেন, তাই তাঁর কৃপায় এই সব ছোট ছোট ছেলেদেরও জ্ঞান-চোখ খুলে যাচ্ছে। বাপ-মা ফেলে সব চলে এসেছে, কেমন ঠাকুরের কাজ করছে! নইলে ঐ সব সংসার কেউ ছাড়তে পারে? এখন দেখ আমরাই ওদের আপনাব, আত্মীয়-স্বজন পর হয়ে গেছে।

এই সময় কয়েক জন ভক্তকে মা এক দিন বলছেন, যদি ঠাকুব না আসতেন, তিনি যদি অহৈতুকী কৃপা না করতেন, তা হলে কি কারুর সাধ্যি আছে যে এই মায়ার বন্ধন কাটে? তিনি নিজে কঠোর তপস্যা করে তার ফল জীবের কর্মফল-নাশের জন্য দান করলেন। দেখছ না, যে গাছে হয়ত বহু বছর পরে ফলফুল ফলত, সেই সব গাছে তিনি রাতারাতি ফলফুল ধরাচ্ছেন? জীবের পাপ-গ্রহণ কোরে তিনি কি কষ্টই না সহ্য কোরেছেন! সে গলার যন্ত্রণা দেখলে বুঝতে পারতে। কিন্তু লোকের কল্যাণের জন্য কথা বলতে ছাড়তেন না, বরং কেউ না এলে দুঃখিত হতেন।

* * *

একদিন (১৯১৮ খৃঃ) উদ্বোধনের গলি দিয়ে বিক্রীর জন্য 'ধারাপাত', 'প্রথম ভাগ', 'গোলোকধাম' ও 'ঘোড়দৌড়' খেলার ছক হেঁকে যাচ্ছে। রাধু বললে, হরিহরদা, ওকে ডাক, আমি গোলোকধাম, ঘোড়দৌড়ের ছক কিনব। ডাকলুম। মা ঘোড়দৌড়ের ছক দেখে বললেন, এ আবার কি খেলা? রাধু বুঝিয়ে দিল, এ খেলাব শেষটা ওঠা বড় কঠিন। মা দেখে চিন্তা কোরে একটু হেসে বললেন, সংসারেও এমনি; শেষ রক্ষেই রক্ষে। বেশ সারা জীবন চলে গেল, কিন্তু শেষটা অসুখ-বিসুখ, রোগভোগ, শোক-তাপ কত কি জ্বালা! ঠাকুরের কৃপা থাকলে শেষটাও বেশ উৎরে যায়। প্রারব্ধের শেষ কি না—অনেকে হাবুডুবু খায়। যারা ঠাকুরের শরণ নেয় তিনি তাদের প্রারব্ধ খণ্ডন কোরে দেন। তাঁর কত দয়া! তিনি কপালমোচন। তবে খুব যাদের প্রারব্ধ তাদের একটু টাল-মাটাল খাইয়ে তার পর ভোগ থেমে যায়।

এক জন ভক্তমহিলা গোলোকধামখানা খুঁটিনাটি কোরে দেখছিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, এই রকম সব লোক আছে নাকি? মা বললেন, আছে বৈ কি; যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ এই সব ভানুমতীর খেলা আছে। ঈশ্বর-দর্শন হলে এসব ছায়ার মত মিশে যায়। তখন এক ঈশ্বরই সত্য, আর সব মিথ্যা।

মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এই সব জায়গায় লোকে যায় কি করে? মা বললেন, স্থুল দেহের পাত হলে সূক্ষ্ম শরীরের কর্মের সংস্কার-অনুযায়ী ঐ সব ভাল-মন্দ লোকে গতি হয়। তাতে অজ্ঞানী জীব সূক্ষ্মশরীরের গতিটাই নিজের গতি বলে মনে করে। দেখনা, মন স্বপ্ন দেখে, তখন এই বাহ্য বাস্তব জগৎ ভুল হয়ে গিয়ে স্বপ্নজগৎটাই সত্য বলে হয়।

মহিলাটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুম ভেঙে

গেলে আবার আমরা জেগে উঠি। ওখানকারও ত ঘুম ভাঙে? মা বললেন, জাগ্রৎও যেমন সংস্কার, স্বপ্নও তেমনি সংস্কার, আবার পরলোকও তেমনি সংস্কার। জগতের সবই অনিত্য, তখন সংস্কারও অনিত্য, এক দিন না এক দিন ক্ষয় হবে, তখন ঘুম ভাঙবে।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, সংস্কার যদি ক্ষয় হয়, তবে আবার জন্ম হয় কেন?

মা বললেন, সংস্কার কি সোজা গা? অনন্ত জীবনের অনন্ত সংস্কার তোলা রয়েছে। একদল গেল তো আর এক দল আসে, রক্তবীজের বংশ!

ভদ্রমহিলা—তা হলে এর হাত থেকে রেহাই কি করে পাওয়া যাবে?

মা—সব বাসনা ত্যাগ কোরে যারা সচ্চিদানন্দ চায়, তারাই মুক্ত হয়ে গেল। বাসনাই এই সংস্কারগুলোকে জাগিয়ে তোলে।

ভদ্রমহিলা—এখন সচ্চিদানন্দে মতি হয় কি কোরে বলে দিন।

মা—তিনি যখন আকর্ষণ করেন তখনই কৃষ্ণে মতি হয়।

ভদ্রমহিলা—তিনি আমাদের টানছেন না কেন?

মা—তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁর লীলা কোন আইন-কানুনের বশ নয়। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন! তাঁর ইচ্ছা হলে মায়া আর জীবকে বন্ধন করে না। ঠাকুর বলতেন, তাঁর ছেলে-মানুষের স্বভাব। যে চায় না তাকে দিয়ে দিলে, যে চায় তাকে দিলে না!

ভদ্রমহিলা—তা হলে আমাদের কর্তব্য কি?

মা বললেন, তাঁর কৃপা প্রতীক্ষা কোরে থাকা। তাঁর আদেশ-পালন করা। তিনি তো যুগে যুগে এসে জীবকে কত উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু পালন করে কে? এই ত চোখের সামনে ঠাকুরের ত্যাগবৈরাগ্য, সাধনভজন, উপদেশ দেখলে, শুনলে। এখন কর্তব্য ত তোমার নিজের মুঠোর মধ্যে। বলেছেন, 'একটাও করলে ভেসে যাবে।'

ভদ্রমহিলাটি মাকে প্রণাম করে বললেন,—যাই বলুন মা, আপনি কৃপা না কোরলে কিছুই কিছু নয়।

মা হাসলেন—বললেন, তোমাদের সব মঙ্গল হোক।

* * *

কপিল মহারাজের (স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ) অসুখ করায় (১৩২৫, বৈশাখ) মঠ থেকে আমাকে 'উদ্বোধনে' পূজা করতে পাঠান হলো। বলরামমন্দিরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের দেহরক্ষার কিছু দিন পূর্বে (১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫) এক দিন সন্ধ্যারতির পূর্বে ঠাকুরঘরে (এখানেই শ্রীশ্রীমা থাকতেন) ধ্যান করছি, কিন্তু নীচে ভীষণ তর্ক বেধে গেছে যুদ্ধ-সম্বন্ধে। খুব অসুবিধা বোধ হতে লাগলো। কিছু দূরে মা বসে। রাধু এসে মাঝে মাঝে এটা সেটা প্রশ্ন করছে। বেলুড় মঠের সান্ধ্য নির্জনতা একেবারেই নেই, কিন্তু সামনে গুরু স্বয়ং। তথাপি মনে হচ্ছে 'এ কোথায় এলুম, এখানে যে ভয়ানক গোলমাল।' তখনই রাধু বলে উঠলো,—চল পিসিমা, জয়রামবাটী যাই। মা বলছেন, তা বললে কি হয়? হরিঠাকুর যখন যেখানে রাখেন তখন সেখানেই থাকতে হয়। আমার মনে ছ্যাঁক করে উঠলো, এ তো মা আমাকেই বলছেন, তাঁর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ কোরে সকল অবস্থায় সবংসহ হয়ে পড়ে থাকতে হয়। তখনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে উঠলো, "ঘুঁটি সব ঘর না ঘুরলে চিকে ওঠে না।" মনে খুব ধিক্কার উঠলো,—সামনে গুরু, আর ভাবছি কোথায় যাব? আরতির পর শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি নিয়ে প্রার্থনা করলুম, মা, যেন সর্বাবস্থায় আপনার পাদপদ্মে অচলা ভক্তি থাকে। আপনার পাদপদ্ম যেন ভুলিয়ে দেবেন না। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

'উদ্বোধনে' থাকা-কালীন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের পূজার পর চরণামৃত নিতেন। একদিন বাগ-বাজারের ৺সিদ্ধেশ্বরীর চরণামৃত এসেছে। আমি দুটি পৃথক পৃথক পাত্রে কোরে তাঁর সামনে ধরলুম। তিনি দোতলার বারান্দায় রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে (এখন সেখানে নাটমন্দিরের মত ছাত ও মেঝে হয়ে গেছে)। জিজ্ঞেস করলেন, ও দুটো কি? আমি বললুম, "একটিতে সিদ্ধেশ্বরীর চরণামৃত এবং আর একটিতে আমাদের ঠাকুরের চরণামৃত। বললেন, ও একই, তুমি মিশিয়ে দাও। আমি বললুম, আচ্ছা, কাল থেকে দেব। দেখলুম গম্ভীর হয়ে উঠলেন; বললেন, না, এখুনি আমার সামনেই তুমি মিশিয়ে দাও; আমি তখনই মিশিয়ে দিলুম, মা গ্রহণ করলেন। তারপর হাস্যমুখে সেই হাত আমার মাথায় বুলিয়ে দিলেন।

* * *

তখন 'উদ্বোধনে' ঠাকুরপূজা করি। সে দিন গুরুপূর্ণিমা; শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে বাতাস করছি, বেলা দশটা। মঠ থেকে সাধুব্রহ্মচারীরা ফল-পুষ্প-পত্রাদি নিয়ে শ্রীশ্রীমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্য এসেছেন। তাঁরা অঞ্জলি-অন্তে চলে গেলে মা কৃষ্ণলাল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ আমরুলি শাক্ এনেছে?—বলে হাসতে লাগলেন। বললেন,—দেখ, ঠাকুরের আকর্ষণ, তাঁর আকর্ষণে সব আসছে। সূর্যোদয়ে চাঁদও ম্লান হয়ে যায়, আবার পূর্ণিমায় কেবল বড় তারাগুলো দেখা যায়; চাঁদের আলোয় তারাও মিট মিট করে, কিন্তু সেই চাঁদ একটু সরে দাঁড়ায়, আর লোকে দেখে আকাশ ভরা তারা।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েদের কি হবে? এদের কি নিবেদিতাতেই শেষ হয়ে গেল?

মা বললেন,—তা কেন হবে মা? তারাও মুক্ত হবে। ঠাকুর কি শুধু পুরুষদের জন্য এসেছেন? মেয়েদের জন্যও এসেছেন। তারা কেউ কেউ তাঁর সঙ্গেই, তাঁর কাছ থেকেই এসেছে, কেউ কেউ মুক্ত হবার জন্য এসেছে, পরেও অনেকে আসবে। একটু একটু বাসনা আছে; নইলে জন্ম হবে কেন? কাকেও কাকেও তাঁর কাজের জন্য নিয়ে এসেছেন।

গোলাপ মা বললেন, শরতের কাছে শুনো, সুধীরা একদিন স্বপ্নে দেখলে, ঠাকুর একঘরে সভা কোরে বসে আছেন, নানান লোকজন—স্ত্রী-পুরুষ। সুধীরাকে বললেন, 'আমার একটু কাজ কোরে আসবি?' সে স্বীকৃত হলো, তখন বললেন, 'ঐ দরজাটা দিয়ে যা।' সে বললে, 'দরজা খুলে যেতেই দেখি এই সংসার'। (সুধীরা দেবীর দেহরক্ষার পর পুজ্যপাদ শরৎ মহারাজের নিকট ঐ কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি অনুরূপ কথাই বলেন।)

মা আবার বলতে লাগলেন,—কেউ কেউ জীবদুঃখে কাতর হয়ে এসেছে, দেখ কেমন ত্যাগী! একটু আধটু বাসনা আছে। জীবের প্রতি দুঃখ-বোধ থাকলেই জীবাদৃষ্ট গ্রহণ করতে হবেই—তাই জন্ম। কিন্তু জেনো সংসার-সমুদ্র অথৈ, কত হাতী এতে তলিয়ে গেল! খুব সাবধানে থাকতে হয়। গুরু কে? যিনি জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জানেন। তবে, এবার যারা ঠাকুরের কৃপার গণ্ডির মধ্যে এসে পড়েছে, তাদের শেষ জন্ম; তাদের আর ভয় নেই। ঠাকুরই কেমন কৌশল কোরে মায়ামুক্ত করে দেবেন; তিনি ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙেন। তাঁর কৃপায় মুক্ত হলে জীব নির্মল আকাশে পাখীর মত আনন্দে তাঁর মহিমা-গান কোরে কোরে বেড়ায়।...... শ্রীরামকৃষ্ণ-লোকের বিশ্রামই হলো ধ্যান।...... সেবার পরিশ্রমের মূল্য সেখানে বুঝতে পারবে।

(দুই)

স্বামী সিদ্ধানন্দ

১৯১৪ সালে শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে 'উদ্বোধনে' মায়েব বাড়ীতে আমায় কৃপা করেন। পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আমায় পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট পাঠান। রাগাল মহারাজ তখন ৺কাশীধামে ছিলেন।

শরৎ মহারাজ খুব গম্ভীর পুরুষ। যাহা হউক, ভয়ে ভয়ে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, মহারাজ, আমার দীক্ষার বিষয় মাকে জানাতে বলেছেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন, তুমি কাল আসনি কেন? তিনি তখনই কপিল মহারাজকে ডাকিয়া মহারাজের কথা মাকে জানাইতে বলিলেন। মা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন, ছেলেটিকে গঙ্গাস্নান করে আস্‌তে বলো। আমি গঙ্গাস্নান করিয়াই গিয়াছিলাম। মার কাছে যাওয়া-মাত্র বলিলেন,—বেশ, রাখাল পাঠিয়েছে, আর কথা কি? আর তুমি ত আমাদের আপনার জন গা। দীক্ষার সময় আমার মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়। কেবল সে অভূতপূর্ব আনন্দের স্মৃতি সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সেদিন কিছুই লইয়া যাইতে পারি নাই। পরদিন কিছু প্রণামী দিয়া মাকে দর্শন করিয়া আসিলাম। মন্ত্রে একটু সন্দেহ হওয়ায় মা ঠিক করিয়া দিলেন।

একদিন ভোরে 'উদ্বোধনে' মাকে প্রণাম করিতে গেলাম। ঐ সময় শরৎ মহারাজ প্রভৃতি ২।৪ জন সাধু মাকে প্রণাম করিতেছিলেন। শরৎ মহারাজের প্রণাম একটা দেখিবার জিনিষ ছিল। এমন ভাবটি, যেন প্রণামের সঙ্গে সর্বস্ব অর্পণ, আত্মসমর্পণ করিতেছেন! মাও প্রণাম করা-মাত্র চিবুক-স্পর্শ করিয়া ও মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

৺কাশী হইতে আর এক বার গিয়াছি। মা যেন বেশ চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, লাটু ভাল আছে ত? আমি বলিলাম, হাঁ মা, ভাল আছেন। বিশেষ একটা কাজে আমি কলিকাতা আসিয়াছিলাম। মাকে বলিলাম, লাটু মহারাজের কাছে থাকা বেশ কঠিন। মা বলিলেন, লাটু কি কম গা? তখন (দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন) আমার কাছে কারুর আসবার হুকুম ছিল না; লাটু আসতো। লাটু আমার ময়দা-ঠাসা, বাজার-করা প্রভৃতি কাজ করে দিত। লাটুর কাছে থাক্‌লে তোমার কল্যাণ হবে।

এক বার লাটু মহারাজকে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটী যাওয়ার কথা বলায় সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি আমায় যাওয়ার আদেশ দিলেন। বলিলেন, গুরুস্থান, যাবে বৈ কি? শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির পূর্বেই তাঁহার শ্রীচরণে পৌঁছিলাম। মা খুব খুসী হইলেন। জন্মতিথি-দিবসে তাঁহার শ্রীচরণে ফুল দিয়া পূজা করিলাম। সে যে কি গভীর পরিতৃপ্তি তাহা বলিবার নয়। মার শ্রীচরণপূজার ও করুণা-দৃষ্টি স্মরণ করিয়া এখনও আনন্দ হইতেছে।

আর এক বার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটীতে গিয়াছিলাম। মা খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন ও নিজেই এঁটো পরিষ্কার করিতেন; বারণ করিলে শুনিতেন না। বলিতেন, তোমরা আমার ছেলে। মা খবর লইলেন, শীতের জন্য বস্ত্র আছে কিনা। আছে বলিলাম। মা বলিলেন, অনেক ছেলেরা আনে না। শীতকাল—গরম কাপড় দরকার। একদিন মা মুড়ি ভাজিতেছিলেন। কাছে যাওয়া-মাত্র মা তখনই মুড়ি-জিলাপী খাইতে দিলেন।

বিদায় লইবার সময় মা একখানি কাপড় দিলেন। আমি কালীমামার নিকট গিয়া দেখাইতে তিনি উহা মাথায় জড়াইয়া লইতে বলিলেন।

৺কাশীধাম হইতে কলিকাতা যাওয়ার সময় জনৈক ভক্তকে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, আমার দক্ষিণেশ্বরের মা, আমাব মা। তিনি ঐ কথা মাকে বলায় মা একটু হাসিলেন। লাটু মহারাজ মায়ের জন্য কাশী হইতে লোক সঙ্গে নূতন কপি, বেগুন ইত্যাদি পাঠাইয়া দিতেন। লাটু মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, তোবা মাকে কি মনে কবিস? মুখেই মা মা করিস্। অমন মাতৃভক্তি আমি চাই না। আমাব মা লক্ষ্মী। আবার কখনও তিনি সীতা। মা আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন।

কাশীতে একদিন লাটু মহারাজ সহ ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতেছিলাম। সে সময় মা কাশীতে একটি ভক্তের বাড়ীতে ছিলেন। রাস্তা হইতে ফিরিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন, এখানে সাক্ষাৎ মা আছেন। লাটু মহারাজের সঙ্গে আমরা সকলে আগে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গেলাম। মাকে প্রণাম করাব সঙ্গে সঙ্গে লাটু মহারাজের ভাব হইল। নীচে নামিয়া বলিলেন, প্রসাদ নিয়ে এস। মা প্রসাদ দিলেন।

বৈদিক সাহিত্যে কৃষি

অধ্যাপক শ্রীবিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্-এ

মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পার খননকার্যের ফলে অবশ্য বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত সভ্যতাই যে প্রাচীনতম সভ্যতা নয়—তার অনেক আগে হ'তেই যে একটা সভ্যতা এই ভারতবর্ষেরই বুকের উপর জাঁকিয়ে রাজত্ব কোরেছিল এবং সেটা যে বৈদিক সভ্যতা হোতে উন্নত না হোলেও হীন নয়—এ ধারণাব সৃষ্টি হোয়েছে। নবাবিষ্কৃত এই সভ্যতাকে প্রাগ্-বৈদিক ব'লে যাঁরা মনে করেন তাঁরা ধ'রে নেন যে, আর্যরা বাহির হতে এর অনেক পরে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু সমস্ত বৈদিক *সাহিত্য তন্ন তন্ন কোরে ঘেঁটেও এমন একটা* কথাও পাই নি, যার থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, আর্যরা বহির্দেশ হ'তে আমাদের *দেশে এসেছিলেন।* এ ধারণা আমাদের মনে সৃষ্টি করেছে ইংরেজরা, আব সেই ধারণা নিয়েই আমাদেব দেশের ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষেব ইতিহাস লিখে গিয়েছেন। বস্তুতঃ 'আর্য'-শব্দ *কৃষ্টিবাচক, জাতিবাচক নয়।*

কিন্তু আমাদের সত্যকার ইতিহাসবধূকে বিলুপ্তির অন্তঃপুর থেকে টেনে আন্‌বার দায়িত্ব আমাদেরই—তার বিস্মৃতির অবগুণ্ঠনকে মোচন কোরে তাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করাব কর্তব্যও আমাদেরই। মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা খাঁটি বৈদিক সভ্যতা—*নির্ভেজাল ভারতীয় সভ্যতা।*

মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ যে উচ্চস্তরের সভ্যতার পরিচয় দেয় তা, একদিনে

নিশ্চয়ই গ'ড়ে ওঠে নি। একথা মার্শাল সাহেবও স্বীকার কোরেছেন, যখন তিনি বোলেছেন—"One thing that stands out clear and unmistakable both at Mohenjodaro and Harappa that the civilization revealed at these two places, is not an incipient civilization but one already ageold and stereotyped on Indian soil with *many millenia* of human endeavour behind it." সে সভ্যতার উৎসমুখে পিছন ফিরে চাইলে কতদূরে আমাদের দৃষ্টি যায় তাও বলা সহজ নয়। সে সভ্যতার ভাষা ও সাহিত্য নিশ্চয়ই বৈদিক সাহিত্যের ভাষা হতে ভিন্ন—আজও আবিষ্কৃত শীলমোহরগুলির পাঠোদ্ধার হয় নি। যে ভাষায় ও যে সাহিত্যে সেই সভ্যতার ইতিহাস বাঁধা ছিল তাও আজ লুপ্ত। বৈদিক সাহিত্য যে সভ্যতার ইতিহাস, সে সভ্যতা প্রাচীনতম নয়, তাহা মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পা-সভ্যতারই একটা অবিচ্ছিন্ন, হয়তো বা, উন্নততর ধারা—বৈদিক ঋষিদের পূর্বপুরুষরা এবং দেশবাসীরাই তার প্রতিষ্ঠাতা। এই অর্থেই উহা প্রাগ্-বৈদিক। উভয় সভ্যতার মধ্যে পথগত ব্যবধান আছে, উৎসগত ব্যবধান নেই। তবে ইতিহাস হিসাবে বৈদিক সাহিত্যকে প্রাচীনতম না বলে উপায় নেই—প্রাচীনতম ইতিহাস যা ছিল তা 'মৃতের স্তূপে'র (সিন্ধি ভাষায় প্রকৃত শব্দ 'মো অন্ জো দড়ো' এবং ইহার অর্থ 'মৃতের স্তূপ') মধ্যেই মরে গেছে। তবে ধারাগত অনবচ্ছিন্নতার জন্য তার কিছু কিছু কথা থেকে গিয়েছে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে—বেদের ঋষিরা স্মরণ করেছেন সে সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতৃগণকে, তাঁদের বলেছেন 'পূর্বজ', 'পথিকৃৎ'।

সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার প্রথম অধ্যায়ের কথা লিখতে বসলে আজ আর বেদ ছাড়া ঐতিহাসিকের কোনও অবলম্বন নেই। তার পূর্বের ইতিহাস বলবে মোহেন্জোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ এবং আম্‌সি দেখে আমের আকারের অনুমান যতখানি করা চলে, সে ইতিহাসও আমাদের ততখানি পরিমাণেই খাঁটি হবে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি বৈদিক যুগে কৃষি কতখানি উন্নত ছিল, তারই আলোচনা করবো। মনে হয়, মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পার যুগে কৃষির চাইতে বাণিজ্যের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হোয়েছিল বেশী—মোহেন্-জো-দাড়ো হ'তে সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত 'সার্থবাহ-পথ' (Caravan route)-গুলি তারই সাক্ষ্য দেয়। তথাপি কৃষি তখন অনুন্নত ছিল না। মোহেন্জো-দাড়োতে গমের যে নমুনা (sample) পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো বর্তমানেও পাঞ্জাবে যে শ্রেণীর গম উৎপন্ন হচ্ছে, সাক্ষাৎভাবে তারই পূর্বপুরুষ—বিশেষজ্ঞরাই এ কথা বোলেছেন। রুশ বৈজ্ঞানিকগণ এ কথাও স্বীকার কোরেছেন যে, এখনও পাশ্চাত্যদেশে যে গম জন্মায়, সেগুলো আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও পাঞ্জাব থেকেই ওদিকে গিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া মোহেন্-জো-দাড়োতে কাপড়ের টুকরো ও সুতাকাটার অসংখ্য টেকো পাওয়া গিয়েছে। কৃষি অত্যন্ত উন্নত না হোলে কোনও জাতিই একসংগে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না।

পাশ্চাত্য দেশে ভার্জিল রচিত "Gergic Circa' (খৃঃ পূঃ ৪০) কৃষিবিজ্ঞানের উপর প্রথম গ্রন্থ, এ কথা বোধ হয় খুব অত্যুক্তি নয়। তারপরে ১২৪০ খৃষ্টাব্দে Petrus Crescentius হ'তে আরম্ভ কোরে Van Helmont (১৬২৭), Jethro Tull (১৭৩১), Kulbel (১৭৪১), Priestley (১৭৭৫), Ingen Howz (১৭৭৯) এবং উনবিংশ শতাব্দীতে Theodore de

Sanssure প্রভৃতি নব নব অবদানে কৃষিবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ কোরে তুলেছেন। নিজের দেশের ঐতিহ্যকে বড় কোরে দেখবার ও দেখাবার জন্য সভ্যতার সর্বক্ষেত্রে বর্তমান বিজ্ঞানের দানকে গায়ের জোরে অস্বীকার করা চলে না। তবু, আমরা কী হব বা কী হ'তে পারি তা জানতে হ'লে আগে আমাদের বুঝতে হবে আমরা কী ছিলাম।

ঋগ্বেদ ১০।৩৪ সূক্তের একটি মন্ত্রে কৃষির মাহাত্ম্য বোধ হয় সর্বাপেক্ষা আবেগময়ী ভাষায় রূপ পেয়েছে। জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত ও অনুতাপ-দগ্ধ কোনও জুয়াড়ীর মুখ দিয়েই ঋগ্বেদের ঋষি বিধান দিচ্ছেন—

অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব।
বিত্তে রমস্ব বহুমন্যমানঃ॥
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া
তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্যঃ॥ (ঋ, ১০।৩৪।১৩)

—অর্থাৎ, 'হে কিতব, জুয়া খেলিও না। চাষ কর; তাতেই যা পাবে তাই বহু মনে কোরে সন্তুষ্ট থাক। স্ত্রী, গোধন প্রভৃতি সব কিছুই তা থেকেই হবে। সবিতা আমাকে এই কথাই বোলেছেন।' অথর্ববেদে আছে—

তে কৃষিং চ সস্যং চ মনুষ্যা উপজীবন্তি (৮।১৩।১২)

—অর্থাৎ, কৃষি ও শস্যের উপর নির্ভর কোরেই মানুষ বেঁচে থাকে। কৃষির অপরিহার্য অংগ—ফাল, কিষাণ, বলদ আর জল। তাই ঋগ্বেদের ঋষি প্রার্থনা করছেন—

শুনং ন ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা
অভিযন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা
শুনমস্মাসু ধত্তম্॥ (৪।৫৭।৮)

—অর্থাৎ, 'ফাল উত্তমরূপে জমি কর্ষণ করুক; কিষাণ বলদের সহিত সানন্দে চলিতে থাকুক; মেঘ উত্তম বৃষ্টিদান করুক; হল ও ফাল আমাকে আনন্দ দান করুক।' 'শুনাসীর' শব্দ হল ও ফালকেই (কর্ষণকালে লাংগলের যে অংশ ভূমধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়) বুঝাইয়াছে। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদেও সামান্য একটু ভাষার হেরফের কোরে ঐ একই প্রার্থনা দেখতে পাওয়া যায়—

শুনং সুফালা বিকৃষন্তু ভূমিং
শুনং কীনাশা অভিযন্তু বাহৈঃ॥
শুনাসীরা হবিষা তোশমানা
সুপিপ্‌পলা ওষধীঃ কর্তনাস্মৈ॥

(যজু. ১২।৬৯)

ও

শুনং সুফালা বিতুদন্তু ভূমিং
শুনং কীনাশা অনুযন্তু বাহান্॥

(অথর্ব, ৩।১৭।৫)

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রেই বলদ, কিষাণ, হল, এমন কী বলদ চালাবার জন্য কিষাণের হাতে 'চাবুকে'রও উল্লেখ আছে। ঐ মন্ত্রেই 'লাংগল'-শব্দেরও উল্লেখ দেখা যায়—

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাংগলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিংগয়॥ (৩।১৭।৬)

বলদ, কিষাণ ও লাংগল আনন্দের সংগে চাষ করুক। আনন্দের সংগে হল চালাও এবং চাবুক তোল।

আমাদের ভক্ষ্য ও পেয় কৃষিরই দান। তাই এ দুটিকে বলা হ'য়েছে 'কৃষির দুগ্ধ'—

যদশ্নাসি যৎ পিবসি ধান্যং কৃষ্যাঃ পয়ঃ॥

(অথর্ব, ৮।২।১৯)

ভূমি আমাদের মা, আমরা মায়ের দুগ্ধ পান কোরেই বেঁচে থাকি—

মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ॥ (অথর্ব, ১২।১।১২)

ফাল জমিকর্ষণ করে অন্ন উৎপন্ন ক'রে। ঋগ্বেদের ঋষি বলছেন, পুরুষকার অবলম্বন কর, স্বহস্তে হলচালনা কর, অন্ন আপনা হতেই মিলবে। চলমান ব্যক্তি পদসাহায্যেই পথ

অতিক্রম করে। স্বাবলম্বী হও, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ, অন্নের অভাব কখনই হবে না—

কৃষন্নিৎ ফাল আশিতং কৃণোতি
যন্নধ্বানমপবৃঙ্‌ক্তে চরিত্রৈঃ॥ (ঋ, ১০।১১৭।৭)

হল বা লাংগলের কথা জানা গেল। বলদে লাংগল টানিত তাহাও জানা গেল। এখন সাধারণতঃ আমরা যে সকল লাংগল দেখি তাহা দুইটি বলদের দ্বারাই বাহিত হয; কিন্তু বৈদিক যুগে একটি লাংগল ছয়টি, আটটি এমনকী বারটি বলদে পর্যন্ত টানত। ইহা হতে তৎকালে প্রচলিত লাংগলের আয়তন কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। এই সব লাংগলকে 'ষড়্‌যোগ', 'অষ্টাযোগ', 'দ্বাদশাযোগ' বা 'ষড়্‌গব', 'অষ্টাগব' বা 'দ্বাদশগব' ব'লে উল্লেখ করা হোয়েছে। বাহুল্যভয়ে মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত কোরলাম না, স্থাননির্দেশ কোরলাম মাত্র—অথর্ব, ৮।৯।১৬; ৬।৯১।১; তৈ স, ৫।২।৫।২; শ ব্রা, ১৩।৮।২।৩ ইত্যাদি।

হলচালনার সময় কিষাণ হলের যে অংশ হাত দিয়া চাপিয়া ধরত তাকে বলা হোত 'ৎসরুঃ' (অথর্ব, ৩।১৭।৩)। কিষাণের হাতের চাবুককে বলা হোত 'তোদ', 'তোত্র', 'অষ্ট্রা' (ঋ, ৪।৫৭।৪; ৪।১৬।১১; ৬।৫৩।৯;) ফালের নামান্তর ছিল 'স্তেগ' (ঋ, ১০।৩১।৯; অথর্ব ১৮।১।৩৯)।

মানুষের বাঁচবার পক্ষে কৃষির অপরিহার্যতা ঋষিরা উপলব্ধি কোরেছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁরা শুধু স্বর্গের কামনাই করেন নি, বৃষ্টি ও কৃষির জন্যও প্রার্থনা জানিয়েছেন—

কৃষিশ্চ মে বৃষ্টিশ্চ মে জৈত্রং চ ম ঔদ্‌ভিদ্যং
চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্। (যজুঃ, ১৮।৯)

অথর্ববেদেও রাজার বহু কর্তব্যের মধ্যে কৃষির উন্নতিসাধনকেও একটা কর্তব্য বোলে ধরা হোয়েছে—

নো রাজা নি কৃষিং তনোতু॥ (অথর্ব ৩।১২।৪)

কৃষি হ'তে তখনকার দিনে কী কী শস্য উৎপন্ন হোতো, তা জানা আমাদের পক্ষে খুব কষ্টকর নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দশ রকম শস্যের নাম পাওয়া যায় (৬।৩।২২)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় বার রকম শস্যের নাম পাওয়া যায়—ব্রীহি, যব, মাষ, তিল, মুগ, খল্ব (ছোলা), প্রিয়ংগু, অণু, শ্যামাক, নীবার, গোধূম ও মসূর,—

ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ মে
তীলাশ্চ মে মুদ্‌গাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে
প্রিয়ংগবশ্চ মে অণবশ্চ মে শ্যামাকাশ্চ
মে নীবারাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে মসূরাশ্চ
মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্। (বা, স, ১৮,১২)

ইহা ছাড়া বৈদিক সাহিত্যে অন্যান্য যে সব শস্যের নাম পাওয়া যায় নীচে তাদের মোটামুটী উল্লেখ ও স্থাননির্দেশ করা গেল—

কুল্মাষ—ছা উ, ১।১০।২; আম্ব—কাঠক স, ১৫।৫; তৈ স, ।১৮।১০।১; নাম্ব—শ ব্রা, ৫।৩।৩।৮; ধানা, ধান্য—ঋ, ১।১৬।২; ৬।১২।৪; শালী—অথর্ব, ৩।১৪।৫; গর্মুত—তৈ স, ২।৪।৪।১; গবেধুকা—শ ব্রা, ৫।২; উপবাক—বা,স, ২১।৩০; তির্য, তিল—অথর্ব, ৪।৭।৬; ২।৮।৩; ক্লাণ্ডক—শ ব্রা, ৫।৩।৩।২; মসূষ্য—তৈ ব্রা, ৩।৮।১৪।৬; সস্য—অথর্ব, ৭।২।১ ইত্যাদি।

হল জোতা হতে আরম্ভ কোরে ঘরে শস্য তোলা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলির উল্লেখ আছে—

যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং
কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয়
ইৎ সৃণ্যঃ পকমেয়াৎ। (ঋ, ১০।১০১।৩)

—লাংগল জোড়ো, যুগ (বলদের কাঁধে যে অংশ স্থাপিত থাকে) ঠিক কর, জমি প্রস্তুত করিয়া বীজ বপন কর। গান গাইতে গাইতে আমি প্রচুর ধান্য পাব এবং

ধান পাকলে আমার 'সৃণী' ('কাস্তে' বা 'হেঁসো, যা দ্বারা ধান কাটা হয়) উহার নিকট গমন করবে।

আবার

কৃষন্তো হ স্মৈব পূর্বে, বপন্তো, যন্তি লুনন্তো, অপরে মৃণন্তঃ। (শ ব্রা, ১৷৬৷১৷৩)

—কেহ হল চালনা করে, কেহ বীজ বপন করে (এদের বলা হ'য়েছে 'ধান্যাকৃৎ'—ঋ, ১০৷৯৪৷১৩), কেহ ধান কাটে আবার কেউ সেই ধান গাছ হতে ঝেড়ে পৃথক্ করে।

মাঠে ধান পাকলে কৃষক তা' কাস্তে বা হেঁসো দ্বারা কেটে এক স্থানে জড় করত; এই কাস্তে বা হেঁসোকে বলা হত 'সৃণী' বা 'দাত্র'। কাটা ধানগাছগুলি আঁটি বেঁধে রাখা হত। আঁটিকে বলা হত 'পর্ষ'। সমস্ত দিন মাঠে মাঠে ধান কেটে কৃষক তা জড়ো করে রেখেছে, ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করছে যেন সে তা' ভোগ করতে পারে—

তবেদিন্দ্রাহমাশসা হস্তে দাত্রং চ নাদদে।
দিনস্য বা মঘবন্ সম্ভৃতস্য বা পূর্ধি যবস্য কাশিনা॥
(ঋ, ৮৷৭৮৷১০)

ঐ ধানের আঁটি ঘরে এনে পাথরের উপর আছাড় দিয়ে ধানগুলিকে গাছ হতে পৃথক করে লওয়া হত। ঐ পাথরকে বলা হত 'খল'। কিংবা 'খল' হয়তো কোনও বৃহৎ পাত্র ছিল, যার মধ্যে গাছগুলি রেখে পেষণ করলেই ধানগুলি আলাদা হয়ে যেত। 'চালুনি' দিয়ে ছাতু চালা হত (ঋ, ১০৷৭১৷২), চালুনিকে বলা হত 'তিতউ'। ধান কোটা হওয়ার পর কুলায় করে তা' ঝাড়া হত, যাতে তুষ ও খুদগুলি পৃথক্ হয়ে যায় (অথর্ব, ১২৷৩৷১৯)। এই কুলাকে বলা হত 'শূর্প'। বর্ষাকালে জন্মায় এমন একজাতীয় গুল্ম (বেত?) দ্বারা এই শূর্প তৈরী করা হত—এইজন্য একে বলা হয়েছে 'বর্ষবৃদ্ধ'। ঝাড়বার পর পরিষ্কার চাল বেরোল—এই চালকে বলা হয়েছে 'তণ্ডুল' (অ, ১০৷৯৷২৬)। এবং যে খোসাগুলি বেরিয়ে যায় তাকে বলা হত 'তুষ' (ঐ, ৯৷১৬৷১৬)। সতুষ ধানকে বলা হয়েছে 'অকর্ণ' এবং চালকে বলা হয়েছে 'কর্ণ' (তৈ স, ১৷৮৷৯৩)। চাল বেরোবার পর তাকে মেপে ঘরে তোলা হত। যে পাত্রে মাপা হত তাকে বলা হত 'উর্দর' (ঋ, ২৷১৪৷১১)।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে কর্ষণোপযোগিতা ও উৎপাদিকা শক্তি-অনুসারে ভূমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হোয়েছে—(১) আর্তনা (২) অপ্নস্বতী (৩) উর্বরা (ঋ, ১৷১২৭৷৬)। 'আর্তনা' ভূমিই বোধ হয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছিল এবং এতে চাষ করা কষ্টসাধ্য ছিল ব'লেই এই রকম নাম দেওয়া হোয়েছে। সব জমিতেই চাষ করা হোত না; গোচারণের জন্য কতকগুলি জমিকে পতিত রাখা হোত। এই জমিকে বলা হত 'খিল' (অথর্ব, ৭৷১১৫৷৪)। এখনকার মত বোধ হয় তখনও প্রত্যেকের জমির পরিমাণের হিসাব রাখা হোত, কারণ জমি মাপার পদ্ধতি তখন প্রচলিত ছিল (ঋ, ১৷১১০৷৫)। যাঁরা জমির মাপজোপ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের বলা হোত 'ক্ষেত্রবিৎ' (ঋ, ১০৷৩২৷৫)।

জমির উর্বরতা-শক্তি বাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে জমিতে চাষ বন্ধ করা হোত। কখনও বা একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্নরকম শস্যের চাষ করা হোত (তৈ স, ৫৷৭৷৩)। গোবর যে জমির একটা ভাল সার এ তথ্য তৎকালে অজ্ঞাত ছিল না এবং জমিতে গোবরের সারও দেওয়া হোত (ঋ, ১৷১৬১৷১০; অথর্ব, ১২৷৪৷৯; তৈ স, ৭৷১৷১৯৷৩)।

ঋগ্বেদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটি হ'তে জানা যায় যে, জমিতে জলসেচনের জন্য তখনকার লোকে নৈসর্গিক উপায়ের উপর নির্ভর করেই শুধু ব'সে থাক্‌তো না, কৃত্রিম উপায়ে নদী পর্যন্ত খাল খনন কোরে জমিতে জল আনা হোত—

যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি
খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ ॥
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ
তা আপো দেবীবিহ মামবন্ত ॥

(ঋ, ৭।৪।৯।২)

এই মন্ত্রে জলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হোয়েছে—(১) দিব্যা আপঃ—অর্থাৎ, বৃষ্টির জল। (২) খনিত্রিমা আপঃ অর্থাৎ যে জল খাল খনন করে আনা হত। (৩) স্বয়ংজা আপঃ — অর্থাৎ স্বভাবজাত ঝরণা ইত্যাদির জল। 'খনিত্রিমা আপঃ'-সম্বন্ধে Vedic Index-এর উক্তি এই প্রসংগে প্রণিধানযোগ্য—"Khanitrima apah, waters produced by digging, clearly refers to artificial water channels used for irrigation."

মোটামুটি বৈদিক যুগের কৃষি-সম্বন্ধে যেটুকু বিবরণ দেওয়া হল তাতে তৎকালীন কৃষিকে কোনও রূপেই নিম্নস্তরের বলা চলতে পারে না। বিশেষতঃ, এখন আমরা দ্বাদশবৃষ-বাহিত বৃহদায়তন লাংগলের কথা কল্পনাতেও আনতে পারি না। অনুসন্ধান করলে কৃষিসম্বন্ধীয় আরও অনেক তথ্যই উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। এই বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

বিশ্ব-দেউলের দেবতা

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

নুয়ে পড়া দেহ টেনে টেনে নিয়ে বৃদ্ধ অশীতিপর
গেল বছরেও গিয়াছিল রথে লাঠিতে করিয়া ভর।
বিগ্রহ যবে মন্দির হ'তে উঠাল রথের 'পরে,
গাঁথি মালা নানা গন্ধ-কুসুমে পরম ভক্তিভরে
সাজায়ে অর্ঘ্য নানা উপচারে পূজিয়া জগন্নাথে,
ভূমিতল হ'তে পদরজ লয়ে মাখিল আপন মাথে।
তারপর রথ হ'লে গতিমান রশিটি পরশ করি'
'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিল আননে—পরাণ উঠিল ভরি'।
বরষের পরে আজি পুন এল রথযাত্রার দিন ;—
আজিকে বৃদ্ধ লাঠির ভরেও চলিতে শক্তিহীন।

ঢুকে গেছে দূর মন্দিরে গিয়া মাল্য অর্ঘ্য দান,
নাহি আর আশা রশ্মি পরশের রথে যবে পড়ে টান।
বসতি তাহার পর্ণকুটিরে যাতায়াত-পথ পাশে—
না হ'তে প্রভাত রথযাত্রীর কোলাহল কানে ভাসে।
বৃদ্ধ তখন তনয়ে ডাকিয়া কহিল আবেগ-ভরে—
"অঙ্গন মোর পূত করে' রাখ গোময়ে লেপন করে।
আসিবেন এই অঙ্গনতলে দয়াল জগন্নাথ,
করিব বরণ পিতা ও পুত্র মোরা হয়ে একসাথ।"
ভাবিল তনয়—এ বাণী পিতার নিরাশ বেদনাময়।
ব্যথা পেয়ে তাই পিতারে সে ধীরে সুকোমল স্বরে কয়—
"বহুদূরে রহে ঠাকুরের রথ, কেমনে আসিবে হেথা?
দুঃখ ক'রো না, বহিয়া তোমারে আমি নিয়ে যাব সেথা।"
শুনে কহে পিতা—"ভুল বুঝো না'ক, কোন ব্যথা নাই মনে,
বলেছি সত্য, রথে চড়ে' দেব আসিবেন এ অঙ্গনে।
গৃহ মোর জলসত্র হইবে, ঘড়া ভরে' রাখ জল;
ফিরিবে যখন নিদাঘ-শ্রান্ত ভক্ত যাত্রিদল,
তুষিব সবারে জলদানে আমি ক্লান্তি করিয়া দূর—
ভক্তিধারায় আজি তাহাদেব প্রাণ মন ভরপুর।
পুরাতে বাসনা সেবা নিতে মোর ভক্তের হিয়া-রথে
দয়াল জগন্নাথ আসিবেন আজি এ সুদূব পথে।
যত গোপী তত কৃষ্ণ হলেন দ্বাপরে বৃন্দাবনে,
আজি হবে পুন সেই অভিনয় হেথা মোর অঙ্গনে।
অযুত ভক্ত-হিয়া মাঝে হেরি' অযুত জগন্নাথে
পুলকিত চিতে অঙ্গনভরা পদধূলি ল'ব মাথে।
ভক্তজনের পূত পদধূলি তাঁরি পদরজ মানি,
অচ্যুতধামে চলিবার পথে সেইতো পাথেয় জানি।
প্রতি মানুষের হিয়া মাঝে যদি তাঁর দেখা পাই তবে
চলিতে শক্তি নাই বলে' মোর কেন বল দুখ হবে?
মানুষের গড়া মন্দিরে মোর প্রয়োজন কিসে আর?
তাঁহারি রচিত বিশ্ব-দেউলে পেয়েছি যে দেখা তাঁর॥"

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) যে বইখানি লিখেছেন তার উপক্রমণিকায় আছে: কোন ধর্মকে অথবা ধর্মমাত্রকেই জানতে, বিচার করতে অথবা নিন্দা করতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন অধ্যাত্ম-চেতনার ব্যাপারে নিজে গবেষণা করা। কথাটা খুব সত্য। অনেক লোক আছেন যাঁদের ধর্মভাব বলতে কিছু নেই। ধর্ম কিছুই নয়, একটা বুজরুগি-মাত্র—এই কথাটা প্রমাণ করবার জন্য সর্বদাই তাঁরা সচেষ্ট। যা তাঁরা বোঝেন না তাকে আক্রমণ করবার এ ধৃষ্টতা কেন?

আমরা যে জানিনে তার কারণ আমরা জানতে চাই নে। ঈশ্বরকে জানবার জন্যে আমাদের মনে কৌতূহলের অভাব। ঠাকুর বলতেন: প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ক'রে ভগবানকে পাবো। গুরু তাকে জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে এনে বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হ'য়েছিল? শিষ্য বল্লে—যেন প্রাণ যায়। গুরু বল্লেন, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে। ঈশ্বরকে জানবার জন্য কোনই ব্যাকুলতা নেই, অথচ বলবো ঈশ্বর নেই—এর কোন মানে হয় না। ঠাকুর বলতেন, তিন টান এক হ'লে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান—এই তিন ভালোবাসা একসঙ্গে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়। ঠাকুর ব্যাকুলতার উপরে বারংবার জোর দিয়েছেন। বলেছেন, ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেরই ভোগান্ত না হ'লে ব্যাকুলতা আসে কই?

কলম্বাস যে আমেরিকাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, সেও তো নূতন দেশকে জানবার জন্য তাঁর দুরন্ত কৌতূহলের জন্যে। যেখানে কোন নাবিক যেতে সাহস করে নি সেখানে যাবার জন্য অজানা সমুদ্রে তিনি তরী ভাসিয়ে দিলেন। কোন-কিছুর পরোয়া করলেন না। মাঝ দরিয়ায় নৌকাডুবি হতে পারে, সেই সঙ্গে নিজেরাও সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যেতে পারেন এরকমের কোন দুশ্চিন্তা কলম্বাসকে নিরস্ত করতে পারলো না। বেরিয়ে পড়লেন তিনি। শুয়ে থাকা নয়, ব'সে থাকা নয়, দাঁড়িয়ে থাকাও নয়। দুনিয়ায় যারা বিপদ-বাধাকে তুচ্ছ ক'রে চলতে পেরেছে, অজানার আকর্ষণে তাদেরই নব নব আবিষ্কার মানুষের সভ্যতাকে গৌরবের শিখর থেকে গৌরবের শিখরে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কলম্বাস রাতে আমেরিকার স্বপ্ন দেখতেন!

ঈশ্বরকে জানবার জন্যও এই রকমের একটা পাগলামি চাই। ঠাকুর বলতেন, "মাগের ব্যামো হ'লে, কি টাকা লোকসান হলে, কি কর্মের জন্য লোকে এক ঘটী কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল দেখি!" ভৌগোলিক সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্য যে চলার সাহস আমরা দেখেছি কলম্বাসের মধ্যে, আধ্যাত্মিক সত্যকে আবিষ্কার

করবার জন্য সমস্ত সুখ এবং আরামকে পিছনে ফেলে সাধনার ক্ষুরধার দুর্গম পথে চল্‌বার সেই সাহস আমরা দেখেছি ভারতীয় সাধকদের মধ্যে যুগে যুগে। কঠোপনিষদে যম এই সত্যান্বেষণ থেকে নচিকেতাকে নিরস্ত করবার জন্য কত রকমের পার্থিব সুখের প্রলোভন দেখিয়েছেন! কিন্তু কোন প্রলোভনই ঋষিপুত্রকে তাঁর বজ্র-কঠোর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। নচিকেতার যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রীরাম-কৃষ্ণের যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তের ইতিহাসে (আমরা দেখেছি পরম সত্যকে জয় করবার জন্য) অভিযানের পর অভিযান। যা চরম সত্য, তাকে শুধু একটা দার্শনিক তত্ত্ব-হিসাবে জেনে তাঁরা খুসী থাকেন নি। যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁকে চোখ দিয়ে দেখা চাই, তাঁর বাণী শোনা চাই কান দিয়ে, তাঁব অঙ্গেব গন্ধ পে'তে হবে নাসিকায়, সর্বাঙ্গ দিয়ে পেতে হবে তাঁর স্পর্শ। ভারতের সাধকেরা তাঁদের অধ্যাত্ম-চেতনায় পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে এই উপলব্ধির কথা নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। 'কথামৃতে'র তৃতীয় ভাগে এক জায়গায় আছে: "ঈশ্বরকে দেখা যায়, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি!"

ঈশ্বরকে সমগ্রভাবে জানবার জন্য দক্ষিণে-শ্বরের গঙ্গাতীরে আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রার যে চমকপ্রদ ইতিহাস তৈরী হয়েছে—তার বুঝি তুলনা নেই। ভৈরবী এসে কেমন ক'রে ঠাকুরকে তন্ত্রের সাধনায় দীক্ষা দিলেন, কেমন ক'রে স্নেহময়ী জননীর শুশ্রূষার দ্বারা ব্রাহ্মণী তাঁকে ধীরে ধীরে সুস্থ ক'রে তুললেন, কেমন ক'রে ধর্মজগতের নানা রহস্যের সঙ্গে একে একে তাঁর পরিচয় করালেন—সে সব কথা পড়তে পড়তে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। তারপর উলঙ্গ সন্ন্যাসী তোতাপুরী কেমন ক'রে অদ্বৈতবেদান্তের পথে তাঁকে নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ-পারাবারে পৌঁছে দিলেন, কি ক'রে বিচারের তরবারির দ্বারা মায়ের রূপকে দু'টুক্‌রো ক'রে অবশেষে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম শিখরে গিয়ে তিনি পৌঁছালেন—তার কাহিনীর কাছে আরব্যোপ-ন্যাসের কাহিনী হার মানে।

ঠাকুরের এই অধ্যাত্ম সাধনাব তীর্থযাত্রার বিঘ্নসঙ্কুল ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে যে-কথাটি আমাদের মনে বারংবার জাগে তা হ'চ্ছে—পরম সত্যের পরিচয় পেতে গিয়ে কোথাও তিনি থামেন নি। তিনি ছিলেন ভক্ত। ভক্তের ভাবপ্রবণ হৃদয় নিয়ে তিনি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ঈশ্বরের রূপের সাগরে ডুবে থাক্‌তে, তাঁকে স্পর্শ করতে, তাঁর জীবন্ত কায়াকে দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে, তাঁর আনন্দ-সমুদ্রে ভাস্‌তে। তোতাপুরী যখন বল্‌লেন যিনি অরূপ, যিনি নির্গুণ তাঁর মধ্যে তনুমনকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিতে, তখন সেই অরূপের কঠোর সাধনার ব্রতী থাক্‌তে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। নাম এবং রূপের রাজ্যকে অতিক্রম ক'রে গিয়ে নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে ডুব্ দিতে পারা কি সহজ কথা! যতবার তিনি সেই চেষ্টা করেন ততবারই মায়েব রূপ এসে তাঁকে বাধা দেয়। সেই আধ্যাত্মিক সংগ্রামের অদ্ভুত কাহিনী পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়: ঠাকুর ছিলেন চিরকালের পরিব্রাজক, চিরকালের পথচারী। তীর্থযাত্রার পথে শিখরের পর শিখর অতিক্রম ক'রে চ'লেছেন তিনি পরম-সত্যকে উপলব্ধি করবার সুতীব্র উন্মাদনায়। পুরাতনের জাবর কাট্‌বার কোন লক্ষণ নেই, অতীত নিয়ে পড়ে থাক্‌বার কোন জড়তা নেই। চলেছেন পরমসত্যের গৌরীশৃঙ্গকে আবিষ্কার

করতে গিরিচূড়ার পর গিরিচূড়াকে পেরিয়ে, উপত্যকার পর উপত্যকাকে পিছনে ফেলে। এক একটি চূড়াকে অতিক্রম করতে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছে তবু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবার নামটি নেই। ঠাকুর কথামৃতের মধ্যে বলেছেন: "আমায় সব ধর্ম একবার ক'রে নিতে হ'য়েছিল, —হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ;—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত,—এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর,—তাঁর কাছেই সকলে আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।"

ঠাকুরের কণ্ঠে, সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী। পরম-সত্যের শিখরদেশে আরোহণ করেছিলেন তিনি নানাদিক থেকে, নানা পথকে অনুসরণ ক'রে। সত্য তাই বিভিন্ন মূর্তিতে তাঁর কাছে প্রতিভাত হ'য়েছিল। সাধারণ সাধকেরা খণ্ড সত্য নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকেন। সত্যের যে-টুকু অংশ ধরা দিয়েছে তাঁদের দৃষ্টিতে তারই সঙ্গে তাঁদের জীবনব্যাপী কারবার। সেই আংশিক সত্য দিয়ে তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ যখন চলে যায় তখন দরকার কি 'সত্য' 'সত্য' ক'রে সুস্থ মনকে বড্ড বেশী ব্যস্ত করবার? তাঁরা আছেন নিজের নিজের কুঠুরিতে বন্দী হ'য়ে। বাড়ীর একতলায় দোতলায় আরও যে লোক আছে তাদের অস্তিত্ব-সম্পর্কে উদাসীন তাঁরা; প্রতিবেশীদের পদধ্বনি তাঁদের কানে যায় না। ঠাকুরের মধ্যে এই উদাসীনতা আমরা কখনও দেখিনি। যুগে যুগে দেশে দেশে আবির্ভূত হ'লেন যাঁরা স্বর্গের আলোতে প্রাণের প্রদীপকে জ্বালিয়ে নিয়ে,—পরম সত্যের অভ্রভেদী গিরিশিখরে উপনীত হবার জন্য যাঁরা করলেন সুকঠিন তপস্যা, গভীরসমুদ্রের তলায় ডুব দিয়ে যাঁরা সংগ্রহ ক'রে আনলেন আধ্যাত্মিক রাজ্যের দুর্লভ মণিমুক্তা, তাঁদের সাধনাকে ঠাকুর নিজের সাধনা ক'রে নিলেন। পরিব্রাজকের দণ্ডহাতে তিনি বাহির হ'লেন তীর্থযাত্রায় সত্যকে তার বিচিত্ররূপে দেখতে, সাধকের পর সাধকের ধর্মসাধনার নিগূঢ় রহস্যকে জানতে। চললেন সাধনার পর সাধনার পথকে অনুসরণ ক'রে। বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই, জড়তা নেই। তীর্থযাত্রার পর তীর্থযাত্রা সমাপ্ত ক'রে কি দেখলেন তিনি? দেখলেন সেই এক ঈশ্বর। তাঁর কাছে সকলই আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। শুনলেন শতাব্দীর পর শতাব্দীর কণ্ঠ থেকে উঠছে বিচিত্র সুর আর সেই সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছে এক মহাসঙ্গীতের ইন্দ্রলোক। কোন মতবাদের তিনি নিন্দা করলেন না, কোন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তিনি বক্রদৃষ্টিতে চাইলেন না। যতকিছু ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছে কালে কালে দেশে দেশে, তাদের সকলের মূলে তিনি করলেন জলসিঞ্চন। তিনি স্বীকার করলেন দ্বৈতবাদকে, স্বীকার করলেন অদ্বৈতবাদকে, স্বীকার করলেন বিশ্বাসের প্রয়োজনকে, স্বীকার করলেন বিচারের প্রয়োজনকেও, স্বীকার করলেন সাকারবাদকে, স্বীকার করলেন নিরাকার ব্রহ্মকেও। পরস্পর-বিরোধী সুরগুলিকে তিনি মিলিয়ে দিলেন এক বিরাট ঐকতানের মধ্যে। বললেন, 'মিছরির রুটি সিধে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও, মিষ্ট লাগবে।'

হুইট্‌ম্যানের কবিতায় আছে:

My gait is no fault-finder's or
rejecter's gait,
I moisten the roots of all that
has grown.

এ যেন ঠাকুরের কথা!

পৃথিবীর ধর্মসাধনার ইতিহাসে ঠাকুর যা করলেন এবং যা বললেন, তার সত্যসত্যই কোন তুলনা নেই। নিন্দা নয়, কলহ নয়,—শ্রদ্ধা। ছিদ্রান্বেষণ নয়, নিজের বিশ্বাসের এবং আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টার পিছনে যে অভিমান

প্রচ্ছন্ন থাকে—সেই আত্মাভিমান নয়;—নম্রতা। দশ জনকে নিজের চেলা বানিয়ে গুরুগিরি করবারও কোন উদ্যম নেই। একজনের কথা উল্লেখ ক'রে গিরিশ ঠাকুরকে একবার বল্লেন: 'সে আপনার চেলা।' ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন: চেলা-টেলা নেই; আমি রামের দাসানুদাস!' ঠাকুর ঐক্যে যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি বিচিত্রতায়। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা—এ তো ঠাকুরেরই কথা। ঈশ্বর যখন মানুষকে আলাদা আলাদা রুচি দিয়ে, প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তখন অপরকে আমার ছায়াতে ও প্রতিধ্বনিতে পর্যবসিত করবার ঔদ্ধত্য কেন? কেন মনে করবো, আমার মতের সঙ্গে যার মতের মিল হোলো না, সে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত এবং আমিই ঠিক? কেনই বা মনে করবো আমার জীবন নিরর্থক এবং পরের অনুকরণ করা ছাড়া জীবনকে সফল করা সম্ভব নয়? ঈশ্বরের লীলাবৈচিত্র্যে বিশ্বাস না থাকলে এক ক্ষুরে সকলেরই মাথা কামানোর ইচ্ছা বলবতী হওয়া স্বাভাবিক, ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসে শ্রদ্ধা রাখা কঠিন। ফরাসী মনীষী মন্‌তাইন্ (Montaign) ঠিকই বলেছেন: "সাধারণ লোকে একটা ভুল ক'রে থাকে। নিজের সঙ্গে মিলিয়ে তারা অন্যের বিচার করে। আমি সে ভুল করি নে। অন্যেরা যেহেতু আমার থেকে স্বতন্ত্র সেই হেতু আমি তাদের আরও বেশী ভালোবাসি, আরও বেশী শ্রদ্ধা করি।" এ যেন ঠাকুরেরই কথা। রোমাঁ রোলাঁ 'রামকৃষ্ণের জীবনী'তে (The Life of Ramakrishna) ঠাকুরের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ক'রে লিখেছেন: His respect for and love of the personality of others, his dread of enslaving it went so far that he was afraid of being loved too dearly. He did not wish the tenderness of his disciples for him to bind them."

অনুবাদ: "অন্যদের ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিল এমন গভীর, সেই ব্যক্তিত্ব পাছে শৃঙ্খলিত হয় তার আশঙ্কা ছিল এমন প্রবল যে, তিনি তাদের ভক্তির আতি-শয্যকে একটু ভয়ের চোখেই দেখতেন। তিনি চাইতেন না তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে ভালোবেসে এক জায়গায় বাঁধা পড়ুক।"

আজকের দিনে ঠাকুরকে আমাদের ভারি দরকার আছে। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে—সে পার্থক্য তো ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। এ পার্থক্য না থাক্‌লে দুনিয়া বড়ো একঘেয়ে হয়ে যেতো। ঠাকুর একঘেয়েমিকে আদৌ পছন্দ করতেন না। বলতেন, "সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম ক'রে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে, অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নামগুণগান করি, কখন বা তাঁর নাম ক'রে নাচি।" তিনি জান্‌তেন প্রতিটি মানুষেরই জীবন এমন কিছু যার মূল্য আছে, মর্যাদা আছে, সুষমা আছে। কাউকে বাদ দেওয়া যায় না, কাউকে উপেক্ষা করা চলে না। তিনি বলতেন, 'ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন—যা কিছু দেখি ঈশ্বরেরই এক একটি রূপ।' বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়ে দিয়েছিলেন। সেই জগন্মাতাই তো বিড়াল হ'য়েছেন। তর্ক করতে দেখে হয়ত হাজরাকে গালাগালি দিয়েছেন। মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম ক'রে তবে আবার শুতে গেছেন। তাঁর অন্তরঙ্গদের মধ্যে যেমন চরিত্রবান জিতেন্দ্রিয় বিবেকানন্দ ছিলেন, তেমনি ছিলেন মদ্যপায়ী গিরিশ ঘোষও। ঠাকুর গিরিশ

ঘোষকে কখনও মদ ছাড়তে বলেন নি। মানুষের জীবনকে এই ভাবে গৌরব দান করতে পারা—হৃদয় কতখানি বিরাট হ'লে তবে এ সম্ভব! তিনি কখনো কাউকে বাঁধতে চান নি, চাপিয়ে দিতে চান নি কারও উপরে নিজের মতবাদ, চেলা তৈরীর দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিলো না কখনো। আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগের মানুষ। আমরাও যেন মানুষ-মাত্রেরই জীবনকে গৌরব দান করতে পারি, প্রতিবেশী ভিন্নধর্মাবলম্বী হলেও তার ধর্মবিশ্বাসকে যেন শ্রদ্ধার চোখে দেখি, নিজেরা যেমন স্বাধীন ভাবে বাঁচ্‌তে চাই, অপরকেও যেন তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমার মধ্যে বাচ্‌তে দিই। সর্ব-শেষে ঠাকুরের মধ্যে যে সত্যের সন্ধানী তীর্থ-যাত্রীর রূপ দেখেছি—সেই রূপ আমাদের মধ্যেও ফুটে উঠুক। ঈশ্বর আছেন—খুড়ী-জ্যেঠীর মুখ থেকে শুনে এই আস্তিক্যবোধ পাওয়া এক কথা; কঠিন সাধনায় ঈশ্বরকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি ক'রে তাঁকে বিশ্বাস করা আর এক কথা। হুইট্‌ম্যান বলেছেন: No friend of mine takes his ease in my chair. ঠাকুরেরও একই কথা। আরাম-কেদারায় শুয়ে কেবল মালা জ'পে আর ঘণ্টা নেড়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যাবে না। বই পড়েও আমরা তাঁকে পাবো না। কোন গুরুও হাত ধ'রে তাঁর কাছে আমাদের পৌছিয়ে দিতে পারবেন না। তাঁকে পেতে হ'লে আরাম-কেদারাকে ঠেলে ফেলে বেরিয়ে পড়তে হবে সাধনার ক্ষুরধার দুর্গম রাস্তায়। ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য, নির্জনতা—এসব বাদ দিয়ে কে কবে ঈশ্বরকে পেয়েছে?

কর্মযোগ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

ভারতে আবহমান কাল থেকে মোক্ষোপায়রূপে তিনটী প্রধান সাধন স্বীকৃত হয়েছে—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। অবশ্য এই তিনটী সাধন—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—পরস্পর-বিরোধী নয়, উপরন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত—এই তথ্যটীও ভারতবর্ষে সর্বদাই সানন্দে পরিগৃহীত হয়েছে। অবশ্য এদের মধ্যে কোনটী সর্বশ্রেষ্ঠ, কোনটীই বা মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়—এ নিয়ে যে ভারতীয় দর্শনে নানারূপ বাগ্‌বিতণ্ডা নেই, তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মতবিশেষে একটীকে অন্য দুটীর তুলনায় অধিক মূল্য দেওয়া হলেও, কোনোটীকেই কোনো মতবাদে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন বলে পরিবর্জন করা হয়নি।

'কর্ম'-শব্দটীকে অভিধান-গ্রন্থাদিতে "যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম",—যা করা হয়, তাই কর্ম—এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ডাশ্রয়ী মীমাংসা-দর্শনের মতে, যাগ-যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপই 'কর্ম' বা 'ধর্ম'। সাধারণ ক্রিয়া বা বৈদিক ক্রিয়া-অর্থে, কর্ম তিন প্রকার—শারীরিক, বাচসিক ও মানসিক। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই ভাবে

কর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন : "শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ কর্মশ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ধর্মাখ্যম্" (১।১।৪)।

কর্মের দুটী লক্ষণ—"কর্তুঃ ক্রিয়াব্যাপ্যম্" ও "জন্যফলশালিত্বম্" (ক্রমদীশ্বর ও সারমঞ্জরী)। অর্থাৎ, লৌকিক ও বৈদিক প্রত্যেক কর্মেরই এক জন কর্তা থাকে, যিনি সেই কর্মের দ্বারা একটী পূর্বে অপ্রাপ্ত ফল লাভ করেন। এরূপে, প্রত্যেক কর্মেরই একটী অবশ্যম্ভাবী ফল থাকে। যে কর্ম কর্তার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও বিচারবুদ্ধি-প্রসূত, সেই কর্মের জন্য কর্মকর্তা অবশ্যই নিজেই সম্পূর্ণ দায়ী। সেজন্য ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারেই সেই কর্মের ফল কর্তাকে নিজেই ভোগ করতে হয়। ভোগব্যতীত কর্ম-ফলের নাশ হতে পারে না। এই হল ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি সুবিখ্যাত 'কর্মবাদ'। কিন্তু একই জন্মে শত শত কৃত-কর্মের ফল-ভোগ সম্ভবপর নয় বলে, সেই সব অভুক্ত কর্মের ফল-ভোগের জন্য জীবকে পুনরায় সংসারে জন্মপরিগ্রহ করতে হয়। কিন্তু সেই নূতন জন্মেও সে স্বভাবতই পুনরায় নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাদের সব ফলভোগ পূর্ববৎ সম্ভবপর হয় না বলে তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় —এই ভাবে, কর্ম⟶জন্ম⟶কর্ম⟶জন্মান্তরের প্রকোপে জীব ক্রমান্বয়ে বিঘূর্ণিত হয়; এরই নাম অনাদি 'সংসার-চক্র'। এরূপে 'কর্মবাদ' থেকে ভারতীয় দর্শনের আরেকটী প্রসিদ্ধ মতবাদ 'জন্ম-জন্মান্তরবাদের' উৎপত্তি। ভারতীয় দর্শনের মতে, এই সংসার-চক্র থেকে মুক্তি-লাভই মোক্ষের প্রথম সোপান; কিন্তু উপরি-উক্ত কর্ম ও জন্মের অবশ্যম্ভাবী পারম্পর্য-অনুসারে মোক্ষ ত সুদূর-পরাহত মনে হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ কর্মের দ্বিবিধ ভেদের উল্লেখ করেছেন :—সকাম-কর্ম ও নিষ্কাম-কর্ম। ফল-ভোগের ইচ্ছা-সহকারে কৃতকর্মের নাম সকাম কর্ম, এদের বলা হয় 'কাম্য-কর্ম'। (যথা, নিঃসন্তান ব্যক্তি সন্তান-কামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, এবং সেই কর্মের ফলস্বরূপ অভীষ্ট বস্তু নিজেই লাভ ও ভোগ করেন)। এরূপ সকাম কর্মের ফলই কর্মকর্তাকে বারংবার ভোগ করতে হয়; কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে, ভোগ ব্যতীত এরূপ কর্মের বিনাশ নেই, জীবের মুক্তিও নেই। কিন্তু ফলভোগেচ্ছাশূন্য, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম কর্মের ফল কর্তাকে ভোগ করতে হয় না, এবং তার ফলে জন্ম-জন্মান্তরও তার নেই। যথা, শাস্ত্রোপদিষ্ট তর্পণ প্রভৃতি নিত্য, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম, দান পরসেবা প্রভৃতি জন-হিতকর অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

এই নিষ্কাম কর্মই মুক্তির অন্যতম সাধন বা সাধনাঙ্গ—অর্থাৎ, এই হল 'কর্মযোগ'। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে কর্মযোগের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন : "নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহাণপূর্বকমীশ্বরারাধনার্থে কর্ম-যোগে…" (২।৩৯)। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, কৃতকার্যতা-অকৃতকার্যতা প্রমুখ সমস্ত দ্বন্দ্ব বা বিপরীত অবস্থার মধ্যেও স্থৈর্যসহকারে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য কৃত কর্মই কর্মযোগ বা মোক্ষের উপায়।

কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের প্রথম কথা। ভারতীয় তথা জগৎ-সভ্যতার প্রাচীনতম প্রতীক ঋগ্বেদেও এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য, এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে কর্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম প্রধানতঃ সকাম কর্ম; অর্থাৎ, দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত হোম প্রভৃতির বিনিময়ে ঐহিক বা পারলৌকিক সুখভোগেচ্ছাই এই কর্মসমূহের কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেদে নিষ্কাম কর্মেরও বহু বিধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের

দশম মণ্ডলের ১১৭ সংখ্যক সূক্তটীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সমগ্র সূক্তটীতে দান ও পরহিতব্রতের অতি সুন্দর স্তুতি করা হয়েছে। যেমন, ঋষি বল্‌ছেন :—

"উতো রয়িঃ পৃণতো নোপ দস্যত্যুতাপৃণন্
মর্তিতারং ন বিন্দতে।" (১০।১১৭।১)

"য আধ্রায় চকমানায় পিত্বোঽন্নবান্ সন্
রফিতায়োপজগ্মুষে।
স্থিরং মনঃ কৃণুতে সেবতে পুরোতো চিৎ স
মর্ডিতারং ন বিন্দতে॥" (১০।১১৭।২)

"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি
বধ ইৎ স তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি
কেবলাদী।" (১০।১১৭।৬)

"দানশীল পুরুষের ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; যিনি দানবিমুখ, তাঁর সুখ নেই।"

"যিনি অন্নবান্ হয়েও ক্ষুৎক্লিষ্ট জনকে এবং গৃহে সাহায্যার্থ আগত দারিদ্র্যপীড়িত অতিথিকে নির্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, এমন কি, তাদের সম্মুখেই ভোগে লিপ্ত হন, তাঁর সুখ নেই।"

"যিনি দানবিমুখ, তার অন্নলাভ ব্যর্থ—সত্যই এ তাঁর মৃত্যুরই তুল্য। তিনি দেবতাকেও দেন না, বন্ধুকেও দেন না। যিনি কেবল একাকীই অন্নভোজন করেন, তিনি কেবল পাপই ভোজন করেন।"

উপনিষদেও বহুস্থানে সকাম কর্মের ব্যর্থতা ও নিষ্কাম কর্মের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে মনোরম বিবৃতি আছে। মুণ্ডকোপনিষদের এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটী ঔপনিষদ কর্মযোগের একটী সুন্দর প্রমাণ—

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি॥"
(১।২।৭)

"যাতে হেয়, অশ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের বিবৃতি আছে, সেই অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ ভেলা সমস্তই অদৃঢ়,—অর্থাৎ, সংসারসমুদ্র পার করতে অক্ষম। যে সব মূর্খ ব্যক্তি একেই শ্রেয়ঃ মনে করে প্রশংসা করে, তারা পুনরায় জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়।"

মহাভারতেও এই একই কর্মযোগের কথা বারংবার ঘোষিত হয়েছে। যথা :—

"তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ধর্মান্ ইমান্ সর্বান্ নাভিমানাৎ
সমাচরেৎ॥" (বনপর্ব, ২।৭৪)।

"তস্মাৎ কর্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।"
(অশ্বমেধপর্ব, ৫১।৩২)

"কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর—এই উভয়ই বেদাজ্ঞা। অতএব, অভিমানশূন্যভাবে এই সব কর্ম করবে।"

"সেহেতু, তত্ত্বদর্শিগণ নিষ্কামভাবে কর্ম করেন।"

ভারতদর্শনসার গীতায় কর্মযোগের পূর্ণতম, প্রকৃষ্টতম দ্যোতনা দৃষ্ট হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষার্ধ এই কর্মযোগেরই শ্রেষ্ঠ বিবরণ। যুদ্ধবিমুখ অর্জুনের নিকট স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মকে মোক্ষের উপায়রূপে উপদেশ দিচ্ছেন—

"কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥"
(২।৫১)

"সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মের ফলত্যাগ করে বা নিষ্কামভাবে কর্ম করে জন্মরূপ বন্ধ থেকে মুক্ত হন এবং সর্ব-উপদ্রব-রহিত ব্রহ্মপদ লাভ করেন।"

পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিক মতবাদ-সমূহেও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি, মীমাংসা-

দর্শনের মূল বিষয়বস্তু ধর্ম বা বেদের কর্মকাণ্ডে বিহিত যাগযজ্ঞাদি হলেও ক্রমশঃ এই মতবাদে স্বর্গের স্থলে মোক্ষ এবং সকাম কর্মের স্থলে নিষ্কাম কর্মই যথাক্রমে চরম লক্ষ্য ও তার উপায়-স্বরূপ বলে পরিগণিত হয়। বেদবিহিত কর্ম-সম্পাদন করতে হবে সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে, কোনোরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধি, এমন কি, স্বর্গলাভের জন্যও নয়। এরূপে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কাণ্টের মত, শত শত বৎসর পূর্বে মীমাংসকগণও 'কর্তব্যের প্রণোদনাতেই কর্তব্য-পালন' বা 'Duty for duty's sake'—এই সু-উচ্চ নীতি-প্রচার করেন।

বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটীতেই কর্মযোগের উপর ন্যূনাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। শঙ্করের মতে, স্বর্গের উপায়-স্বরূপ সকাম কর্ম ও মোক্ষের উপায়স্বরূপ জ্ঞান পরস্পরবিরোধী হলেও, সাধনমার্গে নিষ্কাম কর্মের মূল্য অল্প নয়; কারণ, শাস্ত্রোপদিষ্ট নিষ্কামকর্ম যথাবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং এরূপ নির্মল চিত্তেই কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হতে পারে। রামানুজ প্রমুখ অন্যান্য বৈদান্তিকদের মতেও কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান মুক্তির প্রথম সোপান। যথা, রামানুজের মতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম, এবং তৎপরে সপ্তসাধন—বিবেক (অশুদ্ধ পানাহার-বর্জন), বিমোক (বৈরাগ্য), অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন), ক্রিয়া (পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান), কল্যাণ (সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা, নির্লোভতা), অনবসাদ (মানসিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহ), এবং অনুদ্ধর্ষ (চিত্তের স্থৈর্য)—চিত্তের নির্মলতা-সম্পাদন করে' ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছার উদ্রেক করে ও ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক হয়।

উপরের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই প্রতীয়মান হবে যে, কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম-সাধনই ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম মূলমন্ত্র। ভারতীয় 'কর্মবাদের' ভুল অর্থ করে বিদেশী পণ্ডিতগণ কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে কর্মত্যাগকেই ভারতীয় আদর্শ বলে প্রচার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় দর্শনের মতে, একদিকে সকাম কর্ম যেমন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য; অন্য-দিকে ঠিক তেমনি কর্মবিমুখতা, অলসতা ও নিশ্চেষ্টতাও সমভাবে নিন্দনীয়। সেজন্য কর্ম করবে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, ফলভোগেচ্ছাশূন্য ভাবে—এই হল ভারতীয় কর্মযোগের মূল কথা। ভারতদর্শনসার গীতা সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকে অতি সুন্দর ভাবে এই তথ্যটী বুঝিয়ে বল্‌ছেন—

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥" (২।৪৭)

'কেবলমাত্র কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাপি নয়। সেজন্য সকাম কর্ম করে কর্মফলপ্রাপ্তির হেতু হয়ো না। অপরপক্ষে কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।'

এই জ্ঞানবান্, নিষ্কামকর্মীকেই গীতায় বলা হয়েছে 'স্থিতপ্রজ্ঞ', বা 'স্থিতধীঃ'। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে গীতা বল্‌ছেন—

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥' (২।৫৬)

"দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাহীন, লোভ-ভয়-ক্রোধহীন, মুনি বা মননশীল জ্ঞানীই স্থিতপ্রজ্ঞ।"

একটী সুন্দর উপমা দিয়ে গীতা এটী ব্যাখ্যা করছেন—

"আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥" (২।৭০)

অর্থাৎ, অসংখ্য নদ-নদী সমুদ্রে প্রবেশ করলেও সমুদ্র স্বয়ং উচ্ছ্বসিত বা চঞ্চল হয়ে ওঠে না। একই ভাবে, রূপরসাদি পার্থিব ভোগ্যবস্তু

ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষে প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যায়, তাঁকে বিচলিত করতে পারে না।'

এরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষ পৃথিবীর সর্বত্রই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই দর্শন ও উপলব্ধি করেন। জগতে বাস করেও তিনি জগৎকে পার্থিব ভোগের বস্তু বলে কদাপি মনে করতে পারেন না, কারণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁর কাছে ব্রহ্মসত্তাময়। সেজন্য শুক্লযজুর্বেদ (১৪।১) এবং ঈশোপনিষৎ (১) বল্ছেন—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্ ॥"

"জগতের সমস্ত চঞ্চল, চলনশীল বিষয়কে ঈশ্বরের দ্বারাই আচ্ছাদিত করতে হবে; ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর, কারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করো না।"

এই ত্যাগের দ্বারা ভোগের আদর্শ ভারতেরই একান্ত নিজস্ব। একপক্ষে, সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অরণ্যে বাস, অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ সাধারণ গৃহি-জীবন যাপন—ভারতীয় দর্শনে এই উভয় পক্ষের একটি সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে যা অন্যত্র বিরল। জ্ঞান ও কর্মের এই সামঞ্জস্য বিশেষ করে গীতা ও ঈশোপনিষৎ প্রচার করেছেন। এর অর্থ হল এই যে, নিষ্কাম কর্ম-সাধনের পথে যে আত্মবিদ্ পরমপদ (গীতা ২।৫১), পরমা শান্তি, (২।৭১) ব্রাহ্মী স্থিতি (২।৭২) লাভ করেন, তাঁর অবশ্য আর কোনো কর্তব্য কর্ম নেই—

"আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥"
(গীতা, ৩।১৯)

কিন্তু, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য, জনহিতের জন্য, তিনি সর্বদাই আসক্তিশূন্যভাবে কর্মে রত থাকেন—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার ॥"
(গীতা ৩।১৯)

ঈশোপনিষৎ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন:—

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥"(২)
"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"(৯)
"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥" (১১)

অর্থাৎ কেবল কর্ম করেই মনুষ্য শতবৎসর জীবিত থাকতে ইচ্ছা করুক, কিন্তু এই কর্ম হতে হবে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে। যাঁরা কেবল অবিদ্যা বা কর্মের অনুসরণ করেন, তাঁরা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আর যাঁরা কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁরা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যাঁরা কর্ম ও জ্ঞানকে পৃথক্ করেন না, তাঁরা কর্মের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করে জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মসাধন নানাবিধ নৈতিক সাধনের সমাহার। তার মধ্যে "পঞ্চ-মহাব্রত" প্রধান—অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাসাধন। এর প্রত্যেকটারই দুটী দিক্—negative বা নিষেধমূলক, ও positive বা বিধিমূলক। নিষেধে আরম্ভ; বিধিতে শেষ। যেমন, 'অহিংসা' বলতে প্রথমে বোঝায় হিংসার অভাব-মাত্র। কিন্তু পরে অহিংসা পরসেবারূপ ভাবরূপে চরমোৎকর্ষ লাভ করে। একই ভাবে 'সত্যের' অর্থ প্রথমে অসত্যভাষণ থেকে বিরতি; পরে সর্বকালে, সর্ব অবস্থায়, জীবন-বিনিময়েও সত্যভাষণ। 'ব্রহ্মচর্য' কেবল দৈহিক ভোগেচ্ছাই দমন করা নয়, সেই সঙ্গে আত্মিক, পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষার অনুশীলন—কেবল জীবনের নিম্নদিকের পরিবর্জন নয়, উচ্চ দিকেরও পরিবর্ধন।

এরূপে, ভারতীয় দর্শনে কর্মযোগের স্থান অতি উচ্চে। এই যে 'Straight and narrow path of virtue', যাকে কঠোপনিষৎ বলেছেন:

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ" (৩।১৪)—শাণিত ক্ষুরের ধারার মত দুর্গম পথ, তাই হল মুক্তির পথ। এই নীতিব, নিষ্কাম কর্মের পথ ছাড়া অন্য পথ নেই। সেজন্য ভারতীয় দর্শন যে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির জনক ও পরিপালক —একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শ্রুতি বলেছেন—

"কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্।
চরৈবেতি চরৈবেতি।" (ঐতরেয় আরণ্যক)

"নিদ্রাই কলিকাল, জাগরণই দ্বাপর; দণ্ডায়মান হলেই ত্রেতা, ও চলতে আরম্ভ করলেই সত্যযুগ। অতএব কেবল চল্‌তেই থাক, কেবল চল্‌তেই থাক।"

চলাব—অন্ধভাবে, বিভ্রান্ত ভাবে নব—কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে, নিরাসক্তির সঙ্গে চলাব এই সত্যযুগই ভারতের শাশ্বত আদর্শ।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

কে লয়েছ তুলি' পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায়
কোন কূল-ঊষা চোখে তব জাগে ভেদি' ঘন এ-নিশায়!
　　চলো ল'য়ে চলো যেথা তব সাধ
　　বুঝি পথ চেয়ে অমল প্রভাত;
চিরবিমুক্ত তরণী আমার তব ধ্রুব-ইসারায়,
কে লয়েছ তুলি পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায়।

প্রাণে জাগে আজি শত জীবনের বাঞ্ছিত এক আশা
তোমার পাবকমন্ত্র-ধারায় দাও তারে দাও ভাষা।
　　মাধুর্যে তব দীপ-দৃষ্টির
　　খোলো দ্বার খোলো নব সৃষ্টির;
ডাকে অন্তরে প্রাণের পেয়ালা সে অমৃতে ভরি,—আয়,
কে ল'য়েছ তুলি পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায়!

ওগো বিমোহন, পরশ রতন, পরশি' তোমায়—ভুলি,
পলকে পলকে তব সম্বিৎ-সূর্য শিহরে ছলি।
　　বুঝি এ-মর্ত্যম্লান স্মৃতি-তটে
　　তব অনন্ত বাণী আসি' রটে;
আনন্দ তব স্বর্ণ-কুম্ভে সত্তার ভরি' ছায়,
কে লয়েছ তুলি' পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায়!

ভারতীয় শিক্ষায় ভগিনী নিবেদিতার দান

স্বামী তেজসানন্দ

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা, বিশাল হৃদয় ও সুদূরপ্রসারী তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে বাংলা-মায়ের স্নেহকোমল কোল আলো করে বসেছিলেন—ভারতের অন্তরের বাণীকে নূতন করে রূপ দিতে ও ভারত-ভারতীকে নবজাগরণের পথে অভিযান করবার প্রেরণা যোগাতে। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে স্বর্গীয় স্বনামধন্য আইন-ব্যবসায়ী—শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতার টাউনহলে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি-সভায় আবেগময়ী ভাষায় বলেছিলেন, "If the dead bones are beginning to stir today, it is because the Sister Nivedita has breathed the breath of life into them." 'ভারতের মৃত শুষ্ক অস্থিপঞ্জরে আজ যে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে, ভগ্নী নিবেদিতা ওতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন বলেই তাহা সম্ভব হয়েছে।' পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত তথাকথিত শিক্ষিতসমাজ যখন ভারতের সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারকে একটা মস্ত বড় কুসংস্কার বলে ঘোষণা করতে গৌরববোধ করত, সেই অন্ধকার যুগে হিন্দুর জীবন-দীপটি প্রজ্বলিত করে দুর্গম বন্ধুর পথে ধীরে অথচ দৃঢ়তার সহিত পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখিয়ে চলেছেন—মহিমময়ী নারী নিবেদিতা। সে মহাযাত্রায় ছিল গভীর আন্তরিকতা ও অফুরন্ত উৎসাহ, অপূর্ব আত্মনিবেদন ও মানব-কল্যাণ-চিকীর্ষা;—ছিল অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও সেবার আনন্দ। তিনি বিদেশিনী হয়েও ভারত-মাতার আদরিণী কন্যা,—তাঁর জীবনভরা অকুণ্ঠ অবদানের তুলনা নেই। প্রতীচ্য সভ্যতায় গড়া জীবন নিয়ে তিনি কেমন করে ভারতের নর-নারীর শিক্ষার বেদীমূলে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করেছিলেন,—ভারতের ইতিহাস তা গৌরবের সহিত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে,—তাঁর 'নিবেদিতা'-নাম সার্থক হয়েছে।

ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ-সম্বন্ধে ভগ্নী নিবেদিতা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ "Hints on national education in India" গ্রন্থে বলেছেন,—কেবল শুষ্ক পুঁথিগত বিদ্যা ও ঘটনাপুঞ্জদ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না। শিক্ষা বলতে সেই প্রাণদ তথা জীবন্ত ভাবরাশিকেই বুঝায় যা বালক-বালিকার মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমার্জিত করে তোলে। শুধু বুদ্ধির উৎকর্ষ দ্বারা যে শিক্ষা মানুষকে কেবল ধূর্ত বা চতুর করে,—যা শুধু জীবন-নির্বাহের পাথেয় সংগ্রহেরই উপায়মাত্র হয়ে দাঁড়ায়,—তা দ্বারা অনুকরণপ্রিয় একটি মর্কট গড়ে উঠতে পারে বটে, কিন্তু তা মানুষকে যথার্থ মানুষ করে না, তার অন্তর্নিহিত শৌর্য, বীর্য ও মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে না। বুঝতে হবে, সে ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যর্থই হয়েছে। তিনি আবার বলেছেন,—

"Unless we strive for truth because we love it and must at any cost attain, unless we live the life of thought out of our own rejoicing in it, the great things of heart and

intellect will close their doors to us."—যে সত্যকে লাভ করলে আমাদের জীবনকে সরস ও আনন্দময় করে তোলা সম্ভব, সেই সত্যনিষ্ঠা ও সাবলীল চিন্তাশীলতা যে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার মুলমন্ত্র হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বার কোন মহৎ কার্য ও উচ্চচিন্তার দিকে উন্মুক্ত হবে না।

নিবেদিতার পরিকল্পিত শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি,—সেবায়, আত্মত্যাগে। "The will of the hero is ever an impulse to self-sacrifice. It is for the good of the people—not for my own good that I should strive to become one with the highest, the noblest and the most truth-loving that I can conceive." আত্ম-ত্যাগই প্রকৃত বীরহৃদয়ের চিরন্তন সঙ্গীত ও শাশ্বত প্রেরণা। এতেই মানুষকে এক নিমেষে অসীমের সঙ্গে অভিন্ন করে দেয়। বলা বাহুল্য, যে জাতি সর্বসাধারণের মাঝ থেকে এমনি করে হৃদয়বান, নিঃস্বার্থ প্রেমিক গড়ে তুলতে পারে, সে জাতির উন্নতি অনিবার্য,—তার শিক্ষা সার্থক। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সর্বসাধারণের শিক্ষা শুধু একটা শুভ কামনা বা কল্পনায় সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে যেদিন একটা মহান কর্তব্য বা দায়রূপে স্বেচ্ছায় বরণ করতে পারবে, সেইদিন শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন সম্ভব হবে। জীবনের উচ্চচিন্তার দ্বার রুদ্ধ করা নরহত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে জনসাধারণের শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করা সকলের প্রধান কর্তব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই নিবেদিতার ভাষায় বলতে হয়, "The education of all—the people as well as the classes, woman as well as man—is not to be a desire with us but lies upon us as a command. To close against any gates of higher life is a sin far greater than that of murder......there is but one imperative duty before us today. It is to help education by our lives if need be—education in the great sense as well as the little, in the little as well as in the big."

শিক্ষা-সম্বন্ধে নিবেদিতা আরও বলেছেন, "Education in India has to be not only national but nation-making."—শিক্ষা কেবল জাতীয়তা বোধ জাগাবে না, পরন্তু উহা জাতি-গঠনমূলকও হবে। জাতীয়তা-বোধকে কেন্দ্র করে শিক্ষা সুরু হলেই, দেশকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা ও সেবা করা সম্ভব। তাই তিনি শিক্ষার প্রথম সোপানে আন্তর্জাতিকতাকে বড় একটা উচ্চ আসন দেননি। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে স্বদেশপ্রীতির ভিত্তিভূমিতে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে না পারলে, বা দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকে শ্রদ্ধা করতে না শিখলে, প্রথম হতেই শুধু আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গীতে সব দেখতে সুরু করলে তা দ্বারা স্বদেশের প্রতি প্রীতি জাগবে না—দেশবাসীর কল্যাণ সাধিত হবে না; বরং জাতীয়তাবোধের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাবে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বাভাবিক-ভাবে অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তারলাভ করবে, তখন বিশ্বের প্রতি হৃদয় স্বতই উন্মুখ হয়ে উঠবে। পুঁথিপুস্তকের ভেতর দিয়ে আন্তর্জাতিকতা শেখাবার তখন আর প্রয়োজন হবে না।

বৃক্ষের শাখা-পল্লবের বিচিত্র বিস্তার ভেতরের প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করেই হয়ে থাকে। মানবজীবনেও এ নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শিক্ষা-বিষয়ে স্বীয় মন-বুদ্ধিকে স্বদেশী ভাবধারায় পরিপুষ্ট না করে

যেখানে প্রথমেই বিদেশী আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়, সেখানে অপরিচিতের গৃহে পথে কুড়ানো বালকের শিক্ষার মতই হয়ে থাকে তার জীবন। সেখানে কৃতজ্ঞতা থাকতে পারে, —উপকারীকে কর্তব্যবোধে সেবা করবারও প্রবৃত্তি জেগে উঠতে পারে, কিন্তু সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের প্রেরণার যে একান্ত অভাব তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ নিজের জীবন-ভিত্তি দৃঢ় হলেই বিদেশী শিক্ষা অঙ্গের ভূষণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট ভাবসম্পদ গ্রহণ করে মানুষ তখন উদার ভাবাপন্ন হতে সমর্থ হয়। দেশের সার্বভৌম আদর্শ, ধর্ম ও দর্শন যা আমাদের সমাজ শরীর গঠনের অফুরন্ত উপাদান, তার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ার ফলেই আমাদের নৈতিক ও সামাজিক জীবন এতটা নিম্নস্তরে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে নিবেদিতার আদর্শ তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শেরই অনুরূপ। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিলেন যে, একটা জাতিকে যদি বাঁচতে হয় তবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমবেত শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই তাহা সম্ভব হবে। ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি তাই বলেছেন—

"Here in India the woman of the future haunts us. Her beauty rises on our vision perpetually. Her voice cries out on us. Until we throw wide the portals of our life and go out and take her by hand to bring her in, the Motherland stands veiled and ineffective with eyes lost in set patience on the earth......Her sanctuary is today full of shadows. But when the womanhood of India can perform the great *arati* of nationality, that temple shall be all light, nay, the dawn verily shall be near at hand."—অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমগ্ন, বিধি-নিষেধের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত যে মাতৃজাতি যুগযুগান্তর ধরে মৃতকল্প হয়ে পড়ে রয়েছে, যেখানে প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধীভূত হয়ে গেছে, সে মাতৃজাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে, ভারতমাতার রুদ্ধদ্বার কখনও উন্মুক্ত হবে না। লাঞ্ছনামলিন নারী-জাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমরা যে দিন তাকে গৌরবাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হব, সেইদিন ভারতমাতার শতশতাব্দীর অজ্ঞান-অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবে,—প্রভাত-সূর্যের বিমল কিরণে মাতৃমন্দির উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, —জাগরণের দিন ঘনিয়ে আসবে। তখনই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই ভারতভূমির বিশাল প্রাঙ্গণে আবার সহস্র নারীকণ্ঠে সেই উদাত্ত ঋঙ্মন্ত্র ও শৌর্যবীর্যগাথা ধ্বনিত হবে; রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতার গর্ভে আবার ঘোষা, অপালা ও ইন্দ্রাণী; মৈত্রেয়ী, সীতা ও সাবিত্রী; —দুর্গাবতী, পদ্মিনী ও রাণী ভবানীর আবির্ভাব হবে। তাই নিবেদিতা প্রাচীন ভারতের নারীচরিত্রের অত্যুজ্জ্বল ও অতুলনীয় আলেখ্যকে বার বার লক্ষ্য করতে বলেছেন।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও ইতিহাসে নারীজাতির যে উজ্জ্বল আদর্শ বর্ণিত হয়েছে, তাকে সম্মুখে রেখে যদি স্ত্রীশিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা না হয়, তবে সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। তাই তিনি বলতেন, "There can never be any sound education of the Indian womanhood which does nor begin and end in exaltation of the national ideals of

womanhood, as embodied in her own history and heroic literature." তবে তিনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে এই বিপ্লবযুগে কেবল সনাতনপন্থী হয়ে শুধু প্রাচীনকে ধরে বসে থাকলেই চলবে না, বর্তমানের সঙ্গে প্রাচীন আদর্শকে সমন্বিত করে তাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। নিবেদিতার ভাষায়,—"The national ideal of India of today has taken on new dimensions —the national and civic. Here also woman must undoubtedly be efficient ......*In order to achieve the ideal* of efficiency for the exigencies of the twentieth century, a characteristic synthesis has to be acquired."—আজ ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমবায়ে দেশময় যে শিক্ষামন্দির গড়ে উঠছে, যেখানে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলকেই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজার আসনে বসতে হবে, নূতন আলোক-সংগ্রহের জন্য। ভগিনী নিবেদিতা ভারতে এমন স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন যার সাহায্যে আমাদের মাতৃজাতি একদিকে যেমন পবিত্র, সংযত, নিঃস্বার্থ ও ধর্মপরায়ণা হবে, অপরদিকে তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনায় কুশলতা-অর্জন করে জাতীয় জীবনের পুষ্টিবিধান করতে সমর্থ হবে,—লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতিকে পুনরায় কেন্দ্রস্থ, আত্মস্থ ও জীবন্ত করে তুলতে পারবে।

রাজগীর

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সি

অতীত যুগের স্মৃতি-বিজড়িত গিরিব্রজ আজও দাঁড়াইয়া আছে—পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে, তার অস্থি-পঞ্জর দেহে। মহাকালের যাত্রাপথে ইতিহাসের পট-পরিবর্তনে অতীত যুগের গিরিব্রজ কি করিয়া বর্তমান রাজগীরে রূপান্তরিত হইল, তাহার তাত্ত্বিক আলোচনা ইতিহাসের পাতায় নিবদ্ধ থাকুক। আমি শুধু বর্তমান রাজগীরকেই আলোচনা করিব পরিব্রাজকের দৃষ্টি লইয়া।

রাজগীরে আসিয়া আমি এক অতীত যুগের সন্ধান পাইয়াছি, যাহার একত্র সমাবেশ বাংলার এত নিকটে অন্য কোথাও নাই। সেইজন্য রাজগীর প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট, শিল্পীর নিকট, পরিব্রাজকের নিকট আজও বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া আছে। এইখানে এক দিন নরোত্তম রাম বিশ্বামিত্র-সমভিব্যাহারে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধ এইখানেই রাজত্ব করিতেন। তারপর ইতিহাসের দ্রুত পৃষ্ঠা উল্টাইয়া রাজগীরের স্বর্ণ-ইতিহাস আরম্ভ হয় বৌদ্ধযুগে—রাজা বিম্বিসারের রাজত্বকালে। এইখানেই ভগবান তথাগত কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগের সেই বেণুবন আজও পথের পার্শে পড়িয়া আছে। জৈনগুরু মহাবীর এখানে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তদীয় শিষ্য-

সম্প্রদায় কর্তৃক পর্বতশীর্ষে নির্মিত মন্দিরগুলি তাঁহারই স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। তাই রাজগীর হিন্দুর, বৌদ্ধের, জৈনের মহাতীর্থ।

রাজগীর যাইবার দুইটি পথ আছে, একটি গয়া হইতে; অপরটি মেনলাইনে বক্তিয়ারপুর হইতে, বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ে দিয়া। আমাদের প্রথম যাত্রা শুরু হয় গয়া হইতে। প্রায় ৭-৩০ মিঃ নাগাদ বাস ছাড়িল। কতকগুলি গঞ্জ, তন্মধ্যে ওয়াজিরগঞ্জ, নওয়াদা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বাস চলিতে লাগিল—কখনও পাহাড়ের কোল ছুঁইয়া আবার কখনও ঝরণার পাশ দিয়া। গিরিয়ার নিকট আসিয়া একটি বালুকাময় নদীর পরপারে সুসংবদ্ধ পাহাড়ের শ্রেণী দেখিতে পাইলাম, ইহাই রাজগীরের পর্বতশ্রেণী। গিরিয়া আর একদিক হইতে উল্লেখযোগ্য। এইখানেই জৈনদের তীর্থস্থান পাবাপুরী অবস্থিত। এখান হইতে রাজগীর খুব নিকটে মনে হইলেও পথ অনেক ঘুরিয়া গিয়াছে। পূর্ণোদ্যমে ৪ ঘন্টায় প্রায় ৬৪ মাইল অতিক্রম করিয়া বিহার সরিফের নিকট বাস থামিয়া গেল। তখন ১১-৩০। রাজগীর যাইবার ট্রেন ১টার সময়।

যথাসময়ে রাজগীরগামী ট্রেন আসিল। অসীম বিস্ময়ে রাজগীরের পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলাম। প্রথমেই দ্বীপনগর ষ্টেশন। এই স্থানেই নালন্দার একটি গেট্ ছিল; বোধ হয় সেই হইতেই উহার নাম দ্বীপনগর হইয়াছে। তার পরেই নালন্দা। নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ এখান হইতে দেড় মাইল দূরে। বাঁধান পথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর শিলাও। এখানকার খাজা বিখ্যাত, এখান হইতে পাহাড়-গুলি আরও স্পষ্ট ও সুন্দর দেখাইতেছিল। অপরাহ্ণে পর্বত-শিখরে মন্দিরগুলি সূর্যালোকে প্রতিভাত হইয়া একটি অনির্বচনীয় ভাবের সমাবেশ করিয়াছিল। আমার ধারণা ছিল, রাজগীর পাহাড়-ঘেরা গ্রাম। ট্রেনটি যখন ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ভাবিলাম, হয়ত বা সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া পাহাড়ের মধ্যস্থলে যাইবে, অথবা হিমা-লয়ান রেলের মত পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিবে। কিন্তু আমাদের সব কল্পনা ভাঙ্গিয়া দিয়া গাড়ী যখন থামিয়া গেল, তখন চকিত হইলাম; জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম কাষ্ঠ-ফলকে লেখা 'রাজগীর কুণ্ড'; বুঝিলাম গন্তব্যস্থল আসিয়া গিয়াছি। কিন্তু পাহাড় যদিও কাছে তবুও ত অনেক দূরে। সমতলবাসী, তাই পাহাড় এত নিবিড় ভাবে মনে স্থান করিয়াছে। মনটা তাই যেন কেমন দমিয়া গেল।

'সনাতন ধর্মশালা'র একটি দ্বিতল ঘরে আশ্রয় পাইলাম। এখান হইতে দূরের দৃশ্যগুলি বেশ সুন্দর। গিরিব্রজের এই অংশটাই বর্তমান রাজগীর—একখানি সুন্দর গ্রামমাত্র। গ্রামটি গড়িয়া উঠিয়াছে সমতলস্থানে, পুরাতন গিরিব্রজ হইতে দুই মাইল দূরে। যতই আমরা পুরাতন রাজগীরের দিকে অগ্রসর হইলাম, ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দুর্গ-প্রাকার দৃষ্টিগোচর হইল। বেশ চওড়া প্রাকার, প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গঠিত। ইহাই অজাতশত্রু গড়। অজাতশত্রু যখন রাজগৃহে রাজত্ব করেন, তখন তিনি মূল রাজগৃহ হইতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাজধানীর সীমানা নির্দেশ করেন। তাই স্বাভাবিক পাহাড়-প্রাচীর ছাড়িয়া কৃত্রিম প্রাকার-নির্মাণ করিয়া নগর-রক্ষা করিতে হইয়াছিল। মনটা ফিরিয়া গেল হাজার বৎসর আগে, বিস্মৃত ইতিহাসের অন্তরালে। এক দিন এইখানেই হিন্দু বীরেরা ক্ষাত্রতেজে প্রখর হইয়া মুক্ত কৃপাণ হস্তে প্রাকারের উপর ঘুরিয়া নগর-রক্ষা করিত। কত বীর প্রাণবলি দিয়া জয়ের

কেতন শূন্যে উড্ডীন করিয়াছিল। তাহাদের পদচিহ্ন মিশিয়া আছে, প্রতিটি পাষাণের বুকে !

অপর পারে সুউচ্চ টিলার উপর বার্মিস টেম্পল। কবে ইহা প্রথম নির্মিত হয় জানি না; তবে ইহা খুব নূতন। যদিও temple, তবুও ইহা মূলতঃ বৌদ্ধদেব আবাসিক স্থান। এইখানে আসিলে মনে হয় যেন গড়ের ভিতর চলিয়াছি—স্থানটা ঠিক দুর্গদ্বারের মত। দ্বার ছাড়িলেই খানিকটা নীচু জমি। নিকটেই সরকারী ডাকবাংলা এবং বিশ্রাম-নিবাস (Rest House) এইখানেই পথের একপারে বেণুবন। এখানে সন্ধ্যারাগে একদিন বাজিয়া উঠিত মাঙ্গলিক শঙ্খ। পুরনারীরা দীপহস্তে ভগবান তথাগতের আরাধনা করিতেন। অপরদিকে পাহাড়ের কোল ছুঁইয়া রহিয়াছে জাপানী মঠ জাপানী বৌদ্ধেরা এই মঠটি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এখান হইতে রাজগীরের শোভা অবর্ণনীয়। পাহাড়-ঘেরা গিরিব্রজের সমস্ত অংশটা এখান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। চারিদিকে পাহাড়, মাঝে সমতল স্থান। তার মাঝ দিয়া বিসর্পিল পথরেখা চলিয়া গিয়াছে বনানীর ফাঁকে ফাঁকে। সদর রাস্তা ছাড়িয়া অন্য রাস্তা দিয়া যাইলে একটি পাকা পুল পড়ে। উহা একটি শীর্ণকায়া নদীর উপর, নাম সরস্বতী; নিকটবর্তী পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে। এককালে ইহা দুই কূল বাহিয়া প্রবাহিত হইত; সেদিন হয়ত নদীকে কেন্দ্র করিয়া কত জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পুলটি পার হইয়া পাহাড়ের সিঁড়ি দিয়া প্রায় ৫০ ফুট উঠিলে কুণ্ডগুলির সমীপবর্তী হওয়া যায়। কতকগুলি ধারা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার কতকগুলি প্রবলবেগে পড়িতেছে। এখানে সমস্ত প্রস্রবণই উষ্ণজল-সংযুক্ত। এককালে পাহাড়ের গা দিয়া জল ঝরিয়া যাইত; কিন্তু আজ শিল্পীর হাতে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। হয়ত কৃত্রিমতার মাঝে প্রকৃতিরূপকে খর্ব করা হইয়াছে। কুণ্ডগুলির সংলগ্ন লক্ষ্মী-জনার্দন ও সীতারামের মন্দির।

রাজগীর পঞ্চশৈলমালা দ্বারা বেষ্টিত। পাহাড়গুলির নাম যথাক্রমে—বিপুল, বৈভার, সোনাগিরি, উদয়গিরি ও রত্নগিরি। রত্নগিরির নিকট আর একটি ছোট পাহাড় আছে, ইহার নাম গৃধ্রকূট। রাজগীরের উত্তর তোরণ বৈভার ও বিপুলগিরি-মধ্যে অবস্থিত; দক্ষিণদ্বার সোনাগিরি ও উদয়-গিরির মধ্যে; পূর্ব তোরণ উদয়গিরি ও রত্নগিরির মধ্যে এবং পশ্চিমদ্বার সোনাগিরি ও বৈভার পাহাড়ের মধ্যে। ষ্টেশন হইতে যে পথটি দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া পুরাতন রাজগৃহের দিকে গিয়াছে, তাহার বামে বিপুল, ডাইনে বৈভার পাহাড়। রাস্তাটি বিপুল পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া যাইয়া পরে উদয়গিরি ও সোনাগিরির মাঝ দিয়া বানগঙ্গা গিরিপাশ অতিক্রম করিয়া গয়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তে শেষ হইয়াছে। পথটি সত্যই চমৎকার। পাহাড়ী গৈরিক মাটির রাস্তা ধূলি আর প্রস্তরে সমাকীর্ণ। আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; কখনও নদীর পাশ দিয়া, আবার কখনও ঘন বনানীর মাঝ দিয়া পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া। চারিদিকে নিস্তব্ধতা; সমস্ত পুরী যেন মন্ত্রমুগ্ধ পাষাণে পরিণত হইয়াছে। বিদায়-গোধূলি-বেলায়, মায়াময় ছায়ার আবরণে, ধ্যানমগ্ন ধূসর গিরির পটভূমিকায়, গৃহাভিমুখী গাভীর টুং টাং শব্দ গিরি-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত মনে রহস্য মিশাইয়া দেয়।

প্রধান পথ ধরিয়া কিছু দূর যাইলে একটি শুষ্ক নদীবক্ষ অতিক্রম করিতে হয়—নাম গোমতী। বর্ষার প্রারম্ভে নদীতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, আবার শীতের শেষে নদী হারিয়ে যায় গিরিকন্দরে। নদীটি নিকটেই সরস্বতী-নদীতে মিশিয়াছে। এই দুইটি নদীর সংযোগস্থলে একটি উচ্চ টিলার

উপর রাজগিরির একমাত্র শক্তিমূর্তি অষ্টভুজা জ্বালাদেবীর মূর্তি অবস্থিত। ইহারই অনতিদূরে সরস্বতী-নদীর তীরে রাজগীরের শ্মশান—অতীতে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে।

এখান হইতে পাহাড়গুলি একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে। সমস্ত সমতল স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ। পথটি ধরিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটি সংযোগস্থলে আসা যায়। একটি রাস্তা পশ্চিম দিকে শোনভাণ্ডার অথবা ধনভাণ্ডারে যাইয়া শেষ হইয়াছে; অপরটি পূর্বদিক দিয়া যাইয়া পরে দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া বাণগঙ্গা পাশে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই সংযোগ-স্থলেই মনিয়ার মঠ অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত মূর্তি ও শিলালিপিই মঠের প্রতিভূস্বরূপ পড়িয়া আছে ইতিহাসবেত্তার গবেষণার ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য। ইষ্টক-নির্মিত প্রাচীন ভিত্তিই আজ মঠের স্মৃতি। এইখানে মহাভারতীয় যুগে নাগরাজ মণিভদ্রের আবাস ছিল; সেই হইতেই হয়ত মঠটির নামকরণ হইয়াছে। প্রাচীন কালে রাজগৃহে যে নাগপূজার প্রচলন ছিল তাহা নাগমূর্তি হইতে অনুমিত হয়। ইহার নিকটেই নির্মাল্য-কূপ—একটি বৃহদ্ব্যাস-যুক্ত অগভীর কূপ এবং নিকটেই যজ্ঞবেদী। রাজা জরাসন্ধ যখন যজ্ঞ করিতেন, তখন যজ্ঞে আহুত নির্মাল্য এই কূপে নিক্ষেপ করা হইত। সেই হইতে কূপটির নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ কূপটির আকৃতি দেখিয়া ধারণা করেন যে, স্থানটিতে হয়ত বৌদ্ধযুগে মৃৎশিল্পালয় বা পটারী ওয়ার্কস্ ছিল এবং কূপটি মাটির বাসন পোড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। যাহা হউক, কূপটি যে প্রাচীন-স্মৃতিবিজড়িত—তাহা তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ বাণাসুরমূর্তি, নাগমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি এবং গণেশমূর্তি দেখিলে অনুমিত হয়। মূর্তিগুলি কালের প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ইহা ১৯০৫ সালের প্রাচীন-স্মৃতি-সংরক্ষণ আইনের আশ্রয়ে রহিয়াছে। সেইজন্য সরকার বাহাদুর ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উহার উপর একটি ছাউনী দিয়াছেন। সন্দেহের বশবর্তী হইয়া আমরা উহার মধ্যে নামিয়াছিলাম; শুধু পোড়া ছাই ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

মনিয়ার মঠ পার হইয়া পশ্চিমের রাস্তা ধরিয়া যাইলে পূর্বোক্ত সরস্বতী-নদীর উপর একটি ছোট পুল পার হইয়া বৈভার পাহাড়ের সমীপবর্তী হওয়া যায়। এখান হইতে অন্য একটি পথ বনের ভিতর দিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কাষ্ঠফলকে লেখা To Ranbhum. আমরা পথটি পশ্চাতে ফেলিয়া ধনভাণ্ডারের দিকে অগ্রসর হইলাম - স্থানটি খুব নিকটেই। বৈভার-পর্বতের পাদদেশে ধনভাণ্ডার গুহা অবস্থিত। গুহাটি স্বাভাবিক নয়; শিল্পীর নিপুণ হস্তের ছাপ ইহাতে রহিয়াছে। বেশ প্রশস্ত ঘর। প্রবাদ যে, রাজা জরাসন্ধের ইহা কোষাগার ছিল। ঘরটির সামনের দেওয়ালে পাথর কাটিয়া ছোট একটি জানালা করা হইয়াছে। অনুমান ইহা হয়ত টাকা লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হইত। কেহ ধারণা করেন, বৌদ্ধযুগে ইহা শ্রমণদের আবাসিক স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। এ ধারণা খুব অবাস্তব নয়। দেওয়ালে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপির আজও পাঠোদ্ধার হয় নাই। যেদিন হইবে সেদিন হয়ত এ রহস্যের উদ্ঘাটন হইবে। ছাদ পতনোন্মুখ হওয়াতে উহাকে ঠেস্ দিয়া রাখা হইয়াছে।

ধনভাণ্ডার হইতে ফিরিয়া আসিয়া রণভূমের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। বনের ভিতর দিয়া সামান্য পথরেখা, খুব হুঁশিয়ার না হইয়া চলিলে হারাইয়া যাইবার ভয়। কাঁটা-ঝোপের মধ্য দিয়া কোন রকমে পথ করিয়া প্রায় ১০ মিঃ

হাঁটিয়া রণভূম পাইলাম। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের হইতে কোন স্মারকচিহ্ন এখানে নাই। সেইজন্য স্থানটি খুঁজিয়া লইতে বেশ অসুবিধা হয়। রাজা জরাসন্ধ নিত্য এখানে শরীর-চর্চা করিতেন। তাই মাটি ঠিক রাখিবার জন্য নিত্য এখানে দুধ ঢালা হইত। কাহিনী হয়ত অতিশয়োক্তি-দোষে দুষ্ট। কিন্তু চারিদিকে লাল কঙ্করময় মাটির মাঝে এইরূপ শুভ্রকান্তি মাটি নিশ্চয়ই বিস্ময় উৎপাদন করে। মাটি খুবই নরম; হাত দিয়া একটু ঘসিলেই গুঁড়াইয়া যায়। যাহা হউক পুণ্যভূমির মাটি সংগ্রহ করিয়া প্রধান পথ ধরিয়া মনিয়ার মঠে পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম।

মনিয়ার মঠ ছাড়িয়া পূর্বদিকের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। দুই ধারে বন, তাহার মাঝ দিয়া পথ। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া একটি উন্মুক্ত স্থান পাওয়া গেল। স্থানটিতে একটি প্রশস্ত ঘরের প্রাচীন ভিত্তি রহিয়াছে। ইহা রাজা জরাসন্ধের কারাগার। একদিন এখানে কত সামন্তরাজ, শৌর্যে বীর্যে মদমত্ত রাজা বন্দিরূপে মৃত্যুর যূপকাষ্ঠে প্রহর গুনিয়াছিলেন। ভক্তের করুণ প্রার্থনা ভগবানকে ব্যথিত করিয়াছিল। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন মুক্তির দূত হইয়া সাম্য-প্রতিষ্ঠার জন্য। বিগতযুগে রাজা বিম্বিসার এখানে পুত্র অজাতশত্রুর বন্দিরূপে জীবনের শেষদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই। তিনি ত প্রাণ, মন, দেহ ভগবান তথাগতের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এখান হইতে নাতিদূরে গৃধ্রকূট পর্বতে বিরাজিত ভগবান তথাগতের চরণ-দর্শন করিয়া ব্যথিত জীবনে প্রচুর শান্তি পাইতেন। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের আর একটি দৃশ্য মনে পড়িয়া যায়—আগ্রা দুর্গে বন্দী বৃদ্ধ শাহাজান; ব্যথিত জীবনের শান্তি—শুধু তুষারশুভ্র তাজমহল! এখান হইতে গৃধ্রকূট পাহাড়টি বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। মৃত্তিকা-খননের ফলে এখানে ভূসংলগ্ন লোহার আংটি পাওয়া গিয়াছে, অনুমান ইহাতে বন্দীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বাধা হইত। এখানেও কোন স্মারক চিহ্ন নাই।

কারাগার হইতে আরও কিছুদূর যাইলে একটি পথের সংযোগস্থলে আসা যায়। উত্তরাভিমুখী রাস্তাটি গৃধ্রকূটের দিকে গিয়াছে। কাষ্ঠফলকে নির্দেশ To Gridhrakut. রাস্তাটি ধরিয়া প্রায় মাইলখানেক চলিলে গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে পৌছান যায় এবং আরও দেড় মাইল চড়াই-উৎরাই করিলে শিখরে উঠা যায়। পাহাড়টি খুবই ছোট। ইহার তিনদিকে রত্নগিরি ঘিরিয়া রাখিয়াছে। দক্ষিণদিকে অনেকখানি সমতলস্থান জঙ্গলাকীর্ণ। এইখানেই ছিল রাজচিকিৎসক জীবকের আম্রবন; যাহা বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। পাহাড়ের গা কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে, সমস্ত পথটি পাথর দিয়া বাঁধান। রাজা বিম্বিসার নিত্য এই পথ দিয়া ভগবান বুদ্ধের চরণবন্দনা করিতে যাইতেন। তাই এই পথ রাজপথ। রাস্তার দুইধারে দুইটি স্তূপ ছিল, দেখিতে শকুনির মত, অথবা উহার উপর শকুনি বসিত বলিয়া পর্বতটির নাম গৃধ্রকূট হইয়াছে। ইহার শিখরে অনেক-গুলি গুহা আছে। ভগবান বুদ্ধ এইখানে অনেকদিন সশিষ্য বাস করিয়াছিলেন। শিখরের নীচের দিকের গুহাগুলি অর্হৎদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, এবং উপরের দিকে যে গুহার পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহা ভগবান বুদ্ধের। এইখানে তিনি সমতল স্থানে পদচারণা করিতেন এবং সমবেত

ভক্তমণ্ডলীকে উপদেশ দান করিতেন। একদিন যখন পদচারণা করিতেছিলেন, তখন দেবদত্ত উপর হইতে পাথর গড়াইয়া তাঁহাকে মারিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। এই গুহাটির উত্তর পশ্চিমে আনন্দের গুহা; যেখানে শকুনির ছদ্মবেশে মার ঝাপটা মারিয়া ভয় দেখাইত এবং ভগবান তথাগত নিজগুহা হইতে শিষ্যকে অভয়দান করিতেন। গুহাটি বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে রসিক অশ্বথ ও বট তাহাদের মূল প্রবেশ করাইয়া রস-শোষণে প্রয়াসী হইয়াছে। মূলস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে পাথর ধসিয়া পড়িয়া অহিংস আন্দোলন করিতেছে। কিন্তু এ মূক প্রতিরোধের শেষ কোথায়?

প্রধান পথ ধরিয়া চলিলে নিকটেই shell inscription (ঝিনুক-লিপি)। উদয়গিরির পাদদেশে অনেকখানি আয়তাকার স্থান ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। এখানকার মাটি বেশ শক্ত এবং লাল রংএর এবং তাহাতে লিপি খোদিত আছে; তাহা ছাড়া রথ চলারও অনেক দাগ আছে। প্রবাদ, ভীমের সহিত জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ এইখানেই হইয়াছিল। লিপির আজও পাঠোদ্ধার হয় নাই। ইহার পার্শ্ব দিয়াই উদয়গিরি উঠিবার পথ। পাহাড়ের মাঝখানে একটি ডাকবাংলো আছে। এখানে পথটি বামে উদয়গিরি ও ডাইনে সোনাগিরি মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং নিকটেই বাণগঙ্গা পাশ। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যই অবর্ণনীয়। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে—মাঝে মাঝে গভীর খাদ। সেই পথ দিয়া রজত-সূত্রের ন্যায় শীর্ণ নদী বাণগঙ্গা, ঝির্ ঝির্ গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনও লাজে অবগুণ্ঠিতা, আবার কখনও হাস্যোজ্জ্বলা। বাণগঙ্গা নদীর উপর একটি পাকাপুল অতিক্রম করিলে বাণগঙ্গা পাশে পৌঁছান যায়। এখানে উদয়গিরি ও সোনাগিরি পরস্পর নিকটে আসিয়া পথটি সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পথ এখানে প্রায় শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ বালুকাময় নদীর পরপারে গিরিয়া। এখানে রাজগীরের আর একটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়—পাহাড়ের উপর প্রাচীর। পাহাড়গুলি উঁচু নয়, তাই নগর-রক্ষা করিবার জন্য পাহাড়ের উপর পাথর দিয়া উঁচু এবং চওড়া প্রাচীর নির্মাণ করা হইয়াছিল। ইহা বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য-শিল্পের একটা নিদর্শন। রাজগীরের সর্বত্রই এই ধরনের প্রাচীর আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা জঙ্গলে সমাকীর্ণ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু এ স্থানে ইহা সুন্দর ভাবে রহিয়াছে।

রাজগীরের পাহাড়গুলিতে উঠা সত্যই একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। ছোট ছোট পাহাড়, কোথাও পথ নাই, শুধু পাথরের উপর দিয়া পথ করিয়া লইতে হয়, আবার কোথাও বা বাঁধান রাস্তা,—পাথরের সিঁড়ি করিয়া দেওয়া। সমস্ত শিখরেই জৈন মন্দির, ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরে কোথাও শুধু পদচিহ্ন, আবার কোথাও শুধু তীর্থঙ্করের মূর্তি রক্ষিত আছে। বনের ভিতর লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়া চলনামা পথে পাহাড়ে উঠানামা করিতে বেশ আনন্দ হয়। উদয়গিরি ও সোনাগিরিতে উঠিবার পথ খুব ভাল নয়। সবচেয়ে ভাল পথ বিপুলগিরিতে—শিখর পর্যন্ত সমস্ত পথটি সোপান-সংযুক্ত। বৈভার-পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা কুণ্ডগুলির পার্শ্ব দিয়া। এখানে পথ বলিতে কিছুই নাই। অসংলগ্ন পাথরের উপর দিয়া উঠিতে হয়। খানিকটা উঠিলেই একটি শৃঙ্গের উপর সমতল স্থান পাওয়া যায়, এখানে জরাসন্ধ-কা-বৈঠক। ইহা watch tower-এর মত। এখানে অনেকগুলি গুহা আছে, ঐগুলি প্রহরীদের থাকিবার স্থান হিসাবে

ব্যবহৃত হইত। এখান হইতে রাজগীরকে ভালভাবে দেখা যায়; পটে আঁকা ছবির মত। আরও উপরে উঠিলে একটি পথ পাওয়া যায়। চড়াই পথে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা হাঁটিয়া একটি সমতল স্থানে আসা যায়, ইহা আর একটি শৃঙ্গ। এখানে জৈন মন্দির আছে। মন্দিরের পাশ দিয়া একটি পথ চলিয়া গিয়াছে, কাষ্ঠফলকে নির্দেশ To Saptaparni Cave. পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া প্রাচীন সপ্তপর্ণী গুহায় পৌছিলাম। বিরাট গুহা—ভিতরে জমাট অন্ধকার; সামান্য টর্চের আলো এ অন্ধকার ভেদ করিতে পারিবে না। পথ একটু নামিয়া পাষাণের মাঝে অদৃশ্য হইয়াছে। কাহিনী এ পথ গয়ার বৌদ্ধ মন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতিহাসের কোন ভিত্তি নাই, শুধু অলীক প্রবাদ-মাত্র। এইখানে রাজা অজাতশত্রু প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি (মহাধর্মসভা) আহ্বান করেন। ইহাতে স্থবির মহাকশ্যপ সভাপতিত্ব করেন।

বর্তমান রাজগীরে প্রধান আকর্ষক বস্তুই হইল এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণগুলি। সেইজন্য প্রস্রবণগুলি-সম্বন্ধে বিশদ ভাবে না বলিলে রাজগীরের বর্ণনা শেষ হয় না। এখানে অনেকগুলি প্রস্রবণ আছে। গঙ্গাযমুনাকুণ্ড, সপ্তর্ষিকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড,—এই তিনটি কুণ্ড বৈভার-পর্বতে। বিপুলপাহাড়ে কুণ্ডগুলির নাম সূর্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, সীতাকুণ্ড ও মকদমকুণ্ড। শেষেরটি মুসলমানদের জন্য। তন্মধ্যে বৈভারপর্বতের ঝরণাগুলি হইতে প্রবলবেগে জল পড়িতেছে এবং উষ্ণতাও বেশী; সেইজন্য স্নানার্থীর বেশী ভীড় হয়। প্রস্রবণগুলির নির্গমদ্বারে পাথরের মুখ বসান—কোনটিতে সিংহ, আবার কোনটিতে হস্তীর মুখ। এই প্রস্রবণগুলি হইতে অবিরাম ধারা পড়িতেছে। গঙ্গাযমুনা-ধারা দুইটি পৃথক ধারা। সপ্তর্ষি-কুণ্ডে সাতটি ধারা সাত জন ঋষির মুখ হইতে পড়িতেছে। ইহার প্রধান ধারা সাতটি ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে স্নানার্থীর সুবিধার জন্য। ব্রহ্মকুণ্ডটি একটি বর্গাকার জলাধার-মাত্র। তলা হইতে বুদ্‌বুদাকারে জল পড়িতেছে, আর তিন ফুট উঁচু হইতে একটি নির্গম-নল দ্বারা জল বাহির হইয়া যাইতেছে। এখানে একটি কাল পাথরের বিষ্ণুমূর্তি আছে। উষ্ণজল পাথরে দিলে ঠাণ্ডাজল পড়িতে থাকে। পাথরটি তাপ-শোষণ করিয়া লয়। ইহা কাল পদার্থের স্বভাবজাত গুণ। বিপুল পাহাড়ের কুণ্ডগুলির জল অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ। জলগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া গিয়াছে :—

প্রতি ১০০০০০ ভাগে

	ব্রহ্মকুণ্ড	সূর্যকুণ্ড	সপ্তধারা
খরতা	৫.৫	৫.৭৫	২.৭৫
ক্লোরিন্	.৯	.৯	.৪
অক্সিজেন	.০০১৮	.০০১৮	.০০৯
নাইট্রোজেন	.০১	.০২	.০১

প্রতি ১০০০০০ ভাগে

	মকদম কুণ্ড	রামকুণ্ড	সীতাকুণ্ড
খরতা	৫.০	২.৫	৪.৫
ক্লোরিন্	.৯	১.০	.৯
অক্সিজেন	.০০২	.০০২	.০০১৮
নাইট্রোজেন	.০২	.০৩	.০২

ইহা ছাড়া জলগুলিতে সালফেট্ ও লৌহ-গঠিত লবণ আছে এবং উহা পানের পক্ষে উপকারী। কুণ্ডগুলির পার্শ্বেই ইদের দরগা। এখানকার সমস্ত সম্পত্তি বিহার-সরিফের নবাবের। নবাব এই সমস্ত কুণ্ডগুলিতে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্থানীয় হিন্দুরা ইহাতে বাধা দেওয়ায়

প্রথমে ছোট আদালতে মামলা দায়ের হয়। পরে উহা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াইয়া যায়। পরিশেষে রফা হয় এবং একটি কুণ্ড নবাবকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কুণ্ডটির পূর্বে নাম ছিল ঋষ্যশৃঙ্গকুণ্ড; পরে পরিবর্তিত হইয়া উহার নাম মকদমকুণ্ড হইয়াছে। মকদম-নামক এক জন পীরের নামানুসারে ইহা হইয়াছে। কুণ্ডটির জল নাতিশীতোষ্ণ। এখানে চেরাগের মেলার সময় খুব ভিড় হয়। তাহা ছাড়া জৈন পর্বগুলিতে দর্শনার্থীর ভিড় বেশী হয়।

রাজগীরে বায়ুপরিবর্তনকারীর মধ্যে বেশীর ভাগই বাতগ্রস্ত। উষ্ণ জলে স্নানে পীড়ার কিছু উপশম হয়। সেইজন্য অক্টোবর মাস হইতে এখানে কর্মচাঞ্চল্য জাগে এবং শীতের পরিশেষে সমস্ত গ্রামটি পূর্বাবস্থা-প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে এখানে কিছু হোটেল গজাইয়া উঠে। সারা বৎসর লোক-সমাগম হয় না বলিয়া হোটেলের ব্যবসা ভাল জমে না। সেইজন্য ভ্রমণকারীদের সঙ্গে সমস্ত জিনিষপত্র লওয়াই ভাল। অবশ্য ঘর পাওয়া যায়। একটি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র এখানে পাওয়া যায়, তবে বেশীর ভাগই বিহার সরিফ হইতে লইয়া আসিতে হয়। চাষ-আবাদ হয়; তবে রবিশস্যই বেশী। নিকটেই নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ। সকালের ট্রেনে যাইয়া সন্ধ্যার ট্রেনে ফেরা যায়। দশটার পর যাওয়াই উচিত, কারণ মিউজিয়াম্ দশটার পর খোলে। বিহারসরিফ্ হইতে বাসে করিয়া গিরিয়ার নিকট নামিলে জৈনদেব তীর্থস্থান পাবাপুরী পাওয়া যায়। এখানে জলমন্দির দেখিবার মত। বৃহৎ সরোবরের মাঝে মন্দির। রাজগীরের সমস্ত স্থানটি পরিভ্রমণ করিতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে, সেইজন্য উপযুক্ত সময় হাতে রাখিয়া যাওয়াই ভাল।

কবীর-বাণী

("জব মৈঁ ভূলাবে ভাঈ"-বাণীর অনুবাদ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

আমারে যখন ভুলেছিনু আমি
প্রিয় সদ্‌গুরু মোর,
কোথা মম পথ দেখালেন আসি
ঝরিল রে আঁখি-লোর!
আচার বিচার সকলি ছাড়িনু
ছাড়িনু তীর্থে স্নান
জগতে সবাই দেখিনু বিজ্ঞ
আমি শুধু অজ্ঞান!
ধূলায় লুটায়ে প্রণাম ভুলিনু
ভুলিনু ঘন্টানাড়া,
আসন-বেদীতে মূর্তি-নিচয়
করি নাই আমি খাড়া!

পূজা-অর্চনা করি নাই তথা
দিই নাই ফল-ফুল,
সকলে আমারে বাতুল ভেবেছে
নাহি যার সমতুল!
জপ-তপ আর কৃচ্ছ্রসাধনে
তৃপ্ত নহেন হরি,
ইন্দ্রিয়-নাশ বসন-বিরাগ—
তুচ্ছ ইহারে বরি!
দয়ালু চিত্তে যে পালে ধর্ম
সদা রহে উদাসীন,
সকল জীবেরে নিজসম জানে
প্রভুতে সে হয় লীন!

কহিছে কবীর—নীরবে থাকি যে
সহে সব অপমান,
সকল গর্ব দূর করি' রাখে—
তারই মেলে ভগবান!

শান্তি-গীতা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলে পুত্র-বিয়োগবিধুর অর্জুনের শোকশান্তির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার লিপিবদ্ধ সংগ্রহই 'শান্তিগীতা'। অধ্যাত্মজ্ঞান ব্যতীত শোকশান্তির দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠতর কোন উপায় নাই এবং ভারতবাসী ঐ জ্ঞানকেই তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার করায়, সকল শোক অপেক্ষা অধিকতর মর্মপীড়াদায়ক পুত্রশোককে দূর করিতে হইলে ঐ জ্ঞানকেই সর্বপ্রধান অবলম্বন রূপে যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন মায়িকে সত্যবজ্‌জ্ঞানং শোক-মোহস্য কারণম্—অর্থাৎ মায়াময় মিথ্যা বস্তুতে সত্যবুদ্ধিই শোক ও মোহের একমাত্র কারণ। দেহাভিমান-জন্য তুমি মমতামুগ্ধ হইয়াছ মাত্র। কেবল তুমি নহ, মায়ামুগ্ধ জীবগণের প্রত্যেকেই এইরূপে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিতেছে। মায়ার এমনই প্রভাব যে অনাদি কাল হইতে জীব এই মিথ্যা সংসারকে সত্য জ্ঞান করিয়া উহাতে মুগ্ধ হইতেছে। জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় দেহের বর্জন তো অবশ্যম্ভাবী, তথাপি অজ্ঞান মানুষ শোকাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। দেহত্যাগ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি-মাত্র, কর্মফল ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জীব দেহধারণ করে, অতএব এজন্য শোক পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। পুত্র যৌবনদশা প্রাপ্ত হইলে, তাহার বাল্যভাব না দেখিয়া পিতা কি শোক করেন?

সৃষ্টির পূর্বে সৎমাত্রই বর্তমান ছিলেন, তখন দেশ, কাল, ভূত, ভৌতিকাদি কিছুই ছিল না। যখন তাঁহাতে মায়াশক্তি সক্রিয় হন, তখন তাঁহাতে মাল্যসর্পের ন্যায় এই জগৎ উদ্ভূত হয়। মালাতে সর্পের যেমন অধ্যাস হয়, তেমনি সেই সতে জগৎ অধ্যস্ত হয়। মায়ার প্রভাবেই সেই সৎ ব্রহ্ম বিশ্বাকারে পরিদৃষ্ট হন। আত্মগত অজ্ঞানের ফলে তাহাতে এই সংসারের অধ্যাস হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান বা প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত। রজঃ ও তমোবিহীন শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি মায়া-নামে এবং রজস্তমোদ্বারা অভিভূত মলিনসত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যা-নামে অভিহিত হন। গুণ ও শক্তিভেদে প্রকৃতিতে এই পার্থক্য উৎপন্ন হয়। উক্ত মায়াতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়, যিনি মায়ার অধীশ্বর এবং সর্বজ্ঞত্বাদি-গুণযুক্ত। অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। মায়ার আধার যে শুদ্ধচৈতন্য, তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

জীবের স্বরূপ নিত্যমুক্ত আত্মা—নির্বিকার ও নিরঞ্জন। মমতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াই তুমি আমার স্ত্রী, আমার পুত্র বলিয়া মূঢ়ের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছ। তুমি দেহই নহ। তখন তোমার আবার পুত্র কি? এই শোকতাপ প্রভৃতি মনের ধর্ম, মন উহা কল্পনা করে ও স্বয়ংই উহাতে দগ্ধ হয়। তুমি মনও নহ, তুমি নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত অসঙ্গ ও অবিকারী আত্মা। দৃশ্য বিষয় ও দ্রষ্টা ব্যক্তি পৃথক, এই ন্যায়ানুসারে দৃশ্য মন ও দ্রষ্টা তুমি পৃথক; কিন্তু অবিবেক-বশতঃ দৃশ্য-দ্রষ্টার অভেদ-জ্ঞানে আমিই মন

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি পুত্রশোকে দগ্ধ হইতেছি—এইরূপ মনে করিতেছ। মন অন্তঃকরণের সঙ্কল্পাত্মিকা বৃত্তি, বুদ্ধি উহার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, চিত্ত অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি; আর অভিমানাত্মিকা বৃত্তির নাম অহঙ্কার। অতএব অন্তঃকরণের বৃত্তি এই চারি প্রকার। ইহারা আত্মার দৃশ্য এবং আত্মা ইহাদের দ্রষ্টা। তুমি মনে তাদাত্ম্যাধ্যাস-জন্য মনের শোকে নিজেকে শোকসন্তাপগ্রস্ত মনে করিতেছ। দেখ, সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাবস্থায় মন বিলীন হইলে শোকসন্তাপ থাকে না, জাগ্রদবস্থায় মন ক্রিয়মাণ হইলে তাহার ধর্ম শোকদুঃখাদি প্রকাশ পায়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ মন মিলিত হইলে হয় মনোময় কোষ। শোকদুঃখ, ভয়, লজ্জা প্রভৃতি এই মনোময় কোষেরই হইয়া থাকে। তুমি অবিবেকবশতঃ মনের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া শোকাকুল হইতেছ। আত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হইলে মনের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস দূরীভূত হয়—তখন মনোধর্ম শোকমোহ জীবকে ব্যাকুল করিতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলেন—'শোকং তরতি চাত্মজ্ঞঃ'। অতএব তুমি আত্মস্বরূপ অবগত হইতে যত্নবান হও।

কি প্রকারে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—

গুরুসেবাং প্রকুর্বাণো গুরুভক্তিপরায়ণঃ।
গুরোঃ কৃপাবশাৎ পার্থ লভ্য আত্মা ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ, গুরুভক্তিপরায়ণ হইয়া গুরুসেবা করিলে গুরুর কৃপাবশে আত্মাকে লাভ করা যায়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তৎপূর্বে বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, মুমুক্ষুত্ব প্রভৃতি সাধনসম্পন্ন হইতে হইবে। শান্ত, বিনীত ও শুদ্ধচিত্ত শিষ্য 'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্যের সাধনরূপ বিচার গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিলে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারেন। বুদ্ধি নির্মল হইলে তাহাতে বিবেকের উদয় হয়। কামনাশূন্য হইয়া ঈশ্বরের প্রীতিসাধন-মানসে স্বধর্ম-পালন করিলে ও সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিলে বুদ্ধি নির্মল হয়। বিবেক দ্বারা জগৎ মিথ্যা বোধ হইলে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বিবেক-বৈরাগ্যবান ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদিকে তাপদায়ক মনে করিয়া আত্মানন্দ-লাভে ব্যগ্র থাকেন। ভোগবাসনাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া তিনি শমদমাদিসাধন-সম্পন্ন হন। বেদ ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে শ্রদ্ধা। এই সাধন ও শ্রদ্ধাপরায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তি শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, কারণ—

জ্ঞানদাতা গুরুঃ সাক্ষাৎ সংসারার্ণবতারকঃ।
শ্রীগুরুকৃপয়া শিষ্যস্তরেৎ সংসারবারিধিম্॥

অর্থাৎ, গুরুই সাক্ষাৎ জ্ঞানদাতা এবং সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণকর্তা। একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপাবলেই শিষ্য সংসারবারিধি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। আত্মা সতত প্রাপ্তই আছেন; গুরুর উপদেশে অবিদ্যার আবরণ দূরীভূত হইলে তাঁহাকে প্রাপ্তবৎ জ্ঞান হয়।

এইবার আত্মস্বরূপ বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ 'ত্বং'-পদের শোধন-প্রণালী বলিতেছেন। নেতি নেতি বিচার করিতে করিতে বাধের যে সীমায় উপনীত হওয়া যায়, সেই সকল বাধের সাক্ষী স্বপ্রকাশ বস্তুকে তুমি নিজের স্বরূপ বলিয়া অবগত হও। ইহাকেই 'ত্বং'-পদের শোধন বলা যায়। 'তৎ'-পদের শোধন-প্রণালী এইরূপ—জগৎকর্তৃত্ব, ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তাদি লক্ষণ-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া দেশকালবস্তু-পরিচ্ছেদশূন্য, মায়ার অধিষ্ঠান, অজ, অবিনাশী, পূর্ণ, এক, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া জান; ইহাকেই 'তৎ'-পদের শোধন বলা যায়। এক্ষণে 'অসি'-পদের দ্বারা শোধিত ত্বং-পদের লক্ষ্যার্থ অবিনাশী প্রত্যক্-চৈতন্যের

সহিত শোধিত তৎ-পদের লক্ষ্যার্থ অবিনাশী ব্রহ্মচৈতন্যের অখণ্ডরূপে ঐক্য অবধারণ কর। যেমন উপাধি ঘট পরিত্যক্ত হইলে ঘটাকাশই অখণ্ড মহাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ত্বং-পদের অবিদ্যাঘটিত অন্তঃকরণ-উপাধি ও তৎ-পদের মায়া-উপাধি পরিত্যক্ত হইলে অন্তঃকরণ-উপহিত প্রত্যক্‌চৈতন্যই ব্রহ্মচৈতন্যরূপে প্রতীত হন। বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট উপাধিদ্বয় ত্যক্ত হইলে এক অখণ্ড চৈতন্যই থাকিয়া যান। হে ফাল্গুনি, তুমি অবধারণ করিয়া মৌনাবলম্বন কর। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ-ভোগ করেন এবং প্রারব্ধবেগ পর্যন্ত উপাধিস্থ হইয়াও আকাশের ন্যায় উপাধির গুণ ও ধর্মে নির্লিপ্ত ও অসঙ্গ থাকেন এবং জীবন্মুক্ত-রূপে প্রারব্ধ কর্মভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে থাকেন। সেই জীবন্মুক্ত পুরুষকে পাপপুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না; তাঁহার কর্তব্য কর্মও থাকে না; তিনি বিধি-নিষেধমুক্ত, তাঁহার শরীর পূর্বকৃত কর্মবশে, অর্থাৎ, প্রারব্ধের বশে পরিচালিত হইলেও তিনি সতত ব্রহ্মসুখসাগরে নিমগ্ন থাকেন।

মায়া কি পদার্থ অর্জুন ইহা জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মায়া ব্রহ্মের অনাদি শক্তিবিশেষ। ইহা সত্ত্ব রজঃ ও তমো-গুণময়ী ও মহাবলবতী। জগৎকার্যদ্বারা এই পরমাত্মশক্তি মায়া অনুভূতা হন। মায়াকে অনির্বচনীয়া বলা হয়। মায়া জগদুৎপত্তির পূর্বে অব্যক্ত থাকে এবং নামরূপে পরিণত হইয়া তাহাই জগদাকারে প্রকাশিত হয়। মায়া এমনই অঘটনঘটনপটীয়সী যে, উহা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রতীতি করায় এবং তাঁহারই আভাসে তাঁহাকে ঈশ্বর ও জীবস্বরূপে পরিণত করায়। জীবের যখন 'সোঽহং' জ্ঞান হয়, তখন তাহার নিকট আর মায়া থাকে না। অতএব মায়া অনাদিভাবে বিশ্বব্যাপিনী হইলেও জ্ঞান দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়; এইজন্য তাহাকে অসতী বলা হয়। মায়াতে আবরণ ও বিক্ষেপ-নামক দুই শক্তি আছে। বিক্ষেপশক্তি রজোগুণ-প্রধানা ও আবরণশক্তি তমোগুণপ্রধানা অবিদ্যা। আবার সত্ত্বগুণপ্রধানা বিদ্যারূপা মায়া জীবের মোহ বিনষ্ট করিয়া তাহাকে স্বরূপজ্ঞান দান করেন। চৈতন্যই মায়ার আশ্রয়।

যেমন বালকগণের প্রীতির জন্য ধাত্রী গল্প-কল্পনা করেন, সেইরূপ বিচারশূন্য ব্যক্তিদের জন্য অধ্যারোপ-শ্রুতি জগৎসৃষ্টির গল্প বলিয়াছেন। ব্রহ্মের সত্যত্ব ও সৃষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করাই বেদের অভিপ্রায়। যেমন বায়ুসংযোগে সমুদ্রে নামরূপবিশিষ্ট তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্‌বুদাদির উদয় হয়, কিন্তু তাহা জল ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নহে, সেইরূপ অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যে মায়াপ্রভাবে নামরূপাত্মক এই জগৎ দৃষ্ট হয়, উহা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নহে। জগৎকারণ মায়াই যখন মিথ্যা, তখন তাহার কার্য কখন সত্য হইতে পারে না। মায়া-উপহিত ঈশ্বরে মায়ার প্রভাবে 'একোঽহং বহু স্যাম' এই সঙ্কল্পের উদয় হয়। মায়াশক্তি হইতে কালের উৎপত্তি হয়, উহার নাম মহাকাল। মহাকালের শক্তি মহাকালী—ইনিই আদ্যাশক্তি-নামে কথিতা হন। কালে সমস্ত উৎপন্ন হয়, কালে অবস্থিত থাকে এবং কালেতেই লয় পায়। যথা :—

কালেন জায়তে সর্বং কালে চ পরিতিষ্ঠতি।
কালে বিলয়মাপ্নোতি সর্বে কালবশানুগাঃ॥

সেই মহাকালে নিমেষ, পল, দণ্ড, দিবা, রাত্রি, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প ইত্যাদি কল্পিত হয়। মায়াশবলিত ব্রহ্ম হইতে প্রথমে শব্দমাত্রাত্মক আকাশ উৎপন্ন হয়, তৎপরে স্পর্শমাত্রাত্মক বায়ু, রূপমাত্রাত্মক তেজ, রসমাত্রাত্মক জল ও গন্ধ-মাত্রাত্মক পৃথিবী এই পঞ্চ সূক্ষ্ম তন্মাত্রের

উৎপত্তি হয়। এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের তামসাংশ পঞ্চীকৃত হইয়া আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে এক এক জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা—আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনা ও পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্মভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক সূক্ষ্মভূতের রজঃ-অংশ হইতে এক এক কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, যথা—আকাশের রজঃ-অংশ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজঃ-অংশ হইতে হস্ত, তেজের রজঃ-অংশ হইতে পদ, জলের রজঃ-অংশ হইতে উপস্থ, ও পৃথিবীর রজঃ-অংশ হইতে পায়ু উৎপন্ন হয়। পঞ্চভূতের মিলিত রজঃ-অংশ হইতে পঞ্চপ্রাণের উৎপত্তি হয়। স্থূলভূত হইতে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জলে বুদ্‌বুদের ন্যায় অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে সমস্তই কল্পিত, স্বপ্নবৎ বিবর্তমাত্র। যেমন ধূম দ্বারা আকাশ মলিন হয় না, সেইরূপ মায়া ও মায়াকার্য দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য বিকৃত হন না। তাঁহাতে মায়ার লেশমাত্রও নাই, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বর নাই, কেবল এক ব্রহ্মমাত্র আছেন। তাঁহাকে এক বলাও যায় না, দ্বিতীয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ-রহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে কোন সংখ্যাবদ্ধ করা যায় না। তিনি উপমারহিত, এই জন্য ব্রহ্ম এইরূপ বা সেইরূপ বলা যায় না। তিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তিনি আনন্দস্বরূপ, কারণ আত্মা হইতে প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। আত্মা স্বপ্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও অবিদ্যাবরণ-জন্য অপ্রাপ্তের ন্যায় বোধ হন। গুরুকৃপায় আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে সেই প্রাপ্তবস্তুই যেন প্রাপ্ত হওয়া গেল এইরূপ মনে হয়।

ঘটমধ্যস্থ আকাশ যেমন ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ বলিয়া উক্ত হয়, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্য বুদ্ধিগত হইয়া বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য নামে কথিত হন। তিনিই তোমার স্বরূপ। কিন্তু এই অবচ্ছেদ কল্পনামাত্র। কারণ, বুদ্ধির নাশে সেই অখণ্ড এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সর্বদা স্বভাবতঃ পূর্ণভাবে থাকেন; ঠিক যেমন ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ ঘটনাশে এক মহাকাশ-রূপেই থাকে। অতএব বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য-রূপ জীবত্ব কল্পিত ও মিথ্যা; স্বভাবতঃ অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যই একমাত্র সত্য। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ এক এবং অভিন্ন, তেমনি ত্বংপদের লক্ষ্য কূটস্থ চৈতন্য ও তৎপদের লক্ষ্য ব্রহ্মচৈতন্য এক ও অভিন্ন জানিবে। সেই উভয় পদের ঐক্য দ্বারা আপনাকে অখণ্ডরূপ জানিয়া ব্রহ্মময় হও। যেমন সহস্র সহস্র দীপে একই অগ্নি, তেমনি সকল দেহে একই আত্মা আভাত হন। আমার বিশ্বরূপ যাহা পূর্বে দেখিয়াছ, তাহাও মায়ামাত্র।

শান্তিগীতায় কর্মযোগ-সম্বন্ধেও একটি অধ্যায় আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণের কর্তব্য বা অকর্তব্য কিছুই নাই; তাঁহারা বিধিনিষেধ-বর্জিত। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে শরীরধারী হইলেও নির্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতেই অবস্থান করেন। তিনি ভাবাভাব-বর্জিত, পরমার্থতঃ তিনি সকল প্রকার আচারের অতীত হইয়াও উপাধিদৃষ্টিতে আচারপরায়ণ। প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর পরিচালিত হয়। তিনি নানা বেশধারী হন। কখন ভিক্ষুবেশধারী, কখন নগ্ন, কখন বা ভোগে মগ্নভাবে অবস্থান করেন। তত্ত্বজ্ঞের কেহ গৃহস্থ, কেহ বানপ্রস্থী, কেহ মূঢ়বৎ, কেহ পণ্ডিত, কেহ সুন্দর বসনে বিভূষিত, কেহ চীরধারী, কেহ উন্মত্তপ্রায়, কেহ পিশাচতুল্য, কেহ বনবাসী, কেহ মৌনী, কেহ অতিবক্তা,

কেহ তার্কিক। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বিবিধভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করেন। বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া তাঁহাদিগকে জানিতে পারা যায় না। বাহ্যলক্ষণের দ্বারা কখন অন্তর্ভাব জানা যায় না। প্রারব্ধকর্ম-জন্যই তত্ত্বজ্ঞগণের ভাবের পার্থক্য হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম তাঁহাকে তাঁহার ফল-ভোগ করাইয়া তাঁহার দেহের সহিত বিনষ্ট হয়। প্রারব্ধকর্ম, শরাসন হইতে নির্মুক্ত শর যেরূপ উহার লক্ষ্যকে ভেদ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ ভোগ সম্পাদন না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শরীর ও প্রারব্ধকর্মের ভোগ মিথ্যা জানিয়া উহাতে বিমোহিত হন না, যেমন মানুষ স্বপ্নাবস্থার কর্মসমূহ মিথ্যা জানিয়া তাহাতে গুরুত্ব আরোপ করেন না। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই কর্মত্যাগের অধিকারী। দুইটি মাত্র মানুষের অবলম্বন—এক কর্ম, দ্বিতীয় ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার আর কর্ম থাকে না; এবং যিনি কর্মকে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্ম অনেক দূরে। অতএব হে অর্জুন, তুমি নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া অহঙ্কার ও তদ্‌জাত শোকমোহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর।

মহানিগ্রন্থ

(পুরাতন জৈন কথা)

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

একদা মগধাধিপতি মহারাজ শ্রেণিক মণ্ডিকুক্ষি-নামক উদ্যানে ক্রীড়ার জন্য গমন করিলেন। নানাপ্রকার বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ, বহুপ্রকার প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ও নানাজাতীয় পক্ষিগণের কূজনে মুখরিত হইয়া এই উদ্যান নন্দনবনের ন্যায় শোভা পাইতে ছিল।

মহারাজ শ্রেণিক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বৃক্ষমূলে সুখাসনে উপবিষ্ট একজন তেজঃপুঞ্জমণ্ডিত শ্রমণকে ধ্যানস্থ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ, সৌম্যমুখকান্তি, চিত্তাকর্ষক রূপ দেখিয়া তিনি মোহিত হইলেন। শ্রমণকে দেখিলেই ক্ষমা, নিঃস্পৃহতা ও অনাসক্তির মূর্ত প্রতীক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

শ্রেণিক সাধুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও বন্দন করিয়া নাতিদূরে ও নাতি-নিকটে উপবেশন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে আর্য, আপনার এখন পরিপূর্ণ যৌবনাবস্থা, আপনি এ সময়ে বিষয়ভোগ না করিয়া কেন এই কঠোর শ্রমণজীবন যাপন করিতেছেন? ইহার কারণ জানিতে আমি উৎসুক হইয়াছি, কৃপাপূর্বক বলুন। রাজার কথা শুনিয়া সাধু বলিলেন,—মহারাজ, আমি অনাথ, আমার প্রভু, রক্ষাকর্তা বা সুহৃৎ কেহ নাই,

তজ্জন্য আমাকে এই মার্গ-অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শ্রমণের বাক্যে শ্রেণিক ঈষদ্‌হাস্য-সহকারে বলিলেন,—হে মহাত্মন্, আপনার-ন্যায় অপরূপ রূপলাবণ্যযুক্ত, তেজস্বী পুরুষের কোন রক্ষাকর্তা প্রভু নাই? হে সংযত, আমিই আপনার রক্ষাকর্তা হইব; আপনি আমার রাজ্যে নিবাস করিয়া যদৃচ্ছভাবে স্বজনাদি সহ সুখভোগ করুন। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিব।

শ্রেণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সংযত মুনি বলিলেন—হে মহারাজ, আপনি নিজেও অনাথ, স্বয়ং অনাথ হইয়া কি প্রকারে আমার রক্ষাকর্তা হইবেন? সাধুর অশ্রুতপূর্ব বচন শুনিয়া শ্রেণিক বিস্মিত হইয়া বলিলেন—হে মুনি, আমার হস্তী, অশ্ব, সৈন্যসামন্ত, পরিজনবর্গ, স্ত্রীগণ ও প্রজাসমূহ আছে। আমি এই সকলের অধীশ্বর। আমার ইঙ্গিত-মাত্রে ইহারা সকলেই আমার আদেশ-পালনে প্রস্তুত। তবে আমি কিরূপে অনাথ? আপনার কথার অর্থ কি? আপনি মিথ্যা উক্তি করিয়া আমাকে সম্মোহিত করিতেছেন কেন?

মুনি উত্তর করিলেন—হে রাজন্, আপনি অনাথ কাহাকে বলে তাহা জানেন না। লোকে কিরূপে অনাথ ও সনাথ হয় তাহা আমি বলিতেছি, স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন। হে মহারাজ, প্রসিদ্ধ কৌশাম্বী-নগরীতে প্রভূত ধনশালী এক শ্রেষ্ঠী আমার পিতা ছিলেন। আমার মাতা, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীগণ ও স্ত্রী ছিলেন। যৌবনকালে আমার অত্যন্ত তীব্র অস্থিবেদনা হয়; তাহাতে সমস্ত শরীরে ভীষণ দাহজ্বর হইয়াছিল। আমার কটিদেশে, হৃদয়ে ও মস্তকে ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় জ্বালাময় দারুণ বেদনা হইয়াছিল যাহা সহনশক্তির সীমার বহির্ভূত। আমার পিতা আমার জন্য মন্ত্র-চিকিৎসক, শস্ত্র-চিকিৎসক, ঔষধ-চিকিৎসক প্রভৃতি বহু বৈদ্যাচার্যগণকে আনাইলেন ও আমাকে নিরাময় করিয়া দিলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিবার সংকল্প ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কেহই আমার বিপুল বেদনার অল্পমাত্রও উপশম করিতে পারিল না। হে মহারাজ, ইহাই আমার অনাথতা। আমার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীগণ আমার কষ্টমোচনের জন্য যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা ও নানাপ্রকার দেব-দেবীর নিকট মানত করিলেন, আমার অনুরক্তা ও পতিব্রতা স্ত্রী দিবারাত্র অশ্রুমোচন করিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিলেন, তিনি সর্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইয়াছিল। রাজন্, এমনই আমার অনাথতা! হে নৃপতি, এইরূপে দুঃসহ বেদনা সহ্য করিতে করিতে আমার মনে হইল যে, বিগত অনন্ত জন্মে এইরূপ উগ্র যন্ত্রণা হয়ত কতবার ভোগ করিয়াছি, কিন্তু ইহা রোধ করিবার কোন উপায় আমি এ পর্যন্ত উদ্ভাবন করি নাই এবং তজ্জন্য বারংবার এরূপ বেদনা ভোগ করিতে হইতেছে। আমার বেদনা যদি আজ রাত্রির মধ্যে চলিয়া যায়, তবে প্রত্যূষেই আমি গৃহসংসার-পরিত্যাগ করিয়া শ্রমণ-দীক্ষা গ্রহণ করিব এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর কখনও এরূপ তীব্র বেদনা ভোগ করিতে না হয়, তাহার জন্য উদ্যম করিব। হে মহারাজ, এইরূপ চিন্তা করিয়া শয়ন করিতেই আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম এবং রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত বেদনা উপশান্ত হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে আমি মাতা, পিতা প্রভৃতি স্বজনগণের আদেশ লইয়া গৃহত্যাগ করিলাম এবং শ্রমণ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ক্ষান্ত, দান্ত ও সর্বপ্রকার হিংসা হইতে মুক্ত হইলাম। এখন আমি নিজের ও অন্যান্য সকল প্রাণিগণের নাথ হইয়াছি।

হে মহারাজ, আত্মাই আমার বৈতরণী

নদী, আত্মাই আমার নরকস্থিত কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলী বৃক্ষ, আত্মাই আমার কামদুঘা ধেনু এবং আত্মাই আমার নন্দনবন।

আত্মাই সুখ ও দুঃখের কর্তা এবং সুখ ও দুঃখের বিনাশকর্তা। আত্মাই দুরাচারে বা সদাচারে প্রবৃত্ত হইলে নিজের শত্রু ও মিত্র হয়।

তখন মহারাজ শ্রেণিক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে জিতেন্দ্রিয় মহাতপোধন, আপনি আমাকে যথাযথভাবে অনাথতার স্বরূপ বিবৃত করিলেন। আপনার মনুষ্য-জন্ম সফল হইয়াছে, অসাধারণ রূপলাবণ্য-প্রাপ্তি সার্থক হইয়াছে। হে মহানির্গ্রন্থ, আপনিই প্রকৃত সনাথ ও সবান্ধব; কারণ, আপনি তীর্থঙ্করগণের উপদিষ্ট ধর্ম দৃঢ়তার সহিত পালন করিতেছেন। হে মহর্ষি, আপনি নিজের ও অন্যান্য প্রাণিগণের নাথ, রক্ষাকর্তা ও মার্গোপদেশক হইয়াছেন। এইরূপ স্তুতি করিয়া মগধাধিপতি মহানির্গ্রন্থকে প্রদক্ষিণ ও বন্দন করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন এবং নির্মলচিত্তে ধর্মে অনুরক্ত হইলেন।

গান

শান্তশীল দাশ

বন্ধু, আমারে দিয়েছ বেদনা,
　দিয়েছ যে আঁখিজল;
সেই তো আমার এই জীবনের
　সার্থক সম্বল।

ধরণীর দান সে তো ক্ষণিকের,
চিরসাথী নয় সে চলা পথের;
দু'দিন সে থাকে, দু'দিনে হারায়,
　সে যে চিরচঞ্চল।

বেদনা আমার চিরসাথী সে যে,
　তোমার প্রেমের দান;
সে বেদনা মোরে ধরণীর বুকে
　করেছে যে মহীয়ান।

হাসি-আনন্দ ক্ষণিকের দান,
নিমেষের মাঝে হ'য়ে যায় ম্লান;
বেদনা আমার চির-সুন্দর
　তার মাঝে নাহি ছল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি-প্রসঙ্গ

(এক)

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

স্থান, ময়মনসিংহ—২২।১।১৬, শনিবার বৈকাল ৪টা। আজ আফিসে আসিয়া শুনিলাম, পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ শ্রীযুক্ত জিতেন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে শুভানুগমন করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আফিস হইতে বাহির হইলাম। মহারাজকে দর্শন করিবারজন্য মন বড়ই ব্যাকুল। জিতেন বাবুর বাড়ীর বৈঠকখানায় মহারাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু পরে শুনিলাম, তিনি ভিতরে আছেন। আমি তখন বাড়ীর ভিতরে গিয়া মহারাজকে দর্শন করিলাম।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ হলঘরে বসিয়া সকল ভক্তদের উপদেশ দিতেছেন; যথা,—স্বামিজীর সেবাধর্মের কথা, নীচ জাতির উপর ঘৃণা রাখা উচিত নহে ইত্যাদি। উপদেশচ্ছলে হাতি ও পিঁপড়ের গল্প বলিলেন। এইবার পূজনীয় মহারাজ বেড়াইবার জন্য বাহির হইলেন, বাবুরাম মহারাজও সংগে চলিলেন। তাঁহারা নদীর পাড়ে বেড়াইতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভক্তও চলিলেন। ইহাতে জিতেন বাবু বাধা দিলে বাবুরাম মহারাজ একটু রাগ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ওরা সাধুসঙ্গ করবে না? কেন বাধা দিচ্ছ? জীবনের এই ত মহৎ কাজ। কার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ হয়? সাধুসঙ্গ বড় দরকার। তোমরা ভক্তদের বাধা দিও না। পূজনীয় মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ নদীর পাড়ে courtএর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মহারাজ—বাবুরামদা, দেখছ, কি সুন্দর মাঠ, কি সুন্দর নদী, বেশ যায়গা! হুর হুর করে বাতাস বইছে। এসব দেখে আমার উদ্দীপন হচ্ছে।

বাবুরাম মহারাজ,—হবে বৈকি। বেশ যায়গা। ঠাকুর বলতেন, হৃদয়ের বাড়ী মাঠ আছে, তাই সেখানে থাকতে ভালবাসি। মাঠ দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে।

মহারাজ—জয় গুরু, শ্রীগুরু!

বাবুরাম মহারাজ—হরিবোল, হরিবোল!

মহারাজ বিশ্ব, একটা ভগবানের নাম কর না। কিরে, এত দেরী সয় না। অন্য আর একজন ব্রহ্মচারীকে বল্লেন, তুই বল না। তখন ব্রহ্মচারী একটি স্তব পাঠ করিলেন।

মহারাজ—এটা কোন দিক্? সকলে বলিলেন, উত্তরপুব কোণ।

মহারাজ তখন প্রণাম করিলেন।

তৎপর আর একজন ব্রহ্মচারী স্তবপাঠ করিলেন। মহারাজ বলিলেন, এ সব যায়গায় সন্ধ্যা ও সকালে ধ্যান করা ভাল, মন পবিত্র হয়। ভগবানের নামই সত্য। আর যা দেখছ সব মিথ্যা। তাঁর উপর ভক্তি-বিশ্বাস, তাঁর গুণগান এই জীবনের কর্ম। এই সব কথাগুলি তিনি খুব ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলে মহারাজ বারণ করিতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ বিনীত ভাবে বলিলেন, মহারাজ, তোমার এখন এই অবস্থা। ওরা একটু প্রণাম করে নিক্। (ভক্তদিকের দিকে চাহিয়া) এই সময় তোরা প্রণাম

করে নে। মহারাজ, তুমি একটু দাঁড়াও। সকলে প্রণাম করিলে মহারাজ সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, কালে দেখছি এই সব ছেলেরা দেবতা হয়ে যাবে। আবার সকলে নদীর পাড়ে বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ আবেগপূর্ণ ভাষায় স্বামিজীর কথা, মহাবীর হনুমানের মত তাঁহার ভক্তি, ইত্যাদি সব বলিতে আরম্ভ করিলেন।

*　　*　　*

২৩।১।১৬, রবিবার

আজ সকাল সাড়ে সাতটার সময় জিতেন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কিছু সময় নানা প্রসঙ্গের পর সুসঙ্গের মহারাজকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলিলেন, দেখুন, আপনি গান-বাজনা করেন খুব ভাল কথা। এর মধ্য দিয়েও ভগবানের নিকট যাওয়া যায়। এই সুরই 'নাদব্রহ্ম'। তপস্যা করলে এই সব অনুভূতি হবে। মহারাজজী এই কথা এমন জোরের সহিত বলিলেন যে, উপস্থিত সকলের মনে উহা গভীর রেখাপাত করিল। আমি বলিলাম, মহারাজ, মন বড় চঞ্চল। ধ্যান-জপ হয় না। কি করলে ঐ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়? মহারাজ বলিলেন, দেখ্, খুব সকাল ঘুম হতে উঠবি এবং হাতমুখ ধুয়ে আসনে বসবি। মনকে শাসন করে বলবি, মন স্থির থাক, বাজে চিন্তা এখন করতে পাবে না। এইরূপ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে বশে আনবি। দেখবি শীঘ্রই মন স্থির হয়ে যাবে, আর বাজে চিন্তা আসবে না। মস্ত হাতীকেও বশে আনা যায়, আর তুই মানুষ হয়ে নিজের মনকে বশে আনতে পারবি না? আমি কাউকে বেশী উপদেশ দিই না। এখন এই সব কথা নিয়ে জাবর কাট্। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, জাবর কাটতে হয়।

এই বার গানের আয়োজন হইতেছে, সকলেই প্রণাম করিয়া গান শুনিতে বৈঠকখানায় গেলেন। পাশের ঘরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ধ্যান করিতেছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বীরেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বীরেন, মহারাজ কাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন? বীরেনবাবু আমাকে দেখাইয়া দিলেন। বাবুরাম মহারাজ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যা বাঙ্গাল, এবার তোর হয়ে গেল। মহারাজ বড় কাকেও উপদেশ দেন না, পরে বুঝবি। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; তিনি খুব আশীর্বাদ করিলেন।

*　　*　　*

বৈকালে ৪টার সময় পুনরায় মহারাজদের দর্শন-মানসে জিতেন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। প্রণাম করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ বৈকালে বেড়াইবার জন্য বাহির হইলেন।

আমরা বাহির হইয়া আজ নূতন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আসিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ আজ আশ্রমের উদ্বোধন করিবেন, তাই বহু লোকের ভিড়। রাত্রি তখন ৭টা হইবে; তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি ও বাবুরাম মহারাজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ নিজেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক করিলেন। তিনি আরতি করায় সকলের প্রাণে একটা বিমল আনন্দ হইল। মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে কিছু বলিতে বলিলেন। বাবুরাম মহারাজ চমৎকার একটি বক্তৃতা দিলেন স্বামিজীর সেবাধর্ম-বিষয়ে। তাহার পর গান হইল। ২।৩ দিন পরে তিনি ঢাকাযাত্রা করিবেন। যাবার দিন স্থির হইল, তিনি রাত্রি ৮টার ট্রেনে রওনা

হইবেন ; আমি বৈকালে যাইয়া শ্রীচরণ-দর্শন করিলাম। আজ সকলের প্রাণে এক বিষাদের ছায়া ; জিতেন বাবুর ত কথাই নাই। যথাসময়ে মহারাজ সকলকে খুব আশীর্বাদ করিয়া একটি ফিটনে উঠিলেন। সংগে বাবুরাম মহারাজ ও অমূল্য মহারাজ। পূজনীয় মহারাজ আমাকে দেখিয়া বলিলেন, চলে আয় আমার সাথে। আমি উত্তর দিলাম, হাঁ, ষ্টেশন পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে যাব। মহারাজ বলিলেন, না না, আমার গাড়ীতে আয়। আমি সংকোচ প্রকাশ করিলাম। ভাবিলাম, মহারাজের সংগে কি করিয়া যাই ? বাবুরাম মহারাজ তখন বলিলেন, মহারাজ ডাকছেন, ওঁর কথা শুনতে হয় ; তোর কোন সংকোচ করতে হবে না। অতঃপর ফিটনে পূজনীয় অমূল্য মহারাজের পাশে বসিলাম। মনে মনে ভয়, পাছে পা কোন প্রকারে মহারাজের গায়ে লাগে। আবার নিজকে ধন্য মনে করিতেছিলাম, এমন কি তপস্যা করিয়াছি যে, মহারাজের এত সহজ সান্নিধ্য-লাভ করিলাম। যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌছান গেল। গাড়ী আসিবার সময় হইল। আমার দিদি গিয়াছিলেন ; তিনি মহারাজদিগকে প্রণাম করিলেন। মহারাজ দিদিকে বলিলেন,—মা, গাড়ী এসে গেল, সময় আর নেই ; তোমাকে এক কথায় জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছি। রোজ কথামৃত পড়। তবেই হবে। কথামৃতের মধ্যেই সমস্ত ধর্ম আছে।

এইবার তাঁহারা সকলে গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন। আমরা সকলে একে একে প্রণাম করিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজও প্রাণ খুলিয়া সকলের জ্ঞান-ভক্তি হোক্ এইরূপ আশীর্বাদ করিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিল ; বিষণ্ণ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিলাম।

(দুই)

(১৯১৬, ২৭শে নভেম্বর, ত্রিবাঙ্কুরের আলওয়া শহরে ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত)

শ্রীপি শেষাদ্রি কর্তৃক সংগৃহীত

তীর্থভ্রমণে অনেক উপকার। তীর্থস্থানে সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গ করবার সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া ঐ সময়ে সাংসারিক চিন্তাটা কম থাকে ; একটানা ঈশ্বরচিন্তা করা সম্ভব হয়।

কাশী পরম পুণ্যক্ষেত্র ; বহু সাধু, মহাপুরুষ বাস করেন। সাধুসঙ্গ করবার বিশেষ সুবিধা। ওখানে একটা নিরন্তর আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ বোঝা যায়। গৃহীদেরও সাধন-ভজন করবার সব রকম সুবিধা আছে। ৺কাশীতে কিছুকাল বাস করা সকলেরই পক্ষে খুব ভাল।

বৃন্দাবনও কাশীর মত একটি পবিত্র তীর্থ-স্থান। বৃন্দাবনে রাতদিন ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন অনেক সাধু ও ভক্ত আছেন। সকলেরই অন্ততঃ একবার এই সব পবিত্র তীর্থদর্শন করা উচিত।

ঈশ্বরের নাম-জপ করা খুবই ভাল। তাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। নাম-জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টের স্মরণও করা উচিত। এই স্মরণ-পূর্বক জপ খুব উপকারী। মনে অন্য চিন্তা রেখে শুধু মুখে নাম উচ্চারণ করলে কোন বিশেষ ফললাভ হয় না। অধিকারিভেদে ইষ্টদেবতা স্থির করে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন। অধিকারি-অনুসারে ইষ্টদেবতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকেন। স্বয়ং জ্ঞানলাভ করবার আগে গুরুর উপদেশ-অনুসরণ করাই শ্রেয়। গুরুর উপদেশ যতই পালন করবে ততই হৃদয় নির্মল হবে।

গুরুর উপদেশ ব্যতীত সাধন করা প্রায়ই দুঃসাধ্য। অসামান্য মনোবলসম্পন্ন অতি বিরল কোন কোন লোকের পক্ষে হয়ত গুরুর প্রয়োজন তত নেই। কিন্তু গুরুর আশ্রয় নিয়ে সাধন করাই শ্রেয়স্কর; ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয় থাকে না। কিন্তু গুরুলাভ না হওয়া পর্যন্ত অলস হয়ে বসে থাকা কোনও মতে উচিত নয়। সাধন করে যেতে হবে—যথাসময়ে গুরু নিজে এসে উপদেশ দেবেন।

নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুতে সাহায্য করে। স্ত্রী, সন্তান প্রভৃতি সকলকে ঈশ্বরের সম্পত্তি বলে জানবে। এই ভাব ঠিক ঠিক পোষণ করতে পারলে তোমাদের সমস্ত কাজই আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

ধ্যান অভ্যাস করলে অনুভূতি হচ্ছে বলে তোমরা নিজেরাই প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারবে। কেবল শাস্ত্রপাঠ ও বৃথা তর্ক করলে কোনও লাভ হয় না। ধ্যানে চিত্ত শুদ্ধ হবে; আর চিত্ত শুদ্ধ হলে ঈশ্বর-লাভ হবে। তোমাদের সমস্ত শক্তি ও পৌরুষ সাংসারিক বিষয়ের জন্যই তোমরা ব্যয় করছো। ঈশ্বর-ভজনের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করছো না। এই ভাবে জীবন ব্যর্থ করা উচিত নয়। ঈশ্বর-ভজনে ও ভক্তি-সাধনায় লেগে যাও। সময়ের অপব্যয় করো না। আমাদের জীবন তো ক্ষণ-স্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ঈশ্বরের আরাধনাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। কাজের মধ্যেও ঈশ্বরকে স্মরণ করবে। দিনের মধ্যে শুধু কোন একটা সময়ে ঘরের কোণে বসে চোখ বুজলেই যথেষ্ট নয়। তখন তো জাগতিক চিন্তাই তোমাদের মন অধিকার করে বসে থাকে।

দ্বৈতভাব থেকে সাধন আরম্ভ করাই প্রশস্ত। এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হলে তোমরা আপনা আপনি সহজেই অদ্বৈতে পৌঁছুবে। ঈশ্বরকে প্রথমে বাহিরে দেখাই ঠিক; পরে তোমাদের অন্তরেও তাঁকে দেখতে পাবে। আনন্দের অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত ধ্যানের অভ্যাস ছাড়বে না। সেই অবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত দ্বৈত-ভাবই অবলম্বন করতে হবে।

সমাধি-অবস্থায় কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই দেখতে পাবে। তখন মন ঈশ্বরময় হয়ে যাবে। সমাধির স্বরূপ-বর্ণনা করতে পারা যায় না।

সমালোচনা

Mysticism of the Tantras: ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্‌-এ, পিএইচ-ডি প্রণীত। প্রকাশক :—শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্‌-এ, বি-এল্‌; ভারতী মহাবিদ্যালয়; ১৭০, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬; পৃষ্ঠা—২১৬; মূল্য—৭৲ টাকা।

ভারতী মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক ইংরেজীতে প্রদত্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ বক্তৃতামালা' চব্বিশ অধ্যায়ে বিভক্ত বর্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথিতযশা দার্শনিক গ্রন্থকার তন্ত্রের মরমিয়াবাদ (mysticism) ও অধ্যাত্ম-দর্শনের বিভিন্ন দিক লইয়া গম্ভীর ও মনোগ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। তন্ত্র প্রধানতঃ সাধনশাস্ত্র হইলেও গভীর দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া পূর্বে যথোচিত আলোচনা হয় নাই। কয়েক বৎসর হইল গ্রন্থকার তাঁহার বাংলা 'তন্ত্রালোক'-গ্রন্থে তান্ত্রিক দর্শনের

আলোচনা করেন। তন্ত্র-সম্বন্ধে শিক্ষিতমহলে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি উক্ত ভ্রান্তধারণা নিরসনে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে।

গ্রন্থকারের মতে এই জগৎপ্রপঞ্চের মূলে যে মহাশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তন্ত্র তাহাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাই তন্ত্র-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এই পরমতত্ত্ব নিত্যমুক্ত এবং শান্ত হইয়াও অবিরাম গতিশীল। "তন্ত্র চরম সত্তার অদ্বয়ভাবের সহিত তাহার সৃষ্টিশীলতার সমন্বয়-সাধন করিয়াছে।" (১৫ পৃঃ) তন্ত্র একাধারে কলা ও বিজ্ঞান।

"আমাদের মূল সত্তার উপলব্ধি এবং তাহার সহিত জীবন, আলোক, জ্ঞান ও শক্তির মূল উৎসের যোগসাধন করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চারের দ্বারা আমাদের সমগ্র জীবন ও সত্তার আধ্যাত্মিক রূপান্তর-সাধনের কৌশলই তন্ত্রের শিক্ষা।" (২২ পৃঃ) এই কারণেই তান্ত্রিক ধর্মে বিচারবুদ্ধি ও বিচারশীল প্রজ্ঞার সাহায্যে সত্য-লাভের চেষ্টা না করিয়া আমাদের অতিমানস সত্তাকে জাগ্রত করিয়া সত্যদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছে। তান্ত্রিক সাধনা মানুষের সুপ্ত শক্তি-সমূহকে প্রকটিত করিয়া তাহার মূল সত্তার আবরণ উন্মোচন করিয়া দেয়। তখন মানব-জীবনের প্রতিস্তরে অবিরাম দৈবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতে থাকে। (৩৮ পৃঃ) তন্ত্র অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতিকে উপেক্ষা করে নাই। পাতঞ্জল যোগদর্শনে অলৌকিক বিভূতি-গুলি আত্মসাক্ষাৎকারের পথে বাধা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্র এই সকল অলৌকিক বিভূতিকে সাধনার সহায় বলিয়া মনে করে। তন্ত্রমতে উহা "(১) আমাদের সুপ্ত সত্তাকে বাহির করে; (২) আমাদের মানসস্তরের সহিত মহাজাগতিক শক্তিসমূহের যে মিল রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করে; এবং (৩) আমাদের যে কেন্দ্রীয় সত্তা ঐ শক্তিগুলিকে পরিচালিত করিয়া আমাদিগকে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্ত করে এবং আমাদের জীবনে দৈব-ইচ্ছা এবং দিব্যশক্তিকে ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে, সেই সত্তার স্বরূপ প্রকাশ করে।" (৪৪ পৃঃ) তন্ত্রে অলৌকিক বিভূতির এই প্রকার উচ্চমূল্য স্বীকৃত হওয়ায় গ্রন্থকার অলৌকিকবাদের (occultism) আলোচনায় তিনটি অধ্যায় নিয়োগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বপ্নের অলৌকিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ফ্রয়েড্-এর স্বপ্নতত্ত্বের সহিত তন্ত্রের স্বপ্নতত্ত্বের তুলনা এবং ফ্রয়েড্-মতের অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পাতঞ্জলযোগ প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ। তন্ত্র জ্ঞানমার্গকে অস্বীকার করে নাই। তান্ত্রিক যোগে জ্ঞান-সাধ্য মুক্তির সহিত শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত লীলার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। অধ্যাত্মশক্তির গতিশীলতা, ভাগবতী ইচ্ছার সৃষ্টিধর্মকে তন্ত্র কখনও উপেক্ষা করে নাই। (৭৬ পৃঃ) এই বিষয়ে সাংখ্য বেদান্তের সহিত তন্ত্রের পার্থক্য। তন্ত্রমতে মানবজীবনে মহাশক্তির লীলা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সঙ্কীর্ণতা লোপ পায়; তখন অনন্ত সত্তার সহিত মানবজীবনের ঐক্য সাধিত হয় এবং ঐক্যানুভূতিরূপ জ্ঞানের বিকাশ হয়। তন্ত্র বেদান্তের ন্যায় ব্যষ্টিপুরুষের মুক্তিলাভে সন্তুষ্ট নহে; তাহার সহিত সমষ্টি-জীবনের আধ্যাত্মিক রূপান্তর-সাধনও ইহার লক্ষ্য। (১২৪ পৃঃ)

শেষের কয়েক অধ্যায়ে গ্রন্থকার কুণ্ডলিনী-রহস্য, শক্তি, নাদ এবং বিন্দুর তত্ত্ব, শব্দশক্তি ও মন্ত্র-রহস্য, অধ্যাত্মশক্তির আরোহ এবং অবরোহ, শক্তি ও কলা, দীক্ষাতত্ত্ব এবং তন্ত্রোক্ত ত্রিবিধ ভাব, অর্থাৎ আচারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার আধুনিক কালের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক,—বিশেষভবে 'মিষ্টিক' দর্শনে বিশেষজ্ঞ।

যে গভীর মননশীলতা এবং দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি-সহায়ে তিনি তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু পাঠক এবং তত্ত্বাভিলাষী সাধক উভয়ের পক্ষেই উপযোগী হইয়াছে। বিষয় দুরূহ হইলেও গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ এবং সাবলীল। কিন্তু বহুসংখ্যক ছাপার ভুল পাঠকের চক্ষু ও মনকে পীড়িত করে। এরূপ উচ্চাঙ্গের গ্রন্থে এত মুদ্রণ-প্রমাদ বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন (অধ্যাপক)

মানবতার প্রাণশক্তি—রফিউদ্দীন প্রণীত। প্রকাশক: মহীউদ্দীন, জিলাপাড়া, পোঃ ও জেলা পাবনা, পূর্ব পাকিস্তান; পৃষ্ঠা—১০০; মূল্য—২।০ আনা।

প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন রোমক, প্রাচীন সেমিটিক, মধ্যযুগীয় আরবী এবং বর্তমান ইউরোপীয় —এই পাঁচ সংস্কৃতির মনোজ্ঞ পরিচয়-গ্রন্থ। এই সকল সংস্কৃতির মধ্য দিয়া মানবতার প্রাণশক্তি কি ভাবে শিক্ষা-সমাজ-নীতি-দর্শনে, তথা ধর্মে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার তুলনামূলক ও তথ্য-বহুল আলোচনা প্রাঞ্জল ও সরস ভাষায় করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে কেন লেখক আলোচ্য বিষয় হইতে বাদ দিলেন বুঝিলাম না।

মানুষ হলেও দেবতা বলি—শ্রীঅতুলানন্দ রায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভারতী প্রণীত। প্রকাশক—'অরোরা'র পক্ষে—শ্রীআশালতা রায়, মনোভিলা, দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা, কলিকাতা —৩০; ৫৫ পৃষ্ঠা; মূল্য—১।০ আনা।

মহাভারতের কয়েকটি গল্প ছেলেমেয়েদের জন্য সরস ভাষায় চিত্তাকর্ষক কল্পনা-সংযোগে লেখা। বর্ণনাগুলি লেখকের নিপুণ হাতে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যত্বের যে উচ্চ আদর্শ গল্পগুলিতে নিহিত কিশোর মনে উহা বসাইয়া দিবার কৌশল লেখক জানেন দেখিলাম।

কৃষ্ণকুমারী (নাটক)—লেখক: শ্রীঅতুলানন্দ রায়, 'মনোভিলা', দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা, কলিকাতা—৩০, ৭৯ পৃষ্ঠা; মূল্য—১৸০ আনা।

মেবার-রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী-অবলম্বনে এই বিয়োগান্ত নাটিকাখানি রচিত। মহাকবি মাইকেলও এই কাহিনী লইয়া তাঁহার বিখ্যাত 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' লিখিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের ঘটনা-নির্বাচন, সংলাপ এবং নাটকীয় সংগতি ভাল লাগিল। বাংলার নাট্য-সাহিত্যে বইখানি উপযুক্ত স্থান পাইবে আশা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ—৭ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর) বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন-কার্যালয়) পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি-উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষপূজা, হোম, ভোগরাগ, ভজন-কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী ওঙ্কারানন্দজী প্রায় দুই-ঘণ্টাকাল স্বামী সারদানন্দ মহারাজের তপস্যা ও সেবাময় পুণ্যজীবন-কথা আলোচনা করেন।

৯ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বেলুড়মঠের নাটমন্দিরে যীশুখ্রীষ্টের সুসজ্জিত আলেখ্যের সম্মুখে তাঁহার পুণ্যাবির্ভাব-স্মরণে ভগবদ্ভজন, বাইবেলপাঠ ও তাঁহার জীবনী-আলোচনা করা হয়। কলিকাতা উদ্বোধন-কার্যালয়ে এবং মঠ ও মিশনের আরও বহু কেন্দ্রে ঐদিন এই পবিত্র স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীগিরিশ-

চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েক জন গৃহস্থ ভক্তকে অভূতপূর্ব দিব্যাবেশে স্পর্শ এবং 'তোমাদের চৈতন্য হোক্' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন (শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ, পরিশিষ্টে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনাটিকে 'ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া' বলিয়া ভক্তেরা নির্দেশ করিতেন। গত ১৭ই পৌষ (১লা জানুয়ারী, ১৯৫৩) কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (উদ্যানবাটী) এই পুণ্যদিনের স্মরণে সারাদিনব্যাপী পূজা-পাঠ-ভজন-কীর্তন-প্রসাদবিতরণাদি সহ 'কল্পতরু উৎসব' অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিকালে একটি জনসভায় প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এবং স্বামী সৎস্বরূপানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠেও (যোগোদ্যান) 'কল্পতরু উৎসব' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২৩শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী) পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ৯১তম জন্মতিথি-উৎসব বহুল সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে বিশেষ পূজাহোম প্রভৃতি, কঠোপনিষৎ-পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং উচ্চাঙ্গের ভজন-সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামিজীর সমাধি-মন্দিরেও বিশেষ পূজাদি নির্বাহ হয়। প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত নরনারী ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। বৈকালে মন্দিরের পূর্বদিকের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ জনসভায় আচার্য যদুনাথ সরকার (সভাপতি), শ্রীঅমর নন্দী এবং স্বামী ওঙ্কারানন্দজী স্বামিজীর জীবন ও বাণী-সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে জয়রামবাটী, কাটিহার এবং রাঁচিতে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাইয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগামী জন্মতিথি —আগামী ৩রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার) ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বেলুড়মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম পুণ্যাবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হইবে। পরবর্তী রবিবারে (১০ই ফাল্গুন) এই উপলক্ষে সর্বসাধারণের জন্য প্রতিবারের মত সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব—সুবর্ণজয়ন্তী-পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান ২৬শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর) আরম্ভ হইয়া সমারোহের সহিত ২রা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) সমাপ্ত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে ১০ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়ের আশ্রম-বিভাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত এবং নিম্নের পাঁচটি শ্রেণীর ৩৫৯ জন ছাত্রীগণের মধ্যে পোষাক বিতরিত হয়।

১১ই ডিসেম্বর, সকাল সাড়ে ছয়টায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের প্রায় ৬০০টি ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ ভগিনী নিবেদিতার সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রায় বাহির হন।

৯টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে উদ্বোধন-অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে ছাত্রীগণ বৈদিক স্তোত্র আবৃত্তি করিবার পর পূজনীয় সভাপতি মহারাজ ভগিনীর একখানি প্রতিকৃতির আবরণ-উন্মোচন করিয়া উহাতে মাল্যদান করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ করেন; পরে তিনি তাঁহার অভিভাষণ দেন।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী যূথিকা রায়ের একটি সঙ্গীতের পর বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা শ্রীমতী রেণুকা বসু বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপে পাঠ করেন।

শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদারের 'বন্দে মাতরম্' গানে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ এবং কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট সুধী ব্যক্তি ঐ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি একটি কক্ষে সজ্জিত রাখা হয়। বেলা ১১টায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করানো হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিবসে বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্যন্ত ছাত্রীদিগের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। অপরাহ্ণ ৩॥০ টায় রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পুনর্বাসন-মন্ত্রী মাননীয়া শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানের ৮টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। ১৮ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত মহিলাদের জন্য প্রদর্শনী-বিভাগ খোলা রাখা হইয়াছিল।

ঐ দিন বিকাল ৪॥০ ঘটিকায় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে একটি মহিলা-সভা হয়। তিনি শ্রীশ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতার একত্রে তোলা একখানি সুবৃহৎ আলোকচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া মাল্য অর্পণ করেন। শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও কার্য আলোচনা করিয়া একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শ্রীমতী মনীষা রায়, শ্রীমতী মীরা দাশগুপ্তা ও শ্রীমতী বাসনা সেন স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে সভানেত্রী তাঁহার ভাষণ দেন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিবস ১৩ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কর্তৃক একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৪ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪½ ঘটিকায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা হয়। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কাট্‌জু, আইন-সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, স্বাস্থ্যসচিব, শ্রীযুক্তা অমৃত কাউর, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীরাজগোপালাচারী এবং ডক্টর কালিদাস নাগ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির শুভেচ্ছা ও বাণী পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেবী, স্বামী যতীশ্বরানন্দ, শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাকসার এবং মাননীয় রাজ্যপাল ভগিনীর জীবন ও কার্য-সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন।

১৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলন হয়। ভগিনী নিবেদিতার অতি পুরাতন ছাত্রী শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেবীকে সভানেত্রীরূপে বরণ করা হয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করেন। উভয়েই তাঁহাদের ছাত্রীজীবনের কথা স্মরণ করিয়া নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতের প্রতি ভগিনীর অপরিসীম প্রীতির কথা উল্লেখ করেন ও ভারতীয় রমণীগণের উন্নতিকল্পে তাঁহার অবদানের কথা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করেন।

এইদিন ছাত্রী ও অভিভাবিকাদের জন্য বিচিত্র অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হইয়াছিল।

১৬ই ডিসেম্বর, বৈকাল ৫½ ঘটিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে 'ধর্মের মাধ্যমে সমাজ-সেবা' বিষয়ে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা সুজাতা রায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং বক্তাদের মধ্যে ডক্টর রমা চৌধুরী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, রেভারেণ্ড জন্ কেলাস, শ্রীযুক্ত কে এস্ সীতারাম, এবং ডক্টর মাখনলাল রায় চৌধুরী বিভিন্ন ধর্মের মাধ্যমে সমাজ-সেবার কথা বলেন।

উৎসবের শেষ দিন, ১৭ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে বিকাল ৫½ ঘটিকায় মহিলাদের জন্য একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠান হয়। শ্রীমতী যূথিকা রায়, শ্রীমতী উৎপলা সেন, শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষ প্রভৃতি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে ইহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে দার্জিলিংএ শ্রীযুক্তা আনা ডরথি মজুমদারের উদ্যোগে ১৩ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪টার সময়

ব্রাহ্মসমাজহলে ভগিনী নিবেদিতার স্মরণে একটি সভা এবং ঐ দিন সকালে ভগিনীর সমাধিতে সুবর্ণজয়ন্তী পরিষদের পক্ষ হইতে মাল্য অর্পণ করা হয়।

বাঁকুড়া শাখাকেন্দ্র—এই আশ্রমের ১৯৫১ সালের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। মঠবিভাগে নিয়মিত ঠাকুরসেবাদি ছাড়া আলোচ্য বর্ষে ১৩০টি ধর্মালোচনাসভা এবং সাময়িক উৎসবাদিও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পুস্তকাগারে ২৮০৭ খানি বই পাঠের জন্য বাহিরে দেওয়া হইয়াছিল। মিশন-বিভাগ:—৩টি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে নূতন রোগীর সংখ্যা ছিল ২০,৮১১; পুরাতন রোগী—৪৯,১৭৩। বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ে ৮ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। সারদানন্দ ছাত্রাবাসে ১২ জন ছাত্র ছিল। রামহরিপুর পরিবর্ধিত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২৪০। এতদ্ব্যতীত মিশনবিভাগ হইতে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট রোগীদিগের মধ্যে কুইনাইন-বিতরণ, দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে আর্থিক সাহায্য এবং অগ্নিদাহ ও বসন্ত-রোগে সেবাকার্যও করা হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

ডক্টর ৺সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—গত ৩রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর) প্রখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লক্ষ্ণৌতে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ডক্টর দাশগুপ্তের সমগ্র জীবনে অনলস অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও গ্রন্থরচনাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি আবাল্য অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় দেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক-রূপে ডক্টর দাশগুপ্ত প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত চারখণ্ডে প্রকাশিত ভারতীয় দর্শনের সুবৃহৎ ইতিহাস তাঁহার অক্ষয় কীর্তি-স্তম্ভ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অসুস্থ শরীরেও তিনি এই গ্রন্থের পঞ্চমখণ্ড-রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। আমরা এই অতন্দ্র জ্ঞানতপস্বীর লোকান্তরিত আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—৯ই পৌষ হইতে তিন দিন কটকে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টাবিংশতিতম অধিবেশন অপূর্ব সাফল্য ও উদ্দীপনার সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মুখ্য সভাপতি। বাংলার এবং উড়িষ্যার বহু সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং মনীষী সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রধান এবং বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণের সুচিন্তিত ভাষণগুলি (যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে) বাঙ্গালীমাত্রেরই অনুধাবনীয়। এই সম্মেলন বাংলা এবং উৎকলের সাংস্কৃতিক বন্ধন ও মৈত্রী দৃঢ়তর করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে সন্দেহ নাই।

ভ্রম-সংশোধন—পৌষমাসের উদ্বোধনে 'অঞ্জলি' প্রবন্ধত্রয়ের প্রথমটির লেখকের নাম অসিতকুমার বিশ্বাসের স্থলে অজিতকুমার বিশ্বাস ছাপা হইয়াছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

উদ্বোধনের পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের গ্রাহকসংখ্যা পরিবর্তিত হইয়াছে। তাঁহারা অনুগ্রহকপূর্বক এই নূতন সংখ্যা লক্ষ্য করিবেন।

"যে রাম, যে কৃষ্ণ……"

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতন্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥

(স্বামী বিবেকানন্দ)

প্রেমের প্রবাহ যাঁর দুর্নিবার বেগে
আচণ্ডাল সবারে ভাসায়
লোকাতীত যিনি তবু লোক-হিত-পথে
রহিলেন মানব-সেবায়—

অতুল মহিমা যাঁর ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে
জানকীর প্রাণ-প্রিয় রাম
নররূপে আসিলেন পরম দেবতা
ভক্তি-সীতা-বৃত জ্ঞান-ঠাম।

ধরিলেন বেশ পুনঃ অর্জুন-সারথি
থামে মহা-প্রলয়-গর্জন
কাটে ঘোর-তমোময়ী সুচির রজনী
টুটে অন্ধ-মোহের বন্ধন।

ছাপি রণরোল উঠে গীতা-সিংহনাদ
ললিত গম্ভীর গীত-ধ্বনি
যেই রাম যেই কৃষ্ণ প্রথিতপুরুষ
সেই আজি রামকৃষ্ণ গণি।

ফাল্গুনে

ফাল্গুন বাংলার ধর্মজীবনের একটি অতি পবিত্র, মধুর স্মৃতি বহন করিয়া আনে। চারিশত সপ্তষষ্টি বৎসর পূর্বের সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা! হাটে বাটে নাগরিকগণের দোল-মহোৎসব চলিতেছে। এদিকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গার তীরে স্নানার্থী নরনারীর ভিড়। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে, হরিনামের রোল উঠিতেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকারের ছায়া পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিল। ভাবুক কবি বলিয়াছেন, গৌরচন্দ্রের উদয়ে পূর্ণচন্দ্রও যেন লজ্জা পাইয়া আত্মগোপন করিলেন।

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে' ভাসে ত্রিভুবন॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ১।১৩)

শচীদুলাল নবদ্বীপচন্দ্র নিমাইএর ক্রমবিকাশমান বাল্য, কৈশোর, যৌবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী বাঙালী তাহার বহু কাব্যে, সঙ্গীতে, কথিকায় গাঁথিয়া রাখিয়াছে। তাহার পর নিমাই পণ্ডিত গয়ায় গিয়া কী ঝড়ের মুখে পড়িলেন—কী বন্যা ডাকিয়া আনিলেন—সর্বপ্লাবী অশ্রুর বন্যা—শান্তিপুরকে ডুবাইল, নদীয়াকে ভাসাইল, বাংলার সীমানা ছাড়াইয়া উৎকল, দাক্ষিণাত্য, কাশী বৃন্দাবনে আঘাত করিল। প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে আজিও বাংলার বুকে সেই অশ্রু জীবনের সঞ্জীবনী সুধা হইয়া অতি-যত্নে সঞ্চিত আছে। আজও বাঙালীর প্রাণ হরিনামসংকীর্তনের শব্দে নাচিয়া উঠে—গৌর-চন্দ্রিকার মিনতিপূর্ণ আবাহন-স্বর শুনিয়া তাহার চোখে ভাসিয়া উঠে সেই 'আউলের' ছবি—'কৃষ্ণ' ব্যতীত আর কিছু যিনি জানিতেন না, বলিতেন না, ভাবিতেন না,—বিদ্যা, ঐশ্বর্য, জাতির অভিমান-বর্জিত শুধু ভগবানের দাসরূপে এক অখণ্ড মানবগোষ্ঠী যিনি গড়িয়া তুলিবার উদ্দীপনা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বাঙালীর অবিস্মরণীয় দেবতা। ফাল্গুনে তাঁহার ত্যাগ-ভাস্বর, প্রেম-সমুজ্জ্বল, সেবা-স্নিগ্ধ অলৌকিক জীবনের কথা গভীরভাবে স্মরণ করি।

* * *

১৪০৭ শকাব্দের ঠিক সাড়ে তিনশত বৎসর পরে ১৭৫৭ শকের ফাল্গুন। শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পুনরায় এক দিব্য আবির্ভাব—বাঙলার 'নিমাই'-এর স্বর্ণ-স্মৃতির সহিত ভাবী বহু শতাব্দীর জন্য বাঙলার 'গদাই'-এর স্মৃতির সংযোজন। সাড়ে তিন শত বৎসরে ভারতের, তথা জগতের ইতিহাসে বহুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল—উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের চিন্তা, কর্ম ও জীবনধারায় অচিন্ত্যপূর্ব বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছিল। তাই পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্য-জীবনের সহিত উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বহুতর সাদৃশ্য সত্ত্বেও পার্থক্যও যে বিপুল হইবে ইহা স্বাভাবিকই। এই পার্থক্য কিন্তু বিভেদ নয়, বিকাশ-বৈচিত্র্য। মুদ্রার উপাদান স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রই থাকে, তবুও নবাবী আমলের মুদ্রার গঠন ও ছাপ বাদশাহী আমলে আলাদা হইয়া যায়। কালের প্রয়োজনে মুদ্রার ছাপ বদলায়—যুগের প্রয়োজনে যুগ-সাধনা, যুগ-ধর্মের পরিবর্তন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'এবার ছদ্মবেশে আসা, যেমন জমিদার গোপনে কখনও জমিদারী দেখতে যায়, সেইরূপ।' কিন্তু ছদ্মবেশে শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করিতে পারিলেন কি? ধরা কি পড়িয়া যান নাই? রূপ, বিদ্যা এবং সর্ব-প্রকার ঐশ্বর্য ও বিভূতির প্রকাশ চাপিয়া রাখিলেও আত্মভোলা সরল পূজারী ব্রাহ্মণের ভিতর তাঁহার তিরোধানের কিছু কালের মধ্যেই দিগ্-দিগন্তরে শতসহস্র নরনারী তাঁহার ভিতর যুগের আধ্যাত্মিক আদর্শ খুঁজিয়া পাইল কি করিয়া? উদ্বেল ঈশ্বরপরায়ণতা, অপূর্ব ত্যাগ-বৈরাগ্য, বিশ্বাবগাহী সহানুভূতি এবং আশ্চর্য জীব-প্রেম শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের মর্মকথা। সেই কথাই যেন ফাল্গুনে আমাদের সমস্ত চেতনায় ধ্বনিত হয়।

আমার ঠাকুর

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১)

আমার ঠাকুর পাঠশালার পড়াও শেষ করতে পারেন নি, পড়ার ভয়ে পাঠশালা থেকে পালাতেন, স্কুলকলেজ-পুঁথির মুখ দেখেন নি···গেঁয়ো লোকের মতন ষ্টেশনকে বলতেন ইষ্টিশান···যতীন্দ্রকে বলতেন যতিন্দর···পণ্ডিত লোকের নাম শুনলে শিশুর মতন ভয় পেতেন···ইংরেজী যুগে চিনতেন না ইংরেজী হরফ· সাইকোলজী, ফিলসফি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কোন পুঁথির সঙ্গে হয় নি তাঁর কোন পরিচয়··মূর্খ বলে যে-যুগের শিক্ষিত লোকেরা তাঁকে করেছে উপহাস···আনন্দে হেসেছেন আমার ঠাকুর···

আমার ঠাকুর মহাজ্ঞানী···বিশ্বের সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত তথ্য আর তত্ত্ব, বেদ-বেদান্ত, শাস্ত্র-তন্ত্র আমার ঠাকুরের বাণীতে পেয়েছে নব-জীবন···আমার ঠাকুরের স্পর্শে সমস্ত মৃত পুঁথি হয়েছে জীবন্ত আলো, আমার ঠাকুরের চেতনায় সমস্ত বিদ্যা স্বয়ম্বরা হয়ে দিয়েছে ধরা। আমার ঠাকুরের জ্ঞানের আলোয় জগতে আসছে নব-প্রভাত···সেদিনকার জগতের সমস্ত উপহাস আমার মূর্খ ঠাকুরের পায়ের কাছে আজ প্রণাম হয়ে পড়ছে লুটিয়ে।

আমার ঠাকুর অবিশ্বাসী যুগে নিজের জীবনের বাস্তবতায় প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন, জ্ঞান বাইরে থেকে আহরণ করবার জিনিস নয়, জ্ঞান হলো নিজের অন্তরের আবরণ-উন্মোচন।

(২)

আমার ঠাকুর সর্বত্যাগী, বৈরাগী, মহাসন্ন্যাসী। বৈরাগ্যের ঝড়ে উড়ে যায় আমার ঠাকুরের পরিধেয় বসন, মহারিক্ত দিগ্‌বসন আনন্দে নাচেন আমার ঠাকুর। আমার ঠাকুরের বৈরাগ্যের আগুনে নতুন করে মদন হয় ভস্ম···জ্বলে পুড়ে যায় "উমার কপোলে স্মিতহাস্য বিকশিতলাজ"···সে-বৈরাগ্যকে বরণ করতে স্বয়ং উমাকে আবার কঠোরতর তপস্যায় করতে হয় নূতন পুরাণের সৃষ্টি। আমার ঠাকুর সর্বাশ্রয়ী, আনন্দ-মত্ত মহাপ্রেমিক। আমার ঠাকুরের দুপায়ে নাচের তালে বাজে আনন্দের নূপুর; সে-আনন্দের স্পর্শে, জগৎ দেখেছে, কদম্ব-শিহরণ

জেগে উঠেছে বিশুষ্ক মনে মনে। বৈরাগ্যের শ্মশানে আমার ঠাকুর স্বেচ্ছায় মহানন্দে রচনা করেন প্রেমের ফুল-বাসর, বিবাহের রাঙাচেলী আমার ঠাকুরের বিজয়-বৈজয়ন্তী।

বৈরাগ্য আর প্রেম আমার ঠাকুরের দুই হাতে দুই খঞ্জনী, একসঙ্গে বাজে নিশিদিন।

(৩)

জন্মসিদ্ধ আমার ঠাকুর রুদ্র-তপস্যায় যে-লোকে বাস করেন, সেখানে তিনি মহা-একক, সৃজনের আদিতে ব্রহ্ম যেমন ছিলেন একক। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের অতীত নিঃসীম সেই ধ্যানলোকে আমার ঠাকুর বিহার করেন দেহহীন সঙ্গহীন অনাদি অনন্ত জ্যোতিস্বরূপ···কোন কামনা, কোন বাসনা, কোন আকাঙ্ক্ষা, কোন বিষয়সাধ স্পর্শ করতে পারে না আমার ঠাকুরের প্রদীপ্ত চেতনাকে। আমার ঠাকুর বালকের মতন ধূলায় লুটিয়ে কাঁদেন নিজের শিষ্যের বিরহে, গঙ্গার তীরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে আমার ঠাকুরের সাথী-খোঁজা কান্নায় ···স্নেহ-অন্ধ জননীর মত আমার ঠাকুর সযত্নে লুকিয়ে রাখেন মিষ্টান্ন নিজের হাতে শিষ্যকে খাওয়াবেন বলে··অপমানকারী সুরামত্তের ক্ষুব্ধ অভিমান দূর করবার জন্যে আমার ঠাকুর নিজে উপযাচক হয়ে রাত্রি-নিশীথে দশ মাইল পথ ভেঙ্গে যান অপমানকারীর দ্বারে···মানী লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে, নিজের জামার খোলা বোতাম দেখে ভীত সঙ্কুচিত হয়ে ওঠেন বালকের মত আমার ঠাকুর···

নির্বিকল্প সমাধির মহানিস্তব্ধ ধ্যানলোক থেকে প্রতিদিনের জীবনের সামান্যতম ব্যবহারিকতায় অনায়াসে নিত্য যাতায়াত করেন আমার ঠাকুর।

(৪)

চিরতপস্বী আমার ঠাকুর জন্মের প্রথম চেতনা থেকে নিয়ে এসেছিলেন অনায়াস ব্রহ্মচর্যের মহাবীর্য···তাই তন্ত্র-সাধনার যোনি-উপচার উল্লেখেই আমার ঠাকুর সমাধিতে চলে যান দেহস্পর্শের অতীতলোকে। ক্ষমাহীন কঠোরতায় আমার ঠাকুর নারীর ছায়া থেকে দূরে রাখতেন নির্বাচিত শিষ্যদের। নারীর মোহিনী মূর্তি আমার ঠাকুরের তন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেয় মাতৃ-মূর্তিতে।

মাতৃ-সাধক আমার ঠাকুর জগতে অদ্বিতীয় মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন নারীর জায়া-রূপকে। সর্ব-লজ্জা সর্ব-অপমান, সর্ব-লাঞ্ছনা, সর্ব-ক্ষুদ্রতা থেকে নারীত্বকে দিয়ে গিয়েছেন আমার ঠাকুর প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতায়, নিজের বিবাহিত

জীবনে যে-মর্যাদা, যে-গৌরব, যে-প্রেম, সমগ্র মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নারী আর কখনো পায় নি সে-মহিমা। আমার সন্ন্যাসী ঠাকুরের তপস্যার ক্ষীরোদ-সিন্ধু থেকে জগতে জেগেছে নতুন করে মহালক্ষ্মীরূপা নারী, সারদা-সরস্বতী ·· সর্ব তপস্যা, সর্ব সাধনার শেষে আমার প্রেমের ঠাকুর ষোড়শী সহধর্মিণীর পূজায় আনন্দে অঞ্জলি দিয়েছেন সর্বসাধনার সিদ্ধিফল। দেহ-রতির ক্লান্ত চক্র-প্রবর্তন থেকে নারীকে উদ্ধার ক'রে আমার ঠাকুর করে গিয়েছেন নারীত্বের জীবন-আরতি।

আমার চিরসন্ন্যাসী ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন দিব্য প্রেমের পার্থিব মহিমা, আজন্ম ব্রহ্মচারী আমার ঠাকুর প্রতিদিনের ভালবাসায় রচনা করে গিয়েছেন আগামী দিনের নারী-প্রতিমা, নব-সীতা।

(৫)

আমার ঠাকুরের সামান্য স্পর্শে সে-এক নরেন্দ্রনাথ দত্ত হয় বিশ্ব-টলানো বিবেকানন্দ ··বাঙালীর গরীব ঘরের রাখাল-কালী শরৎ-শশী আমার ঠাকুরের ছোঁয়ায় হয় জগৎ-আলো জ্যোতির শিখা···আমার ঠাকুরের চরণামৃতে মদ-মাতাল নিমেষে হয় সৃষ্টি-পাগল মন-মাতাল···আমার ঠাকুরের বাণীর বিদ্যুতে জড় পাথরের বুকে জাগে অমর চৈতন্য···আমার ঠাকুর কল্পতরু ··

কাতরভাবে যখন প্রিয়তম শিষ্য পায়ে লুটিয়ে কেঁদে চাইলো আত্মমুক্তির আশীর্বাদ, সেই আমার কল্পতরু ঠাকুর রুদ্ররোষে তাকে স্বার্থপর বলে করলেন ভর্ৎসনা, কেড়ে নিলেন প্রিয়তম শিষ্যের গহন-সমাধির অর্জিত মহানন্দের বাসনা।

(৬)

আমার ঠাকুর ভগবানের কথা বলেন নি, ভগবান হয়েছিলেন···ধর্মচর্চা করেন নি, হয়েছিলেন ধর্ম। কাউকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে আমার ঠাকুর কোন সিংহাসনে বসেন নি, রচনা করেন নি কোন নতুন সিংহাসন···আমার ঠাকুর আনেন নি কোন একটী তরঙ্গের আন্দোলন, আমার ঠাকুর সর্ব-আন্দোলনময় সর্ব-তরঙ্গময় মহাসাগর। আমার ঠাকুর ইতিহাসের ভগ্নাংশ নন, সকল ভগ্নাংশের যোগফল। আমার ঠাকুর একটী জীবনে প্রত্যক্ষভাবে বাস করে গিয়েছেন সমগ্র মানব-সাধনার ইতিহাসকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগকে স্পর্শ করে আমার ঠাকুরের অস্তিত্বের চেতনা সূর্যের মত আলোকিত করে তুলেছে সমস্ত অতীত শতাব্দীকে, আমার ঠাকুরের অস্তিত্বের ছায়ায় জন্ম নিচ্ছে আগামী কাল। দেশ-

কাল-ধর্মের ঊর্ধ্বে আমার ঠাকুরের জীবনে বিপুল বিশ্ব নীড়ের মত প্রত্যক্ষভাবে দিয়েছে ধরা।

নামহীন অখ্যাত এক গণ্ডগ্রামে একটা ছোট্ট বাগানের পাঁচিলের ভেতর, গুটিকতক দরিদ্র শিষ্যের মধ্যে, সংবাদ-পত্রের সংস্পর্শের বাইরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, সমসাময়িকদের উপেক্ষা আর অবজ্ঞার ঊর্ধ্বে, আমার নিঃসম্বল কপর্দকহীন ঠাকুর কপর্দকহীনতার প্রচণ্ড আনন্দে, নব-জাগরণ-মত্ত শতাব্দীর শত কোলাহল থেকে দূরে, আপনার মনে কাদা আর মাটী দিয়ে গড়ে গিয়েছেন শুধু গুটিকতক প্রদীপ, নিজের প্রাণের ফুৎকারে শুধু জ্বালিয়ে গিয়েছেন তাদের শিখা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতন লোকেরও একদিনের জন্যে কৌতূহল জাগে নি, দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে নেমে উঁকি মেরে দেখতে, যদিও সেই ঘাটের পাশ দিয়ে দিনের পর দিন নৌকো করে তিনি গিয়েছেন-এসেছেন। আমার গেঁয়ো ঠাকুরই উপযাচক হয়ে গিয়েছেন মানী লোকদের, গুণী লোকদের দরজায়, হাতজোড় করে বলেছেন, ওগো, শুনতে এসেছি তোমাদের কথা! আমার ঠাকুরের চিতাভস্ম নিয়ে যারা রাত জেগে ছিল, কেউ তাদের ডেকে দেয় নি সামান্য একটা থাকবার ঘর, ভিক্ষার অন্নে মানকচু-পাতা সেদ্ধ খেয়ে কেটে গিয়েছে তাদের দিন, পাড়ার লোকেরা গালাগাল দিয়ে, ঢিল ছুঁড়ে করেছে তাদের অভ্যর্থনা।

আজ দেশে-দেশান্তরে তাই নিয়ে রচিত হচ্ছে মহাকাব্য, মানবমনের মহাকাব্য।

(৭)

আমার ঠাকুর পরমহংস সন্ন্যাসী, কিন্তু পরেন না গেরুয়া। লালপেড়ে কাপড় পরেন, বার্ণিশ করা চটি জুতো পায়ে, গায়ে ফতুয়া, জামা, চাদর। বনে বা আশ্রমে ধুনি জ্বেলে গাছতলায় বাস করেন না, বাস করেন শান-বাঁধানো-মেঝে-ওয়ালা ইঁটের ঘরে, সে-ঘরে তক্তাপোষ আছে, তার ওপর আছে বিছানা এবং মশারি। আমার সন্ন্যাসী ঠাকুর গৃহকে অরণ্য করেন নি, করেছিলেন মন্দির। সে-মন্দিরে আনন্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জীবন্ত অন্নপূর্ণাকে। যে-অনায়াস আনন্দে আমার ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধির বিশ্ববিহীন বিজনতায় বিচরণ করতেন, সেই অনায়াস আনন্দে আমার ঠাকুর পালন করতেন প্রতিদিনের সংসারের প্রতিটি তুচ্ছ কাজ। যেমন একান্তভাবে তিনি জানতেন জ্ঞানাতীত পরমতত্ত্বের প্রত্যেকটী ধাপ, প্রত্যেক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, তেমনি একান্তভাবে, তেমনি সম্পূর্ণভাবে তিনি জানতেন কোন্ রান্নায় কি ফোড়ন দিতে হয়, কি করে সল্‌তে পাকাতে হয়, ঘর-কন্নার প্রত্যেকটী খুঁটি-নাটি। গৃহিণীপনায় আমার সন্ন্যাসী ঠাকুর ছিলেন অদ্বিতীয়। দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে

যিনি বিরাজ করতেন, সেই আমার ঠাকুর সামাজিকতায়, ভব্যতায় বাইরের প্রত্যেকটী লোকের সঙ্গে আচরণে রেখে গিয়েছেন ব্যবহারিকতার চরম আদর্শ। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের ভাইঝিকে মনে করে আমার ঠাকুর অজ্ঞাতসারে সহধর্মিণীকে বলেছিলেন, 'তুই', অজ্ঞাতসারেও সেই রূঢ় সম্বোধনের অপরাধে আমার ঠাকুর ছুটেছিলেন ক্ষমাপ্রার্থনার জন্যে। টাকার সংস্পর্শে আমার ঠাকুরের হাতের আঙুল আপনা থেকে যায় বেঁকে, অথচ বাজার থেকে শিষ্য যখন জিনিস কিনে আনে, জিজ্ঞাসা করেন, হাঁরে, ফাউ আনিস্ নি কেন? সর্বত্যাগী ঠাকুরের মুখে ফাউ-এর কথা শুনে লজ্জিত হয়ে পড়ে শিষ্য। লজ্জিত শিষ্যকে ভৎ র্সনা করে বলেন আমার ঠাকুর, ভক্ত হবি তো, বোকা হবি কেন?

জীবনের দুই প্রান্তে দুই দুর্গম মেরু, পড়েছিল বিচ্ছিন্ন, সংযোগহীন · আমার ঠাকুরের জীবনে পেয়েছে তারা তাদের সংযোগ-আত্মীয়তা।

(৮)

আমার ঠাকুর মানব-গুরু, কিন্তু করেন নি গুরুগিরি। আমার ঠাকুর পেয়েছিলেন ভগবানকে কিন্তু ভোলেন নি মানুষকে। আমার ঠাকুর রাণী রাসমণির মন্দিরে থাকতেন, মন্দিরে পুরোহিতেরও কাজ করতেন কিন্তু তিনি মন্দির থেকে, পুরোহিত থেকে, পুঁথি থেকে উদ্ধার করেন ধর্মকে। আমার গেঁয়ো ঠাকুর আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগৎকে জানতেন না, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগৎ আমার গেঁয়ো ঠাকুরকেও জানে না···কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগৎ যে-জিনিস খোঁজ করছে, অথচ পাচ্ছে না, আমার গেঁয়ো ঠাকুর আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের জন্যেই সেই পরমপদার্থকে অক্ষয়ভাবে নিজের জীবনে সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছেন, মানবতা তার নাম। আমার চিরবৃদ্ধ ঠাকুর আধুনিকতার জন্মদাতা। এ-মানবতা মস্তিষ্ক-জাত অঙ্কের ফরমুলা নয়, যে-কোন নিয়মের বাঁধনে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে এক-শৃঙ্খলে বাঁধা নয়, এ-মানবতায় হবে মানুষের মনের নব-জন্ম, মানুষের ভেতরে যেখানে রক্ত-কণিকায় লুকিয়ে আছে বিভেদের বিষ, এ-মানবতা করবে তার সংশোধন, মানুষকে দেবে নতুন দৃষ্টি, দিব্য দৃষ্টি। জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবকে সেবা, আমার ঠাকুরের এই অমর উক্তিতে মস্তিষ্ক-ক্লান্ত ক্ষত-বিক্ষত ধরণী বৈজ্ঞানিক সাত্ত্বিকতার দম্ভের অন্তে পাবে সত্যিকারের মানব-ধর্মের সন্ধান, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির বাইরে মানুষের চেতনায় খুঁজে পাবে পৃথিবীর নব-প্রভাতের সন্ধান।

আমার চিরবৃদ্ধ ঠাকুর অতি আধুনিক পৃথিবীর জন্মদাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র-দশক *

স্বামী বিরজানন্দ

ব্রহ্ম-স্বরূপ সবার আদিতে মধ্যে অন্তে যাঁর প্রকাশ,
নিত্য-সত্য-অদ্বয়রূপে বিকার ছয়টি পায়গো নাশ।
বাক্যমনের অগোচর যিনি 'ইহা নয়' ভাবে চিন্তা যাঁর,
সেই দেবদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরে নমি বারংবার॥ ১

সুরগণ-অরি দৈত্য বিনাশি নিবারেন যিনি দেবের ভয়,
সাধু-সজ্জন-অভীষ্টদাতা, হরেন ভূভার দুঃখময়।
যুগে যুগে আসি আপন স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকট হয়গো যাঁর,
সে পরমদেব ভগবান রামকৃষ্ণে করিগো নমস্কার॥ ২

যাঁহার বিধানে কর্মসূত্রে বদ্ধ নিখিল ভূতগণ,
জ্ঞান-কর্মের পুণ্য-পাপের ইতর-বিশেষ হয় সাধন।
সাক্ষি-স্বরূপ বুদ্ধি আলোকি সকল কর্মে বিকাশ যাঁর,
তিনিই তো দেব রামকৃষ্ণ প্রণতি রাখিনু স্মরণে তাঁর॥ ৩

সকল-জীব-দুষ্কৃত-নাশ-কারণ যিনিগো ভবেশ্বর,
স্বীকারি গর্ভবাস-দুঃখ বরিলেন এই দেহ নিগড়।
দিব্য জীবন যাপনে ধরায় লীলা-মহিমা ব্যক্ত যাঁর,
পরমেশ সেই রামকৃষ্ণে প্রণাম নিবেদি বারংবার॥ ৪

কাঞ্চন-ধূলি সমজ্ঞান যাঁর ত্যাজ্য-গ্রাহ্য-বিভেদ নাই,
জগদম্বিকা-শক্তি নারীতে মাতৃভাবনা রহে সদাই।
ভক্তি ও জ্ঞান, ভুক্তি-মুক্তি, শুদ্ধা-বুদ্ধি কৃপায় যাঁর,
প্রণমি শ্রীরামকৃষ্ণে গো পরমেশ্বরে সেই বারংবার॥ ৫

বহু ধর্মের মূলসত্যে হেরিলেন মহা সমন্বয়,
সকল মতের সিদ্ধ পথিক নাহিকো নিজের সম্প্রদায়।
অখিল-শাস্ত্র-মর্মদর্শী বাহিরে নিরক্ষর আকার,
সর্বজ্ঞানী যে সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে নমস্কার॥ ৬

* মূল সংস্কৃত হইতে শ্রীসুকুমার বসু কর্তৃক অনূদিত।

চারু-দর্শন সুকণ্ঠে যাঁর ধ্বনিল গো শ্যামা মায়ের গান,
প্রেম-উন্মাদ সংকীর্তনে ঈশ্বরভাবে বিভোর-প্রাণ।
যাঁহার মধুর কথা-অমৃতে শোক-সন্তাপ যায় গো যায়,
পরম দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ—অর্পিনু নতি তাঁহার পায়॥ ৭

চরণ-কমল-তত্ত্ব-আভাসে হৃদয়ে মৈত্রী-শান্তি ছায়,
অনুরাগ-বাঁধা ভক্তে পরমার্থ-বিভব প্রসারি যায়।
দম্ভিত-জন-দর্প-বারণ বিশ্বের গুরু শঙ্কাহীন,
দেবতা-শ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান মোর প্রণতি নিন॥ ৮

পঞ্চবর্ষ-বালক-স্বভাব এসেছেন সাজি পরমহংস,
সর্বলোক-রঞ্জনকারী সংসারমোহ করেন ধ্বংস।
জীবের জন্ম-ভীতি নাশেন পরম তৃপ্তি-সুখ-আগার,
দেবদেব প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণে নিবেদি প্রাণের নমস্কার॥ ৯

ধর্মের গ্লানি করিলেন দূর বারিলেন যত নিন্দ্যকর্ম,
সর্ব ধর্মে বিশারদ তবু আচরি চলেন লোক-ধর্ম।
সন্ন্যাসি-গৃহী সবার নিত্য সেব্য চরণ-পদ্ম যাঁর,
সর্ব-দেবতা-শিরোমণি প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণে নমস্কার॥ ১০

স্তোত্র-দশক প্রেম-ব্যঞ্জক পরম-দেবতা-মহিমাভরা,
নিত্য পাঠক যে জন তাহার সকল বিঘ্ন-দুঃখ-হরা।
জপ-যাগ-যোগ-ভোগৈশ্বর্য যদি বা কখনো সুলভ হয়,
রামকৃষ্ণে অনুরাগ-ভাব-ভক্তি সহজ-লভ্য নয়॥ ১১

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র-দশক প্রকাশিত যথা-তূণকছন্দ
ভক্তি-সাধক স্তবসার এই রচিলেন যতি বিরজানন্দ॥ ১২

"আমার স্বভাব এই—আমার মা সব জানে।···ভক্তের অবস্থায়—বিজ্ঞানীর অবস্থায় রেখেছে।···এ অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়েছেন! সর্বত্র তাঁকে দেখতে পাই। কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন। দুষ্টলোক পর্যন্ত—ভাগবত পণ্ডিতের ভাই পর্যন্ত।······মাকে কুমারীর ভিতর দেখিতে পাই বলে কুমারীপূজা করি।"—শ্রীরামকৃষ্ণ

ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম-এস্‌সি, বি-টি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আবির্ভূত পুণ্যশ্লোক সে মহামানবের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা তাই আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

সর্বভাব ও সর্ব-ধর্মের সমন্বয়-বিগ্রহ তাঁর লোকোত্তর জীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির বিবিধ বৈচিত্র্য যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, ভাব-সাধনার অস্ফুট, প্রথম প্রকাশ থেকে তার অত্যাধুনিক অভিব্যক্তি পর্যন্ত—যুগে-যুগে লব্ধ ও আয়ত্তীকৃত তত্ত্বগুলো বিবর্তনক্রমের মর্যাদা রক্ষা করে যেরূপে তাঁতে স্তরে স্তরে রূপায়িত হয়েছে, একাধারে এমনটি আর কোথাও, পূর্বগ-কোন অবতার-প্রথিত পুরুষের জীবনেই সংঘটিত হয়নি। ভারতের বিশাল বিস্তৃত বক্ষে শত যুগ মন্বন্তর ধরে ধীরে ধীরে যত বিচিত্র আধ্যাত্মিক গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে, যত ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কারখানা গড়ে উঠেছে—তাদের সকল বিভাগেই এমন পারদর্শী এবং তাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলোকে একই মূল অভিপ্রায় দ্বারা সন্নিবিষ্ট ও সংযুক্ত করে ভারতব্যাপী বিরাট যন্ত্রকে এক লক্ষ্যপথে চালিত করবার এমন দক্ষতাও আর কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। সীমাহীন আকাশগাত্রে বিচ্ছুরিত আলো-তরঙ্গসমূহ যেমন একটি ক্ষুদ্রাবয়ব আতসকাঁচের মধ্য দিয়ে মুহূর্তে এক কেন্দ্রে সংহত হয়ে অতি তীব্র উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্য লাভ করে—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনরূপ যন্ত্রটির মধ্য দিয়েও তেমনি আর্যসভ্যতার সুদীর্ঘকাল-পরিব্যাপ্ত স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সাংস্কৃতিক ধারাগুলো সঞ্জীবিত ও সমন্বিত হয়ে নূতন অর্থ, মর্যাদা ও প্রাধান্য লাভ করেছে। আবার শুধু বিগত অতীতের কথাই নয়, দূর এবং অদূর ভবিষ্যতে জাতিগত ও ও ব্যক্তিগত জীবনের যত জটিল সমস্যা বাহ্যদৃষ্টিতে একান্ত অসমাধান-যোগ্য বলে প্রতীত, তাদেরও সমাধান-ইঙ্গিত এজীবনেরই যুগসাধনায় নিহিত রয়েছে। সে-ইঙ্গিত তাঁর খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম প্রভৃতি বহির্ভারতীয় এবং হিন্দু ভিন্ন অন্যজাতির ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভরূপ অভিনব ব্যাপারের অন্তরালে অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাওয়া যাবে। তাঁর সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত দৃষ্টিতে তিনি যে দেখেছিলেন—সকল ধর্মপ্রবর্তকগণের জ্যোতির্ঘনতনু সাধনান্তে তাঁরই দেহে মিলিয়ে গেল, সকলধর্মের চরম পরিণতি একই সমরস জ্যোতিক্ষেত্রে সাধককে পৌঁছিয়ে দিল—জগতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় সেটি যেমন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, অনাগত ভাবী কালে হিন্দুধর্ম যে অদ্বৈতের ভিত্তিতে এবং অখণ্ড, অবিভাজ্য সত্যের দৃষ্টিতে সকল ধর্মকে নিজস্ব করবার পথে অগ্রসর হবে তারও সুস্পষ্ট নির্দেশে মহিমময়। সুতরাং এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যাবে যে, একই আধারে গার্হস্থ্য-সন্ন্যাসের আদর্শ, কর্মজ্ঞান-যোগ-ভক্তির সমন্বয়-সমৃদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্যা-সঙ্কুল আখ্যায়িকার আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। পরন্তু, ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায়ে অনাগত উত্তরকালে বিশ্ব-সংস্কৃতির গতিপথ-নির্ধারণে

সেটি একটি একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত ঘটনা।

পূর্বগ অবতারগণের প্রত্যেকেই জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি কোন-না-কোন ভাবসাধনার চরমোৎকর্ষ নিজ জীবনে সাধন করে তারই গণ্ডীর মধ্যে কাজ করে গেছেন। কিন্তু সর্ব-বন্ধনবিনির্মুক্ত অথচ সর্বভাব-প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মত এমন সম্পূর্ণ, সর্বতোভদ্র, প্রতিনিধি-স্থানীয় জীবন জগতে আর কখনো আবির্ভূত হয়নি। এমন সকল দিকে, সর্বভাবে মুক্ত পুরুষই জগৎ ইতঃপূর্বে আর কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। যে-বিশেষ পুরুষ-দেহটি ধারণ করে তিনি আমাদের এ-হাসি-কান্নার পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলেন, যাঁর সার্ধ-তিনহস্ত-পরিমিত পরিধিকে আশ্রয় করে এবারে তাঁর বিচিত্র লীলা রূপায়িত হয়েছিল সে দেহের গণ্ডী এবং সাধারণ প্রকৃতিতেও তিনি নিজকে আবদ্ধ রাখেন নি। স্ত্রীভাবে সাধনকালে স্ত্রীজনোচিত অঙ্গ-বিকার তাঁতে পরিলক্ষিত হয়েছিল। হনুমানভাবে সাধন করবার সময় তদনুরূপ অঙ্গবিকৃতি তাঁতে পরিস্ফুট হয়েছিল। প্রেম ও করুণার অভাবনীয় প্রেরণায় সর্ব ভৌগোলিক পরিধি চূর্ণ করে বিগত কালের সকল অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে অতিক্রম করে জীবজগৎ এবং উদ্ভিদ্‌জগতের সর্বপর্যায়ের সঙ্গে একাত্মানুভূতিতে তিনি মর্ত্যলোকে স্বর্গের ছায়া আকর্ষণ করেছিলেন। 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্' এ-তত্ত্ব তাঁর জীবনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজ হয়েছিল, স্বাভাবিক হয়েছিল। তাঁর আনন্দময়, অবাধ, মুক্তজীবনের চতুষ্পার্শ্বে কেবল একটিমাত্র গণ্ডী অদৃশ্য রেখায় অঙ্কিত ছিল বলে মনে হয়। সে-গণ্ডী বাঙ্গালা ভাষার, সে-গণ্ডী বঙ্গের জীবনধারার। দেখা যায়, বাঙলা ভাষার মাধ্যমকে তিনি আজীবন স্বীকার করেছেন ভাবপ্রকাশের যন্ত্ররূপে, সহায়রূপে। আবার বঙ্গ-সংস্কৃতির চিরাচরিত বিধি-বিধান-গুলোকেও মোটামুটি ভাবে তিনি মেনেই নিয়েছিলেন নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনাদিতে। বাঙলার বুকে আধুনিক কালে যে-দুই লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে—তাঁদের উভয়েরই সম্পর্কে এ-মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ের কথা বলছি। অভিশপ্ত ও আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির সম্মুখে আজ যে জীবন-মরণ সমস্যা নির্মম মূর্তিতে প্রকটিত তার অন্তরালে ঐটুকুই বোধ করি আশার একমাত্র ক্ষীণ জ্যোতিঃরেখা। 'অবিতথফলা হি মহাপুরুষাণাং ক্রিয়াঃ।'

অতএব, যে-দিক দিয়েই বিচার করি এ বিচিত্র রহস্যময় জীবনটিকে যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে, বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শুদ্ধমাত্র কোন দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের আত্মিক ও মানসিক চেতনা জাগ্রত করবার জন্যই যে তিনি জন্মপরিগ্রহ করেছিলেন এ-কথা সর্বাংশে সত্য নয়। 'যত মত, তত পথ'-রূপ যে সত্য ধর্মের একদেশদর্শী দোষ দূর করবার জন্য তিনি আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে সচরাচর কথিত হয়ে থাকে, সেও তাঁর অবদান-শতকের অন্যতম ভিন্ন আর কিছু নয়। পরন্তু ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত, জাতিগত ও অন্তর্জাতিগত ক্ষেত্রে এক নূতন জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠাকল্পে ধর্মের প্রয়োগ-কৌশলটি কার্যকর ভাবে প্রকাশ করে স্বর্গের দেবতা ও বনের বেদান্তকে আমাদের মাটির পৃথিবীতে সুখ-দুঃখের গৃহকোণটিতে আনয়ন করে তাকে একান্ত ভাবে আমাদের নিজস্ব সম্পদরূপে, অন্তরের বস্তুরূপে ফুটিয়ে তুল্‌তে এবং সর্বোপরি 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এ-বাণীকে

জীবন্ত ও জাগ্রত করে তুলতেই যেন তিনি বিশেষভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধর্ম যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মামুলি নীতি-কথার সমষ্টি নয়, জীবনের সকল দিক্ ও পর্যায়কে বিধৃত করবার শক্তি যে সে সত্যি ধারণ করে, অনুভূতিই যে তার প্রাণ, ইহজীবনের ও পরজীবনের কল্যাণকল্পে ঠিক ঠিক প্রয়োগেই যে তার সার্থকতা—অতীতে ও বর্তমানে যোগসূত্র-স্থাপন করে এ-কালে তাই তিনি দেখিয়ে গেছেন। আমাদের জীবনের ঋজু-কুটিল যাত্রা-পথে আশার শুভ্র আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করে এ-সদানন্দময় পুরুষ নিরাশপ্রাণে কর্মের অভয় প্রেরণা জাগ্রত করেছেন।

বাক্-সর্বস্ব ও বহুলপ্রচার-বিশ্বাসী বর্তমান যুগে, যে-যুগে কার্যতঃ একখানা করে দশখানা প্রকাশে মানুষ নিয়ত ব্যাপৃত, মিথ্যা-সত্যমিশ্রিত প্রোপাগাণ্ডায় নিরন্তর ক্রিয়াশীল, সে-যুগে শুদ্ধ-মাত্র আচরণদ্বারা, উপলব্ধিদ্বারা সকল তত্ত্ব ও সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বহুপ্রসঙ্গে, বহুজনকে তিনি বলেছেন—'ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে। নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে তাকে আর ডেকে আন্তে হয় না।'··· কাজেই, আপনার অন্তর-কুসুমটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে, শোভন করে ফুটিয়ে তোলাই মানুষের সর্বোত্তম সাধনা। তা না করতে পারলে—লোকে তোমার কথা শুনবে কেন? তোমার কথা নেবে কেন? ···'মন মুখ এক করাই কলির সাধনা'—সেটি হলেই সত্যস্বরূপ ভগবান তোমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হবেন, তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবেন।······

কোন বিশেষ ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে কখনো তিনি প্রকাশ করেন নি, কোন বিশেষ মতবাদও তাঁর নিজস্ব মত বলে চিহ্নিত হয়নি। পরন্তু, সকল দেশের জন্য, সকল কালের জন্য এক কালাতীত ও ভাবমুখ-স্থিত জীবনই তিনি যাপন করে গেছেন এবং তারই ভিত্তিতে এক সর্বমত-সমঞ্জস উদার সাম্যবাদ স্বতঃ প্রচারিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছে। তিনি বলেছেন,—'সবাই নিজের মতটাকেই বড় করে গেছে, যে সমন্বয় করেছে সেই তো লোক।' বলেছেন,—যে ক্ষুদ্র, অপরিসর, দুঃখ সুখের কুক্ষিগত আমাদের দু'দিনের জীবন জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে নিয়ত আবর্তিত হচ্ছে, সেটিই জীবনের সবখানি নয়। তার পশ্চাতে আর এক শাশ্বত সুগভীর জীবনমন্দাকিনী কল্প থেকে কল্পান্তরে নিরবধি বয়ে চলেছে। ব্রহ্ম থেকে অভিন্নরূপে চির-অবিনশ্বর সে জীবন-প্রবাহের প্রকৃত অর্থানুভূতিতে, যথার্থ উপলব্ধিতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি এক প্রীতিবদ্ধ মানব-সমাজ গঠন করতে পারে এবং যে-সকল পরস্পরবিরোধী ভাব ও চিন্তা জাতি থেকে জাতিকে, এক সম্প্রদায় থেকে আর এক সম্প্রদায়কে এতকাল ধরে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, বিবদমান করে রেখেছে—তাদের সম্যক্ নিরাকরণে এক সুন্দর ও শান্ত নবযুগের উদ্বোধন ঘোষণা করতে পারে। তাই দেখা যায়,—তাঁর দেহত্যাগের অত্যল্পকাল মধ্যে চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠোত্থিত অপূর্ব সমন্বয়বার্তা সমগ্র সভ্যজগতের চিন্তাক্ষেত্রে মুহূর্তে এক অচিন্ত্যপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বহু কালান্তরে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়েও আকাশে কান পেতে তারই দূর-প্রতিধ্বনি আমরা যেন শুনতে পাচ্ছি···

"If there is ever to be a universal religion it must be one which will have no location in place or time, which will be infinite like the God it will preach. . It will be a religion which will have no place for persecution or intolerance in its polity, which

will recognise divinity in every man and woman and whose whole scope, whose whole force will be centred in aiding humanity to realise its own true divine nature".

বস্তুতঃ, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বস্তুতান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তি মথিত করে মানব-ধর্মের নূতন স্বীকৃতিতে যে প্রবল ও ডাইনামিক্ ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে, যে আত্মসুখ-পরায়ণ, দানবীয় সভ্যতার প্রভাবে সমগ্র মানব-গোষ্ঠী আজ সম্মোহিত—তাকে বিধ্বস্ত করে, অপসারিত করে প্রেম ও পরার্থপরতার মন্ত্রে নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলবার জন্য যে নূতন জীবন-দর্শন শনৈঃ শনৈঃ আত্মপ্রকাশে নিরত, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবময় দিব্যজীবনটিই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অব্যর্থপ্রক্রিয়ায় তাকে নিয়মিত করছে। অন্ধজন হয়ত তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিংবা দেখেও স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু চক্ষুষ্মান মনীষিগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সম্মুখে সে তথ্য আজ আর রহস্যাবৃত নয়, সন্দেহজড়িত নয়। সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা প্রভৃতি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে আজ যে নব-চেতনা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল তাদের প্রবাহ এবং মর্মার্থ বিশেষভাবে অনুধাবন করলেই সে-কথা নিঃসংশয়ে বোঝা যাবে।

আজ তাই দীর্ঘ কালান্তরে সমস্যাপীড়িত বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত আমরা প্রণতি জ্ঞাপন করি। একদা মানব-সভ্যতার স্বর্ণাভ ঊষায় যে অশরীরী প্রগতির বাণী অনুপম ছন্দগাথার অবাচ্য সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ প্রথম ব্যক্ত করেছিল, যে-সুগভীর আনন্দোপলব্ধির মধ্য দিয়ে জীবনের চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি-লাভের অভ্রান্ত কৌশলটি সে ব্যক্ত করেছিল সভ্যতার ঊষাকালে···চলাই হ'ল অমৃতত্ব-লাভ, চলাই তার স্বাদুফল। সূর্যদেবতা সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত চলার পথে কথনো থামেনি, কথনো বিশ্রামের অবকাশ গ্রহণ করে নি—তাই তো এত আলো, এত ঔজ্জ্বল্যের সমারোহ—অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।···

সেই সুপ্রাচীন প্রগতি-বাণীর সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনিই ধর্মের ডাইনামিক্‌রূপের মধ্য দিয়ে, অনলস সাধনা ও ভৌগোলিক পরিধি-নিরপেক্ষ উদার প্রেমদৃষ্টির মধ্য দিয়ে এ-যুগে নব-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনা-লোকে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রেম-সম্পদে সমৃদ্ধ, ত্যাগদীপ্ত তাঁর অমোঘ জীবনী ও বাণী আজ তাই পূর্ব গোলার্ধের এক প্রান্ত থেকে পশ্চিম গোলার্ধের অপর প্রান্ত পর্যন্ত উন্মুখ ও পিপাসী মানবমনের সকল সংশয়-সমস্যার নিরাকরণোদ্দেশ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ার আজকের পুণ্যদিনে তাঁর নিশ্চিত শুভ-আশীর্বাদ কামনা করে আমরা তাই বলছি;···হে মহাভাগ, হে যুগদেবতা—হিংসায় উন্মত্ত আজকের তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে সার্থক হোক তোমার উদার ও সার্বভৌম বাণী। ভারতবর্ষের যা সাধনা, ভারতবর্ষের যা আরাধনা ও আধ্যাত্মিক সঙ্কল্প তা পূর্ণ হোক, পুণ্য হোক তোমার অভিনব দিব্যজীবনের মাধ্যমে। একদা ··

রিক্তা এই ধরিত্রীরে পরিপূর্ণ করি,
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালে—
প্রাচীর আকাশপট বর্ণে উদ্ভাসিয়া
ঘটেছিল তোমার উদ্ভব।

·

তোমার প্রেমের ধারা, জাতি বর্ণ
না করি বিভেদ,
গোলার্ধের সর্ব প্রান্ত স্নিগ্ধ করেছিল—
অভিনব সাম্যমন্ত্র বিশ্বে প্রচারিয়া।

আজি তব জন্মতিথি জগতের দ্বারপ্রান্তে
ঋতুচক্র-আবর্তনে এসেছে আবার।
করি নমস্কার, করি নমস্কার!

তোমার পরমবাণী, অক্ষয়-সাধনা
চিন্তার অবাধক্ষেত্রে - অদৃশ্য, অমোঘ চিত্রে
ভাবিকাল-ইতিহাস করিছে রচনা।
তোমার জীবন-বেদ যুগ-ভাষ্য নিয়া—
ব্যক্ত হোক, হোক সব জানা—'
ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে—
এই মম রহিল প্রার্থনা।

গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীঅতুলানন্দ রায়

আবাল্য তাপস, আজীবন অনাসক্ত, চিরজীবন স্নেহ-শ্রদ্ধা-প্রেমময় গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহী কি সন্ন্যাসী এ নিয়ে মতভেদ আছে। থাকবেও। তাঁর অপূর্ব জীবনাদর্শ বুঝবার শক্তি আমাদের নেই। বৃহস্পতির ন্যায় জ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ঠাকুরকে সম্যক বুঝিনি ব'লেই তাঁর কথা বলতে ভয় পাই। কি জানি যদি আমার বলার অক্ষমতায় তাঁকে ছোট করে ফেলি।

ঠাকুর স্বামিজীকে বলতেন, সাক্ষাৎ সর্বত্যাগী শঙ্কর; বিবেক-বৈরাগ্যের গৈরিক পতাকা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ঠাকুরকে বলতেন, ত্যাগীর বাদশা।

পাশ্চাত্ত্য মনীষী রোমাঁ রোলাঁ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম জীবনী-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "The man whose image I here evoke was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people. He was a little village Brahmin of Bengal, whose outer life was set in a limited frame without striking incident...But his inner life embraced the whole multiplicity of men and Gods...."

—দু'হাজার বৎসর ধরে প্রগতিপরায়ণ ত্রিশ কোটি মানবাত্মার অক্ষুণ্ণ আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার পূর্ণ বিকাশ। চরম স্ফুরণ। শেষ কথা।···বহু মত ও পথের মিলন-মন্দির। বহু রূপ রস রশ্মির মিলিত বিকাশ। আর্ত মানবাত্মার ডাকে যুগে যুগে যিনি আসেন, তিনিই এসেছিলেন হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ-জীবনের এক সঙ্কটক্ষণে। কে তিনি, কেন আসেন জানি না, বুঝিও না। আমার মধ্যে হিন্দুরক্ত, আমার সংস্কার দুর্দম কণ্ঠে বলে, তিনি আছেন, তিনি আসেন। যখনই যেখানে খড়্গ তুলে দাঁড়ায় দানব, তখনই সেখানে দেবমানব-রূপে নেমে আসেন তিনি আর্তকে বাঁচাতে, দানবকেও পথ দেখাতে, অখণ্ড আত্মার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলতার ফলে সব চেয়ে বেশী ভেঙে পড়েছিল হিন্দুর গার্হস্থ্য-জীবন, হিন্দু জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মানুরাগ, সামাজিক নিষ্ঠা, আত্মসংযম। অযোধ্যার যে রাম লক্ষ্মণ ভরত হিন্দু গৃহীর ঘরে ঘরে সজীব ক'রে রাখতেন রামায়ণ, ধরার মেয়ে যে সীতা উঁচিয়ে রাখতেন হিন্দু কৃষ্টির অনবনত পতাকা, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভাঁওতায় হিন্দু ভুলে গেল তাঁদের জীবনাদর্শ, তাঁদের বিচিত্র আত্ম-বৈশিষ্ট্য, তাঁদের ঐতিহ্য। স্বধর্ম ছাপিয়ে স্ব-মত ও স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হলো বড়। সবাই ভুলে গেল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদাত্ত নির্দেশ, স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ।

ভুলে গেল, জগন্মাতা মানে আমার-ই মা নয়, সবার-ই মা। ভগবান শুধু আমার-ই মন্দিরে নয়, রয়েছেন মসজিদেও, চার্চেও। ভুলে গেল যে প্রদীপ জ্বলে আলো দেয় সে তার নিজের অঙ্গ পুড়িয়ে ছাই করে পরের সেবায়।

আত্মবিস্মৃতির ফলে বিষিয়ে গেল হিন্দু-গৃহীর জীবন, ধ্বসে পড়লো গৃহের বনেদ। বিপন্ন মানবাত্মা আর্তনাদ ক'রে ডাকলো, 'ঠাকুর বাঁচাও!' বিপন্ন গৃহীর ডাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন

গৃহীকে দেখাতে জীবনাদর্শ, সন্ন্যাসীকে দেখাতে সচ্চিদানন্দের স্বরূপ। গৃহীকে শেখাতে সহজ ধর্মানুরাগ, সন্ন্যাসীকে শেখাতে সহজ সাধনা। গৃহীকে শেখাতে আত্ম-উন্নয়ন, সন্ন্যাসীকে শেখাতে আত্ম-সংযম।

রাজর্ষি জনক, রঘুপতি রাম, কি পরমপুরুষ কৃষ্ণের মতোই বলবো, না বলবো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তাঁদের চেয়েও উচ্চাঙ্গের জীবনাদর্শ অনন্যসাধারণ জ্ঞানী, নিরক্ষর, নিঃসম্বল, গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্তরে অম্লান সন্ন্যাস, অপূর্ব অনাসক্তি সত্ত্বেও তিনি অকুণ্ঠ ভাবে জীবন যাপন করেছেন গৃহে, আদর্শ গৃহীর বেশে, সহজ গৃহস্থের পরিবেশে। অশান্ত গৃহীর সংসার-বিতৃষ্ণা দেখে বলেছেন, 'মাগ ছেলেকে কি পাড়াপড়শীরা খেতে পরতে দেবে গা?' চরম বৈরাগ্যের স্তরে এসে জগন্মাতাকে বলেছেন, 'মা, আমায় রসে বশে থাকতে দে মা। আমি শুকনো নীরস হতে চাই নে।'

গৃহী ভক্তদের বলেছেন, 'গৃহে থেকেই থাক না। পাঁকাল মাছের মতো থাক। মাঝে মাঝে নির্জনে বসে তাঁর ধ্যান কর।'

কঠোরতম বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞ তোতা-পুরীর প্রিয়তম শিষ্য রামকৃষ্ণ, সবত্যাগী শঙ্করের পূর্ণ প্রতীক নরেন্দ্রের গুরু, স্বামী বিবেকানন্দের স্রষ্টা রামকৃষ্ণ, আবার তিনিই জননী চন্দ্রমণির আদরের দুলাল গদাই, কামারপুকুরে গৃহদেবতা রঘুবীরের আবাল্য পূজক গদাধর, ঝামাপুকুরের যজমানগৃহে প্রিয় পুরোহিত ছোট ভট্‌চাজ, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী শ্যামার পাগল পূজারী রামকৃষ্ণ, জানবাজারে রাসমণির অন্দর-মহলে রমণীর বেশে পরিহাস চতুর রসিক 'বাবা', শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর প্রেমময় স্বামী।

পিতা-মাতার প্রতি রামকৃষ্ণের আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তির তুলনা নেই। সহোদর-সহোদরা, ভাইপো-ভাগ্নে, স্বজন-বান্ধবদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতাও ছিল অপরিসীম। চিরজীবন সংসারীর সামাজিক কর্তব্য তিনি অকুণ্ঠ চিত্তেই পালন করেছেন। ভক্তদের মধ্যে কারও এসব গৃহীর কর্তব্যের ত্রুটি বা অবহেলার কথা শুনলে তিনি কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন।

গৃহ-সংসারের প্রতি বীতরাগ হাজরা মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে এসে ছিলেন। গীতা-ভাগবত পাঠ করতেন। সাধন-ভজনও করতেন। অন্তিম সময়ে হাজরার মা ঠাকুরের ভাইপো রামলালকে দক্ষিণেশ্বরে আসবার সময় অনেক ক'রে ব'লে দিলেন, রামকৃষ্ণকে ব'লো, হাজরাকে যেন ব'লে ক'য়ে একটিবার পাঠিয়ে দেয়। ওকে একটিবার দেখতে বড্ড সাধ হচ্ছে। রামকৃষ্ণ হাজরাকে ডেকে বললেন। হাজরা গেলেন না। কেঁদে কেঁদে পুত্রস্নেহ-কাতরা বৃদ্ধা হাজরার মা মারা গেলেন। শুনে চটে রামকৃষ্ণ বললেন, ...মা কেঁদে কেঁদে মরে গেল, ও আবার গীতা পড়ে, ধর্ম-সাধনা করে।

দেবমানব-জ্ঞানে পিতাকে শ্রদ্ধা করতেন রামকৃষ্ণ। ঠাকুরের পিতা পরম ভক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় 'শান্ত' ভাবে গৃহদেবতা রঘুবীরের সেবা করতেন। ক্ষুদিরামের একান্ত সেবায় প্রীত হয়ে নারায়ণ ক্ষুদিরামকে বাৎসল্য ভাবেও তাঁর সেবা করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। পিতার প্রসঙ্গ উঠলে রামকৃষ্ণ মৌন হয়ে যেতেন। এমনি গভীর ছিল পিতার প্রতি ভক্তি। ইষ্টের মতো তাঁর কথা যেন আলোচনার যোগ্য নয়। বহু ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাকে ছেড়ে, কামারপুকুর ছেড়ে অগ্রজ রামকুমারের সেবা ও সাহায্য করতে রামকৃষ্ণ কলকাতায় ঝামাপুকুরে আসেন। সে সময় সারা দিন যজমানদের বাড়ী পূজায় অক্লান্ত শ্রম করেও বাড়ী ফিরে স্বহস্তে রান্না ক'রে দাদাকে খেতে দিতেন,

নিজেও খেতেন। দাদার শ্রম লাঘব করতে ঘরকন্নার সব কিছুই ঠাকুর নিজের হাতে করতেন। বেদান্ত-সাধনার পর একবার সিহড়ে এলেন, ভাগ্নে হৃদয়ের মা হেমাঙ্গিনী দেবীকে দেখতে। রামকৃষ্ণের পিসতুত বড় বোন তিনি। গুরুজন। রামকৃষ্ণ পায়ের ধুলো নিতে গেলেন। হেমাঙ্গিনী দেবী সভয়ে পা সরিয়ে বললেন, 'ওকি ওকি ? তুই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।' রামকৃষ্ণ হাসিমুখে বললেন, 'তুমি যে দিদি। গুরুজন।'

হেমাঙ্গিনী বলে ফেললেন, 'তবে বল্ আমি যেন তোর স্বরূপ দেখতে দেখতে মরি।'

রামকৃষ্ণ তেমনি হেসে বললেন, 'তা তুমি দেখতে চাও তো দেখবে। এখন তো পায়ের ধুলো দাও।'

ভাগ্নে হৃদয় ছিল ঠাকুরের আবাল্য সহচর। সিহড়ের বাড়ীতে দুর্গোৎসব করলো হৃদয়। বললো, 'মামা, তোমাকে যেতেই হবে সিহড়ে।' মথুরের বাড়ীতেও মায়ের পূজার সমারোহ। ঠাকুরকে ছাড়লেন না মথুর। মথুর ভক্ত। হৃদয় ভাগ্নে। মথুরকে সন্তুষ্ট করতে রামকৃষ্ণ সশরীরে রইলেন জানবাজারে। ভাগ্নের সাধ মেটাতে পূজার তিন দিন সূক্ষ্ম দেহে উপস্থিত থাকলেন সিহড়ে।

গুরুতর অপরাধের দরুন মথুরের ছেলে হৃদয়কে বা'র ক'রে দিলেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ী থেকে। ঢুকতে পেতো না হৃদয়। মাঝে মাঝে ফটকের বাইরে থেকে মামার সঙ্গে দেখা করতো। আক্ষেপে কাঁদতেন রামকৃষ্ণ হৃদয়ের জন্য। জগন্মাতাকে বলতেন, 'মা, ওর ভালো কোরো। ও আমায় পীড়ন করেছে খুব, সেবাও করেছে খুব।'

কেশবের অসুখ। শয্যাগত। দক্ষিণেশ্বরে আসতে পাবেন না কেশব। রামকৃষ্ণের মন কেমন করে। নিজেই যান কেশবের বাড়ী। কেশবের বাড়ী যাওয়ার পথে বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের বাড়ী গিয়ে মায়ের দোরে মাথা খুঁড়ে বললেন রামকৃষ্ণ, 'কেশবের ভালো কর মা। আমি তোমায় ডাবচিনি দিয়ে পুজো দেব।' সরল বিশ্বাসে ঠাকুর-দেবতার চরণে এই কাতর মিনতি, এই মানত করা, এই তো চিরন্তন গৃহী মানব-মনের চরম পরিচয় !

রামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি বর্ণনাতীত। অকপট মাতৃভক্তিই হয়ত তাঁর জীবনের অনন্যসাধারণ সাফল্যের প্রাণশক্তি। মহর্ষি ব্যাস বা বাল্মীকি কেউই এরূপ আদর্শ মাতৃভক্ত সন্তানের চরিত্র চিত্রণ করতে পারেন নি।

সাক্ষাৎ জগদম্বা-জ্ঞানে রামকৃষ্ণ মা'কে শ্রদ্ধা করতেন। অথবা জননীরই পূর্ণ বিকাশ তিনি দেখেছিলেন জগজ্জননীর মধ্যে। শৈশবে বৃদ্ধা জননীকে গৃহ-কর্মে সাহায্য করতেন রামকৃষ্ণ। বেদান্ত-মতে সাধনার পূর্বে আত্ম-তর্পণ ক'রে ব্রহ্মোপলব্ধির পরও প্রত্যহ নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথম মায়ের পদধূলি মাথায় ও সর্বাঙ্গে মেখে কুশল-প্রশ্ন করতেন। কতবার বলেছেন, 'মাকে দুঃখ দিলে ঈশ্বর-ফীশ্বর সব বিগড়ে যায়। অকারণেও মায়ের চোখে জল পড়লে ভগবান বিমুখ হন।'

শৈশবে এক দিন কামারপুকুরের অতিথিশালায় সমাগত সাধুদের সাধ মিটিয়ে পরিধেয় বসন ছিঁড়ে কৌপীন পরেছিলেন রামকৃষ্ণ। দেখে চন্দ্রমণির চোখে জল এলো। আদরের ছেলে তো! কোনও মা দেখতে পারেন না সন্তানের সন্ন্যাসি-বেশ। মা'কে কাতর দেখে বালক রামকৃষ্ণ তক্ষুনি কৌপীন ছেড়ে ফেলে বললেন, 'আর পরবো না মা, কেঁদ না তুমি।'

সতের আঠারো বছর বাদে, বেদান্ত-সাধনের পূর্বে সন্ন্যাসী গুরু তোতাপুরী বললেন, 'গৈরিক পরতে হবে···'

রামকৃষ্ণ বললেন, পারবো না। আমার মা রয়েছেন নহবত-ঘরে। গেরুয়া-পরা দেখলে মা কাঁদবেন। মাকে কাঁদাতে পারবো না।

মেজ ভাই রামেশ্বরের মৃত্যুর সংবাদ এলো দক্ষিণেশ্বরে। জননী চন্দ্রমণি তখন সেখানে। বৃদ্ধা শোক-তাপ-রোগজীর্ণা। রামকৃষ্ণের সে কী উদ্বেগ! মা কালীর মন্দিরে গিয়ে কাতর প্রার্থনা জানালেন যাতে জননী এই আঘাত সহ্য করবার মতো শক্তি পান। দিব্যজ্ঞানী যিনি তাঁরও মনে মায়ের জন্য কী শিশুর ব্যাকুলতা, আকুল কাতরতা!

সুদীর্ঘ ছ'মাস নিরন্তর অদ্বৈতভাবভূমিতে থেকে অসুস্থ হলেন রামকৃষ্ণ। শরীর সারাতে এলেন দেশের বাড়ীতে কামারপুকুরে। সঙ্গে এলো হৃদয়, শক্তি-সাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী।

জয়রামবাটী থেকে মামীকে নিয়ে এলো হৃদয়। প্রথম সজ্ঞানে শ্বশুরবাড়ী এসে দেব-দুর্লভ স্বামীকে দেখলেন পূর্ণযুবতী সারদামণি। রামকৃষ্ণ সাগ্রহে সযত্নে পত্নী সারদামণিকে শেখালেন, প্রদীপের সলতে পাকানো, গুরুজনদের সেবা করা, ঘর নিকানো, সাঁজের প্রদীপ জ্বালানো, ত্রি-সন্ধ্যায় ধুনো দেওয়া, শাঁক বাজানো, অতিথি-অভ্যাগতের সমাদর করা এই সব। সব-ই জানতেন তো রামকৃষ্ণ। দিনের পর দিন আদর্শ গৃহিণীর নিত্য কর্তব্য কর্ম নিজে-ই তিনি শেখালেন সরলা সহধর্মিণীকে। ব্রহ্মচারিণী ভৈরবীর ভালো লাগতো না এ-সব। এ কি! গৃহী সংসারীর মতো স্ত্রীর কাছে কাছে থাকা! স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা! বললেন, রামকৃষ্ণ, এতে পতন হবে তোমার। সাবধান।

রামকৃষ্ণ স্বভাবসুলভ রসিকতায় বললেন, তা কি হয়! বুড়ি ছুঁয়েছি তো।

মথুর মারা গেছেন। রামকৃষ্ণ রয়েছেন তখনও দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ীতে। হৃদয়কে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনভোলা রামকৃষ্ণের সেবা-যত্নের ত্রুটি হয়। গভীর রাত্রিতে এক দিন পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এলেন সতী সাধ্বী সারদামণি। পথশ্রমে অবসন্না, গায়ে প্রবল জ্বর।

দেখেই রামকৃষ্ণ বললেন, এত দিনে তুমি এলে? আর কি আমার সেজ বাবু আছে যে তোমার সেবাযত্ন হবে?

মথুর নেই, রাণী রাসমণি নেই। ঠাকুরবাড়ীর তখনকার কর্তাদের এসব দিকে ওঁদের মতো টান নেই। রুগ্না স্ত্রীর জন্য, তাঁর ঔষধ-পথ্য, সেবা-যত্নের জন্য রামকৃষ্ণের সে কী দুশ্চিন্তা! রুগ্না পত্নী জগদম্বার জন্য মথুর এসে রামকৃষ্ণের পায়ে পড়েছিলেন। ভক্ত মথুরের কাতর প্রার্থনায় রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, যাও, তোমার স্ত্রী সেরে উঠবে। বাড়ী ফিরে মথুর দেখলেন, শয্যাগতা মুমূর্ষু জগদম্বা বিছানায় উঠে বসে বেশ কথা বলছেন। দু'দিনও দেরী হয়নি যাঁর মুখের কথা ফলতে, তিনি পারতেন তো নিমেষে সারদামণির রোগ সারিয়ে তাঁকেও সুস্থ করতে। তা নয়। প্রেমময় গৃহী স্বামীর মতো রুগ্না স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষা করলেন অকাতরে। দেখে শুনে, দু'চার দিন থেকে সারদার পিতা দেশে ফিরলেন। গাঁ'ময় বলে বেড়ালেন, কে বলে জামাই আমার ছন্নছাড়া খামখেয়ালী? চোখে-ই তো দেখে এলাম হাজারে এক জন মেলে না এমন আদর্শ স্বামী।

সারদা সুস্থা হয়েছেন। নহবত-ঘরে শাশুড়ীর কাছে থাকেন। রামকৃষ্ণের ঘরে এসে তাঁর বিছানা পেতে দেন, পেটরোগা স্বামীর জন্য শুকতো, মাছের ঝোল রেঁধে দেন। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালান, ধুনো দেন। স্বামীর ঘরে এটুকু সেটুকু করেই তাঁর তৃপ্তি। দূরে থেকে, ফাঁকে ফাঁকে দিনে রেতে

এক আধ বার স্বামীকে দেখেই তাঁর কী আনন্দ! সতী সারদার পায়ে পড়ে স্বয়ম্ভূ শিব রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, দেখ, আমি জানি সকল রমণী-ই আমার জননী। তথাপি তোমার ধর্ম্ম-সঙ্গত অধিকার আমি স্বীকার করতে বাধ্য। তুমি আমার স্ত্রী। এখন তুমি যা' বলবে আমি তা-ই করতে প্রস্তুত।

সারদাও সারদা-ই তো। নির্ধূম হোমানল। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে সারদা বললেন, আপনাকে জোর ক'রে সংসারী করবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি কেবল কাছে থেকে আপনার সেবা করতে চাই। আপনার কাছে সাধন-ভজন শিখতে চাই। হলোও তাই। সারদামণি-ই হলেন রামকৃষ্ণের প্রধানা শিষ্যা। সেবায় মমতায় জননী, সাধনায় সহধর্ম্মিণী, অগণিত ভক্ত সন্তানের পথ-নির্দেশ করতে লোকাতীত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিমতী বাণী। প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীশ্রীমা।

ওঁকার উচ্চারণ করতে করতে দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। পরদিন স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্ত তাঁর দেহ সৎকার করলেন। হিন্দু বিধবার চিরাচরিত নিয়ম পালন করতে সতী শ্রীমা হাতের শাঁখা খুলে ফেললেন,...দেখলেন লোকাতীত লোকনাথ স্বামী সামনে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বলছেন, খুলছো কেন গা? আমিও মরিনি, তুমিও বিধবা নও। তোমার আমার সম্পর্ক তো জন্ম-জন্মান্তরের...অটুট, অবিচ্ছেদ্য।

হিন্দুর ঘরে ঘরে ওঁরাই তো স্মরণাতীত কাল থেকে চিরবরেণ্য সীতা-রাম।

শাশ্বত গৃহী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ...শাশ্বতী গৃহিণী শ্রীশ্রীমা।

তুমি

শ্রীচিত্ত দেব

আমারি মাঝে রয়েছ তুমি
রয়েছ মন জানে
তবুও খুঁজি পাগল আমি
জানিনে কোন্‌খানে।
কোন্ গভীরে অন্ধকারে
কোন্ সে পদ্মতলে
দেখেছি মোর হরিণ-চোখে
তোমারি আলো জলে।
এ-ময় স্বপন, পরশ-রতন
পেয়েছি আমি কভু
তোমার সাথে মিলন পুনঃ
হবে না কিগো তবু!

তুমি কি শুধু প্রতিমা সেজে
নীরব হয়ে রবে
হৃদয় নিয়ে বেদনা দিয়ে
ছলনা সে-যে হবে!
হাত বাড়ালে পেতাম যদি
বাড়াইনি কি হাত
এমনি কত জবাবদিহি
ঘুম না-জানা রাত।
জানিনে ঘুমোই কিংবা জাগি
তোমারে মনে রেখে
এ-শুধু জানি আমারে তুমি
রাঙাও থেকে থেকে।
তোমার প্রেম-অনল-তাপে
আমি কি তলে তলে
মোমের মতো গলছি শুধু
দু'টি নয়ন জলে!

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

অখ্যাত আর অজ্ঞাত এক পল্লী-কুটীর মাঝে,
তুমি এসেছিলে স্বর্গের দ্যুতি ক্ষুদ্র শিশুর সাজে।
চন্দ্র-বয়ানে অপরূপ হাসি, দেহে লাবণ্য-জ্যোতি,
তোমারে অঙ্গে ধরিয়া জননী হলেন ভাগ্যবতী।

কেহ জানে নাই কোন্ শুভদিন সে দিন ধরার 'পরে,
জাগিয়া উঠিল এই নিখিলের আর্ত্ত মানব তরে!
দিকে দিকে শাঁক বাজেনি সেদিন, ওঠে নাই আগমনী,
গগন ভেদিয়া ওঠেনি স্বনিয়া তোমার জয়ধ্বনি!

সবার আড়ালে চুপে চুপে এলে আঁধারে জ্বালিয়া আলো,
রাঙায়ে তুলিলে দূর-দিগন্ত—দূরি' পুঞ্জিত কালো!
এই ধরণীর কত মূক প্রাণে দানিলে নূতন ভাষা,
নিরাশার ঘন তিমিরের মাঝে জাগালে মুক্তি-আশা!

সে দিন বিহগ কি সুরে গাহিল, প্রচারিল কোন্ বাণী!
সে দিন কানন-কুসুম-সুবাস কি বারতা দিল আনি'!
মন্দ-পবনে কি মধু ছন্দ ব'য়ে গেল দিকে দিকে,
উদয়-সূর্য কি আলো জাগালো স্বর্ণ-ছটায় লিখে!

কেহ বোঝে নাই, কেহ দেখে নাই, সে দিনের ইতিহাসে—
অলক্ষ্যে কোন্ শুভ ইঙ্গিত জাগিল বিশ্বাকাশে!
কেহ জানে নাই, সে কোন্ প্রকাশ, স্বরূপ দেখাবে ব'লে
নেমে এল এই ধরণীর বুকে—চন্দ্রাদেবীর কোলে!

কত না লীলার মাধুর্য-রসে ভ'রি পল্লীর গেহ,
কত না তৃষিত বক্ষে জাগালে প্রাণের নিবিড় স্নেহ!
আদরে যত্নে প্রীতি-মমতায় ক্রমে হ'য়ে বর্ধিত,
জীবনে জীবনে দিব্য-প্রেরণা করিলে সঞ্চারিত!

পিতা মাতা আর পল্লীবাসীর, কাহারো একার নহ,
তোমারে ডাকে যে আর্ত্ত-নিখিল পলে পলে অহরহ!
তোমারে খোঁজে যে তৃষিত পথিক, মরুমাঝে পথ-হারা,
নিরাশ হৃদয় কেঁদে কেঁদে ফিরে লভিতে করুণা-ধারা!

যে আলোর লাগি' আঁধার আকাশ চেয়ে থাকে অনিমেষে,
কমলের কলি করে প্রতীক্ষা বিরহ-কাতর বেশে,
যে আলোর লাগি' সৃষ্টি-প্রেরণা নীরবে দিবস গোণে,
তা'রি স্পন্দন করিল আঘাত তোমার দরদী মনে!

ছুটে গেলে তাই সুদূরের পানে ভেঙে দিয়ে খেলাঘর,
তুমি বিশ্বের, বিশ্ব তোমার, কেহ নহে তব পর!
প্রেমের প্রকাশ দেখাবে তুমি যে, সেই ত' তোমার ব্রত,
তাই ত এসেছ এ মহাভুবনে করুণাভারাবনত!

তোমার জীবনে ফুটায়ে তুলিলে বিশ্বময়ীর লীলা,
চেতনা-দীপ্তি তাই ত লভিল কঠিন-প্রতিমা শিলা!
মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা তোমার শ্মশান-ভস্ম 'পরে,
শবের মাঝারে জাগাইল শিব, প্রাণ জাগাইল জড়ে!

লৌহ করিলে নিকষস্বর্ণ, তুমি যে পরশ-মণি,
নিঃস্বরে তুমি বুকে টেনে নিয়ে দেখালে রত্ন-খনি!
দ্বন্দ্ব-কলহ-হিংসার মাঝে দেখালে শান্তি-রূপ,
কামনা-কুটিল-মর্মে জ্বালালে প্রেমের পুণ্য-ধূপ!

মরু-মরীচিকা-ভ্রান্তি টুটিয়া দেখালে অমৃত-পথ,
আবিলতা মাঝে বহালে গঙ্গা, হে নবীন ভগীরথ!
ধর্মের তরে মানুষে মানুষে যে বিভেদ জেগে র'য়,
উৎপাটি তাহা, এ মহাভুবনে জাগালে সমন্বয়!

যে মহাসাধনা এ মহাভারতে জেগেছিল একদিন,
তা'রি আগমনী-গীতিতে সাধিলে তোমার হৃদয়-বীণ!
সত্য-জ্ঞানের পূত হোমানল জ্বালালে নূতন করি,
ধ্বনিয়া তুলিলে ঋকের মন্ত্র কম্বু-কণ্ঠ ভ'রি!

এই বিশ্বের মনোমন্দিরে প্রেমের আসনমাঝে,
চির-করুণার বিগ্রহ তব সুন্দর-রূপে রাজে!
শান্তির বাণী, মুক্তির বাণী ধ্বনিয়া নিরন্তর,
বিরাজিছ তুমি নিখিল-জীবনে, ছেয়ে আছ চরাচর!

নব ভারতের হে প্রাণ-পুরুষ, গাহি আজ তব জয়,
স্বর্ণযুগের করুক সূচনা তোমার অভ্যুদয়!
দাও বরাভয়, দাও শুভাশিস্, দাও ফিরে মঙ্গল,
অমৃতে কর নিখিল পূর্ণ—কর প্রাণ উজ্জ্বল!

কামারপুকুর

স্বামী সংস্বরূপানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ও মধুর বাল্য ও কৈশোর-লীলার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ এই কামারপুকুর গ্রামখানির অধ্যাত্ম-সম্পদ্ অতুলনীয়। দক্ষিণেশ্বর ৺কালীমন্দির তাঁহার উগ্র তপোভূমি ও তেজোবিকিরণ-ক্ষেত্র এবং বেলুড়মঠ, তাঁহার নিজকথানুসারে,[১] নিত্য-লীলাকেন্দ্র — উভয় স্থানই গরিমা ও মহিমায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কামারপুকুর তাঁহার ব্রজধাম, মধুরিমা ও সুষমায় আপনভোলা, পাগলপারা। এই সরল অনাড়ম্বর আবেষ্টনে এই চিরসরল দেবশিশু যে অপূর্ব লীলাহিল্লোল তুলিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটির চিহ্ন অবিস্মরণীয় ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই গ্রামখানি রসলিপ্সু ও রসজ্ঞকে মূকমুখর আহ্বান জানাইতেছে। কৌটিল্যের কালকূটদগ্ধ মানব এই সরলতাতীর্থে স্নান করিয়া শান্তি লাভ করিবে, মাথার গুরুভার চিরতরে নিক্ষেপ করিয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলিবে, আপন হৃদয়কুম্ভটি কানায় কানায় ভরিয়া লইয়া সমাজে অমৃতসিঞ্চন করিবে।

এই কামারপুকুরেই এই দেবশিশু ধনী কামারিণীর প্রাণের আকুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন; ধর্মদাস লাহার, চিনু শাঁখারীর ও সীতানাথ পাইনের বাটীর মধুময় লীলাগুলি এই গ্রামেই অভিনীত হইয়াছিল; এইখানেই পাঠশালায় যাত্রাগান, পুঁথিপাঠ ও হনুমানকে কৃপাপ্রদর্শন করা হইয়াছিল; ইহার নিকটেই সেই আম্রকানন, সেই গোচারণভূমি, সেই মাণিকভবন যাহাদের রস রসিকের নিকট মূকবৎ আস্বাদ্য; এইখানেই ৺রঘুবীরের মালাগ্রহণ হইয়াছিল, এইখানেই তাম্বূলরঞ্জিত ওষ্ঠাধর ও চেলীপরিহিত বরবপু দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় সরল নরনারী কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়াছিল—কত বলিব, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' কয়টি চিত্র আঁকিতে পারিয়াছে? এই সব প্রেমাভিনয়ের জমাট-বাঁধা স্মৃতি এই পল্লীবালা আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—কি অপূর্ব ইহার সৌভাগ্য!

ইহাতেই কামারপুকুরের সৌভাগ্যের শেষ হয় নাই। উপরের স্মৃতিগুলি যেমন মধুর, তেমনি বড় করুণ এক স্মৃতি ইহা বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়া আছে। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী শ্রীসারদামণি দেবীর জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনীর। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন; মায়ের

১ "নরেন আমাকে মাথায় ক'রে নিয়ে যেখানে রাখবে, আমি সেখানেই থাকব।"

বিরহ-ব্যথা হৃদয়ে গুমরিয়া উঠিতেছে; অন্নবস্ত্রের সংস্থানের কথা ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁহার সন্তানগণ; কেহই জানেন না মা'র দিনগুলি কি ভাবে যাইতেছে; আত্মীয়েরা উদাসীন, নির্মম; জননী ব্যথায় মুক, সাধনা ও তপস্যায় মৌন, জগৎকল্যাণ-চিন্তায় বিভোরা, সন্তানদের দুঃখপূর্ণ তপস্যায় ব্যথিতা ও প্রার্থনরতা, অনশন-অর্ধাশনে ক্ষীণ তনু ক্ষীণতরা—বুঝি বা বাল্মীকি-তপোবনে পরিত্যক্তা জনকনন্দিনীর দুঃখচিত্রও ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ইহা এই কামারপুকুরেই শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটিয়াছিল।

এই গ্রামখানি কোথায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালে কিরূপ ছিল? আমরা স্বামী সারদানন্দের অমরলেখা হইতে উদ্ধার করিতেছি:

"হুগলি জেলার উত্তরপশ্চিমাংশ যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে সেই সন্ধিস্থলের অনতিদূরে তিনখানি গ্রাম ত্রিকোণমণ্ডলে পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত আছে। গ্রামবাসীদিগের নিকটে ঐ গ্রামত্রয় শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুররূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত থাকিলেও, উহারা পরস্পর এত ঘন সন্নিবেশে অবস্থিত যে পথিকের নিকট একই গ্রামের বিভিন্ন পল্লী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সেজন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে উহারা একমাত্র কামারপুকুর-নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।...

"কামারপুকুর হইতে বর্ধমানশহর প্রায় বত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত শহর হইতে আসিবার বরাবর পাকা রাস্তা আছে।...গ্রামকে অর্ধবেষ্টন করিয়া উহা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ৺পুরীধাম পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।...

"কামারপুকুরের প্রায় ৯।১০ ক্রোশ পূর্বে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে দারুকেশ্বর নদের তীরবর্তী জাহানাবাদ বা আরামবাগের মধ্য দিয়া কামারপুকুরে আসিবার একটি পথ আছে। তদ্ভিন্ন উক্তগ্রামের প্রায় নয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ঘাটাল হইতে এবং প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বন-বিষ্ণুপুর হইতেও এখানে আসিবার প্রশস্ত পথ আছে।

"১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া-প্রসূত মহামারীর আবির্ভাবের পূর্বে কৃষিপ্রধান বঙ্গের পল্লীগ্রামসকলে কি অপূর্ব শান্তির ছায়া অবস্থান করিত, তাহা বলিবার নহে। বিশেষতঃ হুগলী বিভাগের এই গ্রামসকলের বিস্তীর্ণ ধান্যপ্রান্তরসকলের মধ্যগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি বিশাল হরিৎসাগরে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় প্রতীত হইত। জমির উর্বরতায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব না থাকায় এবং নির্মলবায়ুতে নিত্যপরিশ্রমের ফলে গ্রামবাসীদিগের দেহে স্বাস্থ্য ও সবলতা এবং মনে প্রীতি ও সন্তোষ সর্বদা পরিলক্ষিত হইত। বহু জনাকীর্ণ গ্রামসকলে আবার কৃষি ভিন্ন ছোটখাট নানাপ্রকার শিল্পব্যবসায়েও লোকে নিযুক্ত থাকিত। ঐরূপে উৎকৃষ্ট জিলাপী, মিঠাই ও নবাত প্রস্তুত, আবলুষ কাষ্ঠনির্মিত হুঁকার নল (ইত্যাদি) নির্মাণ,...সূতা, গামছা ও কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য এবং অন্য নানা শিল্পকার্যেও প্রসিদ্ধ ছিল।...

"গ্রামে আনন্দোৎসবের অভাব এখনও লক্ষিত হয় না। চৈত্রমাসে মনসাপূজা ও শিবের গাজন এবং বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে চব্বিশ প্রহরীয় হরিবাসরে কামারপুকুর মুখরিত হইয়া উঠে।...

"গ্রামে তিন চারিটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে হালদারপুকুরই সর্বাপেক্ষা বড়। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অনেক আছে। তাহাদের কোন কোনটি আবার শতদল কমল, কুমুদ ও কহ্লারশ্রেণী

বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। গ্রামে ইষ্টকনির্মিত বাটির ও সমাধির অসদ্ভাব নাই। পূর্বে উহার সংখ্যা অনেক অধিক ছিল।...গ্রামের ঈশান ও বায়ুকোণে 'বুধুই মোড়ল' ও 'ভূতীর খাল' নামক দুইটি শ্মশান বর্তমান। শেষোক্ত স্থানের পশ্চিমে গোচরপ্রান্তর, মাণিকরাজা-প্রতিষ্ঠিত সর্বসাধারণের উপভোগ্য আম্রকানন এবং দামোদর নদ বিদ্যমান আছে। ভূতীরখাল দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া গ্রামের অনতিদূরে উক্ত নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।"[২]

কিন্তু ১৮৬৭ হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া, কুটীর শিল্পের ক্রমাবনতি, শহরে কল-কারখানায় যোগ দিবার জন্য লোকের তথায় গমন, প্রাচীন গ্রাম্য শিক্ষার পরিবর্তে শহুরে ইংরেজী শিক্ষায় অধিক অর্থাগম ইত্যাদি কারণবশতঃ কামারপুকুর অন্যান্য বঙ্গপল্লীর ন্যায় জনবিরল হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে পল্লীটি আরও হতশ্রী হইতেছে। লোক ও লোকের দরদ না থাকায় পুকুর ও সায়রগুলি মজিয়া গিয়াছে; ইহাতে শুধু যে পানীয় জলের অভাব হইয়াছে তাহা নহে, শস্যক্ষেত্রে জল-সেচন করিতে না পারায় খাদ্য-দ্রব্যও পূর্বের ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে না। আনন্দোৎসব ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। বহু বাড়ী ও মন্দির এখন ভগ্নস্তূপে পর্যবসিত হইয়াছে। এই বাহ্যিক শ্রীহীনতার সহিত অধিবাসীদিগের আন্তর দৈন্যও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অবনতির এই দুর্বার বেগ রোধ করিবে কে? এ কর্তব্য কাহাদের? তাঁহাদের, যাঁহারা এই গ্রামখানির চির প্রোজ্জ্বল অধ্যাত্ম-মহিমা বুঝিতেছেন, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া ধন্য হইতেছেন।

সৌভাগ্যের বিষয় পরিম-রেখা (graph) আবার উঠিতেছে। যে দেব-মানবের জন্মে গ্রামের শাশ্বত সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া উহা মেঘমুক্ত হইয়া আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। বৎসরাধিক কাল হইল শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক যে স্থানটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সেইখানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার নিত্য পূজা-ভোগরাগাদি প্রবর্তিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া পূজাদি পরিচালনার সহিত গ্রামের সর্বপ্রকার উন্নতির পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হইতেছে। দেশ-বিদেশের ভক্তগণ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, গ্রামের পূর্বাপর ইতিহাস শুনিয়া ও বিশিষ্ট স্থানগুলি দেখিয়া প্রেমাপ্লুত হইতেছেন, এবং এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৌম্যস্নিগ্ধতা রক্ষা করিয়া নবীনের আশাকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর ভাগবত জীবন গড়িয়া তুলিবে সেই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। ম্যালেরিয়া-নিবারণ-কার্য আরম্ভ হইয়াছে; হালদার পুকুরটির পঙ্কোদ্ধার কার্য শুরু হয় হয়; শিক্ষায়তন ও চিকিৎসালয়-স্থাপনের জল্পনা কল্পনা-রাজ্য অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছে, কর্মিবৃন্দ আসিয়া জুটিয়াছেন, দেশবাসীর দৃষ্টি ও হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে, রাষ্ট্রনায়করাও উদ্বুদ্ধ ও সচেষ্ট হইয়াছেন। কাজেই আমরা আশা করিতেছি, অচিরকাল মধ্যেই পল্লীটি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিবে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই ঋষিদৃষ্ট পূর্ণাবয়ব জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিয়া ইহা একখানি আদর্শ গ্রাম হইয়া চতুর্দিকে শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিবে।

তীর্থাবগাহী পাঠক, অরুণিমা ভেদ করিয়া সবিতা উঠিতেছেন, সাবিত্রী পাঠ করুন।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, পৃ ২৫-৩০।

কামারপুকুর-যাত্রা

স্বামী—

(১)

চিন্ময় আনন্দধাম কামারপুকুর নাম
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়াতীত ভূমি।
দেহ-অভিমানী হয়ে কামনার বোঝা নিয়ে
কেমনে যাইবে মন তুমি ?
বৈকুণ্ঠ-অতীত স্তরে গোলোকের অভ্যন্তরে
শুদ্ধ মাধুর্যের লীলাধাম।
আপনি আপন-রস পান-অভিলাষ-বশ
যেথা লীলা করে পূর্ণকাম।
এক 'দুইরূপ' ধরে, পুন তাহা বহু করে
নানাভাবে করে আস্বাদন।
মহাভাগ্যবান যে-ই দরশন পায় সেই
অনুরাগে করি আরাধন।

(২)

এবে যশোমতী রাণী, সাজি ধনী কামারিণী,
পুত্রহীনা বিধবার বেশ।
বৎস তরে গাভী প্রায়, অতি ব্যাকুলিতা হায়,
উন্মাদিনী আলু থালু কেশ।
চক্ষু বহি প্রেমনীর, বক্ষ ভেদি স্নেহক্ষীর,
ঝরিতেছে বাৎসল্যের রসে।
পরকীয় পুত্ররতি স্নেহরস গাঢ় অতি,
সেই রস পিয়ায় গোপেশে॥

(৩)

ধূলায় ধূসরকায় ভূমে গড়াগড়ি যায়,
হামাগুড়ি দিয়া কভু চলে।
আবার দাঁড়ায়ে চলি, ভূমিতে পড়িছে ঢলি,
ধরণী ধরিছে বক্ষ খুলে।
ধরণী ধারণ যে-ই ধরাতলে লুটে সেই
দেহভার ধরিতে অক্ষম।
জননীর মুখ চেয়ে, কাঁদিছে ব্যাকুল হয়ে
নিজে নহে চলিতে সক্ষম!
দিগম্বর দীর্ঘকেশ বাল গোপালের বেশ
গলে শোভে বাঘনখ মালা
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে, চলিতে মধুর বাজে,
পায়ে হাতে মনোহর বালা।
আধ আধ মিঠা বুলি, হাস্য নৃত্য বাহু তুলি
বালরূপে গঙ্গাধর খেলে।
যোগমায়া সংঘটন সহ সম শিশুগণ
'কামারপুকুরে' লীলাছলে।

(৪)

শ্রুতি ছাড়ি নিজদেশ, ব্রজে যার গোপীবেশ,
বৈশ্যবধূ সেথায় সেজেছে।
হালদার পুকুরেতে, জল আনিবার পথে,
কুম্ভকক্ষে আসিয়া মিলেছে!
গোপনে যতন করে, অতিশয় প্রেমভরে,
সুরস মিষ্টান্ন ফল মূল।
কতই মনের সাধে, এনেছে আঁচলে বেঁধে
গদাধরে খাওয়াতে আকুল॥

(৫)

পরমা প্রকৃতি যিনি, সাজি দীন কাঙ্গালিনী,
সৌম্য শান্ত পল্লীবালা-বেশ।
বস্ত্রে মুখ ঢেকে রাখে, কলসী বহিছে কাঁখে,
লম্বমান পৃষ্ঠে দীর্ঘ কেশ।
কভু ঢেঁকিশালে পশে, কভু বা রন্ধনে বসে
কভু মাজে ঘাটেতে বাসন।
আপনার গ্রাস লয়ে সন্তানের মুখে দিয়ে
মাতৃস্নেহ করে আস্বাদন।

(৬)

জাহ্নবী যমুনা এসে, কামারপুকুরে পশে
ক্ষীণ করি স্বীয় কলেবর।
লীলারস আস্বাদিয়া পুলকে পূরিছে হিয়া
নাচিয়া চলিছে আমোদর।
ত্যজিয়া ঐশ্বর্যরাশি যত দেবদেবী আসি
কামারপুকুরে বাস করে।
আম্রকাননের পাশে কেহ বা রয়েছে বসে
প্রেমলীলা দরশন তরে।

(৭)

বক্ষে ধরি পূর্ণ ইন্দু, চিন্ময় আনন্দসিন্ধু
কামারপুকুর শোভমান।
উথলিলে একবার সারা বিশ্ব একাকার
সর্বভেদ চির অবসান।
এমন আনন্দপুরে বাসনা রাখি অন্তরে
কেমনে পশিবে তুমি মন?
দাঁড়াইয়া পথধারে যাত্রিগণ-পায়ে ধরে
শুভাশিস্ করহ গ্রহণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অপূর্ব সমাবেশ*

স্বামী নির্বেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে যে সকল নানা ধর্ম ও ভাবের সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য এই দুটি আদর্শের অপূর্ব সমাবেশটিকে সম্যক বুঝিয়া উঠা বোধ করি খুবই কঠিন। আমাদের বিশ্লেষণে অনেক সময়েই হয়তো আমরা এই লোকোত্তর পুরুষের উপর অবিচার করিয়া বসিতে পারি—আবার অনেক সময়ে আংশিক সিদ্ধান্তের দরুন আমাদের নিজেদেরই বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে।

তোতাপুরীর নিকট আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিবার পরও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ সাত মাস জন্মভূমি কামারপুকুরে আত্মীয় পরিজনবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করিয়াছিলেন—ইহা প্রচলিত সন্ন্যাসজীবনের একটি ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। সন্ন্যাস-দীক্ষা অর্থেই আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের মধ্যে সর্বপ্রকার পার্থক্য মুছিয়া দেওয়া—সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হওয়া—নিজের জ্ঞাতি-কুটুম্ববর্গের প্রতি যাবতীয় বাধ্যবাধকতা চিরদিনের মত ত্যাগ করা। সন্ন্যাসীর জীবন সর্বসীমানির্মুক্ত একান্ত স্বাধীন জীবন—আত্মীয়-প্রিয়জনের প্রাচীন সম্পর্কের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত সেখানে রাখিবার কথা নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, তিনি সন্ন্যাসের উপরোক্ত সুপরিচিত আদর্শ ডিঙাইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজে অনুসরণ করিয়াছিলেন একটি সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা। যে পারিবারিক বন্ধন নিজের হাতে একদিন ছিন্ন করিয়া আসিয়াছেন, হিন্দু-সন্ন্যাসী জীবন্মুক্ত হইলেও উহা আর কখনও স্বীকার করিতে যান না। শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরীর কথাই ধরা যাক। ভাবিতে পারা যায় কি যে এই কৃচ্ছ্রব্রতী নির্মায়িক সন্ন্যাসিপ্রবর স্বগ্রামে ফিরিয়া গিয়াছেন, আত্মীয়স্বজনের সহিত তাহাদেরই এক জন হইয়া মিশিতেছেন, তাহাদের

* লেখকের 'Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance' নামক ইংরেজী গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অংশবিশেষ-অবলম্বনে।

সুখদুঃখের সহিত তাদাত্ম্যবোধ করিতেছেন? সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণকে কিন্তু এইরূপ আচরণ করিতে দেখিতে পাই একেবারে নিঃসঙ্কোচে, দ্বিধাশূন্যভাবে। আবার 'সংস্কারক'-রূপেই যে তিনি উহা করিয়াছিলেন তাহাও নয়। সন্ন্যাসীর আচারবৃত্ত-সম্বন্ধে একটি নূতন পথ প্রবর্তন করা নিশ্চিতই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, কেননা, তাঁহার সন্ন্যাসি-শিষ্যবর্গকে কখনও নিজের অনুসৃত ঐ অভিনব ধারায় চলিতে তিনি বলেন নাই। উহা শুধু একক তাঁহারই পথ, তাঁহারই সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক পথ। কিন্তু প্রশ্ন উঠে কেন তাঁহার নিজের ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য?

কেহ হয় তো বলিবেন, সনাতনপন্থী সন্ন্যাসী-দিগের অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর মানুষের প্রতি দয়া-মমতা বেশী ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার নিজের উপর আত্মীয়-স্বজনের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, তাঁহার হৃদয়টি ছিল খুবই কোমল এবং স্নেহপ্রবণ। আমরা জানি তিনি যখন তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস নেন, তখন গোপনেই লইয়াছিলেন, পাছে গর্ভধারিণী জননী (তিনি তখন দক্ষিণেশ্বরে) উহা দেখিয়া প্রাণে কষ্ট পান। সকল বন্ধন কাটিয়া সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করিতে যাইবার প্রাক্কালেও জননীর প্রসন্নতার জন্য এত চিন্তা!

তবুও কিন্তু এই 'দয়ামমতা'র যুক্তি দিয়া তাঁহার পূর্বোক্ত আচরণ বেশীদূর ব্যাখ্যা করা চলে না। কতকগুলি নির্দিষ্ট পারিবারিক সম্বন্ধ এবং গণ্ডীবদ্ধ একটি ক্ষুদ্র নরনারী-গোষ্ঠীর প্রতি তত্তৎ কর্তব্যসমূহ মানিয়া না লইয়াও কি তিনি বিশ্বের সকল মানুষের উপর নির্বিচারে করুণা প্রকাশ করিতে পারিতেন না? আর যদিই বা এই ক্ষুদ্র পরিবারগোষ্ঠীর সহিত সম্বন্ধ রাখিলেন, সাধারণভাবে সস্নেহ ব্যবহার এবং সহানুভূতিটুকু রাখিলেই কি যথেষ্ট হইত না? পুত্র বা স্বামীর তথা অন্যান্য আত্মীয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ছিল কি? ভগবান বুদ্ধ কিংবা শ্রীচৈতন্যদেবের মানবপ্রেম-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ আছে কি? সিদ্ধিলাভ করিবার পর তাঁহাদের স্বজনবর্গের সহিত আচরণে কত ভালবাসা ও নম্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল কিন্তু কই, তাঁহারা তো গৃহী সাজিতে যান নাই। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যে সন্ন্যাসের সীমা লঙ্ঘন করিয়া-ছিলেন 'মানবিকতা'র যুক্তি দিয়া উহা ব্যাখ্যা করা কঠিন। ইহার কারণ-নির্ণয়ের জন্য বোধ করি আরও গভীরতর তথ্যে যাওয়া প্রয়োজন।

জগৎসংসারকে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সম্পূর্ণ নূতন চোখে দেখিতেন—যাহা অবিদ্যাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই, তোতাপুরীর ন্যায় সিদ্ধ পুরুষগণেরও দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বহুলাংশে পৃথক। তাঁহার নিকট 'নির্গুণ তত্ত্ব' এবং 'মায়িক জগৎ' উভয়ই ছিল সমান দিব্যসত্তায় ভাস্বর। জগৎ-অনুভূতির প্রবেশপথে এই বোধে অবস্থিত থাকিতেন বলিয়াই তিনি সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যজীবনের আপাত-বিরুদ্ধ রীতিদ্বয়কে একটি অবিভক্ত সামঞ্জস্যে সম্মিলিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব সমন্বয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় উভয় আদর্শেরই একই প্রকার সুস্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ বিকাশ। এই প্রসঙ্গে সেই চমৎকার ঘটনাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মাতার মৃত্যুর পর একদিন তিনি গৃহস্থের প্রচলিত ধারায় জলে তর্পণ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই উহা পারিলেন না। পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করিবার জন্য করপুটে যেই জল নেন অমনি আঙ্গুলগুলি আপনা হইতে ফাঁক হইয়া গিয়া সমস্ত জল পড়িয়া যায়। হঠাৎ তাঁহার মনে

পড়িয়া গেল, সন্ন্যাসীর তর্পণে অধিকার নাই—তিনি যে সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণে গৃহী এবং সন্ন্যাসী মিলিয়া এক হইয়া যাইবার একটি নিখুঁত ছবি এই ঘটনা হইতে পাওয়া যায়।

বিশ্বসংসারকে উহার নিখিল বৈচিত্র্যের সহিতই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—কেননা উহাদের সব কিছুর মধ্যেই তিনি জগজ্জননীর লীলা দেখিয়া অসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তাঁহার অনুভব হইত যে, সেই রঙ্গময়ী মা-ই দিব্য-নাট্যে তাঁহার আত্মীয়স্বজন সাজিয়াছেন। তাই সেই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সহিত লেনদেন রাখিয়া, তাঁহাদিগকে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়া দিব্য অভিনয়টির মাধুর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁহার ছিল এত নিখুঁত যত্ন। জননী, সহধর্মিণী, ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী—ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁহার চোখে বিভিন্নবেশ-ধারিণী মা-কালীই; অতএব ইঁহাদের সহিত সম্পর্কগুলি খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর আদর্শ সন্ন্যাসী হইয়াও সুদক্ষ অভিনেতার মত গৃহস্থের মুখোস পরিয়া রঙ্গমঞ্চে নিজের ভূমিকা কী সুন্দরই না অভিনয় করিয়া গেলেন! তাঁহার নিকট হইতে যতটা আশা করা সম্ভবপর ততটাই নিঃসঙ্কোচ ভালবাসা, আন্তরিক মনোযোগ এবং অকুণ্ঠিত সেবা আত্মীয়গণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া গৃহস্থের ভূমিকায় থাকিবার সময়ে এমন কিছু তিনি নিশ্চিতই করিতে পারিতেন না যাহা গৃহিসাজের অন্তরালবর্তী 'সন্ন্যাসী'কে কোন প্রকারে ম্লান করে। পূর্বোক্ত 'তর্পণ'এর ব্যাপারটিতেই ইহা দেখা গিয়াছে—সহধর্মিণীর সহিত তাঁহার আচরণের ক্ষেত্রেও ইহা আমরা দেখিতে পাইব। তাহা ছাড়া তাঁহার টাকা-পয়সা স্পর্শ করিতে না পারা, অর্থসঞ্চয়ের কল্পনায় স্বভাবগত বিতৃষ্ণা, ব্যক্তিগত সেবার জন্য মাড়োয়ারী ভক্তের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা দান লইতে অস্বীকার, রহস্যচ্ছলেও তাঁহার মুখ হইতে কখনও কোন মিথ্যা বাহির না হওয়া, পাকা বিষয়ী লোকের সঙ্গে অত্যন্ত কষ্টবোধ, রমণীমাত্রে—এমন কি বেশ্যার ভিতরও সর্বদা জগন্মাতাকে দেখা এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগ-বিষয়ে চরম উদাসীনতা—এই সকল ঘটনা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, গৃহিবেশের অভ্যন্তরে তাঁহার হৃদয়টি চিরদিনের মত আরূঢ় ছিল সন্ন্যাসের উচ্চতম আদর্শে। এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এই দুই বিপরীত জীবন-ধারার একটি অনুপম সমন্বয় এবং প্রত্যেকটি ধারাই স্বকীয় আদর্শের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। সন্ন্যাসী এবং গৃহী উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবনের এই ছাঁচ হইতে নিজ নিজ জীবন পূর্ণভাবে গড়িয়া লইতে পারিবেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ এবং দুই পুত্রকে পর পর হারাইয়া মাতা চন্দ্রমণি দেবীর শরীরমন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলে তিনি সংসারে একান্ত বীতস্পৃহ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে কনিষ্ঠপুত্রের নিকটে চলিয়া আসেন এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শরীরত্যাগ পর্যন্ত নহবতের ঘরে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শোকগ্রস্তা বৃদ্ধা জননীর প্রতি বিনম্রসেবা ও শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ণ আচরণ ছিল ঠিক একটি আদর্শ কর্তব্যনিষ্ঠ পুত্রের মতই। দক্ষিণেশ্বরে ভাগিনেয় হৃদয়ের প্রতিও তাঁহার ব্যবহার দেখিতে পাই সংসারের আর দশটি স্নেহশীল মাতুলেরই ন্যায়। ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালও কি তাঁহার নিকট খুল্লতাতের স্নেহভালবাসা এক বিন্দু কম পাইয়াছিলেন? মোট কথা, উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরূঢ় হইয়াও পরিজনবর্গের সহিত তাঁহার সম্পর্কে একটুও অস্বাভাবিকতা

দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের একমাত্র পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার অধীর ক্রন্দনের কথাও মনে পড়ে। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহার ভিতরকার সন্ন্যাসী যেন সম্পূর্ণ লুকাইয়া আছে—গৃহীর ভূমিকাই সুপ্রকট।

কিন্তু তাঁহার সহধর্মিণীর প্রতি আচরণ একেবারেই অপূর্ব। ইতিহাসে উহার কোন তুলনা নাই এবং বলিতে গেলে উহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। ইন্দ্রিয়সমূহকে সম্পূর্ণ বশে আনিয়াছেন এমন এক জন পুরাদস্তুর সন্ন্যাসীকে 'পতিধর্ম'-পালন করিতে কে কবে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে? এই অত্যাশ্চর্য সম্মিলনে যেন আমরা প্রত্যক্ষ করি দুটি বিপরীত মেরুর সংযোগ! অদ্ভুত দম্পতির বিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বয়ে বহিয়া যাইতেছে কামলেশশূন্য পবিত্রপ্রেমের স্নিগ্ধ ধারা—সর্বমালিন্যমুক্ত দুটি ভাস্বর আত্মার অতিলৌকিক মিলন!

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতে করিতে সারদা দেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমাকে তোমার কি মনে হয়?" তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল—"যে মা মন্দিরে, যে মা এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন আর সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন, তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সত্যই তোমাতে সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ দেখতে পাই।" কত সহজ ভাবে পরিণীতা ধর্মপত্নীর মধ্যে জগজ্জননীকে দেখিতেছেন; আবার গভীর রাত্রে তাঁহাকে পদসেবার অনুমতি দিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে স্বামীর আসন গ্রহণ করিতেছেন! ভাবিতে গেলেও যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের নিজকে জগন্মাতা হইতে অণুমাত্র পৃথক বোধ হইত না—অন্যথা সহধর্মিণীরূপে হইলেও সেই জগদম্বিকাকে পদস্পর্শ করিতে দেওয়া নিশ্চিতই তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি স্বয়ং তথা সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড হইয়া গিয়াছিল বিশ্বপ্রাণা মহামায়ার একটি অখণ্ড অভিব্যক্তি। ১২৮০ সালের (১৮৭২ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা রজনীর সেই অদ্ভুত ঘটনাটির কথা মনে পড়ে। ফলহারিণী কালিকাপূজার সমস্ত উপচার দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে কালীর সহিত অভিন্ন ভাবে তন্ত্রশাস্ত্রনির্দিষ্ট ষোড়শী পূজা করিলেন। আরাধ্যা দেবী সারদা অতীন্দ্রিয় ভাবাবেশে বাহ্যসংজ্ঞাহীনা—পূজক শ্রীরামকৃষ্ণও গভীর সমাধি-মগ্ন। স্থূলজগৎ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়মন-বুদ্ধির পারে নির্বিশেষ একত্বের ভূমিতে দিব্য-দম্পতির অপূর্ব আধ্যাত্মিক সম্মিলন!

কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতীরূপে দেখা এবং পূজা করা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে স্ত্রীর আসনেও রাখিয়াছিলেন। কখনও কখনও ভক্তগণের বিশেষতঃ যাঁহারা গৃহী ও বয়স্ক তাঁহাদের নিকট রহস্যচ্ছলে তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত—"বলতে পার আমার আবার বিয়ে কেন? ভেবে দেখ দেখি এই দেহের যত্ন নেবার জন্যে ও (সারদাদেবী) যদি না থাকতো তা হলে আমার অবস্থা কি হত। এমন যত্ন করে কে আমাকে বেঁধে খাওয়াতো—আর আমার পেটে যা সয় বেছে বেছে এমন সব রান্না আলাদা করে করে দিত?" এখানে সারদা-দেবীকে তিনি দেখিতেছেন সেবাপরায়ণা সাধ্বী পত্নীরূপে। এই পত্নীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার ছিল কী মমতামাখা! তাঁহাকে নারীজাতির উচ্চাদর্শে গড়িয়া তুলিতে কী গভীরই ছিল তাঁহার আগ্রহ! আধ্যাত্মিক এবং সাংসারিক উভয় বিষয়েরই নানা খুঁটিনাটি একান্ত যত্ন এবং মনোযোগ সহকারে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সারদাদেবীর নিকটেও তিনি পাইয়াছিলেন অপরিমেয় বিশুদ্ধ ভালবাসা ঐকান্তিক ভক্তি এবং অকুণ্ঠিত সেবা।

আবার যতই কেন অদ্ভুত মনে হউক না কেন, ইহাও সত্য যে সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবতী বলিয়া দেখিতেন। স্বামীর প্রতি এই অত্যদ্ভুত দৃষ্টি তিনি আজীবন রাখিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি 'মা, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় গেলে গো' বলিয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। তথাপি সর্বক্ষণই তাঁহার পত্নীধর্মও ছিল অক্ষুণ্ণ। পতির দেহত্যাগের পর তিনি বৈধব্যের বসন পরিধান করিতে গিয়াছিলেন—অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন দিয়া নিষেধ করাতে উহা আর পরিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর এই বিচিত্র সম্বন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে। সর্বময়ী বিশ্বজননী, প্রেমময়ী পত্নী এবং স্নেহপাত্রী শিষ্যা—এই তিনের একটি সুসমঞ্জস সমন্বয় কিরূপ তাহা কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? অপরদিকে জগদম্বা কালী, প্রাণপ্রিয় স্বামী এবং ধর্মজীবনের গুরু এই তিনটির সমাবেশ কি আমাদের ধারণায় আসে? বাস্তবিকই মানুষের বুদ্ধি এখানে হার মানে—ভাষাও উহা বর্ণনা করিতে অসমর্থ। বিভিন্ন বিচারকের দৃষ্টিকোণ অনুসারে অপ্রাকৃত, অমানব, অতিলৌকিক বা ঐশ্বরিক যে কোন সংজ্ঞাই দেওয়া যাক্ না কেন এই দিব্যদম্পতির অনুভবে যে অপূর্ব সামঞ্জস্য প্রকট হইয়াছিল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মানুষ কোন কিছু দ্বারাই তাহার যথাযথ ধারণা করিতে পারিবে না। একটি জিনিষ কিন্তু সুস্পষ্ট। তাঁহাদের এই অদ্ভুত দাম্পত্য সন্ন্যাসী এবং গৃহী উভয়েরই জন্য দেহলালসা-বর্জিত একটি বিশুদ্ধ জীবনলক্ষ্যের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গৃহীর আত্মসংযমের আদর্শ তথায় দিব্য পবিত্রতায় রূপান্তরিত—সন্ন্যাসীর জিতেন্দ্রিয়তা সকল প্রলোভনের ঊর্ধ্বে ভাস্বর বিদেহতায় সমুন্নীত!

কল্পতরু

শ্রীপ্রণব ঘোষ

ছায়া দাও,
তোমার নিভৃত শান্তি,
পল্লবে সবুজ কান্তি,
জীবনে জাগাও।
ছায়া দাও।

তৃষাদীর্ণ মাঠ হতে জীবনের চৈত্রঝড় আসে,
আকাশ আকুল হয়ে আগুনের দহন—নিঃশ্বাসে
দিক থেকে দিগন্তরে অন্ধ ধূলি মাতে।
রিক্ত—শ্যাম সেই সাহারাতে
তোমার পল্লব গায় দূরশ্রুত শ্রাবণের গান,
তোমার শাখায় শুনি কুসুমের সবুজ আহ্বান।
ছায়া দাও।
হে চির-চিন্ময়-তরু,
মরুর ঊষর বক্ষে শিকড়ে শিকড়ে,
যে গোপন সাধনায় মূক মাটি নড়ে,
অজেয় সে—সাধনার পথ-চলা দাও।
জানি সে-পথের প্রান্তে তোমারি আশ্রয়,
তোমারি পাতায় ছায়া-ফলে ভরাভরা।
আতপহরণ বন্ধু, তোমারি আশায়
দিন দিয়ে দিন গাঁথি প্রাণের ভাষায়।
সকল আশ্বাস-শেষে অন্তহীন মরু,
জানে তুমি আছ মোর চির কল্পতরু।
তোমার নিভৃত শান্তি
পল্লবে সবুজ কান্তি
পরিপূর্ণতার ফলে দাও ভরে দাও,
ছায়া দাও!

শ্রীরামকৃষ্ণের অতীন্দ্রিয়ত্ব

ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, যথা—তিনি সর্বধর্মসমন্বয় করেছেন, জ্ঞান ও ভক্তিপথের ভেদ নষ্ট করেছেন ইত্যাদি। এ কথাগুলি কিন্তু সব সময়ে বিশেষ চিন্তা করে প্রকাশ করা হয় না। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একটি নূতন জীবন—যেখানে অতীন্দ্রিয়ত্বের সহিত পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের মিলন হয়েছে। তিনি পুস্তকের ভাষায় কোন কথা বলেন নি। তাঁর স্বভাব তা ছিল না। যেমন অনুভব হত তেমনিই বলতেন। এইটি ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। নিজে ছিলেন পরম অনুভবিক পুরুষ, তাই এটা সম্ভব হত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁর কথাবার্তা স্বামিজীর সহিত কথাবার্তা হতে বিভিন্ন রকমের। স্বামিজীকে বেদান্তাভিমুখে নিচ্ছেন, আর কেশব বাবুকে পরাভক্তি-অভিমুখে চালিত করছেন। আধার বুঝে তিনি উপদেশ দিতেন। এতবড় বিরাট তাঁর স্বরূপ ছিল যে, মানুষকে দেখলেই তার অন্তর বাহির দেখে নিতেন। এ দেখার জন্য তাঁর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হত না। দেখামাত্রই ভিতর বাহির এবং তার পারিপার্শ্বিক (environment) বুঝে নিতেন। সত্যিকার তিনি ছিলেন psychic; psychic লোকের স্বভাবই এই। পদার্থ সামনে পড়লেই তার স্বরূপ অন্তরে আপনা হতেই বিকশিত হয়ে ওঠে। এর জন্যে গুরূপদেশ বা বাইরের শিক্ষা কিছুই দরকার করে না। এই শক্তি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাভাবিক। এজন্যে তাঁর সকলের সহিত ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হতে হত। শ্রীপরমহংসদেবের এইরূপই শক্তি ছিল যে, তাঁর সামনে কিছু পড়লে আপনা হতে তার গূঢ় তথ্য মনে ভেসে উঠত। তার জন্যে বিশেষ কোন চেষ্টা করতে হত না। এই যোগশক্তি ধারণ ও প্রয়োগের যথার্থ অধিকারী খুবই বিরল। নিত্যগোপালের (পরে স্বামী জ্ঞানানন্দ অবধূত) ভিতর এই শক্তির স্ফুরণ হচ্ছে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাবধান করেছিলেন। নিত্যগোপালের সহিত একদিন যেতে যেতে দেখেন তাঁর শরীর দিয়ে আলোক নির্গত হচ্ছে। দেখেই তিনি নিত্যগোপালকে ঐ শক্তিবিস্তার করতে বারণ করেন। বললেন, তুমি কখনও এটা করো না। করলে তোমার শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, অপরেও ঠিক বুঝতে পারবে না। যে পর্যন্ত না দিব্য তেজোময় বিকাশ (psychic body) স্থিতিশীল হয় ততদিন তেজের বিকাশ ধরা বা ধরে চলা একেবারেই অসম্ভব। এই জন্যেই পাতঞ্জল দর্শনে বলা হয়েছে যে, বিভূতিযোগ হতে সব সময়ে দূরে থাকবে।

যাহোক জিনিসটা হচ্ছে এই, পরমহংসদেবের অন্তর্জীবনে এমন একটি সুন্দর স্ফুরণ হয়েছিল যাতে তিনি পদার্থের স্বরূপভূত প্রজ্ঞা আপনা হতে লাভ করতে পারতেন। এটা একরূপ যোগবিশেষ। পতঞ্জলি এই প্রজ্ঞাকে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলেছেন। এই প্রজ্ঞাতে সত্য ধৃত হয় এবং তার স্বরূপের উদ্ঘাটন হয়। চিত্তের সমস্ত অবস্থাগুলি শুদ্ধভাবান্বিত না হলে এরূপ শক্তি বেশী দিন ধৃত হয় না। অবশ্য সমাধি হতে এ শক্তি আলাদা। সমাধি আরও উচ্চস্তরের।

তাতে জ্ঞান এবং নির্বিকল্প ভূমির পূর্বাবস্থাগুলি প্রকাশিত হয়। পতঞ্জলি-মতে চার প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সাস্মিতা সমাধি। সাস্মিতা সমাধি স্থির হলে ধীরে ধীরে বিবেকখ্যাতি সমাধি হয়ে সর্বশেষে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত হয়। সমাধি আরম্ভ হলেই পতঞ্জলি বলছেন—ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা—সত্যকে ধারণ করে আছে যে প্রজ্ঞা তার বিকাশ হয়। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই সাধকজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা লাভ হলে নানারূপ জ্ঞানের স্ফূর্তি হয়—যা অন্যরূপে সম্ভব নয়। পতঞ্জলির মতে যৌগিক সমাধির শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—তাতে আত্মজ্ঞান হয়। কিন্তু তার নীচেও অনেক সমাধি আছে—যাতে আজকালকার ভাষায় occult knowledge হয়। পরমহংসদেবের এই occult knowledge (অতীন্দ্রিয় জ্ঞান) স্বাভাবিক ছিল। তিনি কাউকে দেখলেই তার অন্তরের সব কথা জানতে পারতেন। ঐ ভাবে সূক্ষ্মজ্ঞানের তিনি ছিলেন পরম ভাণ্ডার। যখনই যিনি তাঁর কাছে গেছেন তাঁকে দেখেই তাঁর অন্তরজীবনের সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি এর উদাহরণস্থল। আজকালকার দর্শনেতে এই occult knowledge এর স্থান ক্রমে ক্রমে হচ্ছে। কিন্তু পরমহংসদেবের মধ্যে সেটা ছিল সিদ্ধ। তিনি সত্যিকার সিদ্ধবিদ্যায় সিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরম মহানুভবতা ছিল এরূপ জ্ঞানকেও তিনি উচ্চস্তর দিতেন না। এগুলি বিভূতির মধ্যে ফেলতেন। পদার্থের অন্তরে সূক্ষ্মশক্তিতে এরূপ জ্ঞান আবির্ভূত হয়। পরমহংসদেবের এই সূক্ষ্মশক্তির রাজত্বে ছিল পূর্ণ অধিকার, কিন্তু তিনি এইরূপ সিদ্ধির অধিকারী হয়েও তা তুচ্ছ করে ফেলে দিয়েছিলেন। সূক্ষ্ম জ্ঞানে তাঁর অধিকার-সম্বন্ধে সুন্দর একটি কথা আছে। তিনি একদিন মন্দিরে বসে মহাকালীর গান করছেন, রাণী রাসমণি নিকটে বসে শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি রাণী রাসমণিকে মৃদু চপেটাঘাত করলেন, কেননা তাঁর অনুভব হল রাণী বিষয়ের কথা ভাবছেন। মায়ের কাছে সমস্ত বিশ্বের লোক অতি সামান্যই ছিল। সাধারণ নীতিজ্ঞানে তিনি এরূপ কাজ করতে পারতেন না। পরমহংসদেবের অবতারত্ব এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে নিয়েই।

সত্য যাঁরা অবতার হন সাধারণতঃ বলা হয় তাঁরা ঈশ্বরশক্তিতে আবিষ্ট হয়ে জগতে ভগবানের কথা বিকাশ করেন। সত্যি পরমহংসদেবের ভিতর এটা ছিল। তিনি কাউকে কাউকে কখনো দেখিয়েছেন তাঁর ভিতর মায়ের কৃপার ক্রিয়াশীলতা। স্বামী বিবেকানন্দের মত তীক্ষ্ণমেধাবী ও বিচারশীল মহা পণ্ডিতকে আসনে বসিয়ে পায়ের আঙ্গুলের দ্বারা মস্তিষ্ক স্পর্শ করে কুণ্ডলিনী জাগরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামিজী সেই অবস্থায় চিৎকার করে উঠেছিলেন মহা শক্তির স্পর্শে। এই যে কুণ্ডলিনী জাগরণ এও অতীন্দ্রিয় শক্তির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। যাঁদের এই শক্তি আসে তাঁরা যা ভাবেন তাই হয়—এবং যা স্পর্শ করেন তাতে দিব্যভাব অনুস্যূত হয়। এ জন্যই জগতে পরমহংসদেব এতভাবে পূজিত হচ্ছেন—কারণ তাঁর দিব্যভাবটি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে এবং ক্রিয়াশীল হচ্ছে। শক্তির এমনই খেলা যে তা ক্রমশঃ বর্ধিত হতে হতে বিশ্বকে আলোড়িত করে। এ শুধু শাস্ত্রের কথা নয়—আমরা পরমহংসদেবের জীবনে দেখতেও পাচ্ছি তাই। তাঁর শক্তি তাঁর শিষ্যদের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করছে। এই জন্যই তিনি অবতার। সহস্র মানুষে যা সম্ভব হয় না ভগবৎশক্তি অবতরণ করলে তা

আপনিই সম্ভব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাবতার ছিলেন—তাই আজ সকলের ভিতরে তাঁর শক্তির স্ফূর্তি। তাঁকে চিন্তা করলেই মানুষ শান্ত ও বুদ্ধ হয়। একালে তাঁব শক্তি অদ্ভুত-ভাবে বিকশিত হয়েছে। যাঁরা ইদানীং ধর্মপথে অগ্রসর হয়েছেন জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক তাঁর শক্তিতেই তাঁরা উর্ধ্বগমন করছেন। প্রত্যেক অবতারের একটি কর্তব্য (mission) আছে—সেটা হচ্ছে এই—তাঁদের ধরে রাখলে অতি সহজে বড় বড় তথ্যের প্রকাশ হয় এবং মানুষের চিত্তটি নির্মল ও ভাস্বর হয়ে ওঠে। প্রত্যেক অবতারই বলতে গেলে Occultist, কেননা প্রত্যেকের ভিতর দিয়েই এইরূপ শক্তি বিকিরিত হয়, মানুষকে বহু সাহায্য করে এবং অতি সহজে ভক্তি, যোগ, জ্ঞানের স্পন্দন জাগিয়ে দেয়। এই ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি এই সমাজের ভিতরে স্থিত হয়ে সমাজকে উদ্ধার করছে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে।

পরমহংস

শ্রীমাধুর্যময় মিত্র

নীর আর ক্ষীর একসাথে আছে মিশে
সৎ ও অসৎ বস্তুর সমাবেশে;
শুনেছি মানস-হংসের দল
ক্ষীরটুকু খায়, পড়ে থাকে জল,
শাশ্বত শ্রেয় বেছে নেয় তারা ক্ষণিকের প্রেয় হতে,
এই ধরণীর নীর-ক্ষীর-মেশা স্রোতে।

* * * *

সংসার হতে সার ও অসার সবটুকু তুমি নিলে
তাই কি তোমারে পরমহংস বলে?
শুচি অশুচির ক্ষুদ্র সীমায়
বাঁধিতে পারেনি বিরাট তোমায়,
ভবতারিণীরে মূর্ত দেখেছো বারবনিতারও মাঝে;
রূপে রূপে তুমি একই অপরূপে দেখেছো দিব্য সাজে।

ঘৃণ্য যাহারা সমাজে সদাই
তুমি তাহাদের ফেলে রাখ নাই
অবহেলাভরে দূরে একপাশে আবর্জনার মতো
কৃপার মলয়স্পর্শে করেছো চন্দনে রূপায়িত।
আমি যে দেখেছি স্বরূপ তোমার
দ্রব করুণার অমিত আধার,
দুর্দম প্রেমে উদ্বেল তব হৃদয়ের দুই তীর—
প্রভেদ হারায়ে একাকার সেথা নিখিলের ক্ষীর নীর।

শ্রীশ্রীমা*

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

আজকের এই মহিলা-সম্মেলনে যে মহীয়সী মহিলার সুমহান জীবনকথা আলোচনা করবার জন্যে তাঁর ভক্তজনেরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, ভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে উপস্থিত হ'তে পাববার সুযোগ পেয়ে নিজেকে যেমন ধন্য মনে করছি, তেমনি আশঙ্কিতও হচ্চি।

আশঙ্কাটা হচ্ছে অযোগ্য লোকের অযোগ্যতা প্রকাশ হয়ে যাবার।

অনধিকারী যদি অধিকার পায়, আনন্দের চাইতে আতঙ্কই বেশী হয় তার।

কথাটা মামুলি বিনয়ের কথা নয়, নেহাৎই খাটি কথা। নিজে তো জানি, নিজের যোগ্যতা কতোটুকু?

শ্রীশ্রীমায়ের কথা আমি কি বলবো? বলবার অধিকারই বা কোথায়? জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে নিয়ে খানিকটা কাহিনী, কয়েকটা ঘটনা, আর কিছুটা তথ্য সংগ্রহ করে ফেলতে পারলেই কি মহান্ জীবনের জীবনকথা আলোচনা করবার অধিকার জন্মায়?

তথ্য সংগ্রহ করে করে যে জানা, সে কতোটুকু জানা?

বাছাই করা ভালো ভালো কয়েকটা কথা সাজিয়ে একটা প্রশস্তি রচনা করে পাঠ করবারই বা মূল্য কি? যদি—সেই মহৎ জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যে সহজ সুন্দর জীবনদর্শন—তা'কে দেখতে না শিখি?

অমন একটি ভাবরূপ সত্তাকে উপলব্ধি করতে যে স্বচ্ছ অনুভূতির প্রয়োজন, সে অনুভূতির আভাসমাত্র কোথায় আমাদের এই সংসারবদ্ধ জড়চিত্তে?

অথচ—আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে শ্রীশ্রীমাও আমাদের, সংসারীই ছিলেন! রীতিমত সংসারী!

লোকে দেখতো—তিনি বাঁধছেন বাড়ছেন, কুটনো কুটছেন, বাটনা বাটছেন। যেন এই সব তুচ্ছ গৃহকর্ম্মই তাঁর একান্ত কর্ত্তব্য। একমাত্র কাজ।

মা নিজে জানতেন না—তিনি কী! তিনি কে!

তাই তিনি সবাইকে বলতেন—"সর্ব্বদা কাজ করতে হয়, কাজে দেহমন ভালো থাকে। আমি যখন আগে জয়রামবাটী থাকতুম, দিনরাত কাজ করতুম।"

কথায় আছে—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—প্রথম দিকে মায়ের ভাগ্যেও প্রায় সেই অবস্থাই ঘটেছিলো।

পরিবারের পাঁচ জনে তাঁকে 'সংসারবঞ্চিতা' বলে করুণা করেছে, 'দুঃখী' বলে আহা করেছে। আবার হেয় করতেও ছাড়েনি, পাড়ার লোকের বাড়ী বেড়াতে যাবার মুখ ছিলো না মার, গেলেই লোকে কথার ছলে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো—'আ ছি ছি, শ্যামার মেয়ের ক্ষ্যাপা বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে—'

কিন্তু মা ছিলেন সব কিছুতেই অবিচলিত।

ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সহ্যের প্রতিমা।

সেই নিতান্ত বালিকা বয়সেও ভুলেও কোনো দিন তিনি কপালে করাঘাত করে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেননি। অন্যের সুখ-সৌভাগ্য দেখে ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলেন নি।

আবার পরবর্ত্তী জীবনে—

* শ্রীরামপুর মহিলা-সম্মেলনে পঠিত।

ঠাকুর যখন বলতেন—"যে মা মন্দিরে আছেন, সেই মাই নহবতে বাস করছেন, আবার তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলেই তোমাকে সত্য দেখতে পাই গো—"

তখনও মায়ের তেমনি অবিচল স্থৈর্য্য।

এহেন অপরূপ তত্ত্ব, এতোবড়ো বিপর্য্যয়ের বাণীও সেই অবিচলিত নম্রতাকে বিভ্রান্ত করে ফেলতে পারেনি।

ভেবে ধারণা করা যায় না, কতো প্রচণ্ড-শক্তির অধিকারিণী হলেই তবে এমন প্রচণ্ড তত্ত্বকে নিতান্ত অবলীলায় নিজের মধ্যে পরিপাক করে নেওয়া সম্ভব!

আজকালকার এই আড়ম্বরের যুগে, অতি প্রচারের যুগে, আত্মবিজ্ঞাপনের যুগে, ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয়, কী সহজ সরল নিরাড়ম্বর আবরণের মধ্যে স্বচ্ছন্দে স্থান পেয়েছিলো সেই অসীম শক্তি!

মা সাধারণের রূপে অসাধারণ! চেষ্টাকরা ছদ্মবেশ নয়, সেই সহজ সাধারণ ভাবই মার নিজভাব।

ঘরের কোণের—মাটির প্রদীপের স্থির শিখার মতো নিঃশব্দ মহিমায় জ্বলেছে সেই এক অনন্ত জ্ঞানের শিখা।

কতো অজ্ঞান ব্যক্তি এসে সেই শিখায় জ্বালিয়ে নিয়েছে নিজেদের অন্ধকার জীবনদীপ! কতো কতো বিরাট পুরুষ অকপটে এসে মাথা নুইয়েছেন সেই অনায়াস মহিমার কাছে।

মনে হয়—বিষ্ণুপ্রিয়ার অসম্পূর্ণ রূপকে সম্পূর্ণ করে তুলতেই বুঝি শ্রীশ্রীমায়ের জগতে আবির্ভাব।

আমরা জানি—সংসারত্যাগী স্বামীর অভাগিনী স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া! পতিবিরহবিধুরা অশ্রুমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া!

"শচীমাতা কাঁদে ঘর ফেটে যায়,
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে পুতলির প্রায়,
দাঁড়ায়ে ললনা বিষণ্ণবদনা
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায়।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই ছবিই শ্রেষ্ঠ ছবি!

যুগযুগ ধরে এই বিষাদপ্রতিমাখানির জন্যে ব্যথাহত ব্যাকুল মানব-হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে আছে - মমতা, সহানুভূতি, আক্ষেপ।

শ্রীশ্রীমায়ের এবারের লীলা সেই আক্ষেপ দূর করবার জন্যে।

এ লীলায় জগতের লোক দেখলো—নারী-রূপের সম্পূর্ণতা হচ্ছে মাতৃরূপে।

এই বিশ্বমাতৃরূপের নীচে কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে সংসারসুখ-বঞ্চিতা, নিরুদ্ধ-যৌবনার বিষাদময়ী মূর্ত্তি!

আজ আমাদের মেয়েদের জীবনে কতো জটিলতা, কতো সমস্যা! মাঝে মাঝে মনে হয়—নারী-সমস্যাই বোধ করি এ যুগের প্রধান সমস্যা।

অস্থির অসন্তুষ্ট নারীজাতির জন্যে নিত্য নতুন আন্দোলন, নিত্য নতুন আয়োজন। আমরা অহরহ বলছি—আমরা আর মেয়েমানুষ হয়ে থাকতে চাই না, 'মানুষ' হতে চাই।

অতএব আমাদের 'মানুষ' করে তোলবার জন্যে দেখা দিচ্ছে কতো অজস্র পরিকল্পনা, রচনা করা হচ্ছে যতো—অদ্ভুত অদ্ভুত আইন!

কোন্‌টা গ্রহণীয়, কোন্‌টা বর্জ্জনীয়, এ নিয়ে তর্কের আর শেষ নেই।

কিন্তু চোখের সামনের এই স্থির সহজ বিরাট আদর্শের দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। বিচার করে দেখবার কৌতূহল পর্য্যন্ত নেই।

পুরণোকালের বাতিল ফ্যাসানকে আমরা আবার পরম আদরে ডেকে আনছি—শাড়ী

গহনা কেশবেশের মাধ্যমে, কিন্তু পুরণো আদর্শের দিকে তাকিয়ে দেখতে গেলেই শিউরে উঠে মূর্চ্ছা যাই।

সে আদর্শের দিকে সম্পূর্ণ পিঠ ফিরিয়ে আমরা মহা উল্লাসে এগিয়ে চলেছি সমুদ্রপারের আলোর হাতছানিতে! কে জানে সেই অচেনা অজানা আলোর মহিমায় আমরা সত্যিই কোনোদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবো, না সেই অগাধ সমুদ্রের অতলজলে আমাদের উল্লাস-যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটবে?

এই ভোগবাদের যুগে ত্যাগের কথা মুখে আনাও ধৃষ্টতা।

ত্যাগের আদর্শ হাস্যকর- মৃত আদর্শ!

নির্লজ্জ সংগ্রামে জাগতিক সমস্ত সুখসুবিধে আদায় করে নেবো এই হচ্ছে আমাদের এখনকার মেয়েদের পণ!

মা বলতেন—"মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে দাও, কিন্তু যে শিক্ষায় মেয়েরা লক্ষ্মীছাড়া বেহায়া হয়ে ওঠে, সে শিক্ষা তাদের দেওয়া উচিত নয়।"

কিন্তু একথা কি অস্বীকার করা যায়, আজকের দিনে মেয়েদের যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সে শিক্ষা লক্ষ্মীছাড়া বেহায়া হয়ে ওঠবারই শিক্ষা?

'প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের সমান হবো—সেই 'হতে পারাটাই' নারীজীবনের চরম সার্থকতা, এর চাইতে শোচনীয় হাস্যকর আদর্শ আর কি হতে পারে?

অথচ এমনই অন্ধ হয়ে ছুটছি আমরা যে এই হাস্যকর দিকটা তাকিয়ে দেখবার হুঁশমাত্র নেই।

স্বভাবগত সৌন্দর্য্য শোভনতা লজ্জালালিত্য সবকিছু বিসর্জ্জন দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে জোর-করে দখল করে নেবো - পুরুষের দখলিকৃত জমি, এই হলো শেষ সাধনা!

এর উর্দ্ধে আর কিছু নেই!

পুরুষকে অতিক্রম করে যাবার যে শক্তি, সে শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়েছি আমরা!

তবু মাঝে মাঝে আশা হয়, এ অশান্ত উত্তেজনা শেষ হয়ে যাবার দিন হয়তো আসছে!

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হতে হতে অদূর ভবিষ্যতে একদিন ক্লান্ত অতৃপ্ত নারী-সমাজ বুঝতে পারবে এই সাধনাই সাধনার শেষ কথা নয়!

যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে মামলা জেতার মতো, নারীচরিত্রের সমস্ত শালীনতা হারিয়ে পুরুষের অধিকৃত জমির ভাগ দখল করে অবশেষে সে দেখতে পাবে সেই জমির সীমানা কতোখানি! বুঝতে পারবে—আইনের প্যাঁচ কষে আদায় করে নেওয়া যে অধিকার, সে অধিকারের জোর কতোটুকু?

সেদিনের সেই আচারনিষ্ঠাহীন ত্যাগধর্ম্মহীন শ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত নারীসমাজ আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাবে—ফেলে আসা পিছনের দিকে।

আবার আশ্রয় নেবে—সারদামণির আদর্শের স্নিগ্ধছায়ায়!

"ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলেছিলেন 'এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। আমার যে কত লোক তার কুলকিনারা নেই।' বলতেন, 'আমি ছাঁচ করে গেলুম, তোরা সব ছাঁচে ঢেলে তুলে নে।' ছাঁচে ঢালা মানে ঠাকুরকে ধ্যানচিন্তা করা। তাঁকে ভাবলেই সব ভাব আসবে।" —শ্রীশ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শক্তিপূজা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনা ও সিদ্ধি স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে। বিভিন্ন পথ ও মতের মধ্য দিয়া তিনি ক্রমে ধর্মসাধনার সার্বভৌম সত্য উপলব্ধি করিলেন। এত বিচিত্রভাবে সাধনার কি প্রয়োজন ছিল? ঈশ্বরলাভ অথবা অধ্যাত্ম-জীবনের চরম অনুভূতিই যদি তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তাহা হইলে জগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শন-লাভের পর, সর্বসংশয় ছিন্ন হইবার পরও তিনি বারম্বার স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কঠোর তপশ্চর্যা করিলেন কেন? তাঁহার দিব্যজীবনের এই পরম অভিপ্রায়টি পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী সারদানন্দজী 'লীলাপ্রসঙ্গে' অপূর্ব ভঙ্গীতে মানববুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মধ্যে সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ দেখিয়াছিলেন, এবং সকল ধর্মই সত্য, ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন পথমাত্র, শ্রীগুরুর এই বাণী ধর্মকলহ নিরসণকল্পে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক জগৎ, বিশেষভাবে বহু ধর্মসম্প্রদায়-প্লাবিত ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ধর্মমত ও সাধনাকে বিকৃতির কলুষমুক্ত করিবার জন্যই যুগাবতাররূপে ঠাকুরের আবির্ভাব। ইহা আমাদের মত স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরও বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। ঠাকুরের তো কথাই নাই, তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের জীবন ও উপদেশের সহিত যাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারাও নবযুগধর্মের রূপান্তর অনুভব করিয়াছেন। কি সে রূপান্তর?

শ্রীরামকৃষ্ণের মত যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ সমগ্র জগৎ ও মানবজাতির কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ হন। সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে রাখিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিচার করিতে গেলে একদেশদর্শী হইবার আশঙ্কাও থাকিয়া যায়। সেদিকে সতর্ক থাকিয়াও আমি বলিব, লোকোত্তরচরিত্র মহাপুরুষগণ যে জাতির মধ্যে, যে কালে, যে সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের কল্যাণ-সম্বন্ধেও তাঁহাদের একটা বিশেষ অভিপ্রায় থাকে। অনন্তভাবময় ঠাকুরের মধ্যেও আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বের ঐতিহাসিক পটভূমিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। জরাজীর্ণ বৌদ্ধধর্ম, ভারতের প্রত্যন্তবাসী অনার্যদের দেবদেবী, ভূতপ্রেত, তাহাদের আচার নিয়ম উপাসনাপদ্ধতি আত্মসাৎ করিয়া সমগ্র গৌড়মণ্ডলে নানাশ্রেণীর উপাসকমণ্ডলী ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। যুক্তিহীন বেদ-বিরুদ্ধ এই সকল সম্প্রদায়কে যখন পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য দ্বারা মুগ্ধ করিয়া ব্রহ্মণ্য-শক্তি নূতনভাবে বিন্যাস করিতে গেল, সেদিনের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। বৌদ্ধ দেবদেবীদের প্রতিষ্ঠা ভ্রষ্ট করিয়া পৌরাণিক (বৈদিক নহে) দেবদেবীদের সিংহাসনে বসাইতে গিয়া অনেক আপসরফা করিতে হইয়াছে। সামাজিক স্থিতি এবং লোক-সাধারণকে নীতি-ধর্ম দিবার জন্য সেই পদ্ধতির প্রয়োগের কোন বিবরণ নাই। প্রাচীন স্মৃতি বিশেষভাবে লোকসঙ্গীত ও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণগণ, বৌদ্ধ শ্রমণদের সরাইয়া সমাজে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায়, আর্যসমাজের মূলভিত্তি চতুর্বর্ণ-বিভাগকেই

বর্জন করিলেন। বাঙ্গালী সমাজে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দুই বর্ণই লোপ পাইল। একদিকে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ, অন্যদিকে অগণিত শূদ্র। সামন্ততান্ত্রিক রাজশক্তির সহায়তায় শূদ্রের সামাজিক অধিকার যেমন সঙ্কুচিত করা হইল, তেমনি ধর্মসাধনায়, পূজা-উপাসনায় ভক্তিতে গদগদ হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়া ছাড়া (তাহাও দূর হইতে) আর কিছুই রহিল না।

সমাজের যখন এই অবস্থা এই সময় আসিল ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান রাজশক্তি। এই বিপ্লব বাঙ্গালীর ধর্মসাধনায় ও সমাজের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল, তাহার কিছুটা পরিচয় গীতিকবিতা ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাচারী নূতন রাজশক্তির আশ্রয়ে ফকীর ও দরবেশরা ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই সময়টা ধর্মের নামে জোর জবরদস্তির যুগ। ফলে স্ত্রী-দেবতাগণের জোর করিয়া পূজা আদায় করিবার দাবীর দৌরাত্ম্যে শৈব সাধনা এবং শান্তি ও ত্যাগের দেবতা, ভোগবিমুখ উদাসীন দেবতা শিব সরিয়া গেলেন,— তাঁহার বুকের উপর দাঁড়াইলেন রণচণ্ডী কালী। চণ্ডী ও মনসার প্রকৃতি অনেকটা মুসলমান রাজশক্তির মত। এঁরা ন্যায় অন্যায় মানেন না, এঁদের অনুগ্রহ-নিগ্রহ নীতির ধার ধারে না। দেবীদের ছলনা ও নিষ্ঠুরতার নিকট সমাজ মাথানত। ছোটকে বড়, দরিদ্রকে ধনী, ভিখারীকে রাজা করিতে যে আর কিছুই চাহে না, চাহে বলি, চাহে পূজা, সেই ভীষণার পদতলে মা মা বলিয়া লুটাইয়া না পড়িয়া উপায় কি? ইহলোকে সুখ ঐশ্বর্য প্রভুত্বের একমাত্র পথ শক্তিপূজা।

অন্যদিকে ঐহিক ও বৈষয়িকক্ষেত্রে অভ্যুদয়ের হতাশায় শূদ্রশক্তি ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল এবং ইহলোকবিমুখ বৈষ্ণব সাধনার কান্ত ও দাস্যভাব অবলম্বন করিল। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলায় বেগবান প্রচারশীল ইস্লামের পাশাপাশি শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাধনধারা পরস্পরের বিরোধী হইয়া বহিতে লাগিল। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, মঙ্গলকাব্যের যুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছে। বৈষ্ণবসাধনা এবং শক্তিসাধনা এই দুইএর বিকৃতির কথা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। বিকৃতি কেমন করিয়া ঘটিল, তাহার আভাস মাত্র দিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব, কেননা বিশদ বিশ্লেষণ আমার উদ্দেশ্য নহে। এবং এই আলোচনায় বৈষ্ণবের কান্তভাব অপেক্ষা শক্তিপূজার মাতৃভাবই আমার বক্তব্য বিষয়।

শক্তি-সাধনা ও শক্তি-পূজার একটা শাস্ত্রীয় দিক নিশ্চয়ই আছে। শিব ও শক্তির দার্শনিক তত্ত্ব যে বেদান্তের অদ্বৈত-সাধনার ভিত্তি এতো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে শক্তিপূজার স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রকৃত কৌলের শক্তিসাধনা এবং বিষয়ীর ও লোক-সাধারণের শক্তিপূজা এক বস্তু নহে। শেষোক্ত শক্তিপূজাই দুর্বল বিধর্মী বিজিত বাঙ্গলায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তি স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর, ইহাকে তুষ্ট করিবার পদ্ধতিও বীভৎস। ইনি উপযুক্ত বলি পাইলে জ্ঞাতিশত্রু বিনাশ করেন, প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্বংশ ও হীনবল করেন, রাজশক্তির মনকে অনুকূল করেন, এমন কি নরবলি পাইলে দস্যুদের পর্যন্ত সহায়তা করেন। সাধারণ লোকে দেখে এবং মনে করে অমুক নর-ঘাতক ভ্রষ্টাচারী চণ্ডী বা কালীপূজার ফলেই মুসলমান রাজশক্তিকে প্রসন্ন করিয়া রাতা-রাতি রাজা হইয়া বসিল। তখন সংসারে যাহারা পীড়িত বঞ্চিত, অথচ তাহাদের দুঃখদৈন্যের কোন ন্যায়ধর্মসঙ্গত কারণ নাই,

তাহারা ধরিয়া লইল, তাহাদের দুর্গতির কারণ দেবীর কোপ। স্তবপূজা বলিতে তাঁহাকে তুষ্ট করা ছাড়া আর কোন পথ নাই। সেই স্বামিজীর কথা—

"মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়
নাম দেয় দয়াময়ী,
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস,
বলে মা দানবজয়ী।
* * * ভক্তিপূজাচ্ছলে স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা।"

মুঘল পাঠান যুগে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির যে নীতিধর্মহীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, তাহার মধ্যেও শক্তিরই প্রকাশ মানুষ দেখিল; ফলে দেবচরিত্রগুলির মধ্যেও মানুষ একই শ্রেণীর বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। ছলনাময়ী প্রতিহিংসা-পরায়ণা শক্তির পদতলে শিব ও ধর্মকে বলি দিয়া লৌকিক উপাসনা-পদ্ধতি কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই সাধনধারাই রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা কারণে আবিল হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্দ্রিয়-ভোগমূলক কুৎসিত কদাচার ধর্ম-সাধনার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। ধর্মের গ্লানির এই পঙ্ক লইয়া পরস্পরের অঙ্গে নিক্ষেপ—পাঁচালী-গানে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব সর্বশ্রেণীর লোক উপভোগ করিত।

শাস্ত্রে শক্তি-সাধনার যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এবং অর্বাচীন যুগের তন্ত্র ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবদেবীদের যে ভ্রষ্টাচার এবং যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার রাশি রাশি আবর্জনার মধ্য হইতে সত্য-উদ্ধার সাধারণ মানুষের কাজ নহে। কুযুক্তি ও কুতর্কের নিরসন করিবার জন্য এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব। হিন্দুর পূজাপদ্ধতির দুর্গতি দেখিয়া রাজা রামমোহন মূর্তিপূজা বর্জন করিতে পরামর্শ দিলেন এবং বেদান্ত গ্রহণ করিয়া "আত্মা পরমাত্মার অভেদ চিন্তনরূপ মুখ্য উপাসনা" প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তিপূজাকে অবলম্বন করিয়াই স্তরে স্তরে চরম সত্যে পৌছিলেন। তাঁহার মূর্তি-পূজা প্রণালীবদ্ধ উপাসনা নহে; মাতাপুত্রের এক রহস্যময় লীলা-বিলাস। প্রথমে তন্ময় আত্মোপলব্ধির পথে, পরে ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরুরূপে বরণ করিয়া যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠানের পথে অগ্রসর হইয়া ঠাকুর দেখিলেন, ভক্তির দিক হইতে যিনি জগন্মাতা, জ্ঞানের দিক হইতে যিনি অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া, যোগের দিক হইতে তিনি বিশ্বের মূলীভূতা আদ্যাশক্তি। শক্তিপূজা শক্তি-সাধনা ঠাকুরের সাধনা ও সিদ্ধির মধ্য দিয়া পুনরায় কলুষমুক্ত হইল। কামনা বাসনা, ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের স্বার্থান্ধ বুদ্ধির গণ্ডীর বাহিরে সচ্চিদানন্দময়ী মা প্রসন্না ও বরদা হইয়া দেখা দিলেন। বাঙ্গালীর ধর্ম-সাধনায় ভক্তিমার্গে যত আবিলতা, যত বিকৃত ভাবাবেগের উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস প্রবলাকার ধারণ করিয়াছিল, ঠাকুরের বাহ্য ভক্তিভাব তাহাকে বাহির হইতে আঘাত না করিয়া, ভিতর হইতে নিরসন করিল। তত্ত্বজ্ঞ ইহার নিগূঢ় ব্যাখ্যা করিবেন। আমি অনধিকারী।

"আমার ভাব মাতৃভাব—সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব, এতে কোন বিপদ নাই, কোন ভোগের গন্ধ নাই। ভোগ রাখলেই ভয়। মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা। 'তুমি মা, আমি তোমার ছেলে' এই শেষ কথা।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

পুণ্যভূমি বাংলাদেশে এই দুই অবতার পুরুষের আবির্ভাব জগতে এক বিস্ময়কর ব্যাপার—মাত্র ৪৫০ বছর পরস্পরের ব্যবধান। একজন জন্মিয়াছিলেন বিদ্যাকেন্দ্র নদীয়া নগরে, —রূপে ও মাধুর্যে অনুপম; বিদ্বান, পণ্ডিত অধ্যাপক, অপরের জন্ম চারটী জেলার প্রায় প্রান্ত-সংলগ্ন হুগলী জেলার এক সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে কামারপুকুর গ্রামে, বিদ্যায় সামান্য লিখন-পঠন-ক্ষম এবং দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মা ভবতারিণীর মন্দিরে সামান্য বেতনভুক্ পূজারী। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কথাই অনেকের মনে উদয় হইত। সর্বপ্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রকাশ্যে পণ্ডিত সভায় নিতাইএর খোলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া রামকৃষ্ণকে প্রচার করিলেন, বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত বৈষ্ণবচরণও তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কালনার সুবিখ্যাত সিদ্ধবৈষ্ণব মহাজন ভগবান দাস বাবাজী রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—'ইনি শ্রীচৈতন্য-আসনে বসিবার যোগ্য।' ব্রাহ্মসমাজ-নেতারাও কেহ কেহ গৌরাঙ্গের সঙ্গে রামকৃষ্ণের তুলনা করিয়াছেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের পরিচালিত 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন "আমরা চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবন পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু ইঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।" স্বয়ং বিবেকানন্দ স্বামিজী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী সারদানন্দের নিকট ঠাকুরের কৃপায় যে দিব্যানুভূতি অনুভব করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে ভাবমগ্নভাবে গাহিলেন "প্রেমধন বিলায় গৌর রায়। গীত সমাপ্ত হইলে আপনমনে তিনি বলিতে লাগিলেন সত্য সত্যই বিলাইতেছেন। প্রেম বল ভক্তি বল, জ্ঞান বল মুক্তি বল গোরা রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা বিলাইতেছেন। কি অদ্ভুত শক্তি!" এই সব বলিতে বলিতে শেষে বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন।" গিরিশ বাবু বলিতেন, "চৈতন্যলীলা না লিখলে আমি ঠাকুরকে অবতার বলে বুঝতে পারতাম না।" কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কাহারও কাহারও মনে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা মনে হইত? রূপে গুণে কোন মিল নাই, অথচ কোথায় সেই সৌসাদৃশ্য!

গঙ্গাতীরে ঠাকুর 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া শেষে দুইটি পদার্থ এক মনে করিয়া জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে—বালক নিমাইকে শচীমাতা খই-সন্দেশ খাইতে দিয়া রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন, বালক নিমাই খইসন্দেশ ফেলিয়া দিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছেন। শচীমা হায় হায় করিতে লাগিলেন। পুত্র নিমাই মাকে বলিলেন—তুমি এরূপ করছ কেন? তুমি তো আমাকে মাটি খাইতে দিয়াছ। তাহাতে শচীমা বলিলেন, 'একি—তোমাকে তো খই-সন্দেশ খাইতে দিয়াছি।' তখন বালক নিমাই উত্তর করিলেন—

খই-সন্দেশ আদি যত মাটির বিকার।
এহ মাটি সেহ মাটি কি ভেদ ইহার॥

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ ইহার বীজসঞ্চারে বলিয়াছেন "সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ"। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ও বিচারে ইহার পরিপূর্ণ রূপ দেখিতে পাই।

স্পর্শে দর্শনে গৌরাঙ্গ যেমন ভাবসঞ্চার করিতেন ঠাকুরের দিব্য জীবনে ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়।

সংকীর্তন ও অপূর্ব নৃত্য, দিব্যভাবে বাহ্যসংজ্ঞা-হারা—দুই জনের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। পাণিহাটী উৎসবে, বলরাম-মন্দিরে, দক্ষিণেশ্বরে, অধর সেনের আলয়ে, রামচন্দ্রের গৃহে, বেলঘরিয়ায় ব্রাহ্মোৎসবে, মণি মল্লিক ও জয়গোপাল সেনের গৃহে যাঁহারা ঠাকুরের কীর্তন নৃত্য ও মুহুর্মুহু ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়াছেন—তাঁহারা অবাক বিস্ময়ে ভাবিয়াছেন, ইনি কি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ?

বৈষ্ণব দার্শনিক ও ভক্তেরা শ্রীগৌরাঙ্গকে খাঁটি দ্বৈতবাদি-রূপে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান এবং তাঁহাকে আচার্যশঙ্কর-বিরোধী মায়াবাদী অদ্বৈতবাদবিদ্বেষি-রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই সম্বন্ধে কোন রচনা বা গ্রন্থ নাই। সেই জন্য সার্বভৌমের সহিত বেদান্ত-বিচারের কথার চৈতন্য-ভাগবতে কোন উল্লেখ নাই। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যসঙ্গী নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাসের রচিত গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বিচারের কিছু মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে দেখা যায় জীবজগৎ সবিশেষ ঈশ্বরের রূপ, ঈশ্বরে অচিন্ত্যশক্তিযোগে পরিণাম :

বস্তুত পরিণামবাদ—সেই ত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্তের স্থান॥

এইটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সিদ্ধান্ত-বাক্য বলিয়া প্রকাশ। কাশীধামে প্রকাশানন্দকে এবং পুরীধামে সার্বভৌমকে তিনি ইহা বলিয়াছিলেন। অথচ তিনি নিজেকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া কখনও কখনও পরিচয় দিয়াছেন এবং—

সিংহারি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য-স্থানে।
মৎসতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে? ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ লীলাও সত্য। 'আমি' যখন তিনি পুছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে। কলাগাছের খোল ও মাঝ, বেলের শাঁস খোলা আর বীচিগুলো ফেলে দিলে বেলের ওজন পাওয়া যায় না।" তাই তিনি বলিতেন, "নিত্য বল্লেই লীলা আর লীলা বল্লেই নিত্য বোঝায়। তিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন—যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি।" মহাপ্রভু বোধ হয় এইরূপ মতপ্রচার করেছেন—ব্রহ্ম আর তাঁর অচিন্ত্যশক্তি। যুগধর্ম প্রেমভক্তি। ঠাকুরও বলিতেন, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে নিজের পরিচয় দিতেন—'আমি মুর্খ।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'আমি মুর্খোত্তম।' শ্রীগৌরাঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছেন :

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

অর্থাৎ 'হে জগদীশ, আমি ধন জন সুন্দরী স্ত্রী বা কবিত্ব-শক্তি চাই না। হে ভগবান, শুধু চাই তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমায় অহৈতুকী ভক্তি থাকে।' কামনাশূন্য ভক্তিই অহৈতুকী বা শুদ্ধা ভক্তি। ঠাকুরের প্রার্থনা "মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। দেহসুখ চাই না মা, লোকমান্য চাই না, অষ্টসিদ্ধি চাই না। কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্কাম, অমলা অহৈতুকী ভক্তি।"—একই সুর।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবদ্যুতিশবলিত। শ্রীরাধাই মহাভাবময়ী প্রেমের পরাকাষ্ঠা। প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ ঊর্ধ্ব স্তর গাঢ়তম অবস্থা চরম অনুভূতির নাম

মহাভাব। প্রেমে—ভাবে, অশ্রুকম্প-পুলকাদির অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ বা বিকার। মহাভাবে উনিশ প্রকার লক্ষণ। এই মহাভাব দুই ভাবে প্রকাশ পায়। মাদন ও মোদন। রূপগোস্বামী উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনী সারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥"

এই মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র জগতে প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরাধায়, আর নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গে। ব্রাহ্মণী ভৈরবী, সুপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ প্রভৃতি বৈষ্ণব ভাগবতগণ লক্ষণ মিলাইয়া দেখিতে পাইলেন সেই মাদনাখ্য মহাভাব—শ্রীরামকৃষ্ণে।

সাধারণ লোকে এই অপূর্বভাব শ্রীগৌরাঙ্গের ভিতর দেখিয়া বায়ুরোগ বলিয়া স্থির করিয়াই বিষ্ণুতৈল প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন—ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব দেখিয়া মথুর বাবু প্রভৃতি বায়ুরোগ সাব্যস্ত করিয়া কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসাধীনে রাখিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণী তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এই মহাভাবই ভক্তিশাস্ত্রে ভগবত্তার পরিচায়ক। "স ঈশঃ অনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ।" এই প্রেমবিগ্রহের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া ভক্তপার্ষদেরা জগতে ভগবানের অবতারত্ব প্রমাণ করেন। বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের কোন মিল নাই—তেমি স্থূল দৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গে ও শ্রীরামকৃষ্ণে কোনও সাদৃশ্য নাই। কিন্তু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের প্রেমঘন মূর্তিতে—তাঁহাদের প্রেম-স্বরূপে—সেখানে, রাম, কৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ এক।

নমি তোমা রামকৃষ্ণ

শ্রীউমাপদ নাথ, বি-এ, সাহিত্যভারতী

সভ্যতার পাণ্ডুলিপি যুগান্তের কীট-কলুষিত;
সনাতন আর্যকৃষ্টি পরধর্ম-অনুকৃতি-বশে
বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত। জীবনের বহু-আকাঙ্ক্ষিত
শুদ্ধ আত্ম-পরিচয় অসম্ভব হয় অবশেষে।
কালকূটে কণ্ঠভরা: কল্পলোকে মুক্তিপথ খোলা;
সমষ্টির রুদ্ধশ্বাসে ব্যক্তি-তপঃ হয় দিশাহারা,
সেবার অকুণ্ঠ হাত মজ্জমান জীবনের ভেলা
রক্ষিতে আসে না ছুটে; আর্ত-ডাকে দেয় নাকো সাড়া।

তখনি তো যুগে যুগে আবির্ভূত হও, নারায়ণ,
জাগাইতে সত্য-স্মৃতি। শতাব্দীর কালিমা-প্রলেপ
মুছে যায় কর-স্পর্শে, রুদ্ধ দ্বার হয় উদ্ঘাটন;
সাধ্যের সাক্ষাৎকারে সাধনার হয় সু-সংক্ষেপ।

তুমি সেই যুগন্ধর, মরুভূমে অমৃতের তরু,
নমি তোমা রামকৃষ্ণ, জগতের ক্ষেমভিক্ষু-গুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর মূলসূত্র

শ্রীরসরাজ চৌধুরী

এক জন নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক প্রভাব তাঁর মহাপ্রয়াণের পর আজ ৬৬ বছর যাবৎ ভারতের তথা সুদূর প্রতীচ্যের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অবধি ক্রমশই বিস্তার লাভ করছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের অনেক মনীষী ও ধর্মপিপাসু ব্যক্তি আজ তাঁর ভাব ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী আমূল বদ্‌লে দিয়ে অনাবিল শান্তি অনুভব করছেন। ধর্মের ইতিহাসে ৬৬ বছর একটা মুহূর্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে, এই স্বল্পকাল-মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার এই সহজ বিস্তৃতির কারণ কি?

বিচার-বুদ্ধির দিক দিয়ে বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ এবং সামাজিক সংস্কার দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় শূদ্রের অথবা গণ-প্রাধান্যের যুগ। ভারতে ও প্রতীচ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং তাদের দেখাদেখি অশিক্ষিতেরাও কোন মতবাদকে স্বীকার করার আগে যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞান-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখেন উহা সর্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক কি না এবং এই বিশ্লেষণের দ্বারা এই মতবাদের একটা সংশ্লেষণ (synthesis) অথবা মূলসূত্রও (formula) আবিষ্কার করেন।

আজ যাঁরা উপনিষদের মূর্তপ্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত, মনে হয়, তাঁরা তাঁর জীবনাদর্শ ও বাণীর মধ্যে এমনই একটি মূলসূত্র অনুভব করেন। তা হচ্ছে—ঈশ্বরের দিকে মন রাখ্‌তে হবে এবং সকল ধর্ম সত্য। প্রথমটি দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনে নিছক বিধি-নিষেধের গৌণত্ব ও মনের অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা এমনই মনের উদারতা-প্রসূত সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাভাব সূচিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ সরল ভাষায় বলেছেন :—

"তোমরা সংসার করছো, এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। (দেশবরেণ্য অশ্বিনীকুমার দত্তকে) তোমরা ত' সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থেকো। কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে।"

অর্থাৎ, ভগবানের দিকে একটু টান বা আকর্ষণ রাখতে হবে। এই গোড়ার কথাটি যে কেবল সংসারীর প্রতি প্রযোজ্য এবং তাকে ধর্মের দিকে একটু মনোযোগ দেওয়ার জন্য বলেছেন তা নয়। এই সামান্য কথাক'টির ভিতর মানুষের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে—জীবনকে ধর্মপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিবিধ ধর্মের আচারানুষ্ঠান ইত্যাদি পরের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশকে বিংশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক জীবনের বর্ণবোধ বলা যায়। বর্ণমালা আয়ত্ত হলে ক্রমে ক্রমে সাহিত্য-ইতিহাস-পাঠ সহজসাধ্য হয়, অথচ এই সাহিত্য বা ইতিহাসের ভিত্তি বর্ণমালা। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর এই মূলসূত্রকে অবলম্বন করে ক্রমশঃ বেদান্তের উচ্চ হতে উচ্চতর ভূমিতে পৌছান যায়। তিনি বলেছেন সংসারে থেকেও ভগবান-লাভ করা যায়। আবার স্বামিজীর একটি বাণী শুনি—সংসার ছেড়ে সর্বত্যাগী না হ'লে আত্মসাক্ষাৎকার অসম্ভব। এই দু'টি

পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়—ওদের মধ্যে ভগবানের দিকে আকর্ষণের মাত্রার (degree) প্রভেদ-মাত্র।

যাদের চৈতন্যোদয় হয়ে মনে শুভেচ্ছা জাগে তাঁদের প্রতি তাঁর উপদেশ এই রকম :

"কলকাতায় গেলাম…সবই পেটের জন্য দৌড়ুচ্ছে… তবে দু-একটি দেখলাম ঈশ্বরের দিকে মন আছে।… প্রধান কথা বিশ্বাস। বিশ্বাস হয়ে গেলে আর ভয় নাই…সংসার করবে, অথচ মাথায় কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে।…কচ্ছপ জলে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু তার মন আড়ায় পড়ে আছে।…দাসীর মত থাকে, সব কাজ-কর্ম করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে থাকে।…দেখেছ ত' দুর্গা-পূজায় জ্যোৎ (যাগ) প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়।"

উপরোক্ত উপদেশের অর্থ মনের মোড় ফিরানোর চেষ্টা। দিনে যতবার সম্ভব ভগবানকে স্মরণ করার চেষ্টা করা—তাঁর ভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিভোর হয়ে থাকা নহে। কচ্ছপ বা দাসী সব সময়ই আড়া বা দেশের কথা ভাবে না—তবে যখন ভাবে তখনি একটু আকুলতা প্রকাশ করে। যাগপ্রদীপে কেউ বড় একটা পাহারা দেয় না—মাঝে মাঝে এসে দেখে জ্বলছে কিনা।

তারপর যখন আকর্ষণ বেড়ে যায় তখন মনের প্রধান চিন্তাই (dominating thought) হয় ভগবান। তখনকার চিন্তা মাঝে মাঝে নয় - তখন সমস্ত কাজ কর্মের উপায় ও উদ্দেশ্য একমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবেই প্রণোদিত হয়। তাদের পেছনে থাকে একটি মাত্র আদর্শ ও চিন্তাধারা।

"ও দেশের ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকী দিয়ে চিঁড়ে কাড়ে…সে হুঁশ্ রাখে যাতে ঢেঁকীর মুষলটা হাতের উপর না পড়ে…ছেলেকে মাই দেয়, ভিজে ধান খোলায় ভেজে নেয়, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কচ্ছে…ঈশ্বরে মন রেখে তেমনি সংসারে নানা কাজ করতে পার। কিন্তু অভ্যাস চাই, আর হুঁশিয়ার হওয়া চাই, তবেই দুদিক রাখা হয়।"

"একবারও যেন তাঁকে ভোলা না হয়, যেমন তেলের ধারা…"

"সংসারে থেকে সকল কাজ করো, কিন্তু দৃষ্টি রেখো যেন তাঁর পথ হতে দূরে না যাও।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ মনকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

"পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে, মন নিয়ে কথা। মনেই বদ্ধমুক্ত।…মন ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।

"সংসারে হবে না কেন? ঈশ্বর বস্তু আর সব অনিত্য—এইটি পাকা বোধ চাই।"

মনই আসল। ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণই মূলকথা। মনকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি আরও বলেছেন :

"পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ কিছুই নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তাহলে আর এসব কর্মের বেশী দরকার নাই।

"আর দেখ, বেশী আচার করো না।…তাঁর নামে বিশ্বাস করো, তাহলে আর তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না।"

"আর তুমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিয়ে বেশী মাথামাখি করো না। ওদের চিন্তা দুপয়সা পাবার জন্য।"

"আমি জানি যে যদি কেউ পর্বতগুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষয়ে মন—কামিনী-কাঞ্চনে মন—সে লোককে আমি বলি ধিক্; আর যার কামিনীকাঞ্চনে মন নাই—খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য।

"যে হবিষ্যান্ন করে কিন্তু ঈশ্বরলাভ করতে চায় না, তার হবিষ্যান্ন গোমাংস তুল্য হয়; আর যে গোমাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু ভগবানকে লাভ করতে চেষ্টা করে, তার পক্ষে গোমাংস হবিষ্যান্ন তুল্য হয়।"

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশে সাধন-পন্থার আরম্ভে শাস্ত্রাচারের কঠোর অনুশাসন ও বিধি-নিষেধের প্রাধান্য নেই। টিকি বা দাড়ি রাখা অথবা রুদ্রাক্ষ ও তুলসীমালা ইত্যাদি বাহিরের চিহ্ন অবান্তর। এই কারণেই শিক্ষিত সমাজে তাঁর এ সব উপদেশের এত আদর। ভারতে ও

পাশ্চাত্যে যাজকের বিধিনিষেধ মেনে নিতে আজকাল কেউ একটা রাজী নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপরোক্ত উপদেশগুলির সারমর্ম এই যে, মানুষ তার জীবনের সাংসারিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন করে মনটি মোটামুটি ভগবানের দিকে একটু ঘুরিয়ে রাখুক। যদি তাঁর দিকে আরও এগুতে চায় তার সেই আকর্ষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যেন। তার পর তিনিই ব্যবস্থা করবেন "যার পেটে যা সয়"। এই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক নির্দেশ। রাজযোগ, যুক্তাহার, খৃষ্টধর্ম্মতে ভগবচ্চিন্তা (contemplation) ইত্যাদি তাদের জন্মেই যারা আধ্যাত্মিক পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। তাঁদের কর্তব্যাকর্তব্য এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

এখন, এই আচার-বন্ধন-মুক্ত মনে স্বতই একটা উদার সার্বজনীন ভাব আসে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন :

"হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গাই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাবরক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাক্‌লে, ভগবান লাভ হবে।

"সব ধর্মের লোকেরা এক জনকেই ডাকছে—কেউ বলছে রাম, কেউ হরি, কেউ আল্লা, কেউ ঈশ্বর কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু। 'ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান', এই বলে নাক সিঁটকে ঘৃণা করো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে। জেনে তাদের সঙ্গে মিশ্‌বে—যতদূর পার। আর ভালবাসবে।"

এই সর্বধর্মসমন্বয়ের মহাবাণী শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম জগতের কাছে প্রচার করেছেন এবং এই যুক্তিবাদের (rationalism) যুগে সকল দেশেরই শিক্ষিত সমাজ এই বাণীকে সাদরে গ্রহণ করবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। আধ্যাত্মিক জীবনে মনই আসল, আচার-অনুষ্ঠান গৌণ। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের গোড়ার কথা। বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এটি একটি মস্ত আশার কথা, কারণ পন্থা অতি সহজ, আচার-নিয়মের নাগপাশে আবদ্ধ নয়। আজ শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর সর্বজনপ্রিয়তার ইহাই মূল কারণ।

প্রেমের ঠাকুর

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

দিগন্তরী অস্তরাগে নামলো যে সাঁঝ দিনান্ত,
প্রেমের ঠাকুর ফিরলো ঘরে ঘর,
বঙ্গপ্রাণী শঙ্খ বাজা– দেখ্ সে কেমন প্রশান্ত
কে বলে তা'য় ভয়াল-ভয়ঙ্কর !
বনাঞ্চলে ঐ সে প্রথম নামে,
গ্রামের পথে ঢুক্‌লো এসে গ্রামে,
ঢুক্‌লো শহর-নগর ভরি' ভুবন-পরম সে পান্থ,
পরমপ্রেমিক দেখ্ সে নটবর,
দিগন্তরী অস্তরাগে নামলো যে সাঁঝ দিনান্ত,
প্রেমের ঠাকুর ফিরলো ঘরে ঘর।

কাজল বরণ সাঁজের আলোয় ঐ সে কেমন সুকান্ত,
ধন্য হরি, ধন্য মরি মরি,
ধন্য হরি ভবের হাটে—ধন্য সে মোর শ্রীকান্ত,
কৃপায় যাহার ভাসে জীবন-তরী।
তাহার যুগল চরণ-নূপুর হ'য়ে
বাজবি যদি থাক্‌রে স্মরণ লয়ে,
সুখের দিনে দেখ্‌বি নাকো দুঃখ-দিনের ক্ষীণাস্ত,
দুঃখ-ব্যথা হানবে না আর শর,
দিগন্তরী অস্তরাগে নামলো যে সাঁঝ দিনান্ত,
প্রেমের ঠাকুর ফিরলো ঘরে ঘর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

(১)

জয় জয় রামকৃষ্ণ, জয় বুদ্ধ-শঙ্কর-গোরার
ভাব-ঘন রূপ ;
জয় বৈরাগ্যাভিষিক্ত জ্ঞান-মূর্তি ভক্তি-সুষমার
প্রত্যক্ষ স্বরূপ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণরূপে আসিয়াছ ত্বাবা-পৃথিবীর
বিজয়-সম্রাট,
অসংখ্য হৃদয়মাঝে প্রতিষ্ঠিত ওগো প্রাচ্যবীর,
তব রাজ্যপাট।

(২)

মিলনের অগ্রদূত, তব কম্বু-কণ্ঠ-আবাহনে,
হে মহামহিম,
মিলেছে প্রাচীর সাথে অ-ছেদ্য অকুণ্ঠ আলিঙ্গনে
উদ্ধত পশ্চিম।
তুঙ্গ তুষারাদ্রি ভেদি, পথ বাঁধি দুর্গম কান্তারে
তোমার মহিমা,
বাঙ্গালার ক্ষুদ্র এক পল্লী হ'তে দেশ-দেশান্তরে
রচিয়াছে সীমা।

(৩)

ভব-মৃগতৃষ্ণিকার প্রশান্ত সম্বোধি-রত্নাকর,
তুমি সুনির্মল,
প্রপঞ্চের প্রাণান্তক অন্ধকারে জ্ঞান-দীপ্তিকর
ভানু সমুজ্জ্বল।
অসার-সংসার-সিন্ধু-আবর্তের সঙ্কট বিষমে
করিয়া বিরাজ,
নীর ছাড়ি ক্ষীর-সার কুড়ায়েছ অবলীলাক্রমে
তুমি হংসরাজ।

(৪)

জীবের মাঝেই শিব করিয়াছ প্রত্যক্ষ দর্শন
সেবাধর্ম-বলে,
তোমার অঙ্গনতলে হাসে নিত্য কাশী-বৃন্দাবন,
যমুনা উথলে।
স্বর্গ আসে ধরা দিতে চতুর্বর্গ করে বারে বারে
সাগ্রহ সন্ধান,
দেবতারা যুক্তকরে মানবত্ব-বিগ্রহ তোমারে
করে অর্ঘ্য দান।

(৫)

তোমার অক্ষরহীন অন্তরের নগেন্দ্র-কন্দরে
লভিয়া জনম,
প্রশান্ত প্রাঞ্জলীকৃত নবরূপে লহরে লহরে—
আগম, নিগম ;
তন্ত্র, বেদ, সংহিতার, বেদান্তের সুধাতরঙ্গিণী
অনন্ত ধারায়
নামিয়া এসেছে দুঃখ-পাপ-তাপ-জ্বালাকরালিনী
বিশ্ব-সাহারায়।

(৬)

"অভিন্ন—বিভিন্নধর্ম, মতবাদ, শ্রেণী, সম্প্রদায়,—
এক ভগবান্।
সহস্র তটিনীধারা এক মহাসিন্ধু-নীলিমায়—
লভে অবসান।"—
এ মহামন্ত্রের গুরু, কল্পতরু, প্রপন্ন-বান্ধব,
প্রেম-অবতার,
বিশ্বহিতে আবির্ভূত দেবস্তুত হে মহামানব,
করি নমস্কার।

অঞ্জলি

(এক)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবিবেকানন্দ পাল, এম্-এ

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি। তোমার কথা-মৃতের নৈবেদ্য সাজিয়ে তোমায় নিবেদন করি। কল্পতরু তুমি; তুমিই শিখিয়েছ তাঁর কাছ থেকে চাইতে হয়। ভক্তি করে প্রাণ দিয়ে চাইলে—চাইবার মত চাইলে, তবেই তো পাওয়া যায়।

"ভক্ত আমি এ অভিমান থাকা ভাল" তোমারই কথা। দীনবন্ধু দাদার দইয়ের ভাঁড়ের গল্প মনকে অভিভূত করে। ছোট ছেলে গোপাল। তার পাঠশালার গুরুমশাইয়ের পিতৃ-শ্রাদ্ধ। পড়ুয়াদের উপর ভার পড়লো কোনও না কোন জিনিষ দেবার। গোপালকে দিতে হবে দই। গোপাল বাড়ীতে এসে মাকে বললে। মা ছেলেকে আশ্বাস দেন, দীনবন্ধু দাদাকে জানাও, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন। কোথায় তাঁর দেখা মিলবে? সব জায়গায়; ডাকার মত ডাকতে পারলেই তিনি দেখা দেবেন। পাঠশালায় যাবার পথে গোপাল তার দীনবন্ধু দাদাকে ডাকে। তিনি বলেন, দই মিলবে। গোপাল তাতে খুসী নয়। তাঁকে দেখে তাঁর হাত থেকে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ছাড়লে। গুরুমশাই দইয়ের ছোট্ট ভাঁড়টি দেখে রেগে আগুন। পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপার, একি ছেলে-খেলা? শেষ পর্যন্ত সেই ভাঁড়টুকু থেকেই বেরুলো দইয়ের অক্ষয় ভাণ্ডার। ভক্তের মান রক্ষা হলো।

সহজ সরলভাবে যা দেওয়া যায় তাই তো ভক্তি। শ্রীদাম-সুদাম শ্রীকৃষ্ণকে এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, আবার ঘাড়ে চড়ছে—এই ভাল লাগার, ভালবাসার ভিতর দিয়েই তাদের ভক্তি উথলে উঠছে। পণ্ডিত গীতার ব্যাখ্যা করছে, ভক্ত শুনছে, একবর্ণও বুঝছে না। কিন্তু ভগবানের কথা হচ্ছে- শুধু এই কথাটুকু জেনে কেঁদে আকুল - সে যে চোখের সামনে সব দেখেছে; অর্জুন, রণ-ক্ষেত্র, রথের উপর শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানকে চোখের সামনে দেখে ভক্তিতে সে কেঁদে আকুল। পাণ্ডিত্যে যে দর্শন মিললো না, ভক্তিতে তা কত সহজে মিললো। ভক্তের মান রাখতে তার মনের মাঝে ধরা যে তাঁকে দিতেই হবে।

শুধু কি ধরা দেওয়া? প্রাণ দিয়ে ভালো-বাসা। মায়ের মতন ভালোবাসা। মা যশোদার ভাব নিয়ে বালগোপালদের স্নেহ করা। রাখালকে দেখলে তোমার যশোদার ভাব হ'তো। রাখালের বাবা এসে অনুনয় করছেন বাড়ী ফেরবার জন্য। রাখাল বলছে, বেশ আছি। মাতৃস্নেহ পেয়ে বেশ থাকবে বৈকি। শুধু কি রাখাল? কীর্তন শুনতে শুনতে তার মাঝে উঠে এসে তোমার ভক্ত নারানকে নিজের হাতে মিষ্টি দিয়ে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করে বলছো, "জল খাবি?" মা ছাড়া আর কে এমনি ধারা করে বল? ছেলেকে খাবার দেবার ভার আর কাকেও দিয়ে কি মা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? দই ও

তরমুজের পানা নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে বলছো—"তুই এইটুকু খা।" ছেলেদের নিজের হাতে খাইয়ে কতই তৃপ্তি।

শুধু কি খাওয়ানো, আদর যত্ন করা? তারা যে তোমার নয়নের মণি। একদণ্ড না দেখলে চঞ্চল হয়ে উঠতে। ছটফট করতে। ব্যাকুল হয়ে মাকে কেঁদে কেঁদে বলতে, "মা, ভক্তদের জন্য আমার প্রাণ যায়, তাদের শীঘ্র আমায় এনে দে।" তাদের জন্য রাত্রে ঘুম নেই। মার কাছে আবদার করেছ, "মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা, ওকে এখানে এনে দাও; যদি না সে আসতে পারে, তাহলে মা, আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।" তোমার সে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার কথা কত বলবো? বাবুরাম মাঝে মাঝে এসে না থাকলে তুমি বলতে, "আমার মন ভারী খারাপ হবে।" আবার হরিবল্লভকে বলছো, "তোমায় দেখলে আনন্দ হয়।" কেউ না গেলেই খোঁজ করছে, "কিশোরী আসে না কেন? হরিশ আসে না কেন?" ভক্ত-বৎসল, ভক্তদের কথা তুমি কেমন করে ভুলবে? মাষ্টারকে বলছো, 'নারানকে তুমি টাকাটি দেবে।' বৃন্দাবনে রাখালের জ্বর, তুমি চণ্ডীর কাছে মানসিক করলে। আবার কেশব সেনের অসুখ শুনে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব-সন্দেশ মানত করলে তুমি। মা ছাড়া এমন দরদ আর কার বল দেখি?

একদিকে তোমার এই মাতৃভাব, আর একদিকে তুমি ছোট ছেলেটির মতই তোমার মা ভবতারিণীর কাছে ছুটছো, এটা ওটা জানতে, কত কি আবদার জানাতে। 'মা' না হলে তোমার একদণ্ডও চলে না। ছোট্ট ছেলেটি যে! ছবি ও রোশনাই দেখে পাঁচ বছরের ছেলের মত আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠছো, ভাবাবেশে বালকের মত ব্যবহার করছো! ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার তোমায় বললেন, "তুমি child of nature" (স্বভাব-শিশু)। ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটি হয়ে তাদের সঙ্গে খেলাধুলা, মান-অভিমান করতেই হবে যে। নইলে তারা আপন জন ভেবে ভালবাসবে কেন? ছুটে আসবে কেন? স্নেহের বাঁধনে বাঁধা পড়বে কেন?

তোমার দেওয়ার কি শেষ আছে? কথায়, গল্পে, গানে, লোককে হাসিয়েছ, কাঁদিয়েছ, জগৎকে মাতিয়েছ। আবার তারই মাঝে কত জ্ঞানের কথা ব'লেছ—কত কি শিখিয়েছ। আলো দেখিয়েছ। বাদুলে পোকা যে আলোয় পুড়ে মরে সে আলোর পানে নয়। মণির আলোর পানে। "মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পোড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।" তুমি বলতে, আলো না জ্বালানো দারিদ্র্যের লক্ষণ। মনের আলো না জ্বালিয়ে আমি কি চিরদরিদ্র হয়ে থাকবো? মনের আলোর খবর না রেখে লণ্ঠন নিয়ে লোকের বাড়ী টিকে ধরাতে যাবো? অন্তরের মধ্যে তোমায় না দেখে কেবল বাইরেই ছুটোছুটি করবো?

তুমি ঠিকই বলেছ, "রাতদিন ফষ্টিনষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ।" ঈশ্বরের দিকে মন ফিরিয়ে দাও। "যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিশ্রির হিসাবও করতে পারে।" বাইরে নয়; "তাঁকে ঘরে আনতে হয় আলাপ করতে হয়।" "খোঁজ খবর নিতে হয়; আমি খুঁজতেই তিনি বেরিয়ে পড়েন।" তবে-"মন মুখ এক করতে হবে। মনে অভিমান নিয়ে বলতে হবে··· তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, দেখা দিতে হবে।" "ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে

পারে না, ভগবানও ভক্ত না হ'লে থাকতে পারেন না।" তোমার বৈকুণ্ঠের সিংহাসন ছেড়ে আমার হৃদয়-আসনে তোমায় আসতেই হবে। "ভক্তের হৃদয় যে ভগবানের বৈঠকখানা।" তুমি এসে তোমার বৈঠকখানায় জমকে বসো এই প্রার্থনা।

(দুই)

মানুষ রামকৃষ্ণ ও ভগবান রামকৃষ্ণ

শ্রীমায়া সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ না ভগবান—এ বড় কঠিন ও জটিল সমস্যা। বাহিরে সাধারণ মানুষের মত হলেও মানুষের মাপকাঠি দিয়ে তাঁকে বিচার করা যায় না। সংসারে থেকেও তিনি সংসারী ছিলেন না …আবার বৈরাগী হয়েও বিবাগী ছিলেন না।

কাঞ্চনকে তিনি বিষজ্ঞান করতেন—এমন কি ঘুমন্ত অবস্থাতেও কেউ তাঁর গায়ে টাকা ছোঁয়ালে সেখানটা বিকৃত হয়ে যেত। এমনই ছিল তাঁর বিতৃষ্ণা। বৈরাগ্যবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'কামিনীকাঞ্চন' ত্যাগে উৎসাহিত করলেও কামিনীকে "ঘৃণার পাত্রী," "নরকের দ্বার" ইত্যাদি বলে অভিহিত করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণলীলার আদিতে নারী, মধ্যে নারী এবং অন্তে নারী; আর এই নারীজাতি তাঁর কাছে মাতৃসমা। সকল নারীতে এমন কি পতিতা নারীতেও তিনি জগন্মাতাকে দর্শন করেছিলেন। তাই নারীপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে ভগবানের স্ত্রীমূর্তির প্রেমে ও পূজায় সারাজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। আপন পত্নীকেও তিনি মহাশক্তিজ্ঞানে পূজা করেছিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে "যত্র নারী তত্র গৌরী'র সার্থকরূপ এমনটি করে আর কেউ স্থাপন করতে পারেননি। আমরা এতদিন যাঁদের সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে—শুধু ঊর্ধ্বে কেন… দেবতারূপে জেনেছি যেমন গৌতম বুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীচৈতন্য তাঁদের জীবনেও এমন দৃষ্টান্ত দেখিনি।

মহামায়ার যথার্থ পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বয়ং মহাশক্তি পর্যন্ত হার মেনেছিলেন। তাই বিপুল ঐশ্বর্য বিভব যশ মান শ্রীরামকৃষ্ণ মহাকালীর কাছ থেকে পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন-যা আমাদের সাধারণ মানুষের একান্ত কাম্য ও প্রার্থনীয় বস্তু। তাই টাকা এবং মাটীতে তিনি কোন প্রভেদ দেখেন নি। উভয়ই ছিল তাঁর কাছে অসার, তাই তিনি নিঃশেষে নির্মুক্ত হয়ে দুটিকেই গঙ্গায় ফেলে দিতে পেরেছিলেন।

আমাদের দেশের সাধক এবং সন্ন্যাসীদের মত শ্রীরামকৃষ্ণ নির্জন বনে বা পর্বতগুহায় গিয়ে ভগবৎসাধনা করেন নি—সকলের মাঝে থেকেও নিরন্তর ভগবৎপ্রেমে ডুবে গিয়েছিলেন। কলকাতার অনতিদূরে দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠেছিল তাঁর সাধনার পীঠস্থান—লোকালয়ের বাহিরে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সত্যের পূজারী। যা সত্য, তাই মঙ্গল এবং তাই সুন্দর। "সত্যং শিবং সুন্দরম্।" তাই একদিন যদু মল্লিকের বাড়ীতে যাওয়ার কথা প্রসঙ্গান্তরে ভুলে গেলেও

পরে অধিক রাত্রিতে সে কথা মনে উদিত হওয়ায় তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তবে তিনি নিরস্ত হয়েছিলেন। দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি ছিল তাঁর বশে—তাই কাহারো সকাম দানের জিনিষ অজ্ঞাতেও গ্রহণ করতে পারতেন না।

যে যুগে তিনি আমাদের মাঝে এসেছিলেন সে যুগ ধর্মনৈতিক ধ্বংসবাদের যুগ। সে যুগের আদর্শ ছিল—Read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English. সেই পরম যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন খাঁটি দিশি বাংলার জয়ধ্বজা উড়িয়ে। বল্লেন, "চারিদিকে বড় গোলমাল; কিন্তু গোলমালেও মাল আছে। গোলটি ছেড়ে মালটি নেবে।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনে আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ব্রাহ্মনেতা শ্রীকেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করেছিলেন। সাধারণ হয়েও তিনি ছিলেন অসাধারণ—তাই আমাদের মত বইয়ের বিদ্যা তাঁর করায়ত্ত না থাকলেও ছোটবেলা হতেই অনেকই কঠিন, জটিল এবং তথ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান করতে পারতেন।

তাঁর জীবন ছিল জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিত-চিকীর্ষা, উদারতার জমাট মূর্তি। জীবন ছিল তাঁর শান্ত কোন গতিবেগ, কোন আড়ম্বর, কোন বাহুল্য সেখানে স্থান পায়নি। তবুও কত গভীর, কত দ্যোতনাপূর্ণ ছিল তাঁর জীবন। সকল বিচার, নিন্দা-প্রশংসার উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। তাঁর জীবন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মূলসুর যে আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগ, তারই অপরূপ এবং অভিনব মূর্চ্ছনায় উদ্ভাসিত। সাম্য, মৈত্রী এবং করুণা এই ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থল ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই প্রেম-করুণার মন্দাকিনী-ধারা তাঁর অন্তর হতে নিঃসৃত হয়ে চরম অধর্মের বারিপ্রবাহকে নষ্ট ক'রেছিল।

যে শতাব্দীতে তিনি এসেছিলেন কয়েক জন ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই তাঁকে চেনেননি। যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর যুগে ১২ জন ঋষি ছাড়া আর সকলেই দাশরথি বলে জেনেছিল। স্বামিজী নিজেই বলেছেন—'Nineteenth Centuryর শেষ ভাগে universityর ভূতব্রহ্মদত্যিরা তাঁর জীবদ্দশায় ঈশ্বর বলে পূজা ক'রেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ না ভগবান এর বিচার মনে। কতটুকুই বা আমরা তাকে জানি! তবে আজ বিশ্ব-সভায় দৃক্‌পাত করলে দেখি যে, সারা জগৎ তাকে মেনে নিয়েছে, স্বীকার ক'রে নিয়েছে যে তিনি সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে—তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান।

পাওয়া ও না-পাওয়া

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

তোমায় পেয়েছি আমি
তাহা ঠিক নয়,
তোমায় পাইনি কভু
সেও ঠিক নয়।

যেটুকু পেয়েছি তাহা
হীরক-কণিকা;
যেটুকু পাইনি প্রিয়
সে তো মরীচিকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য—মিশন ২৪ পরগনার ১০টি ইউনিয়নে ৪ঠা জুন (১৯৫২) হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সেবাকার্য করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

বিতরিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ : চাউল ৯৮০৫।৬।৴০ ; আটা ৯,৪৫৪ মণ। অন্যান্য খাদ্য : গুঁড়া দুধ—৪৪৫ পাউণ্ড ; বিস্কুট—৯০ পাউণ্ড ; Multipurpose Food—৪,৬৪৪ পাউণ্ড।

বস্ত্র : নূতন ধুতি—১৫৭৩ খানা ; নূতন শাড়ী ৩,৩১৭ থানা ; হাফ্ প্যান্ট—১৫০০ ; নূতন সার্ট—১২১৯টি ; নূতন ফ্রক—৭৮২ ; গামছা—২৩৭ খানা ; নূতন চাদর—২০১ ; নূতন মার্কিন্ কাপড়—১৭৫৫ গজ ; অন্যান্য গাত্রাবরণ—৬১ ; পুরাতন কাপড় ও জামা—৪০০। উপরোক্ত খাদ্য ও বস্ত্র ব্যতীত পীড়িতদিগের মধ্যে ঔষধও বিতরিত হইয়াছিল।

সাহায্য-প্রাপ্তদিগের সংখ্যা :

বয়স্ক নরনারী—২,৭৪,৯৮৭

বালক-বালিকা—৩,৫৮,২৭৯

রায়লসীমায় মিশন ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত ৫১,৪২৫ মণ গম এবং কিঞ্চিন্ন্যূন ৮,১০০ মণ চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এই অঞ্চলের সেবাকার্য বর্তমানে শুধু কাড্ডাপা জেলায় সীমাবদ্ধ আছে।

বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামিজীর স্মৃতি-উৎসব—এই উৎসব পাঁচ দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম দিবসে (২৩শে পৌষ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্বামিজীর একটি ১২½ ফুট দীর্ঘ পরিব্রাজক-মূর্তির আবরণ উন্মোচন ও উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই প্রদর্শনীতে স্বামিজীর জীবন কয়েকটি চিত্র-সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখার শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদিও দেখানো হইয়াছিল।

উৎসবের চতুর্থ দিবসে মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় উৎসবক্ষেত্র প্রদর্শন ও স্বামিজীর উদ্দেশে তাঁহার শ্রদ্ধা-নিবেদন করেন। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত, ডাঃ অশোক দত্ত, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কাজি আবদুল ওদুদ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তাগণ বিভিন্ন দিনে স্বামিজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্বশ্রী শ্রীমনতোষ রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়ের বিচিত্র অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন যুবক-সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজে বহুল ভাবে আদৃত হয়। কয়েক জন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত এবং শেষ দিবস আন্দুল সম্প্রদায়ের বিখ্যাত কালীকীর্তন সকলেরই উপভোগ্য হইয়াছিল।

পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ২৩শে পৌষ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী বিশেষ উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকালে বিশেষ পূজা, ভজন, ও স্বামিজীর প্রিয়গ্রন্থ কঠোপনিষদ্ হইতে পাঠ, এবং মঠাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ কর্তৃক স্বামিজীর জীবনী ও বাণী-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর দ্বিপ্রহরে সাত শত ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বিহার-রাজ্যের রাজ্যপাল শ্রীআর আর দিবাকর আশ্রম পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল হিন্দিতে স্বামিজী-সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

মাদ্রাজে বিবেকানন্দ-জয়ন্তী—বিগত ২৩শে এবং ২৭শে পৌষ (৭ই ও ১১ই জানুয়ারী) মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের একনবতিতম শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন পূজা, বেদপাঠ, ভজন, হোম প্রভৃতি এবং দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হয়।

দ্বিতীয় দিবস, রবিবারে ৮০ জন উচ্চশিক্ষিত যুবক প্রায় ২ ঘণ্টায় স্বামিজীর সমগ্র রচনাবলী পড়িয়া শেষ করেন। পাঠের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের উপস্থিতিতে সকলেই প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাইয়াছিলেন। পাঠান্তে দক্ষিণভারতের বিভিন্ন আশ্রম হইতে আগত পাঁচ জন প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামিজীর বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় স্বামী তুরীয়াত্মানন্দের 'হরিকথা' সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করে। অতঃপর ৫॥০ ঘটিকায় স্যার সি পি রামস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। উহাতে সঙ্ঘের পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজও কিছুক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসত্যনারায়ণ রাও, ভূতপূর্ব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ পি সুব্বারায়ন্, বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীচন্দ্রশেখরন্ এবং হলিউড বেদান্ত-কেন্দ্রের ব্রহ্মচারী জন্ ইয়েল যথাক্রমে তেলেগু, তামিল ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে স্বামিজীর জীবনী ও বাণী-সম্বন্ধে সুললিত ভাষণ দেন।

রাঁচিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ২৩শে পৌষ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-উপলক্ষ্যে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনের জন্য বিপুল জনসমাগম হয়। পূর্বাহ্ণে মঙ্গলারতি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সমাগত ভক্তবৃন্দ ও দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণের পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিশেষরূপে নির্মিত মণ্ডপে পুষ্পমাল্যশোভিত স্বামিজীর প্রতিকৃতির সম্মুখে স্বামী শান্তানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অপরাহ্ণে একটি সভা হয়। স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় হিন্দিভাষায় এবং অধ্যাপক শ্রীসরোজ-কুমার বসু বাংলায় স্বামিজীর পবিত্র জীবনকথা ও বাণী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরিশেষে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দ স্বামিজীর নরনারায়ণবাদ-সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

স্বামী হরিহরানন্দের দেহত্যাগ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী হরিহরানন্দজী (বিশ্বরঞ্জন মহারাজ) গত ১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) ৭১ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত-রোগে বেলুড়মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৯০৩ সালে মঠে যোগদান করেন এবং পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মঠ ও মিশনের ঢাকা ও মেদিনীপুর কেন্দ্রের পরিচালনা এবং আরও নানাক্ষেত্রে তিনি সঙ্ঘের অকুণ্ঠিত সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তপস্যা- ও সেবানিষ্ঠ, উন্নত-চরিত্র এই অমায়িক সর্বজনপ্রিয়

প্রবীণ সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা আত্যন্তিক শান্তি লাভ করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

জনশিক্ষা-প্রচার—বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের জনশিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক হুগলী এবং চব্বিশপরগনা জিলার কয়েকটি গ্রামে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মোট ১৯টি, জানুয়ারী মাসে ৪টি এবং ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত ৩টি ভ্রাম্যমাণ শিক্ষাপ্রচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ ম্যাজিক লণ্ঠন ও সবাক্-চিত্রযোগে গ্রামের উন্নতি, স্বাস্থ্যনীতি, সমাজসেবা এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-সম্বন্ধে জনগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অনুষ্ঠান-গুলিতে শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ৩০০ হইতে ১৫০০ পর্যন্ত হইয়াছিল।

বালিয়াটি (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—গত ২৩শে পৌষ পূর্বপাকিস্তানের গ্রাম-অঞ্চলের এই পুরাতন আশ্রমটিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি প্রভূত উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজা, ভজন এবং দরিদ্রনারায়ণ-সেবা উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিবৃন্দ ব্যতীত অনেক মুসলমান ভ্রাতাও আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—সম্প্রতি মালদহে মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের পদার্পণ শহরে এবং সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে ধর্মপিপাসু নরনারীগণের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর আশ্রমে মহারাজজী উপস্থিত সকলকে সহজ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় ধর্মের মূলতত্ত্ব—সত্য, সরলতা, পবিত্রতা, ভগবদ্‌বিশ্বাস, ভক্তি ও অনাসক্ত কর্ম-যোগ-সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেন।

গত ২৩শে পৌষ যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি-উপলক্ষে অপরাহ্নে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ পশ্চিম বঙ্গের বিধান পরিষদের সভাপতি ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় তিন সহস্র নরনারীর সম্মুখে স্বামিজী কর্তৃক ভারতের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণসঞ্চারের ইতিবৃত্ত তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন। ২৪শে পৌষ, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র-নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতা, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ এবং ক্রীড়া ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগীদিগের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ৯ই মাঘ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্র-কুমার মুখার্জি আশ্রম-সংলগ্ন বিবেকানন্দ বিদ্যা-মন্দিরের নবনির্মিত গৃহ ও ছাত্রদের নিজ হাতে তৈরী কুটিরশিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন এবং মিশন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ বাস্তুহারা পল্লীটি পরিদর্শন করেন।

উদ্বোধনের প্রচ্ছদপট

বর্তমান বর্ষের প্রথম (মাঘ) সংখ্যা হইতে উদ্বোধনের প্রচ্ছদপটে যে চিত্র দেওয়া হইতেছে উহা কামারপুকুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানের উপর নবনির্মিত মন্দিরের। পিছনে একদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পৈতৃক গৃহের একখানি ঘর এবং অপরদিকে তাঁহার স্বহস্তরোপিত আম্রবৃক্ষ দেখা যাইতেছে। মন্দিরটির পরিকল্পনা করেন শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে নলিনীরঞ্জন সরকার – কর্মবীর নলিনীরঞ্জন সরকারের মৃত্যুতে বাংলার রাজনৈতিক ও ব্যবসাক্ষেত্র হইতে একটি বলিষ্ঠ শক্তির অভাব হইল। যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অকুণ্ঠ অধ্যবসায়, মেধা ও অনবনমিত কর্মশক্তি-প্রভাবে তিনি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই বিশেষ অনুকরণীয়। আমরা বাঙ্গলার এই সুসন্তানের পরলোকগত আত্মার শান্তি-কামনা করি।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত পৌষ ও মাঘ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সোসাইটি-ভবনে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবী এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের বার্ষিকী স্মৃতিপূজা-উপলক্ষে বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সোসাইটির সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় পণ্ডিত শ্রীহরিদাস বিদ্যার্ণব 'গীতা', অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ও 'বিবেকানন্দের ভারতীয় বক্তৃতামালা' ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করেন। সোসাইটির উদ্যোগে ১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণ-প্রসঙ্গে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, সমগ্র বিশ্বের চিন্তারাজ্যে আজ ভাব ও আদর্শের এক দ্বন্দ্ব চলিতেছে এবং সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য বিশ্ববাসী সাগ্রহে ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু ভারত আজ নিজেই প্রস্তুত নহে, তাই বিশ্বের ভাবরাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং ভারতকে আজ জগতের পথপ্রদর্শকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে, ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভারতের নব-জাগরণের বিপ্লবী নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের প্রচার হওয়া দরকার।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত বলেন যে, ভারতকে জানিতে হইলে, আধুনিক ভারতের নব-জাগরণকে জানিতে হইলে বিবেকানন্দকে জানিতে হইবে। ভারতবাসী আজ এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, স্বামিজীর প্রদর্শিত পথে না চলিলে ভারত অচিরেই প্রাচীন মিশর, গ্রীস, প্রভৃতির ন্যায় বিস্মরণের পথে মিলাইয়া যাইবে।

অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু, অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তও সুচিন্তিত এবং মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন।

মথুরাপুর (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর) শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর শুভ আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষপূজা, ভোগরাগ, প্রসাদ-বিতরণ, কালীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। অপরাহ্নে একটি জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময় জীবনের মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

গত ২৩শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী) হইতে ২৭শে পৌষ পর্যন্ত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবও বিবিধ চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মধ্যে

উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে একটি জনসভায় স্বামিজীর দিব্য জীবন ও বাণী-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা হয়।

বারাসতে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা—গত ২৮শে অগ্রহায়ণ (১৩ই ডিসেম্বর) পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজ) বারাসতস্থ জন্মস্থানে ভক্তগণের উৎসাহে তাঁহার জন্ম-দিবস প্রতিপালিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তাঁহার জন্মস্থানের উপর নির্মিত শ্রীশ্রীঠাকুরঘরের প্রতিষ্ঠা হয়। বিশেষপূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এতদ্‌ভিন্ন শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-কীর্তন বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। সুসাহিত্যিক শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্ত শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন। বেলুড় মঠের কয়েক জন সন্ন্যাসীও উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি—গত ২৩শে পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে স্বামিজীর একনবতিতম জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অবৈতনিক পাঠশালা ও সারদাদেবী বিদ্যাপীঠের বালক-বালিকাবৃন্দ কর্তৃক স্তোত্রপাঠ, উষাকীর্তন, মঙ্গলারতি, পূজা-হোম ও মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীচারুচন্দ্র পাকড়াসী ভাগবত-শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে একটি সভায় বালকবালিকাগণের লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা-পাঠ এবং স্বামিজীর জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

আজমীড় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ২২শে অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীমায়ের শুভ-জন্মতিথি-উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। সায়ংকালে একটি জনসভায় স্থানীয় সনাতন ধর্মসভার প্রধান শ্রীহনুমানপ্রসাদজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমার অলৌকিক চরিত্রকে সর্বত্যাগী শঙ্কর ও উমা হৈমবতীর দিব্যাদর্শের সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, বিদ্যালয়গুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিলে ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক চরিত্রগঠনের প্রভূত সহায়তা হইবে। আজমীড় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, আইন-অমান্য আন্দোলন-হেতু কারাবাস-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গ্রন্থাবলী পাঠের দ্বারা তাঁহার নিজের জীবন অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছে। তাঁহার মতে শ্রীসারদাদেবীর পূত অনাড়ম্বর জীবন আমাদের নারীজাতির আদর্শস্থল; ধনি-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সকলেই তাঁহার সাধন-সম্পদ দ্বারা ধন্য হইয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব-উপলক্ষে গত ২৩শে পৌষ আশ্রম-ভবনে পূজা, পাঠ, ভোগরাগ, ভজন ও আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। ২৭শে পৌষ স্থানীয় বাঙালী ধর্মশালার প্রাঙ্গণে সর্বসাধারণের জন্য আহূত একটি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতে জাতীয়তার কর্ণধার গান্ধীজী যে দীন-হীনদের জন্য কর্ম করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রেরণাদাতা স্বামিজীই। কারণ, তিনিই 'দরিদ্রনারায়ণ' বাণীর উদ্গাতা বা স্রষ্টা।

৺গিরীন্দ্রনাথ রায়—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একনিষ্ঠ ভক্ত ও হিতৈষী বন্ধু নড়াইলের অন্যতম জমিদার শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রায় গত ২৮শে অগ্রহায়ণ হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মিশনের বরাহনগর শাখা-কেন্দ্রের সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড তাঁহাদেরই দান। দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি এই আশ্রমের সম্পাদক ছিলেন এবং সর্বপ্রকারে উহার সেবায় আত্মনিয়ো

করিতেন। এই সদাশয় ভক্ত ও কর্মীর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

শালিপুর (কটক) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম —এই প্রতিষ্ঠানে 'কল্পতরু'-উৎসব-উপলক্ষে পূজা, হোম, রামনাম-কীর্তন এবং ঠাকুরের লীলামৃত-পাঠ অহোরাত্র চলিয়াছিল।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতেও পূজাদি, দরিদ্রনারায়ণসেবা এবং শিশুদিগের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ করা হইয়াছিল। একটি জনসভায় আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীচন্দ্রশেখর মিশ্রশর্মা স্বামিজীর জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-বার্ষিকী স্থানীয় অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধুবৃন্দের উৎসাহে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজার্চনা, ভজন, কীর্তন এবং আলোচনা উৎসবের অঙ্গ ছিল। শেষোক্ত উৎসবে সুপরিচিত ধর্মব্যাখ্যাতা শ্রীরমণী-কুমার দত্তগুপ্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন। শ্রীমতী সুধীরা মজুমদার ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বামিজীর জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক্-সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন।

পরলোকে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য, উদ্বোধনের পুরাতন লেখক, শিক্ষাব্রতী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ২রা মাঘ ৬৫ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ইষ্টনাম উচ্চারণ করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল চেতলা হাইস্কুলে শিক্ষকতা-ব্যপদেশে নির্ভীক উন্নত চরিত্রের জন্য তিনি শিক্ষক ও ছাত্রগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে বরাবর নিজহাতে কাটা সুতার কাপড় পরিতেন। দেবেন্দ্র বাবুর লিখিত চণ্ডী ও গীতার আলোচনা-গ্রন্থদ্বয় সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছে। আমরা এই অনাড়ম্বর কর্মযোগীর আত্মার শান্তি কামনা করি।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মরণোৎসব—পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মস্থান সিকরাকুলীন গ্রামে তাঁহার শুভ জন্মতিথিতে (৪ঠা মাঘ) স্থানীয় শ্রীগোলোকবিহারী ঘোষের আগ্রহে এবং কলিকাতার কতিপয় ভক্তের উৎসাহে সারদিনব্যাপী পূজা, পাঠ, ভজনাদি সহ আনন্দোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া ছিল। বেলুড় মঠের কয়েক জন সন্ন্যাসীও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব–৮০।১এ, ল্যান্সডাউন রোডস্থিত শ্রীসারদা আশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভাবির্ভাব-স্মরণে ১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) হইতে ২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

প্রথম দিন আশ্রমবাসিনীগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি করেন। ভজন-কীর্তনাদিতে ঐদিন আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে। প্রায় ৮০০ শত মহিলাকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় দিবস, রবিবার বৈকাল ৪ ঘটিকায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন বিচারপতি শ্রীযুত কমলচন্দ্র চন্দ্র। বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর পুণ্য জীবনের বিভিন্ন দিক্-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তৃতীয় দিবস অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মহিলা-সভার অনুষ্ঠান হয়। সম্পাদিকা বাণী দেবী আশ্রমের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। উৎসব-উপলক্ষ্যে 'দেবেন্দ্রনাথ-স্মৃতি-ফণ্ড' হইতে ছাত্রীদের মধ্যে 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও আধুনিক নারী'-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন বক্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন।

উৎসবের চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির সম্মুখে আশ্রম-বালিকাগণ কর্তৃক 'শবরীর প্রতীক্ষা' অভিনয়, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং শ্রীশ্রীসারদালীলা-সঙ্কীর্তনের আয়োজন করা হইয়াছিল।

ষষ্ঠ দিনে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের এই উৎসব-উপলক্ষ্যে প্রেরিত আশীর্বাণী ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজীর শুভেচ্ছাপত্র পাঠ করিয়া সকলকে শুনান হয়। পরে আমেরিকান ভক্ত লুইস্-দম্পতীর ব্যবস্থাপনায় ও সৌজন্যে একটি চলচ্চিত্রে বলীদ্বীপের হিন্দু মন্দির ও প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ এবং দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠের চিত্রাবলী প্রদর্শিত হয়।

দরং (তেজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যজন্মতিথি-উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় একাডেমী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীপদ্মেশ্বর বর ঠাকুর। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীহেমন্তকুমার গাঙ্গুলী। ছাত্রগণের মধ্যে স্বামিজীর জীবন ও বাণী অনুশীলন করিবার খুব উৎসাহ লক্ষিত হয়। 'সমাজসংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছেন শ্রীমতী আরাধনা বসু।

আমেদাবাদে বিবেকানন্দ-জয়ন্তী—২৭শে পৌষ, স্থানীয় শ্রীবিবেকানন্দমণ্ডলী পাঠচক্র সকাল হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত ব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমযুক্ত এই জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃপাশঙ্কর পণ্ডিত ও শ্রীজয়ন্তীলাল ওঝা স্বামিজীর সেবা ও ত্যাগ-বিষয়ে প্রবচন করেন।

কামারপুকুরের উন্নতিকল্পে আবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামের যে সকল বস্তু ও স্থান তাঁহার বাল্য-জীবন ও বিবিধ লীলার সহিত জড়িত, তাহাদের সংরক্ষণের গুরু দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থানের উপর তাঁহার মর্মর বিগ্রহসহ চুনার পাথরের রমণীয় স্মৃতি-মন্দিরটি ও শ্রীশ্রীরঘুবীরের মন্দির দ্বারা এই স্থানের সৌন্দর্য্য ও প্রশান্ত গম্ভীর ভাব অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দূরাগত ভক্তগণের সুবিধার জন্য একটি অতিথিভবনও নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক করণীয় বিষয় রহিয়াছে। যথা—প্রাচীন হালদার পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, আশ্রম পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়টির জন্য একটি গৃহ, আশ্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শ বুনিয়াদি শিক্ষায়তনরূপে গঠন, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবা-পূজার সুব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত গ্রামখানির স্বাস্থ্যোন্নতি; আশ্রমটির আর্থিক স্থায়িত্ব-বিধানও প্রয়োজন। এই সকল কার্য্য প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি এই দিকে আমরা আকর্ষণ করিতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি

নিবেদক
স্বামী বগলানন্দ
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও
সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ কামারপুকুর, জেলা হুগলী।

বিচিত্র জীবন-প্রহসন

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা-
স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥
নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো মূঢ়ঃ কায়স্তদপি মরণাপায়চকিতঃ॥

(বৈরাগ্যশতকম্)

কত না আশা-উৎসাহ লইয়া সংসারের সুখ-ভোগ করিতে গিয়াছিলাম, জীবনের সন্ধ্যায় আজ হিসাব-নিকাশ করিতে বসিয়া দেখিতেছি, সংসারকে তো আমরা ভোগ করিতে পারি নাই—সংসারই আমাদিগকে মনের সাধে গিলিয়া উপভোগ করিয়াছে। কোথায় আমাদেরই করিবার কথা ছিল তপ—ঘটিল বিপরীত, আমরাই সারাজীবন সন্তপ্ত হইয়া মরিয়াছি। কালকে আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই—কালই আমাদিগকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া মৃত্যুর দরজা পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছে। দুরন্ত বিষয়-তৃষ্ণা তো একটুও জীর্ণ হইল না—আমাদিগকেই চরম জীর্ণ করিয়া ছাড়িল!

ইন্দ্রিয়ের ভোগ-ক্ষমতা শিথিল হইয়াছে, উত্তুঙ্গ পৌরুষের এত যে দম্ভ-খ্যাতি তাহাও স্তিমিত-প্রায়, সমবয়সী প্রাণসম সুহৃদবর্গ একে একে পৃথিবীর পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, জরাগ্রস্ত শরীরকে আজ অতি সন্তর্পণে লাঠিতে ভর দিয়া তুলিতে হয়, চোখের দৃষ্টিও লুপ্তপ্রায়। জীবন-রঙ্গ-নাট্যের শেষ দৃশ্য অভিনীত হইতেছে, যবনিকা পড়িতে সামান্যই বিলম্ব—কিন্তু তবুও হায় বাঁচিবার কী দুর্বার তৃষ্ণা! এই পৃথিবী যে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিতে গেলেও সারা দেহ যেন শিহরিয়া উঠে।

কথাপ্রসঙ্গে

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে

ঢাকুরিয়া লেকে একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। একখানি বেঞ্চে একটি ভদ্রলোক ও একটি মহিলা বসিয়া গল্প করিতেছেন। নিকটে বড় বেশী কেহ নাই। অপর পাড় হইতে একটি ১৪।১৫ বৎসরের স্কুলের ছেলে তাহার সমবয়সী সাথীকে উহাদের দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল—"দেখ্ দেখ্ হাবু, একজোড়া কপোত-কপোতী।" প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বৃদ্ধ দেশবরেণ্য মনীষী স্যার যদুনাথ সরকার। তাঁহার চোখে দেখা আর একটি ঘটনা:—নৈহাটিতে গিয়াছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে। দেখিলেন ছোট ছোট ছেলেদের (বয়স সকলেরই বারো বৎসরের কম) অসম্ভব ভিড়; হৈ-হল্লা করিতেছে—আগে যাইবার জন্য চিৎকার, ঠেলাঠেলি করিতেছে। খবর লইয়া জানা গেল, তাহারা শুনিয়াছে বঙ্কিম-স্মৃতিবার্ষিকীতে কলিকাতার কোন ত্যক্ত-ভর্তৃকা অভিনেত্রী আসিবেন এবং রাজ্যপালের সামনে নাচগানাদি হইবে! সংবাদটি ছিল অবশ্য একটি গুজব।

'বিবেকানন্দের পদাঙ্কে'-সংজ্ঞক একটি ইংরেজী প্রবন্ধে (Hindusthan Standard, ৭ই জানুয়ারী) স্যার যদুনাথ নারীজাতির প্রতি আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা-প্রসঙ্গে ঐ ঘটনা দুটির উল্লেখ করিয়াছেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী এবং দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণায় আত্মনিয়োগপর এই জ্ঞানতপস্বী জীবনের সন্ধ্যায় জনসাধারণের নৈতিক মানসম্বন্ধে যে বেদনা-মাখা কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা স্বতই হৃদয়কে স্পর্শ করে।

সর্বোপরি একটি জিনিসের জন্য বিবেকানন্দকে আজ আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য—নারীতে তাঁহার মাতৃপূজা। মানুষের প্রত্যেকটি সমাজে মাতাই যে উহার জীবন এবং উন্নতির নিদান ইহা কি আমরা ভুলিতে পারি? * * যে জাতিতে নারীকে কতকগুলি হৃদয়হীন বিবেচনা-শূন্য লোকের সাময়িক ভোগসুখের যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া মনে করা হয়, সে জাতির পরিণাম ধ্বংস কিংবা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়—নৈতিক অধঃপতন এবং ব্যাধির অতল গহ্বরে পতন। ইহা জীব-বিজ্ঞানের সত্য, শুধু ধর্মের মতবাদ-মাত্র নয়। কিন্তু আজ ভারতে তথা বাহিরের বিশ্বেও স্ত্রীজাতির প্রতি জনগণের কি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই? * * আমাদের সাহিত্য, চারুকলা, চলচ্চিত্র, বাহারী প্যারেড্, রূপ-প্রতিযোগিতা—সব কিছুই মানুষের একটি মাত্র জৈবিক প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করে—ইতরপ্রাণীর সহিত যে প্রবৃত্তির সে অংশীদার। কোন বয়সই বাদ যায় না। স্কুলের কিশোর—কলেজগামী তরুণ—অফিসের এবং কারখানার যুবক—প্রত্যেকেরই চোখের সামনে প্রকাশ্যে তুলিয়া ধরা হইতেছে স্ত্রীলোকের নির্লজ্জ প্রলোভনময় দৈহিক আকর্ষণ।

এই দূষিত দৃষ্টি যে আমাদের সমাজের নিম্নতম শ্রেণীতেই আবদ্ধ তাহা নয়। স্ত্রীলোকের প্রতি এই সাধারণ অমর্যাদা, মাতৃজাতির শুচিতার প্রতি এই অনাস্থা—তথাকথিত 'ভদ্রলোক'দিগের মধ্যেও সংক্রমিত হইতেছে। তাঁহাদের বেপরোয়া কথাবার্তা লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়। অশ্লীল পরিহাসকে অনেক সময় বুদ্ধির প্রাখর্য বা প্রাচীন কুসংস্কার-মুক্তি বলিয়া তারিফ করা হইয়া থাকে।

আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নৈতিক জীবনের বলিষ্ঠতার জন্য আচার্য যদুনাথ সরকার জাতির কল্যাণকামিগণকে অবহিত হইতে বলিয়াছেন। এই সর্বগ্রাসী নৈতিক সঙ্কটের বিরুদ্ধে প্রত্যেকে

নিজ নিজ সীমায়িত ক্ষেত্রে তাঁহার সকল প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে।

আর সুনীতি ও শুচিতার প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভিযানে বিবেকানন্দের জীবন হইবে ধ্রুব পথ-নির্দেশক দীপ্তিমান আলোক-স্তম্ভ। পাশবিকতাকে কখনও আমরা দেব-তীর্থের স্থান অধিকার করিতে দিব না। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ইহা যেন আমরা না ভুলি।

নারীজাতিকে যাহাতে আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা করিতে শিখি, সেজন্য স্বামিজী আমাদের যুবক-গণকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল অগ্নিময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেগুলি সত্যই গভীর ভাবে অনুধাবনীয়। 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' মনুসংহিতার এই বাক্য পরিবারে ও সমাজে বাস্তব ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে তিনি আমাদিগকে বার বার আহ্বান করিয়াছিলেন। বর্তমান জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নারী অবশ্যই পর্দানশীন হইয়া লুকাইয়া থাকিবেন না—শিক্ষায়, কর্মে, সামাজিক অগ্রগতিতে তাঁহারা পুরুষের পাশে পাশে আগাইয়া যাইবেন, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীকে মাতৃত্বের যে বিশুদ্ধ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে সেই সুমঙ্গল প্রশান্ত মহিমার স্থান হইতে তাঁহাকে নীচে নামাইয়া আনিবার দুর্বুদ্ধি যেন আমাদের কখনও না হয়। স্বামিজী বলিতেছেন,—

"আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে; কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে?"

"স্ত্রী-জাতির প্রতি ন্যায্য সম্মান দিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশ বা জাতি এই শ্রদ্ধাদানে বিমুখ তাহারা কখনও উন্নতি করিতে পারে নাই—ভবিষ্যতেও পারিবে না। আমাদের জাতির যে এত অধোগতি হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই যে শক্তির এই জীবন্ত প্রতিমূর্তিগণকে আমরা যথাযথ মর্যাদা দিই নাই। * * প্রকৃত শক্তি-উপাসক কে জানো কি? যিনি জানেন বিশ্বপ্রকৃতিতে ঈশ্বর সর্বব্যাপিনী শক্তিরূপে বিরাজিত—আর ইহা জানিয়া যিনি রমণীর ভিতর সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখিতে পান।"

"নারী হইতেছেন জগন্মাতার জীবন্তমূর্তি। ইঁহার বাহ্যিক প্রকাশ ইন্দ্রিয়সমূহের আকর্ষণরূপে পুরুষকে উন্মত্ত করে—কিন্তু ইঁহারই আন্তর বিভূতি—জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি মানুষকে করে সর্বজ্ঞ, সিদ্ধ-সঙ্কল্প এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানী।"

অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ এবং গণতন্ত্র

জানুয়ারী মাসের Calcutta Review পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'জাতিভেদ ও গণতন্ত্র' নামক নিবন্ধে স্বাধীন ভারতের পরি-প্রেক্ষিতে জাতিভেদের বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। লেখকের মতে:—"হিন্দুসমাজের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত জাতিভেদপ্রথা ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বরাবর ঐ সমাজের একটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতার নিদান হইয়া আসিয়াছে। শুধু চতুর্বর্ণ আর এখন নাই—অসংখ্য জাতি-উপজাতিতে সমাজ বহুধা বিভক্ত। ফলে হিন্দুসমাজের প্রধান ধারা দেখি ঐক্য নয়—বিচ্ছিন্নতা। মুসলমান-রাজত্বের বিভিন্ন সময়ে এক একটি ধর্ম-আন্দোলন জাতিভেদ অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা সমাজের উপরিভাগেই কিছু দাগ কাটিয়াছে মাত্র—বিভেদের মূলকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। ব্রিটিশ শাসনের পাশ্চাত্যভাব ও আদর্শের সংঘাতে জাতিভেদপ্রথা কিছুটা ধাক্কা খাইয়াছিল, কিন্তু পরে যাঁহারা উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে হইয়াছিল। * * স্বামী বিবেকা-নন্দ এবং পরে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অনেকে

তাঁহাদের এই ভাবধারাকে বিজাতীয় বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়ের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের সম্মুখে সেই নিন্দুকগণ বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

"স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য তাঁহার স্বল্পপরিমিত জীবনে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযানের কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই - কিন্তু মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘকাল ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়া অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের বাণী দিকে দিকে প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। জাতিভেদ-প্রথা না হইয়া অপর যে কোন রীতিনীতি হইলে মহাত্মা গান্ধীর ঐ দূর-প্রসারী প্রচারের প্রবল অভিঘাতে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুসমাজের দৈনন্দিন জীবনে যে প্রথা দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া গিয়াছে, সেই প্রথাকে বিনষ্ট করা কঠিন বটে!

"স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আশা করা গিয়াছিল, দেশবাসীর মনেরও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইবে এবং বহু শতাব্দী যে সকল সামাজিক আচার মানুষের মনকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছিল সেগুলির অবসান ঘটিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। আমাদের গণতান্ত্রিক শাসন জাতিভেদপ্রথার শক্তিকে যেন বাড়াইয়া দিয়াছে।···গত সাধারণ নির্বাচনের সময় দেশের কোন কোন অঞ্চলে ভোট দেওয়া হইয়াছে উচ্চ-নীচ জাতি বিচার করিয়া। দেশের লোকের চিন্তা ও কর্মধারা যদি এই ভাবেই চলিতে থাকে, তাহা হইলে গণতন্ত্রের মৃত্যু অনিবার্য এবং জাতীয় ঐক্যও একটি স্বপ্নই রহিয়া যাইবে।"

লেখকের উক্ত আলোচনা পড়িয়া মনে হয়, তিনি অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ-প্রথাকে এক পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ এবং গান্ধীজী যে উদ্যত দণ্ড তুলিয়াছিলেন উহা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধেই। বর্ণবিভাগের বর্তমান বিকৃত এবং বহুশাখান্বিত ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সমর্থন না করিলেও উহার উপর তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা সহিষ্ণু ছিল। অস্পৃশ্যতার সর্বপ্রকার অভিব্যক্তি নির্মমভাবে বিনাশ করিতে হইবে, কিন্তু হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণ-বিভাগকে চেষ্টা করিতে হইবে বৈদিকযুগের প্রথম প্রবর্তনার কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক ভাবটিকে ফিরাইয়া আনিতে—ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। জাতিভেদ-সম্পর্কে স্বামিজীর নিম্নোক্ত কথাগুলি অনুধাবনীয়ঃ—

"এমন কোন দেশ পৃথিবীতে দেখি না যেখানে জাতিভেদ নাই। ভারতে বরং জাতি হইতে শুরু করিয়া পরে আমরা এমন এক অবস্থায় থাকিব হই যেখানে জাতি নাই। আমাদের জাতিপ্রথাটি এই নীতির উপরই বরাবর দাড়াইয়া। ভারতীয় ধারণা হইতেছে—প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণত্বে উপনীত করা—কেননা আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ও ত্যাগসম্পন্ন ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের আদর্শ।"

"যুরোপীয় সভ্যতার উপায় হইতেছে তরবারি—আর্যগণের ক্ষেত্রে বর্ণবিভাগই হইতেছে সভ্যতার সোপান—অর্থাৎ বিদ্যা এবং সংস্কৃতি-অনুযায়ী ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে উচ্চস্তরে উঠাইয়া লওয়া। য়ুরোপে সর্বত্র নীতি হইতেছে সবলের জয় এবং দুর্বলের মৃত্যু। ভারতভূমিতে *কিন্তু প্রত্যেকটি সামাজিক নিয়ম দুর্বলের রক্ষার জন্য।* ইহাই আমাদের বর্ণধর্মের আদর্শ। উহার উদ্দেশ্য হইতেছে সমস্ত মানবসমাজকে ধীরে, মৃদুভাবে মহান দেব-মানুষে উন্নীত করা—যে মানুষ সম্পূর্ণ অহিংস, সংযত, প্রশান্ত, পূজার্চনাশীল, পবিত্র ও ধ্যাননিষ্ঠ।"

"জাতিপ্রথা চলিয়া যাওয়া উচিত নয়—শুধু উহার একটু *অদল-বদল দরকার।*···মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হইবেই—কিন্তু ইহার অর্থ ইহা নয় যে, ভোগাধিকারের তারতম্য থাকিবে।

"উহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। জেলেকে যদি বেদান্ত শিখাও তো সে বলিবে,—'তুমি দার্শনিক আর আমি জেলে—কিন্তু তুমিও যে মানুষ আমিও তাহাই। তোমার ভিতর যে পরমাত্মা আমার মধ্যেও তিনি।' আমরা চাই

ইহাই। কাহারও জন্য বিশেষ অধিকার নয়—সকলের জন্য সমান সুযোগ।

"যাহারা ইতিপূর্বেই উঁচুতে আছে তাহাদিগকে নীচে টানিয়া আনিয়া, পানাহারের স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইয়া কিংবা অধিকতর ভোগের জন্য নিজেদের সীমার বাহিরে লাফাইয়া গিয়া জাতি-সমস্যার সমাধান হইবার নয়। সমাধান হইবে যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের বৈদান্তিক ধর্মের অনুশাসনগুলি পরিপূর্ণ করিয়া আধ্যাত্মিকতা এবং আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারি। * * * ব্রাহ্মণই হও কিংবা নিম্নতম চণ্ডালই হও এই দেশের প্রত্যেকের উপরই পূর্বপুরুষগণ একটি বিধান ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—অবিরত তোমাদিগকে উন্নতিলাভ করিতে হইবে—প্রত্যেককে আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার জন্য প্রযত্ন করিতে হইবে।

"নানা জাতির মধ্যে কলহ করিয়া কোন লাভ নাই। ইহাতে বরং আমাদিগকে আরও বেশী বিচ্ছিন্ন, দুর্বল এবং অধঃপাতিত করিবে। * * ব্রাহ্মণদিগের কাছে আমার এই সনির্বন্ধ মিনতি তাঁহারা যেন ভারতের সনাতন আদর্শ ভুলিয়া না যান। প্রথমতঃ নিজ চরিত্রে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ এবং দ্বিতীয়তঃ অপরকে সেই পর্য্যায়ে উন্নয়ন—এই দুইটি দ্বারা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণত্বের দাবী প্রমাণ করিতে হইবে। * * মুর্খজনোচিত যানা বা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের কুসংস্কার ও ভণ্ডামীমাখা অহঙ্কারের ভাবে নয়—যথার্থ সেবার ভাবে চতুষ্পার্শ্বস্থ অব্রাহ্মণদিগকে তুলিয়া লইয়া আপনাদের পৌরুষ ও ব্রাহ্মণত্ব প্রদর্শন করুন। * * * ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলি, সবুর কর, সুযোগ পাইলেই ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইও না। * * তোমরা নিজেদের দোষেই কষ্ট পাইতেছ। কে তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতশিক্ষা অবহেলা করিতে বলিয়াছিল? * * খবরের কাগজে বৃথা লেখালেখি এবং কলহে সময় নষ্ট না করিয়া, সময়, শক্তিটা ব্রাহ্মণদের শিক্ষাদীক্ষা আয়ত্ত করিতে লাগাও তো—দেখিবে কায সিদ্ধ হইবে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায় স্বামিজী বর্ণ-বিভাগের মূল উদ্দেশ্যটির দিকে আমাদিগকে বিশেষ করিয়া অবহিত হইতে বলিতেছেন। ঐ উদ্দেশ্যটি ভুলিবার জন্যই জাতিপ্রথার নিন্দিত অপপ্রয়োগগুলি হিন্দুসমাজের অবর্ণনীয় ক্ষতি-সাধন করিয়াছে। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, স্বামিজী চতুর্বর্ণের মধ্যে শাখা-উপশাখা যত কম হয় তাহারই পক্ষপাতী ছিলেন।

স্বামিজী ও ভারতের গণশক্তি

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের গত পাঁচ বৎসরের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসুবোধ ঘোষ 'জনসেবক' পত্রিকায় (২৬শে জানুয়ারী) একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"প্রজাতন্ত্র-ভারতে সাধারণ মানুষ তার মানবিক অধিকার লাভ করেছে। ·· ··· মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন বুঝি সফল হতে চলেছে। 'এক মুঠো ছাতু খেতে পেলে ত্রিলোকে এদের শক্তি ধরবে না'—ভারতের গণশক্তির এই বিরাট আত্মপ্রকাশের রূপ কল্পনা করতে পেরেছিলেন কর্মযোগী সন্ন্যাসী।"

সত্য, কিন্তু একটি কথা আমাদের ভুলিলে চলিবেনা যে সাধারণ মানুষকে মানবিক অধিকার দেওয়া মানে তাহাকে শুধু নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার দেওয়া নয়। জীবনযাত্রার মান তেমনই নিম্নতম ধাপে পড়িয়া রহিল, ক্ষীণ শিক্ষার আলোক তেমনই মিট্ মিট্ করিতে লাগিল—অথচ ঘরে বাহিরে আমরা প্রচার করিয়া বেড়াইলাম আমরা সকলকে সমান অধিকার দিয়াছি (যে কোন বড় লোক বা মানী লোকের সহিত তাহাদের সমান ভোট দিবার যোগ্যতা আছে!)—ইহা একটি নিদারুণ পরিহাস—অন্ততঃ স্বামী বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিলে তাহাই বলিতেন। তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সুবোধ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"বর্তমান ভারতের নিরক্ষর ও দরিদ্র সাধারণ মানুষই হলো জাতীয় যোগ্যতার প্রধান বাহক ও রক্ষক এবং শক্তির আধার। শুধু সুযোগের এবং অধিকারের অভাবে সে শক্তি কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে।" প্রায়

ষাট বৎসর পূর্বে স্বামিজী যখন এই 'নিরক্ষর ও দরিদ্র সাধারণ মানুষের' উন্নয়নের কথা বলিয়াছিলেন তখন ভারত ছিল পরাধীন। বিদেশী শাসকবর্গের নিকট হইতে সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার আশা না রাখিয়া তিনি এই গুরু কর্তব্যের ভার লইতে ডাকিয়াছিলেন দেশের যুবকগণকে, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে। যাহাদের পরিশ্রমে ও অর্থে ধনী ও শিক্ষিতের তথা কথিত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদিগের মোটা ভাতকাপড়, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার জন্য কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করা 'বড়' এবং 'ভদ্র' লোকদিগের শুধু নৈতিক কর্তব্য নয়—অপরিহার্য ধর্ম; উহা না করাটাই ঘোরতর অন্যায়।

আজ স্বাধীন ভারতে গণশক্তির কথা অনেকে বলিতেছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বহুক্ষেত্রে এক অদ্ভুত বিকৃতরূপ পরিগ্রহ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা যেন বলিতে চান, গণ-উন্নয়নের বোঝা শুধু সরকারের—আমাদের নিজেদের কিছু করিবার নাই—আমরা শুধু সরকারের ভুলত্রুটি বাতলাইয়া চলিব! আজ কর্মীর অপেক্ষা কর্ম-তদারকের সংখ্যাই যেন অধিক। যে শিক্ষিত যুবকগণকে স্বামিজী কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কৃষক-শ্রমিকদের দরজায় দরজায় গিয়া শিক্ষার আলোক বহন করিতে বলিয়াছিলেন, অনেক সময়ে সংশয় জাগে—সেই যুবকদের কৃষক-শ্রমিকে সহানুভূতি পর্যবসিত হইতেছে শুধু রাজনৈতিক বাগ্‌বিতণ্ডায়। মনে হয়, আজ রাজনীতির প্রবণতা কিছু কমাইয়া গণ-দরদী উৎসাহী দৃঢ়চরিত্র যুবকগণের নূতন 'স্লোগান্' হওয়া উচিত—'সেবা'।

পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় ভারতের কৃষক-শ্রমিক শ্রেণী পুঁথিগত লেখাপড়া না জানিলেও যে অনেক বেশী সুসভ্য ইহাতে স্বামিজীর সন্দেহ ছিল না। তাহাদের ধৈর্য, প্রীতি, কার্যদক্ষতা, স্বার্থশূন্যতা, ভগবদ্বিশ্বাসের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শুধু প্রয়োজন আমাদের দীর্ঘকালের পুঞ্জিত অবহেলার আচ্ছাদন তুলিয়া লইয়া বাস্তব সহানুভূতির সহিত তাহাদের একটু চোখ খুলিয়া দেওয়া। ভারতের গণশক্তির জাগরণ এবং অভ্যুদয়ের জন্য এটুকু কি আমরা পারিব না?

নির্বেদ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

দিয়াছিলে অনুরাগে সরস হৃদয়,
তোমার কি দোষ প্রভু? তুমি দয়াময়।
মান-যশ করিবারে ভোগ,
আমি মূঢ় করিয়াছি তাহার নিয়োগ।
ঊর্ধ্বপানে চাই নাই কভু,
তুমি বাসিতেছ বসি দেখি নাই প্রভু।
করিয়াছি জীবনের ব্রত
যারে আমি, এতদিনে বুঝিয়াছি তার মূল্য কত।

জীবন-সায়াহ্নে হায়, বুঝিলাম আজ
প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা, ভ্রান্তি স্মরি পাই বড় লাজ।
তোমার নিদেশ প্রভু করিয়াছি হেলা
তোমারে ভুলায়ে দিল লেখালেখা খেলা।
তোমারে দিতাম যদি অনুরাগে সরস হৃদয়
হারাতে হ'ত না তবে আজিকে আশ্রয়।

স্বামিজীর সান্নিধ্যে

৺শচীন্দ্রনাথ বসু

(স্বর্গত লেখকের কতকগুলি পুরাতন পত্র হইতে সঙ্কলিত। এই সঙ্কলনের কিয়দংশ মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।—উঃ সঃ)

গত সোমবার (৬ই নভেম্বর, ১৮৯৮) বাগবাজার যাইয়া দেখি রাখাল মহারাজ বসিয়া তামাক খাইতেছেন—বেলা তখন ১॥ টা। বলিলেন,—"স্বামিজী এই মাত্র ৫।৭ মিনিট হল বিদেশিনী স্ত্রী-ভক্তদেব সঙ্গে মঠে গেলেন।"··· ঠাকুরের কৃপায় তখনই একখানি নৌকা আসিয়া পড়িল, চড়িয়া বসিলাম। ১ ঘণ্টার মধ্যেই মঠে পৌছিলাম, স্বামিজীর নৌকা ২০ মিনিট আগে গিয়াছে; তাঁহারা পৌছিয়াই নূতন মঠের জমি দেখিতে গিয়াছেন। বেলা চারটার সময় স্বামিজী মিসেস্ বুল, মিস্ ম্যাকলাউড্ প্রভৃতির সহিত আসিলেন। মেয়েরা নূতন মঠ দেখিয়া খুব খুসী হইয়াছেন। বুল্ আর ম্যাক্‌লাউড্ ২রা ডিসেম্বর আমেরিকা যাত্রা করিবেন। স্বামিজী ৪।৫ মাস পরে যাইবেন লণ্ডন হইয়া। স্বামিজীর সহিত এক নৌকায় ঘোরা গেল। তিনিই আমাকে ডাকিয়া লইলেন। নৌকায় কেবল আমরা পাঁচ জন। স্বামিজীর সহিত মেয়েরা নানাবিধ প্রসঙ্গ করিতে করিতে চলিলেন। সন্ধ্যার সময় ঘাটে পৌছান গেল। চিৎপুরের ট্রামে তিন জন উঠিলেন—এস্‌প্ল্যানেডে কোন বোর্ডিং হাউসে আছেন। স্বামিজী ও আমি বাগবাজারে আসিলাম। তাঁহার শরীর ডাক্তার আর এল্ দত্তের গুণে অনেক ভাল; low dietএ থাকিয়া অনেক উপকার পাইয়াছেন। হলঘরে (বলরাম বাবুর বাড়ীর) বসিলেন, আমরাও বসিলাম—কেবল আমি ও রাখাল মহারাজ। কিছু পরে শরৎ চক্রবর্তী আসিল। নানাবিধ কথা হইতেছে, এমন সময় সারদা মহারাজ টলিতে টলিতে আসিয়া হাজির—জ্বর হইয়াছে।

স্বামিজী যখন আলমোড়াতে তখন হইতে ত্রিগুণাতীত মহারাজ তাঁহাকে বার বার চিঠি লেখেন—ভাই, আমি work করিব—তুমি আমাকে ২০০০৲ টাকা দাও, আমি প্রেস করিব, কাজ চালাইব। স্বামিজী তাঁহাকে ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন, বাকী ১০০০৲ টাকা ধার করিয়াছেন। মাসে ১০৲ টাকা সুদ লাগে। ১৫০০৲ টাকায় দুটি বেশ ভাল প্রেস কিনিয়াছেন, কিন্তু কিনিলে কি হইবে? কোন কাজ নাই; ঠায় বসিয়া আছেন; বড় বাজারের এক গুদামে ৮৲ টাকা ভাড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। সুধীরের রাজযোগ[১] বইখানি ছাপাইবার সঙ্কল্প হইয়াছে; কিন্তু পয়সা নাই, কাগজ আসিবে কোথা হইতে?···আমি একবার ত্রিগুণাতীত মহারাজকে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, ও কাজ (প্রেসের কাজ) বড় nefarious; (হীন) আপনার কর্ম নয়। অপর লোকের করা উচিত।" তখন ভারী spirit; বলিলেন, "না, any work is sacred. আমি কাজ পেলে খুশী; কাজ করতে আমি নারাজ নই।" আমি চুপ করিয়া গেলাম। এখন রোজ ৬টার সময় প্রেসে যান; সেই খানেই খাওয়া-দাওয়া হয়; আর আসেন রাত ৭টার পর। রোজ সন্ধ্যার পর জ্বর হয়।

স্বামিজী ও রাখাল মহারাজ একসঙ্গে ত্রিগুণাতীতজীকে অভ্যর্থনা করিলেন,—"কি বাবাজী, এস, আজকের খবর কি? প্রেসের কতদূর? বল, বল! বস, বস!"

ত্রিগুণাতীত—(নাকি সুরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে)—"আঁর ভাই, আঁর পারি নি—ও সব কাঁজ কি আঁমাদের পোষায় ভাই?···

১ স্বামিজীর ইংরেজী রাজযোগের অনুবাদ।

সারাদিন 'তীর্থি'র কাকের মতন বসে থাকতে হয়; না আছে একটা কাজ, না আছে কিছু। একটা job work পাওয়া গেছে, তাতে কি হবে? ৷৷০ আনা বড জোর পাওয়া যাবে। আমি প্রেস বিক্রী করে ফেলার চেষ্টা করছি।"

স্বামিজী—"বলিস কি রে? এরই মধ্যে তোর সব সখ মিটে গেল? আর দিন কতক দেখ্। তবে ছাড়বি। এই দিকে প্রেসটা নিয়ে আয় না—কুমারটুলীর কাছে; আমরা সকলে দেখতে পেতুম।"

ত্রিগুণাতীত—"না ভাই, সেইখানেই থাক্; দিনেক দুদিন দেখা যাক্। ১৫।২০৲ টাকা লোকসান করে বেচে দেব।"

স্বামিজী—"ও রাখাল, বলে কি? ওর যে খুব trial হ'ল দেখছি। তোর এরই মধ্যে সব গুঁড়িয়ে গেল! patience (ধৈর্য) রইল না!"

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর চক্ষু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন ও গর্জিয়া বলিলেন, —"বলিস কি রে? দে, প্রেস্ বিক্রী করে দে। আমার টাকার ঢের দরকার আছে। এই বেলা বিক্রী কর—১০০।১৫০৲ টাকা লোকসান ক'রেও বেচে ফেল্।...কাজের নামটি হলেই এদের সব বৈরাগ্যি উপস্থিত হয়—'আঁর ভাঁই পাঁরি নিঁ —ওঁ সঁব কাঁজ কি আঁমাদের?' কেবল খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি উপুড় করে শুয়ে থাকতে পারে। যাদের কোন কাজে patience নেই, তারা কি মানুষ?...তুই তিন দিন এখনও প্রেস করিস নি। যাঃ যাঃ তোকে ঢের experiment (পরীক্ষা) হয়েছে—তোর বড় আস্থা হয়েছিল। কে তোকে প্রেস করতে সেধেছিলো? তুইই তো আমাকে লিখে লিখে টাকা আনালি। নিয়ে আয় না তুই তোর প্রেস এখানে, সেখানে রাখবার তোর মানে কি? আর এই তোর জ্বর জ্বর হচ্ছে, তুই শরীরটা দেখছিস্ না!"

ত্রিগুণাতীত—"৮৲ টাকা ভাড়া দিতে হবে—এক মাসের এগ্রিমেণ্ট হয়েছে।"

স্বামিজী—"দূর দূর, ছিঃ ছিঃ! এ বলে কি! এ সব লোক কি কোন কাজ করতে পারে? ৮৲ টাকার জন্যে পড়ে আছিস্? তোদের এ ছোটলোকপনা কিছুতেই যাবে না! তুই আর হরমোহনটা সমান। তোদের কখন কোন business (ব্যবসায়) হবে না—সেও এক পয়সার আলু কিনতে পঞ্চাশ দোকান ঘুরবে আর ঠকে মরবে।...... দে প্রেস আমাদের মঠে পৌঁছে —আমাদেরও ত একটা প্রেস চাই। দেখ্, কত lecture (বক্তৃতা) দিয়েছি, কত লিখেছি; তার অর্ধেকও ছাপা হ'ল না। তুই আমাকে work দেখাস্? রাখাল, মনে কর, সে আজ কত দিনের কথা—আজ সে ১২।১৩ বৎসরের কথা—সেই গঙ্গার ধারে বসে আমরা কয় জনে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁদছি। আমি বললাম,—'তাঁর অস্থি গঙ্গার ধারে রাখা উচিত, গঙ্গার ধারেই মন্দির হওয়া উচিত; কারণ, তিনি গঙ্গার ধার ভালবাসতেন।' আমার কথা শুনল না। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁকুড়গাছির বাগানেতে রাখল। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজেছিল। রাখাল, মনে কর আমি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আজ বার বছর bull dog-এর মতন সেই idea নিয়ে তামাম দুনিয়া ঘুরেছি; একদিনও ঘুমোই নি। আজ দেখ্ তা সফল করলাম। সেই idea (ভাব) আমাকে একদিনও ছাড়ে নি। * * * এ জাতের কি আর উন্নতি আছে?"

ত্রিগুণাতীত—"ভাই, তোমার brainটি (মস্তিষ্কটি) কেমন! তোমার brainটি আমায় দিতে পার?"

এই কথায় খুব হাসি পড়িয়া গেল, কারণ, বলিবার তারিফ ছিল। পরে ত্রিগুণাতীত বলিলেন, এ জ্বরের উপর সকালে একটু সাবু খাইয়াছিলেন; এ বেলা এক সের রাবড়ী, আধসের কচুরী ও তদুপযুক্ত তরকারী আহার করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বামিজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"শালা! তোর stomachটা দে দেখি—দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে দি। লাহোরে সুরজলাল বলেছিল, 'স্বামিজী, তোমার নানকের brain, আর গুরুগোবিন্দের heart (হৃদয়) এসে গিয়েছে—কেবল জগমোহনের (খেতড়ীর রাজ-দেওয়ান) মত পেটটি চাই'।"......

কঠোপনিষৎ

বনফুল

[বাজশ্রবার পুত্র উদ্দালকি আরুণি গৌতম স্বর্গ কামনায় বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। দানের দক্ষিণার জন্য নীয়মান গাভীগুলিকে দেখিয়া উদ্দালকের অল্পবয়স্ক পুত্র নচিকেতার মনে যে সব কথা জাগিয়াছিল তাহারই বর্ণনা দিয়া কঠোপনিষৎ আরম্ভ হইয়াছে। উদ্দালক যখন সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন তখন নচিকেতার মনে হইয়াছিল যে তাঁহাকেও দান করা হইবে। কাহার হস্তে তাঁহাকে প্রদান করা হইবে এই কথা পিতার নিকট বারবার জানিতে চাওয়ায় পিতা বিরক্ত হইয়া বলেন, তোমাকে যমকে দিব। নচিকেতা যমালয়ে যান এবং যমের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হয় তাহাই কঠোপনিষদের বিষয়বস্তু। প্রথম প্রথম বুঝিতে অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া এই ভূমিকাটুকু লিখিলাম। শ্লোকগুলি কবিতায় অনুবাদ করিয়াছি। যথাসাধ্য মূলানুগ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া ছন্দকে নানাভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।]

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

বাজশ্রবার পুত্র যজ্ঞ-ফল-কামনায় সর্ব্বস্ব দিলেন;
তাঁর পুত্র নচিকেতা নাম
সুকুমার সে বালক নীয়মান গাভীগুলি হেরি
শ্রদ্ধাভরে চিন্তা করিলেন
কিবা এর দাম?
তৃণ জল আর কভু খাবে না যাহারা
নিরিন্দ্রিয় যারা দুগ্ধহারা
তাহাদের দান করি নিরানন্দ লোকে
ঘটে পরিণাম ॥ ১-৩ ॥

আমারে দিবেন কারে? শুধান পিতারে;
দ্বিতীয় তৃতীয় বারে
তোমারে যমকে দিব—ক'ন পিতা তারে ॥ ৪ ॥
[এই কথা শুনিয়া নচিকেতা চিন্তা করিলেন]

অনেকের মধ্যে আমি হয়েছি প্রথম
অনেকের মধ্যে আমি হয়েছি মধ্যম
না জানি আমারে দিয়া
কোন কার্য্য সাধিবেন যম ॥ ৫ ॥
[পুত্রকে এই কথা বলিয়া উদ্দালক সম্ভবতঃ অনুতপ্ত হইয়া মত পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী এই শ্লোক হইতে মনে হয় পিতা পাছে সত্যভ্রষ্ট হ'ন তাই নচিকেতা তাঁহাকে বলিতেছেন]

যথাক্রমে পূর্ব্বাপর আলোচনা করি
দেখ পিতা, শস্যসম জীর্ণ হই মোরা
শস্যসম পুনরায় নব-জন্ম ধরি ॥ ৬ ॥

[ইহার পর পিতা তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইলেন। যম বাড়িতে ছিলেন না। তিন দিন পরে যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন যমের আত্মীয়গণ যমকে বলিলেন]

ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহেতে আসেন
অগ্নির মতন
তাই তাঁর শান্তি লাগি বিবিধ যতন
বৈবস্বত পাদ্য অর্ঘ্য কর আনয়ন ॥ ৭ ॥

প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা আর সুসঙ্গ-গৌরব
প্রিয়বাক্য, দান ধ্যান, পুত্র পশু সব
সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় অল্পবুদ্ধি সেই দুর্ভাগার
অভুক্ত ব্রাহ্মণ গৃহে যার ॥ ৮ ॥

[যম তখন নচিকেতাকে যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন]

তিন রাত্রি মোর গৃহে অনশনে করিয়াছ বাস
সম্মানিত অতিথি ব্রাহ্মণ
তোমারে প্রণাম করি, আমার কল্যাণ কর,
তিন বর করিব অর্পণ
কহ কিবা চাও ॥ ৯ ॥

[নচিকেতা উত্তর দিলেন]

উৎকণ্ঠা না রহে যেন পিতা গৌতমের*
তুমি ছেড়ে দিলে গৃহে ফিরিব যখন
চিনিয়া আমারে যেন অক্রোধ প্রসন্ন মনে
অভ্যর্থনা করেন তখন
প্রথমেই এই বর দাও ॥ ১০ ॥

[যম বলিলেন]

পূর্ব্ববৎ হবে জেন ঔদ্দালকি আরুণির স্নেহ পুনরায়
আদেশে আমার
ক্ষোভ রহিবে না চিত্তে আর
সুখনিদ্রা হবে রজনীতে মৃত্যু-মুক্ত দেখিয়া তোমায়।

[এইবার নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলেন]

স্বর্গে যম তুমি নাই নাহি কোন ভয়
জরায় ডরে না কোন লোক
অতিক্রমি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক
স্বর্গলোক চিরানন্দময় ॥ ১২ ॥

হে মৃত্যু, তুমিই জান সেই অগ্নিরূপ
যেই অগ্নি সে স্বর্গ-কারণ
যে স্বর্গে অমৃত লভে স্বর্গকামিগণ
আমার দ্বিতীয় বরে শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে জানাই প্রার্থনা
কহ মোরে তার বিবরণ ॥ ১৩ ॥

* ঔদ্দালকি আরুণির আর এক নাম।

[যমের উত্তর]

স্বর্গের কারণ-ভূত অগ্নির স্বরূপ সবিশেষ জানি নচিকেতা
কহিতেছি হও অবহিত
অনন্ত লোকের পথে ইহাকেই জানিও আশ্রয়
মর্ম্ম এর গুহায় নিহিত ॥ ১৪ ॥

সৃষ্টির আদি অগ্নির কথা কহিলেন তারে যম
অগ্নি-চয়নে যত ইট চাই আরও আছে যে নিয়ম
শুনি সব কথা নচিকেতা পুন আবৃত্তি করিলেন
তুষ্ট হইয়া যমরাজ তাঁরে পুনরায় কহিলেন ॥১৫॥

তোমারে আর এক বর দিব পুনরায়
প্রীতিভরে কহিলেন যম মহাত্মন
এই অগ্নি তব নামে প্রসিদ্ধ হইবে
বহুরূপী এই মাল্য করহ গ্রহণ ॥ ১৬ ॥

তিনের সহিত যিনি সম্বন্ধ রাখিয়া
নাচিকেত এই অগ্নি তিন বার করেন চয়ন
তিন-কর্ম্ম-কৃতী সেই জন
জন্ম মৃত্যু করি উত্তরণ
উপলব্ধি করি' সেই ব্রহ্মজাত পূজনীয় দেবে
পরম শান্তিরে শেষে করেন বরণ ॥ ১৭ ॥

তিনবার নাচিকেত অগ্নি-সেবাকারী
তিনের রহস্য জানি সেই সেবা করিবেন যিনি
পূর্ব্বেই মৃত্যু-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া
উপভোগ করিবেন শোকাতিগ স্বর্গলোক তিনি ॥ ১৮ ॥

দ্বিতীয় বরেতে তুমি প্রার্থনা করেছ যাহা
সে স্বর্গ-অগ্নির কথা নচিকেতা কহিনু তোমারে
এ অগ্নি তোমারই নামে প্রসিদ্ধ হইবে লোকমাঝে
তৃতীয় বরেতে কহ কি চাহ এবারে ॥ ১৯ ॥

[নচিকেতা বলিলেন]

মৃত্যুর পরে আছে সংশয় সদাই
কেহ বলে থাকে কিছু কেহ বলে নাই
হে যম, তৃতীয় বরে আজিকে তোমার মুখে
সত্য কথা শুনিবারে চাই ॥ ২০ ॥

[যমের উত্তর]

সৃষ্টিকালে দেবগণও ছিলেন সংশয়াকুল
অতি সূক্ষ্ম এই তত্ত্ব জটিল দুর্বোধ
অন্য বর চাও তুমি ত্যাগ কর এ প্রার্থনা
নচিকেতা করিও না বৃথা উপরোধ ॥ ২১ ॥

[নচিকেতা]

দেবগণ নিশ্চয়ই ছিলেন সংশয়াকুল
তুমিও বলিছ ইহা নহে সুবিজ্ঞেয়
তাহলে ইহার তুল্য অন্য কোন বর নাই
তুমি ছাড়া বক্তাও নাহি অন্য কেহ ॥ ২২ ॥

[যম]

শতজীবী পুত্র পৌত্র করহ প্রার্থনা
পশু হস্তী অশ্ব স্বর্ণ দিব চাও যত
বিশাল রাজত্ব লও—
নিজ আয়ু চাহ ইচ্ছা মত।
এর তুল্য অন্যবর যথা ইচ্ছা, নচিকেতা, করহ
প্রার্থনা,
লও বিত্ত, অমরত্ব, রাজা হও বিশাল রাজ্যের,
পূর্ণ কর সকল কামনা,
মর্ত্যলোকে দুর্লভ যা' সেই সব কাম্য বস্তু
যাহা ইচ্ছা মাগ মোর কাছে

ওই যে রথের পরে বাদ্য যন্ত্র সহ
রমণীরা আছে
মনুষ্যের আয়ত্তের অতীত ইহারা,
মোর বরে ভোগ কর ইহাদেরও পরিচর্য্যা-সুখ
মৃত্যু-বিষয়েতে শুধু, নচিকেতা, হ'য়ো না উৎসুক।
॥ ২৩-২৫ ॥

[নচিকেতা]

অনিশ্চিত মৃত্যুশীল এই সব ভোগ্য বস্তু
জীর্ণ করে ইন্দ্রিয়ের শক্তি আর সুখ
জীবনই তো ক্ষণস্থায়ী; বাহন বা নৃত্য-গীত
চাহি নাকো,—তোমারই থাকুক ॥ ২৬ ॥
বিত্ত লভি তৃপ্ত কভু হয় না মানব
পেয়েছি দর্শন যবে বিত্ত লাভও হবে এর পর
যতদিন প্রভু তুমি, জীবনও রহিবে মোর
আমি কিন্তু চাই ওই বর ॥ ২৭ ॥
অধঃস্থ পৃথিবীবাসী জরাশীল কোন ব্যক্তি কহ
অজর অমৃতলোকে আসি একবার
লভিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞান রূপ-রতি-প্রমোদ চিন্তিয়া
অতি দীর্ঘ জীবনেতে সুখ পাবে আর ॥২৮॥
যেই পরলোক-তত্ত্ব সংশয়েতে ঘেরা
মহতী সে তত্ত্বকথা কহ মোরে এ মোর
প্রার্থনা
নিগূঢ়ের মর্ম্ম-মাঝে নিহিত যে বর
তাহা ছাড়া নচিকেতা অন্য কিছু করে না
কামনা ॥ ২৯ ॥

প্রথম বল্লী সমাপ্ত

(ক্রমশঃ)

"সংস্কৃত ভাষার 'শ্রদ্ধা' কথাটী বুঝাবার মত শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় 'একাগ্র-নিষ্ঠা' বল্লে সংস্কৃত শ্রদ্ধা কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

(এক)

স্বামী ঈশানানন্দ

১৩২৬ সাল। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতা রওনা হইবার দিন স্থির হইতেছে। সংবাদ পাইয়া শিবুদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশিবরাম চট্টোপাধ্যায়) কামারপুকুর হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বেলা প্রায় ১২টায় জয়রামবাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাকে প্রণাম করিয়া শিবুদা পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন। কুশল-প্রশ্নাদির পর মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সকাল সকাল না এসে এত দেরী করে এলি কেন শিবু? শিবুদা বলিলেন,—ছোট বেলা, খুড়ীমা, আর রঘুবীরের পূজা ভোগ সব সেরে আসতেই দেরী হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর আমাদের সহিত শিবুদার আহারান্তে মা বলিলেন,—শিবু, এখন ওদের ঘরেই বিশ্রাম কর, বেলা পড়লে যাওয়ার সময় রঘুবীরের জন্য ফল মিষ্টি বেঁধে দেব, নিয়ে যাবি। শিবুদা বলিলেন,—রঘুবীরের জন্য ফল মিষ্টি যা দেবে, নিয়ে যাব, তবে আজ আর যাব না। আজ খুড়ীমা, তোমার কাছেই থাকব; কাল সকালে যাব। মা বলিলেন,—কি করে থাকবি? বাড়ীতে রঘুবীর-শীতলার সন্ধ্যারতি পূজাদি আছে, তার কি হবে? শিবুদা বলিলেন,—তা খুড়ীমা, সে সব সেরেই এসেছি। আজ এখানে থাকব বলে পূজার পর আরতি করে, ঠাকুরদের লেপ কাঁথা ঢাকা দিয়ে রাত্রের শয়ন দেওয়া সেরেই আসছি। কাল সকালে গিয়ে শয়ন থেকে তুলে পূজা করব। মা শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলেন,—সে কিরে! তোরা থাকতেই যদি রঘুবীর-শীতলার পূজা এই ভাবে হয় তবে পরে ছেলেরা কি করবে? কি ভাবে কি হবে? শিবুদা বলিলেন,—তা হোক্, একদিন ত? আজ তোমার এখানে না থেকে যাব না, খুড়ী মা। ইহা বলিতে বলিতে শিবুদা আমাদের ঘরে আসিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। শ্রীশ্রীমাও আর কিছু বলিলেন না। কিছু পরে শিবুদা দুপুরের বিশ্রামের জন্য শুইয়া পড়িলেন।

ইতোমধ্যে মা কতকগুলি ফল ও কিছু শাকসব্জী ইত্যাদির একটি ছোট পুঁটুলি বাঁধিয়া বেলা তিনটা নাগাদ শিবুদাকে ডাকিয়া আমাকে বলিলেন,—ওই পুঁটুলিটি নিয়ে শিবুর সঙ্গে নদী পার হয়ে অমরপুর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এস। শিবুদাকে বলিলেন,—রঘুবীরকে শয়ন থেকে তুলে আবার সন্ধ্যারতি করে শয়ন দিগে যা, ও যা করেছিস্, যেন দুপুরের বিশ্রাম হলো। চিন্তা কি, দক্ষিণেশ্বরে যাবিতো, তখন দেখা হবে। শিবুদা বিশেষ আর আপত্তি না করিয়া মাকে প্রণাম করিলেন এবং সাশ্রুনয়নেই আমার সহিত যাত্রা করিলেন। আমি শিবুদাকে অমরপুর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া দেখিলাম, মা কাপড়-চোপড় কাচিয়া কুটনা লইয়া বসিয়াছেন। আমিও হাত পা ধুইয়া মার কাছেই বসিয়া আছি, এমন সময় শিবুদা পুঁটুলিটি বগলে ও

লাঠি হাতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। বারান্দায় সে সমস্ত নামাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। শ্রীশ্রীমাও বঁটীটি রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন। শিবুদা মার শ্রীচরণ হইতে মাথা তুলিতেছেন না; কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন,—মা, আমার কি হবে বল, তোমার কাছে শুনতে চাই। মা বলিলেন,—শিবু, ওঠ্, তোর আবার ভাবনা কি? ঠাকুরের অত সেবা করেছিস, তিনিও তোকে কত ভালোবেসেছেন, তোর চিন্তা কি? তুই ত জীবন্মুক্ত হয়ে আছিস্। পরস্পরের ঐ অবস্থা দেখিয়া আমিও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তখন শিবুদা বলিলেন,—মা, আপনি আমার ভার নিন, আর আপনি যা বলেছিলেন, আপনি তাই কিনা বলুন। মা যতই শিবুদার মাথা ও চিবুকে হাত দিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলেন, শিবুদা ততই অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলিতেছিলেন,—বলুন, আপনি আমার সমস্ত ভার নিয়েছেন? আর বলুন আপনি তাই কিনা। শ্রীশ্রীমা এই ব্যাপারে একটু বিব্রত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেও শিবুদার দৃঢ় ভাব ও ব্যাকুলতায় মুগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে শান্ত ও গম্ভীর ভাবে তাঁর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, —হাঁ, তাই। শিবুদাও তখন হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া গদ্গদ্ হইয়া আবৃত্তি করিলেন—সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

প্রণামান্তে উঠিয়া শিবুদা চোখের জল মুছিলেন। মা তাঁহার চিবুক ধরিয়া চুমা খাইলেন। আনন্দোজ্জ্বল মুখে শিবুদা পুঁটুলী ও লাঠি লইয়া রওনা হইবার উপক্রম করিলেন। মা বলিলেন,—পুঁটুলীটি বরদাকে দাও, ও অমরপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমি শিবুদার হাত হইতে উহা লইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছি। গ্রাম অতিক্রম করিয়া মাঠে গিয়া পড়িলে শিবুদা বেশ প্রফুল্লমনে আমাকে বলিলেন, ভাই, মা সাক্ষাৎ কালী, উনিই 'কপালমোচন' ওঁর কৃপাতেই মুক্তি, বুঝলে?

শিবুদাকে অমরপুর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেশ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সকল কাজ সমাপনান্তে মায়ের ঘরে চিঠি পড়িয়া শোনাইতে গিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, আজ মা হয়ত শিবুদার ওই বিষয়ে কিছু কথা তুলিবেন, কিন্তু মা একটি কথাও বলিলেন না। মনে হইল, যাহা ঘটিয়াছে তাহা যেন তাঁহাদের একটি ঘরোয়া ব্যাপার!

(দুই)

শ্রীমতী শৈলবালা মান্না

পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে আমি যেবার প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাই, তখন আমার বয়স মাত্র চৌদ্দ। সবে বিয়ে হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট থেকে দীক্ষা পাব আশা করেছিলাম—কিন্তু সেবার মা দেন নি; বলেছিলেন, পরে হবে। তারপর সত্যই সেই শুভ দিন উপস্থিত হল। মা আমার অভিভাবকদের লিখেছিলেন, এবার বৌমাকে নিয়ে এস, দীক্ষা হবে। তদনুযায়ী যথাসময়ে কলকাতা এসে দীক্ষা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলাম।

পরে একবার তাঁকে কলকাতায় দর্শন করতে এসে হৃদয়ের আবেগে বলেছিলাম, মা, এ

হতভাগিনীকে কি দয়া হবে না, মা? হতভাগিনী শব্দটি শুনে মা মনে কষ্ট পেলেন। বললেন, আচ্ছা বল দিকিনি, তোমার বাপের বাড়ীতে তো অনেকেই আছেন, শ্বশুরবাড়ীতেও কত লোক রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কয় জন ঠাকুরের পদাশ্রয়ে আসতে পেরেছেন? তোমার কত অল্পবয়সে ঠাকুরের চরণে মতি হয়েছে। পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে কি এমন হতে পারতো? 'হতভাগিনী' মুখে এনো না, মা। বল যে, আমি ধন্য, আমি লক্ষ্মী—সেই জন্যে ঠাকুর এত অল্পবয়সে কৃপা করেছেন। ঠাকুরকে চিন্তা করবে—আর নিজেকে কখনো ওরকম ভাববে না।

আর একবার মায়ের কাছে আসি খুব শোকগ্রস্তা হয়ে। সেবার আমার প্রথম খোকাটি মারা যায়। মা সব শুনে খুব দুঃখিত হলেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুঃখ কোরোনা বৌমা, ও একজন ভক্ত তোমার পেটে এসেছিল। বেশী দিন তো পৃথিবীতে ওর থাকার কথা নয়, তাই চলে গেল।

আর একবার কলকাতায় মায়ের কাছে এসেছি। আবেগভরে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সেবা করছি। গোলাপমা একটু পরে সেখানে এসেছেন। দেখে হেসে বললেন, বৌমা, তুমি একাই যদি মায়ের সমস্ত পায়ের ধুলো নিয়ে যাও তো আমাদের জন্যে কি থাকবে? মা শুনে খুব হেসে উঠলেন। বললেন—না গো, বৌমাটি বেশ ভক্তিমতী। আহা করুক। অল্পবয়সে ভাল মতিগতি হয়েছে। ঠাকুরের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি হোক্।

(তিন)

শ্রীমতী—

বিবাহের প্রায় তিন বৎসর পরে দেখিলাম স্বামী পূজা-অর্চনার দিকে খুব মন দিয়াছেন—কোথায় যেন কিসের একটা সন্ধান পাইয়াছেন। কৌতূহলবশে এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু স্বামী কথাটা চাপিয়া গেলেন। বলিলেন,—"তোমার এসব জেনে দরকার কি? আমি যেথানে যা পাই না কেন তোমার শুনে কোন লাভ নেই।" আমার মুখ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু মনের জিজ্ঞাসা থামিল না। কখন কখন ঐ জিজ্ঞাসা একটি অব্যক্ত ব্যাকুলতার রূপ লইয়া সমস্ত প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিত। এক দিন স্বপ্নে দেখিলাম নদীতে স্নান করিতেছি—একটি শ্যামবর্ণা যুবতী উপরে দাঁড়াইয়া। যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কি তোর ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিস?" আমি বলিলাম,—"আমার মন্ত্র হয় নাই—ইষ্টদেবতা কে জানি না।" তখন মেয়েটি আমাকে জলে ডুব দিতে বলিলেন। ডুব দিলে ভগবানের একটি নাম শুনাইলেন। ঐ স্বপ্নে পাওয়া নাম জপ করিয়া প্রাণে কিছু শান্তি পাইলাম। আট বৎসর কাটিয়া গেল।

স্বামী কলিকাতা হইতে একবার দেশের বাড়ীতে আসিয়াছেন। একদিন লক্ষ্য করিলাম ডাকে একখানি চিঠি আসাতে উহা ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পড়িতে লাগিলেন। চিঠিখানি পরে তাঁহার পকেট হইতে লইয়া পড়িলাম। ঠিকানা দেখিলাম—জয়রাবাটী গ্রাম-আনুড় পোঃ—লিখিতেছেন—'তোমাদের মাতাঠাকুরাণী'। এতদিন পরে মাকে আবিষ্কার করিয়া কী যে আনন্দ হইল তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। তাঁহাকে পত্র দিলাম। দয়াময়ী উত্তরও দিলেন। সেই অবধি প্রাণ ছটফট্ করিত কি করিয়া

তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইব,—তাঁহার কৃপা লাভ করিব।

১৩২৬ সালের আশ্বিনের ঝড়ে সমগ্র যশোহর খুলনা জেলায় নিদারুণ বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের বাড়ীঘর উড়াইয়া লইয়া যায়। বাধ্য হইয়া স্বামী আমাদিগকে কলিকাতা লইয়া আসিলেন। আমার 'শাপে বর' হইল—কেননা এখন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইব। কিন্তু কলিকাতা আসিয়া শুনিলাম, শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে আছেন—ফাল্গুন মাসে আসিবেন। তখন কার্তিক চলিতেছে।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি মা আসিলেন। স্বামী সংবাদ দিলেন, মেয়েদের দর্শন দিবেন, পুরুষদেব নিষেধ। পরের দিনই সকালে বেলা ৯টায় উদ্বোধনের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। মন আনন্দে ভরপুর। একজন সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আসুন উপরে।" সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় টের পাইলাম, আমার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, মা সিঁড়ির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একটি পা চৌকাঠে—একখানি হাত দরজার উপরে। তাঁহার শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া প্রণামান্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম,—"আপনি কি আমাদের মা?" করুণাময়ী হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ, আমিই তোমাদের মা। ঘরে এসো।" কাছে বসাইয়া কয়েকটি কথা বলিলেন।

সাতদিন পরে আবার গিয়াছি। দীক্ষা প্রার্থনা করিলাম। বলিলেন,—"আচ্ছা, হবে এখন পরে।" একদিন তাঁহাকে বলিলাম,—"মা, আমার দীক্ষা হয়নি শুনে লক্ষ্মীদিদি বলেছেন -'মায়ের শরীর খারাপ, সুস্থ না হলে হবে না। তা আমিও দিতে পারি'।" শুনিয়া মা বলিলেন,—"না, না, আমিই তোমাকে দেব। স্বামিস্ত্রীর এক গুরু করতে হয়।" মায়ের একটি ব্রহ্মচারী সেবক মায়ের শরীর অসুস্থ বলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে নিষেধ করিতেন। একদিন মা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"থাম না বাপু, ও যে দূর দেশ থেকে এসেছে।"

প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া মায়ের বাড়ী যাইতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন ঐরূপ যাইতেই দেখি শ্রীশ্রীমা প্রথম দিনের মত দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। ডানদিকের ঘর দেখাইয়া বলিলেন,—"এসো এই ঘরে।" (সেদিন ব্রহ্মচারীটিকে দেখিতে পাইলাম না।) দুটি আসন পাতিয়া একটিতে আমাকে বসিতে বলিলেন—অপরটিতে নিজে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বপ্নে কিছু পেয়েছিলে কি?"

আমি।—হাঁ, মা, পেয়েছিলাম। কিন্তু তা নাকি কাউকে বলতে নেই?

মা।—আমাকে বলতে আছে। আর কাউকে বলতে নেই।

নয় বৎসর আগে উপরোল্লিখিত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলাম। * * * মা বসিয়া আছেন। আমিও বসিয়া। মনে হঠাৎ খুব দুঃখ হইল। আমার দিদিমার দীক্ষাগ্রহণ পূর্বে দেখিয়াছিলাম। কত জিনিস-পত্রের আয়োজন—কত অনুষ্ঠানাদি। আর আজ মা আমাকে এত অনাড়ম্বরভাবে এত সংক্ষিপ্ত একটি মন্ত্র দিয়া বিদায় করিতেছেন! তবে কি মা আমাকে অপাত্রজ্ঞানে ফাঁকি দিলেন? কিছুক্ষণ বাদে অন্তর্যামিনী বলিতেছেন,—"যাও বউমা, ঠাকুর-প্রণাম করে এসো। ভেবো না। এতেই সব পাবে।" নিমেষে সমস্ত সন্দেহ-বিষাদ তিরোহিত হইল। ঠাকুর প্রণাম করিয়া, প্রসাদ লইয়া পরিপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।

বেনেদেত্তো ক্রোচে

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন, এম্-এ

গত নভেম্বর মাসের ২০শে তারিখে বর্ত্তমান ইটালীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী বেনেদেত্তো ক্রোচে (Benedetto Croce) ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ক্রোচে যে কেবল বর্ত্তমান ইটালীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন তাহা নয়, বর্ত্তমান যুগের ধুরন্ধর দার্শনিকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার চিন্তাধারার মৌলিকতা এবং দর্শন ও রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে অভিনব দৃষ্টিভংগী বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দর্শনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম। তাঁহার প্রথম জীবনে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে তাঁহার পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল থাকায় তাঁহাকে জীবিকার জন্য কোনও চাকুরী বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে হয় নাই। এ জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত সময়ই অখণ্ড মনোযোগের সহিত সাহিত্য এবং দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চায় নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি 'La critica' নামক সাহিত্য, ইতিহাস এবং দর্শনের সমালোচনামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নব্য ইটালীর সাংস্কৃতিক সংগঠনে তাঁহার দান অতুলনীয়।

রাজনীতিতে ক্রোচে ছিলেন উদারপন্থী। তাঁহার মতে দর্শন-শাস্ত্র এবং ইতিহাস এক ও অভিন্ন। ইতিহাস কেবল ঘটনার ধারাবাহিক বিবৃতি নহে, বিচারশীল দৃষ্টিতে ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাই ইতিহাস। এই দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি ইতালীর সাম্প্রতিক ইতিহাস-সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক এবং ক্রোচের রাজনীতি মুসোলিনী-সরকার সুনজরে দেখেন নাই। মুসোলিনীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এক বৎসরের জন্য তিনি ইতালীর শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশের মধ্যে তিনি এই পদের যোগ্যতম ব্যক্তি হইলেও মুসোলিনী তাঁহাকে কোনও পদ দেন নাই। ১৯১৪ খৃঃ অব্দেও মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেল এবং রোমাঁ রোলাঁর ন্যায় তিনি ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। ফলে তাঁহাকে দেশের তদানীন্তন শাসক-শ্রেণীর বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। দেশের নানাপ্রকার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেও ক্রোচে কিন্তু স্বীয় মত ও পথ হইতে বিচলিত হন নাই।

ক্রোচের দর্শন

ক্রোচে বিজ্ঞানবাদী এবং তাঁহার বিজ্ঞানবাদ অনেকাংশে হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদের অনুগামী। হেগেলের ন্যায় তাঁহার মতেও সত্য বা তত্ত্ব-পদার্থ জ্ঞান-স্বরূপ। তাঁহার মতেও ঐতিহাসিক জগৎ সেই জ্ঞানরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বের ক্রমবিকাশ। কিন্তু হেগেল এই অধ্যাত্মতত্ত্বে একটা তুরীয় (transcendent) অবস্থা স্বীকার করেন এবং তাহাকেই সত্যের পারমার্থিক এবং সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে অধ্যাত্মতত্ত্ব (reason) স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাত্মক (universal); তাহার মধ্যে কোনও অপূর্ণতা নাই। এক এবং অসীম হইয়াও এই তত্ত্ব বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং তাহার ফলেই জগৎ-ইতিহাস রচিত হইতেছে। তত্ত্বপদার্থ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাত্মক হয়, তাহা হইলে তাহার আবার

আত্মপ্রকাশের তাৎপর্য্য কি? হেগেলীয় দর্শনে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। ব্র্যাড্‌লি-প্রমুখ হেগেলের অনুগামী দার্শনিকবৃন্দ অধ্যাত্মতত্ত্বের অখণ্ড নির্ব্বিশেষ সত্তাকেই তাহার পারমার্থিক স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জগদ্ব্যাপার অধ্যাত্মতত্ত্বের ভান (appearance)-মাত্র। ক্রোচে কিন্তু জ্ঞান বা অধ্যাত্মতত্ত্বের কোনও তুরীয় সত্তা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে মানবমনের সমস্ত জ্ঞানানুভবই সত্য। সুতরাং তত্ত্বপদার্থ মানুষের মনে অন্তর্নিহিত (immanent)। জ্ঞান বা চৈতন্য মনের ধর্ম্ম, অর্থাৎ মনকে তাহার জ্ঞান হইতে পৃথক করা যায় না। এই জ্ঞান আবার কোনও স্থিতিশীল নির্ব্বিকার পদার্থ নহে। ইহা ক্রিয়াশীল গতিশীল অনুভূতি। অন্যভাবে বলা যায় যে, মনন-ক্রিয়াই জ্ঞান এবং মন, চৈতন্য এবং জ্ঞান একার্থক শব্দ। সুতরাং ক্রোচের মতে এই সৃষ্টিশীল মনই সত্য এবং এই মনের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানই দর্শন। আবার সৃষ্টিধর্ম্মী মনের সৃষ্টিই ইতিহাস। এই অর্থে দর্শন এবং ইতিহাসের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়।

ক্রোচের মতে মন অবিরাম ক্রিয়াশীল। মন এবং তাহার ক্রিয়া পৃথক নহে। মনন-বৃত্তিই মন। এই মননবৃত্তি আবার জ্ঞান ও এষণা (thought and will) ভেদে দুই প্রকার। জ্ঞানবৃত্তি হইতে সর্ব্বপ্রকার বোধ বা অনুভব এবং এষণাবৃত্তি হইতে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। জ্ঞানবৃত্তির আবার দুইটী ক্ষণ বা স্তরভেদ আছে। প্রথম স্তরকে ঈক্ষণ (intuition) এবং দ্বিতীয় স্তরকে বুদ্ধি (intellection) বলা যাইতে পারে। ঈক্ষণ-ক্রিয়ার দ্বারা মন প্রথমতঃ বিশুদ্ধ রূপ (image) সৃষ্টি করে। বুদ্ধি-বৃত্তির ফলে বিশুদ্ধ প্রত্যয় (concept) বা সাধারণ ধারণার উদ্ভব হয়। মনের এই ঈক্ষণ-ক্রিয়া রসশাস্ত্র বা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের (Aesthetics) প্রধান উপজীব্য এবং বুদ্ধির সৃষ্টি যে প্রত্যয় তাহাই যুক্তিবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

ঠিক এই ভাবে এষণারও দুইটী ক্ষণ বা স্তরভেদ নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথম স্তর স্বার্থৈষণা; ইহা কর্ত্তা ব্যক্তির স্বকীয় উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয় স্তর পরার্থৈষণা; ইহার ফলে মানুষ সমাজের কল্যাণে বা জগতের কল্যাণে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। স্বার্থৈষণা অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এবং পরার্থৈষণা নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। সুতরাং মননক্রিয়ার এই চারিটি স্তরভেদে দর্শনশাস্ত্রেরও চারিটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয়। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব (Aesthetics), বুদ্ধিশাস্ত্র (Logic), অর্থশাস্ত্র (Economics) এবং নীতিশাস্ত্র (Ethics)—দর্শনশাস্ত্রের এই চারিটি অংশ।

মনন-ক্রিয়ার পূর্ব্বোক্ত চারি স্তরের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। ক্রোচে বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

মনন-ক্রিয়াকে প্রথমতঃ জ্ঞান এবং এষণা এই দুই স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এষণা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞান ছাড়া কোনও এষণা অর্থাৎ সংকল্প বা ইচ্ছা হইতে পারে না। সুতরাং এষণার স্তরে জ্ঞানবৃত্তি অনুস্যূত থাকে। জ্ঞানের সৃষ্টি সংকল্প-সঞ্জাত কার্য্যে পরিণতিলাভ করে। জ্ঞানবৃত্তি কিন্তু এইরূপে এষণার অপেক্ষা রাখে না। যদিও সংকল্পের মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি ঘটে, তাহা হইলেও সংকল্পের পূর্ব্বে সংকল্প-নিরপেক্ষ (এষণা-নিরপেক্ষ) জ্ঞানের উদয় হওয়ায় কোনও বাধা নাই।

জ্ঞান ও সংকল্পের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান জ্ঞানবৃত্তির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যেও

অনুরূপ সম্পর্ক বর্ত্তমান আছে। বুদ্ধির ক্রিয়া ঈক্ষণ-ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। ঈক্ষণ ছাড়া বুদ্ধি-বৃত্তির কোনও ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা যে সকল প্রত্যয়ের অনুভব হয় ঈক্ষণসৃষ্ট 'রূপ'ই (image) তাহার অবলম্বন। অর্থাৎ রূপ-সমূহকে অবলম্বন করিয়াই এই সাধারণ প্রত্যয়-সমূহ আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। ঈক্ষণ কিন্তু বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল নহে। বরং ইহা সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি-নিরপেক্ষ বলিয়াই বিশুদ্ধ অবিকৃত রূপ-সমূহের (pure images) সৃষ্টি করিতে পারে।

ঈক্ষণতত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা ক্রোচের দর্শনের একটি মৌলিক ও বিশিষ্ট অবদান। ক্রোচে দার্শনিক অপেক্ষা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অন্যতম ভাষ্যকার হিসাবে পণ্ডিত-সমাজে সমধিক প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। এই ঈক্ষণক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণের উপরেই তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

ক্রোচের মতে আমাদের মানসজগতের বাহিরে সত্য বলিয়া আর কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টিধর্ম্মী মন নিজেই নিজের জ্ঞেয় বিষয় সৃষ্টি করে। কাণ্টের মতেও জ্ঞানের বিষয়বস্তু অনেকাংশে বুদ্ধির সৃষ্টি। কিন্তু কাণ্ট জ্ঞানের অতীত একটি বস্তুসত্তা (thing-in-itself) স্বীকার করেন। ইহা যেন জ্ঞানরাজ্যের অপর প্রান্তে থাকিয়া জ্ঞানের বিষয়-বস্তুর জন্য মালমসলা সরবরাহ করে। এই মালমসলাই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে রূপান্তরিত হইয়া জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত হয়। ক্রোচে কিন্তু জ্ঞানাতীত কোনও বস্তুসত্তা স্বীকার করেন না। ঈক্ষণ-ক্রিয়ার দ্বারা মন নিজ অনুভবের বিষয় নিজেই সৃষ্টি করে। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রাথমিক সংবেদনের (sensation) উপর নির্দ্দিষ্ট আকার (form) চাপাইয়া ঈক্ষণবৃত্তি বিবিধ রূপ (image) সৃষ্টি করে। রূপ ঈক্ষণেরই প্রকাশ। ঈক্ষণক্রিয়া স্বরূপতঃ সৃষ্টিধর্ম্মী এবং প্রকাশধর্ম্মী। সুতরাং অপ্রকাশিত ঈক্ষণ অসম্ভব। এই কারণে কাব্য ও শিল্পসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ঈক্ষণবৃত্তি। ঈক্ষণ অন্তরের অব্যক্ত অনুভূতি-সমূহকে রূপদান করে। অন্তরের সৃষ্টি ও তাহার প্রকাশেই কবির কবিত্ব এবং এবং শিল্পীর রসসৃষ্টি। রসমাত্রই ঈক্ষণের প্রকাশ। এই মূল রসোপলব্ধিকে পরে শিল্পী রং-রেখা প্রভৃতির সাহায্যে রূপদান করেন; কিন্তু উহা রসের গৌণ বহিরাবরণ-মাত্র। অন্তরের প্রকাশই রসের স্বধর্ম্ম। ক্রোচের এই মত রসশাস্ত্রে 'প্রকাশাত্মক রসতত্ত্ব' (expressionist theory of art) নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ঈক্ষণ-বৃত্তির দ্বারা মন এই যে রূপসমূহ প্রকাশ করে তাহারা কিন্তু স্বলক্ষণ, অর্থাৎ তাহারা স্বস্বরূপেই প্রকট হয়, বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব হইতে তাহারা মুক্ত। তাহাদের অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করাতেই মনের আনন্দ। জ্ঞানবৃত্তির প্রথম স্তরে রূপ-সৃষ্টির এই আনন্দ প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে। সুতরাং মানুষ-মাত্রই মূলতঃ কবি বা শিল্পী।

জ্ঞানবৃত্তির দ্বিতীয় স্তর বুদ্ধি। ঈক্ষণের দ্বারা যেমন বিশুদ্ধ রূপের অনুভব হয়, বুদ্ধির দ্বারা সেইরূপ শুদ্ধ প্রত্যয়ের (pure concept) অনুভব হয়। এই শুদ্ধ প্রত্যয় আমাদের সমস্ত অনুভবের মূলেই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাহারা সর্ব্বাত্মক (universal) এবং সত্য। গুণ (quality) এইরূপ একটি শুদ্ধ প্রত্যয়। কারণ গুণ ছাড়া আমরা কোনও বিষয়ের চিন্তা করিতে পারি না। অতএব গুণ সর্ব্বাত্মক এবং আমাদের সমস্ত অনুভবের মূলে বর্ত্তমান থাকায় ইহা বাস্তব সত্য। যুক্তিশাস্ত্র এইরূপ শুদ্ধপ্রত্যয় লইয়া আলোচনা করে। সাধারণতঃ আমরা যে সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি তাহাদের মধ্যে

রূপ ও প্রত্যয় মিলিত থাকে। ঈক্ষণের দ্বারা রূপ এবং বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রত্যয়ের অনুভব হয়। অনেকগুলি বস্তুর অনুভব হইতে তাহাদের কোনও একটি সাধারণ গুণ বা লক্ষণকে পৃথক ভাবে চিন্তা করিয়া তাহাকে প্রত্যয় নাম দেওয়া যায় না। কার্য্যতঃ আমরা অনেক সময়ে এইরূপ ভাবে বস্তু হইতে তাহার গুণকে পৃথক বলিয়া চিন্তা করি। এইরূপ চিন্তাকে ক্রোচে প্রত্যয়াভাস (pseudo-concept) বলিয়াছেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান এইরূপ প্রত্যয়াভাস লইয়া আলোচনা করে। এ জন্য বিজ্ঞান বাস্তব সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন। বিজ্ঞান সত্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আলোচনা করে, দর্শনশাস্ত্র সত্যকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করে।

মনের দ্বিতীয় বৃত্তি এষণা। এষণা হইতে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ক্রোচের মতে নিষ্ক্রিয় এষণা বলিয়া কিছু নাই। এষণা-মাত্রই কার্য্য, এবং কার্য্যমাত্রই এষণা। ক্রোচের মতে জগৎ যখন তত্ত্বতঃ বিজ্ঞানময় (spiritual) তখন জগতের সকল প্রকার গতি এবং কার্য্যই এষণা। স্বার্থ এবং পরার্থভেদে কার্য্যের দুইটী স্তর। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য লোকে যে কার্য্য করে তাহা স্বার্থৈষণা। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সুতরাং মানুষ হিসাবে সে পরার্থে কার্য্য না করিয়া পারে না। পরার্থ-সাধনের দ্বারা তাহার নীতিবোধ চরিতার্থ হয়। জ্ঞান যেরূপ কার্য্যের মধ্যে অনুস্যূত থাকে, স্বার্থও সেইরূপ পরার্থের মধ্যে অনুস্যূত হয়। সেইজন্য পরার্থ-সাধনে মানুষ পরম আনন্দলাভ করে। পরার্থ-সাধনের মধ্যে ব্যষ্টি মানুষের সহিত সমষ্টি মানুষের একাত্মতা সম্পাদিত হয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ক্রোচের দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। আমরা উহার কয়েকটি মূল সূত্রের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। সমালোচকের দৃষ্টিতে এই দর্শনের সকল অংশ যুক্তিসহ বলিয়া মনে হইবে না; দর্শন-শাস্ত্রের বহু মূল সমস্যার সমাধানও হয়ত ইহাতে মিলিবে না। তাহা হইলেও ক্রোচের চিন্তা-ধারার মৌলিকতা এবং চমৎকারিত্ব আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। ইটালীয় বিজ্ঞানবাদের বিভিন্ন ধারা তাঁহার দর্শনে সংহত এবং কেন্দ্রীভূত হইয়া নূতন আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

শুধু আঁখিজলে বিরচি অর্ঘ্য, যদি এ কামনা তব
জ্বালাব না যামি প্রদীপ-শিখায়, সুন্দর অভিনব।
আরতি আমার অশ্রুর সাজে
রবে সুনিথর সঙ্গীত-মাঝে,
তোমারি দানের গহন-গানের মূর্চ্ছনে সাধি' লব।
পন্থায় তব যদি মোরে চাও ভরি' অনন্ত-কাল,
মানিব তুমিই রহি মাঝে মোর কাটিবে নিশীথজাল।

না হ'লে উদয়-আলো-উন্মেষ
শুধাব না এর আছে কি না শেষ,
শুধু চরণের অবিশ্রান্ত অনাহত লব তাল।

অতল দহনে দহিয়া আমায় চাও যদি জ্বালিবারে
যুগ-যুগান্ত পার হ'য়ে চলি—সে তোমার অভিসারে।
লভি' চুম্বন তব বহ্নির
সার্থক মানি নয়নের নীর,
অঙ্গুলি-শিখা লয় তুলি' তব সুনিভৃত মোর তারে।

শিবক্ষেত্র কাঞ্চীপুরম্

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

ছেলেবেলা হ'তে আমরা বহু জিনিস শুনি, পড়ি বা দেখি। পরজীবনে তাদের অধিকাংশই মনে থাকে না, স্মৃতির অতল গর্ভে কোথায় যেন তারা নিঃশেষে তলিয়ে যায়, কিন্তু সে সব শ্রুত, পঠিত বা দৃষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে দু চারটি মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে এবং স্মৃতিপটে সদা জাগরূক থাকে।

যাই হোক্, ছেলেবেলায় একটা গান শুনেছিলাম 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়…'। বহুকাল অতীত হয়ে গেলেও গানের এ লাইনটি কখনও ভুলতে পারিনি। অবশ্য যখন শুনেছিলাম তখন কোথায় কাশী, কোথায় কাঞ্চী সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না। অর্থ বোধগম্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি না ঐ সব স্থানগুলি দর্শনের তীব্র বাসনা হয়। ঈশ্বরানুগ্রহে গয়া, কাশী, গঙ্গা-দর্শনে ধন্য হই, কিন্তু প্রভাস ও কাঞ্চীদর্শনের সম্ভাবনা যেন অনুসরণকারী ব্যক্তির ছায়ার মত কেবল পিছিয়েই যেতে থাকে। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্বে সত্যসত্যই শুভ সুযোগ এসে পড়ল; এক বন্ধুর সাদর আহ্বানে কাঞ্চীদর্শনের জন্য গত ২৫শে অক্টোবর সকালে তাঁর মোটর-গাড়ীতে উঠে বসলাম। মাদ্রাজ শহর থেকে এই ঐতিহাসিক শহর ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান মাত্র ৪৭ মাইল দূর। মাদ্রাজের এগ্‌মোর রেলষ্টেশনে গাড়ীতে উঠে চিঙ্গলপুট জংশনে গাড়ী বদল করে কাঞ্চীতে যাওয়া যায়। তা ছাড়া মাদ্রাজ শহর হতে রোজ একাধিক মটরবাসও কাঞ্চী যাতায়াত করে—বরাবর পিচের রাস্তা। আমাদের গাড়ী পুণামালী হাই রোড্ ধরে চল্‌তে লাগল। বন্ধু নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। চওড়া রাস্তার দুপাশে সবুজ ধানের ক্ষেত। ভোরের মৃদুমন্দ বাতাসে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত ধানের শীষগুলি বেশ নয়নাভিরাম দৃশ্য সৃষ্ট করছিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা শ্রীপেরম্বুদুরে এসে পৌছলাম। এই স্থানটি মাদ্রাজ হতে ২৫ মাইল—বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক উদারহৃদয় শ্রীশ্রীরামানুজাচার্যের এটি জন্মভূমি। অল্পদিন পূর্বেই এই মহাপুরুষের জন্মস্থানের ওপর একটি মন্দির এবং তৎসংলগ্ন বেশ প্রশস্ত নাটমন্দির তৈরী হয়েছে। নাটমন্দিরের সাম্‌নেই সু-উচ্চ গোপুরম্-সমন্বিত আদিকেশব পেরুমলের খুব প্রাচীন মন্দির। সত্বর কাঞ্চী-দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকায় আমরা মনে মনে দেউলের দেবতা ও শ্রীরামানুজকে প্রণাম জানিয়ে তাঁদের এলাকা ছাড়িয়ে অগ্রসর হলাম। কয়েক মাইল যাওয়ার পরই ২।৩টি খুব উঁচু মন্দিরের গোপুরম্ দেখতে পেয়ে আমরা ভৌগোলিক জ্ঞান হ'তে ঠিক করলাম যে, উহাই কাঞ্চীপুরম্—আমাদের অগুকার গন্তব্যস্থল। প্রায় ১৫।১৬ মাইল দূর থেকে ঐ গোপুরম্ দেখা গেল, কাজেই ঐগুলি কত উঁচু সহজেই অনুমেয়। অবশ্য পাহাড়ী সমতলক্ষেত্র বলে বড় গাছপালা সামনে বিশেষ ছিল না। প্রায় ৪৫ মাইল সোজা যাওয়ার পর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে মাত্র আড়াই মাইল এসেই আমরা শহরে প্রবেশ করলাম। এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ আছে, তথায় স্বামিজীদের পূর্বেই খবর

দেওয়া ছিল। খোঁজ-খবর নিয়ে আমরা আশ্রমের শান্ত-শীতল ক্রোড়ে এসে যখন পৌছলাম তখন ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে ন'টা। আশ্রমটির পরিবেশ অতি সুন্দর। কোনও ভক্ত-প্রদত্ত বাড়ীতে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত। শহরের মধ্যে সব চেয়ে বড় লাইব্রেরী ও পাঠাগার আশ্রম-কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করেন—সেজন্য সকাল-বিকাল বহু পাঠকের সমাগম হয়। দুজন সন্ন্যাসী স্থায়ী ভাবে আশ্রমে আছেন এবং অবসরপ্রাপ্ত ২।৩ জন বয়স্ক ভক্তও জীবনের শেষ সময়টুকু পবিত্র আবহাওয়ায় ও সাধুসঙ্গে কাটাবার উদ্দেশ্যে আশ্রম-বাস করছেন।

এই সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মাহাত্ম্য এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইংরেজীতে এই শহরের নাম Conjeevaram. হিন্দুরাজত্বকালে ইহা পল্লব ও চোল-বংশের রাজধানী ছিল—জৈনরাও কোন সময়ে এই শহর দখল করেন এবং এখনও তাঁদের কারুকার্যের ভূরি ভূরি নিদর্শন বর্তমান।

কথিত আছে, ভারতবর্ষে সাতটি প্রসিদ্ধ পবিত্র শহর আছে—যাদের বলা হয় সপ্তপুরী। এদের মধ্যে কাশী, হরিদ্বার ও অবন্তী এই তিনটি শিবক্ষেত্র; অযোধ্যা, মথুরা ও দ্বারকা বিষ্ণুক্ষেত্র; কিন্তু কাঞ্চী আরও বিখ্যাত যেহেতু ইহা একাধারে শিবক্ষেত্র ও বিষ্ণুক্ষেত্র। শহরের দুই অংশ—যেদিকে শিবমন্দির তার নাম শিবকাঞ্চী এবং যেদিকে বিষ্ণুমন্দির তার নাম বিষ্ণু-কাঞ্চী। বিভিন্ন সময়ে এ শহরে যে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব ছিল তার প্রচুর দৃষ্টান্ত আজও বর্তমান। বিভিন্ন যুগের শত শত শিলালিপি এখনও মন্দিরমধ্যে বর্তমান। কথিত হয়, কোনও সময়ে এই শহরে ১০৮টি শিবমন্দির এবং ১৮টি বিষ্ণুমন্দির ছিল—এছাড়া অন্যান্য মন্দিরের সংখ্যাও ছিল অনেক। শহরের মধ্যস্থলে বাস করতেন ব্রাহ্মণরা এবং উপকণ্ঠে ছিল রাজপ্রাসাদ এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বসতি। যে শহরে এতগুলি দেবালয়, তথায় ধর্মভাব যে কত প্রবল তা ধারণা করা কষ্টসাধ্য নয়।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক হুয়েন সাঙ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কাঞ্চী পরিদর্শন করেন। তাঁর বিবরণে পাওয়া যায় যে, ছয় মাইল পরিধি-বিশিষ্ট কাঞ্চী তখন সমগ্র দ্রাবিড় দেশের রাজধানী ছিল। তাঁর মতে সাহসিকতায়, পাণ্ডিত্যে ও আধ্যাত্মিকতায় এখানকার লোক ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের চেয়ে উন্নততর ছিল। তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাব ছিল এই শহরে। পরে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজের আবির্ভাব ও প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রায় একেবারেই লোপ পায় এবং তার স্থান অধিকার করে শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম। শ্রীশঙ্কর নিজে কাঞ্চীতে মঠ স্থাপন করেন এবং সে মঠের নাম দেন 'কামকোটি-পীঠম্'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মঠ কুম্ভ-কোণম্-এ স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু এখনও কাঞ্চীর বিখ্যাত কামাক্ষী মন্দিরে আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তির নিয়মিত পূজাদি হয়। কন্যাকুমারী, রামেশ্বর প্রভৃতি পরিদর্শনান্তে শ্রীশঙ্কর সমগ্র দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্র কাঞ্চীতে উপনীত হন এবং তদানীন্তন চোল রাজা রাজসেনার সাহায্যে বিষ্ণু ও শিব কাঞ্চীর সবচেয়ে বিখ্যাত বরদরাজ ও একাম্বরনাথের মন্দির সংস্কার করেন এবং কামাক্ষীদেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে সমগ্র শহরটি পুনর্গঠিত করেন। কথিত আছে, দেবী আগে পর্বত-গুহায় থাক্তেন এবং রোজ রাতে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে শহরে এসে ভীতিপ্রদর্শন, হত্যা

প্রভৃতি নানারূপ অত্যাচার ও উৎপাত করতেন। শ্রীশঙ্কর এক রাতে তাঁর সম্মুখীন হন এবং তাঁর অসীম শ্রদ্ধা, অমিত তেজ এবং অতুলনীয় জ্ঞানের প্রভাবে দেবীকে সংহার মূর্তি ত্যাগ করিয়ে কৃপাময়ী বরাভয়া কামাক্ষী-মূর্তিরূপে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। শহরবাসীর আতঙ্ক শঙ্করের কৃপায় চিরতরে দূরীভূত হয়। তদবধি দেবী কামাক্ষী সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে লক্ষ লক্ষ ভক্তসন্তান কর্তৃক অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজিতা হচ্ছেন। দেবীর পুরোভাগে অষ্টলক্ষ্মীচিহ্নযুক্ত দেবীযন্ত্র শ্রীশঙ্কর কর্তৃক স্থাপিত হয়।

পূর্বেই বলেছি শহরে অনেকগুলি মন্দির। তন্মধ্যে শিবকাঞ্চী বা বৃহৎকাঞ্চীতে শ্রীএকাম্বরনাথ, শ্রীকামাক্ষীদেবী, ও শ্রীসুব্রহ্মণ্য (কার্তিকেয়)—এঁদের মন্দির এবং বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজের মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হতে সহস্র সহস্র যাত্রী এখনও এই মন্দিরগুলি দর্শন করে অপার আনন্দ পেয়ে থাকেন। বছরে দুবার খুব বড় উৎসব হয়, তখন অগণিত লোক-সমাগম হয়ে থাকে।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণমঠে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে প্রথমেই বিষ্ণুকাঞ্চী বা ক্ষুদ্রকাঞ্চী দর্শনে গেলাম। আশ্রম হতে একজন পরিচালক আমাদের সঙ্গে এলেন। বিরাট গেট দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢুকেই বামদিকে এক পুকুরে গিয়ে তার জল স্পর্শ করলাম। শুনেছি তীর্থদর্শনে গেলে যেখানে যে আচার ও রীতি তা মেনে চলতে হয়—কাজেই পুকুরের জল স্পর্শের অযোগ্য হলেও অনেকে ভক্তিভরে সেই জলেই আচমন করছেন দেখলাম। পুকুরের উপরই একটি সুবৃহৎ মণ্ডপ—এখানে যজ্ঞাদি হয়। এই মণ্ডপের পাথরের পোষ্ট-গুলির কারুকার্য অতুলনীয়। একই পাথরের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারের দেবদেবীর সুন্দর মূর্তি, কোথায়ও বা পাথরের শিকল, কোথায়ও রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য-বিশেষ ক্ষোদিত হয়েছে, মোটের ওপর পাথরের ওপর এত সুন্দর ও সম্পূর্ণ কারুকার্য পূর্বে আর কখনও কোথায়ও দেখবার সুযোগ হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি এসব দেখে নিয়ে আমরা মন্দিরের ভেতর গেলাম—প্রথমেই নৃসিংহমূর্তি। সেখানে পূজা দেওয়ার পর মন্দিরের পেছন দিকে কতকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করে ওপরে শ্রীশ্রীবরদরাজের মন্দির। হস্তিগিরি নামে খুব ছোট একটি পাহাড়ের ওপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বিরাট চতুর্ভুজ নয়নাভিরাম পাথরের বিষ্ণুমূর্তি। পূজার জন্য আমরা নারিকেল, তুলসী, ফুল, ধূপ, মালা ও কর্পূর সঙ্গেই নিয়েছিলাম। চার আনা পয়সা দিলেই পুরোহিত যাত্রীর পক্ষ থেকে ১০৮ বার মন্ত্র পড়ে দেবতার পূজা করেন। সাধারণতঃ তুলসীপাতা দিয়েই পূজা হয়। পূজান্তে কর্পূর আরতি হল—তারপর প্রসাদী টোপর (ধাতু-নির্মিত) সব যাত্রীর মাথায় ছোঁয়ালেন। বেশ ভক্তিমান পুরোহিত ৩।৪ জন রয়েছেন; পয়সার কোনও চাহিদা নেই। পূজার হার সরকার বেঁধে দিয়েছেন, পাণ্ডার অত্যাচারও বিশেষ নেই দেখে আনন্দ হল। মন্দিরের আবহাওয়া, শ্রীমূর্তি ও পূজা বেশ লাগল। কিছুক্ষণ জপাদি করে চতুর্দিকে সুপ্রশস্ত বারান্দা দিয়ে প্রদক্ষিণ করা হল। বারান্দার এক কোণে একটু ঘেরা যায়গা—সেখানে ছাদের (ceiling) সংলগ্ন রয়েছে একটি সোনার গিরগিটি; প্রায় ১ ফুট লম্বা। উহা স্পর্শ করবার জন্য একটা মইও কড়িকাঠের সঙ্গে লাগানো রয়েছে—একজন পুরোহিত আছেন, স্পর্শ করবার জন্য এক আনা পয়সা দিতে হয়

এবং স্পর্শ করলে যত পাপ এ পর্যন্ত করা হয়েছে সব থেকে নাকি মুক্ত হওয়া যায়। মাত্র এক আনা দিয়ে সব পাপের হাত থেকে মুক্ত হতে আর ইচ্ছা হল না—দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

তারপর আমরা এলাম শ্রীশ্রীএকাম্বরনাথের মন্দিরে—বরদরাজের মন্দির হ'তে ইহা প্রায় ৩ মাইল। সামনে ২১০ ফুট উঁচু গোপুরম্—গগনবিদারী চূড়া দেখতে বেশ সুন্দর। দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা উঁচু গোপুরম্। কলকাতার মনুমেণ্টের চেয়েও উঁচু। উপরে উঠ্‌বারও বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু এদিকে প্রায় বারটা বাজে, মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে এই ভয়ে আর ওপরে ওঠা হ'ল না। মন্দির-প্রাঙ্গণে বাম দিকে সহস্র থাম (পোষ্ট)-বিশিষ্ট একটি মণ্ডপ। ইহার এক অংশ ভেঙ্গে যাচ্ছে। বাইরে থেকে মন্দির এত বড় মনে হ'ল না। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখি বিরাট ব্যাপার। কয়েক বছর আগে লক্ষ্মীর বরপুত্র এক চেটিয়ার ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দিরটি মেরামত করে দিয়েছেন। কাজেই, কত বড় ও প্রশস্ত মন্দির সহজেই অনুমেয়। অনেক দূর থেকেই দেবাদিদেব মহাদেবের পুষ্প ও বিল্বাচ্ছাদিত লিঙ্গ দেখা গেল—চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শান্ত জমজমাট ভাব। সহজেই মন স্থির হয়ে আসে। এই মন্দিরের পবিত্র গম্ভীর পরিবেশই সব থেকে ভাল লাগল। বালির লিঙ্গ, কাজেই জল দিয়ে পূজা বা অভিষেক (স্নান) হয় না। ফুল, বেলপাতা, চন্দন, মালা প্রভৃতি দিয়ে জগৎপিতার পূজা হয়। পূর্বের ন্যায় নারিকেল, ফুল, ইত্যাদি দিয়ে ১০৮ বার অর্চনা হল। কর্পূর-আরাত্রিকান্তে আমরা ভস্মপ্রসাদ ধারণ করে পরম তৃপ্তি লাভ করলাম। মন্দিরের পেছন দিকে ১৫০০ বছরের পুরাণো এক বিরাট আমগাছ। এত মোটা গুঁড়ি পূর্বে কখনও দেখি নি। চারিদিকে বাঁধানো ও ঘেরা। এখনও প্রচুর আম হয়। কথিত আছে, এই আম গাছের নীচে বসেই মা পার্বতী শিবের কঠোর আরাধনা করেছিলেন এবং শিবও সন্তুষ্ট হয়ে এখানেই তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। বেগবতী নদীর তীরে এই স্থানটি। সেখানে বালি প্রচুর, কাজেই মাটি না পেয়ে দেবী পার্বতী বালিরই শিবলিঙ্গ গড়িয়ে পূজা করতেন। মায়ের গড়া সেই লিঙ্গই নাকি এখন পূজিত হচ্ছেন। বিরাট এবং স্মৃতিবহনকারী আমগাছটি রক্ষার ভার এখন ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। এখানে যাত্রীর ভীড় খুব কম থাকায় বেশ ভালভাবে অনেকক্ষণ ধরে দর্শন করা গেল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানে শিবলিঙ্গ অপরে স্পর্শ করতে পাবে না বা গর্ভমন্দিরে কাহারও প্রবেশাধিকার নেই। একটু দূর থেকেই আমরা দর্শন করলাম। মহাদেবের একটি বিরাট রূপার রথ আছে। ৩০।৪০ ফুট উঁচু। ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনেক দিন আগে উহা নির্মিত হয়েছিল। বছরে একবার একাম্বরনাথের উৎসব-বিগ্রহ ঐ রথে চড়িয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হয়। দাক্ষিণাত্যের সব মন্দিরেই দেবতার দুইটি বিগ্রহ থাকে—একটি আসল বিগ্রহ, আর একটি ধাতু-নির্মিত উৎসব-বিগ্রহ। আসল বিগ্রহ কখনও স্থানান্তরিত হন না।

বারংবার ভোলানাথকে অন্তরের প্রণতি জানিয়ে বিদায়গ্রহণ করলাম। মন্দিরের জমাটভাব মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছিল।

তারপর আমরা কাঞ্চীর অধিষ্ঠাত্রী কামাক্ষী-দেবীর মন্দির দর্শন করে ধন্য হলাম। একাম্বরনাথের মন্দিরের কাছেই ইহা অবস্থিত। মায়েরও ঐরূপ একটি রূপার বড় রথ আছে।

মায়ের কথা পূর্বেই বলেছি। যথারীতি পুজাদি দিয়ে এবং মাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে সুব্রহ্মণ্যদেবের (কার্তিকের) মন্দির দর্শন করে প্রায় ১টার সময় আশ্রমে ফিরলাম। প্রসাদ-গ্রহণের পর একটু বিশ্রামান্তে বামনাবতারের মন্দির-দর্শনে গেলাম—আশ্রমের নিকটেই। অসময় হলেও পুরোহিত আমাদের জন্য মন্দির খুলে দিলেন—প্রায় একতলা সমান উঁচু কালপাথরের বিরাট বামনাবতারের মূর্তি। তাঁর এক পা স্বর্গের দিকে, আর এক পা পৃথিবীর ওপর এবং তৃতীয় পদ বলিরাজার মাথার ওপর। ভূমি-সংলগ্ন বলিরাজার মাথাটাই কেবল দেখা যায়। বলিরাজার দর্পচূর্ণ করবার জন্য ভগবান তাঁর কাছে মাত্র ত্রিপাদ-পরিমাণ ভূমি চেয়েছিলেন। দুই পায়ে স্বর্গ ও মর্ত আচ্ছাদন করে ফেলেন। তৃতীয় পদ রাখবার যায়গা না থাকায় বলিরাজা তাঁর মাথা এগিয়ে দেন এবং মাথার উপরই উহা স্থাপিত হয়।

শহরে দর্শনযোগ্য আরও বহু মন্দিরাদি রয়েছে; কিন্তু এ কয়টি, বিশেষ করে প্রথম মন্দির তিনটি, তন্মধ্যে আবার শ্রীশ্রীএকাম্বরনাথের মন্দির দর্শন করেই আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নানাস্থান দর্শন করে সে ভাব ভাঙ্গতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এদিকে আবার ফিরবারও সময় হ'য়ে এসেছিল, কাজেই শ্রীএকাম্বরনাথ, ৺কামাক্ষীদেবী ও শ্রীবরদরাজের উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম এবং রাত ৮টায় মঠে এসে পৌছলাম। অল্প সময়ের জন্য হলেও এ পবিত্র স্মৃতি ভুলবার নয়। তীর্থদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ও তীর্থ-মাহাত্ম্য সত্যই অস্বীকার করা যায় না। মনকে অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার এরূপ সহজ পন্থা বোধ হয় কমই আছে।

বর্ষ-বিদায়ে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এত সমারোহ, এ সাজসজ্জা,
আর নাহি ভাল লাগে,
অস্তাচলে যে চলিয়াছে রবি
বিদায়ী লোহিত রাগে।
কবে রাজসূয় হয়ে গেছে শেষ—
মিলায়ে গিয়াছে শানায়ের রেশ,
ম্লান মণ্ডপে শুকানো পাতার
মৃদু মর্মর জাগে।

সেই রথ, সেই গাণ্ডীব তূণ,
নিতি সেই অভিযান,
আকর্ষণ যে হারায়েছে তার
হাঁপায়ে উঠিছে প্রাণ।

পাণ্ডুর ছায়া ঢাকিছে অবনী,
শ্রবণে পশিছে আহ্বান-ধ্বনি—
দুর্গম মহাপ্রস্থান পথ
হাতছানি দিয়া ডাকে।

দীর্ঘ হয়েছে অতিথির স্থিতি
আর থাকা নাহি সাজে
চৈত্রের মেলা ভাঙিয়া যেতেছে
হেথা রহি কোন্ কাজে

ময়দানবের প্রসাদ বিমল,
জমিতেছে তাহে শৈবাল-দল,
মলিন ধূলির স্তর পড়িতেছে
বাসি-কুঙ্কুম-ফাগে।
আর নাহি ভাল লাগে

চতুঃষষ্টিকলা

শ্রীমতী বাসনা সেন, এম্-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে নানাবিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ইহা আমরা ভারতীয় দর্শন-কাব্য-সাহিত্যাদির আলোচনা হইতে জানিতে পারি। ভারতীয় নানাবিদ্যা যখন উন্নতির চরম শীর্ষে আরূঢ়, তখন কলাবিদ্যাও পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। যে কোন সভ্য-জাতির পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, অধ্যাত্মবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যাও বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে এই সকল বিষয়ের চর্চা না থাকায় অনেক তথ্য আমাদের অজ্ঞাত রহিয়াছে। বাৎস্যায়ন-রচিত 'কামসূত্রে' এই চতুঃষষ্টিকলা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত শুক্রনীতি-সার, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কলা-বিষয়ক বহু কথা জানিতে পারা যায়। শুক্র-নীতিসারে ক্রিয়াত্মক ভাবে অনুষ্ঠীয়মান যে অংশ তাহাই কলা নামে প্রসিদ্ধ। বিদ্যার দুই ভাগ বলা হইয়াছে—জ্ঞান ও ক্রিয়া; এই ক্রিয়া-অংশই কলাবিদ্যার অন্তর্গত। মহাভারতেও এই কলাবিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

গর্গ উবাচ—চতুঃষষ্ট্যঙ্গমদদৎ কলাজ্ঞানং মমাদ্ভুতম্—

বিদ্যা হ্যনন্তাশ্চ কলাঃ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে।
বিদ্যা মুখ্যাশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চতুঃষষ্টিঃ কলাঃ স্মৃতাঃ॥
যৎ সৎ স্যাৎ বাচিকং সম্যক্‌কর্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকম্।
সক্তো মূকোঽপি যৎ কর্তুম্ কলাসংজ্ঞন্তু
তৎ স্মৃতম্॥

(মহাভারত, আনুশাসনিকপর্ব, ১৮ অধ্যায়)

চৌষট্টি প্রকার কলা কি কি এবং তাহার প্রয়োগ কি প্রকার তাহা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে—

(১) গীত—স্বরগ, পদগ, লয়গ এবং চেতোঽবধানগেয়, এই চারি প্রকার গীত। সঙ্গীত-চিন্তামণি, সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এই গীতবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) বাদ্য—ঘন, বিতত (আনদ্ধ), তত ও সুষির এই চতুর্বিধ বাদ্য কাংস্য, (ঢক্কা) পুষ্কর, তন্ত্রী ও বেণু দ্বারা যথাক্রমে বাদিত হয়। বীণাপ্রকাশ-গ্রন্থে এই বিষয় বিশেষ-রূপে বিবৃত হইয়াছে।

(৩) নৃত্য—করণ, অঙ্গহার, বিভাব, ভাব, অনুভাব ও রস, সংক্ষেপতঃ নৃত্য এই ছয় প্রকার। পুনরায় নৃত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—নাট্য ও অনাট্য। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে নিবাসকারীদের কৃত ব্যাপারের অনু-করণই নাট্য। ইহাই বর্তমান নাটকাভিনয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্বিপরীত অনাট্য, যাহা নর্তকের আশ্রিত। অন্যান্য শাস্ত্রে নৃত্যবিশেষ বোঝাইবার জন্য পৃথক্ ভাবে নাট্যকলা বলা হইয়াছে।

(৪) আলেখ্য—রূপের বিশেষত্ব, প্রমাণ, ভাব ও লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ (নানারঙের চিহ্নদ্বারা বর্ণের উৎকর্ষ প্রতিপাদন জন্য শ্রেণীপূর্বক রঙ্‌ বিন্যাস করাকে বর্ণিকা-ভঙ্গ বলে)—এই ছয় প্রকার চিত্রযোগ। এই

চিত্রযোগ চিত্তবিনোদনের হেতু এবং অপরের অনুরাগের জনক। এই চারিটি বিষয় গান্ধর্ব-শাস্ত্র ও চিত্রশাস্ত্রে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

(৫) বিশেষকচ্ছেদ্য—তিলককাটা; বিশেষক ললাটের তিলক। পূর্বে ভূর্জপত্র কাটিয়া তিলক-রচনার প্রথা ছিল। কেবলমাত্র ভূর্জপত্র নহে, আরও উপকরণ ছিল। ললাটের তিলক প্রধান বলিয়া তাহার নামই এখানে উল্লেখ করা হইল, এই কলারই অপর নাম পত্রচ্ছেদ্য। কেবল ললাটে নহে, কপালেও এই পত্রচ্ছেদ্য রচিত হইত। প্রাচীন কালে এই শিল্প অত্যন্ত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ কলাকুশল বৎসরাজ এই তিলক-রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন।

(৬) তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার—অখণ্ড তণ্ডুল দ্বারা পদ্মাদি-রচনা, বিনাসূত্রে কুসুমাবলী দ্বারা ভূতলে লতাপ্রতান নির্মাণ, তণ্ডুলাদিচূর্ণ দ্বারা আলিপনা দেওয়া, কুসুমরসে তাহার রঞ্জন—এই সকল শিল্প ইহারই অন্তর্গত।

(৭) পুষ্পাস্তরণ—বাসগৃহে বা উপাসনা-গৃহাদিতে নানাবর্ণের পুষ্পদ্বারা যে শয্যারচনা করা হয় তাহা এই শিল্পের অন্তর্গত। ইহার অপর একটি প্রকার-বিশেষের নাম পুষ্পশয়ন। এমন কৌশলে এই পুষ্পবিন্যাস হইত, যাহা দেখিলে শুভ্রবসনাচ্ছাদিত সোপধান পুরু বিছানা বলিয়া বা নানাবর্ণের উৎকৃষ্ট গালিচা বলিয়া ভ্রম হইত।

(৮) দশনরসনাঙ্গরাগ—দশনরঞ্জন, বসনরঞ্জন ও অঙ্গরঞ্জন শিল্প। ইহা রঞ্জনশিল্প-নামেই অভিহিত। ইহার মধ্যে অঙ্গরাগ, কুসুমাদিদ্বারা অঙ্গমার্জন। বিলাসিনীদের দশনাদিসংস্কার অত্যন্ত অভীপ্সিত।

(৯) মণিভূমিকা-কর্ম—ঘরের মেঝে মণিময় করিবার অর্থাৎ মুক্তা বা মরকতাদি মণিদ্বারা শীতল মেঝে তৈরী করিবার শিল্প।

(১০) শীত-গ্রীষ্মাদি-ভেদ-অনুসারে রক্ত (অনুরাগসম্পন্ন) বিরক্ত (বিরাগসম্পন্ন) ও মধ্যস্থ (উদাসীন)-অভিপ্রায়বশতঃ আহারের পরিণাম বুঝিয়া শয্যারচনা করা; অর্থাৎ, শয়নকারীর তাৎকালিক মনের ভাব বুঝিয়া তদনুরূপ শয্যা প্রস্তুত করার বিধান বুঝাইতেছে।

(১১) উদকবাদ্য—জলে করতাড়নাদি করিয়া তাহা হইতে মৃদঙ্গ-প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি উৎপাদন। বর্তমানের জলতরঙ্গাদি বাদ্য এইরূপ।

(১২) উদকাঘাত—করতলদ্বয় পিচ্‌কারির ন্যায় করিয়া তাহার দ্বারা অন্যের গাত্রে জলক্ষেপ। এই নিক্ষিপ্ত জলধারার স্থিরলক্ষ্যতা, বেগাধিক্য বা দূরগামিত্বের তারতম্যে এই শিক্ষার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ স্থির হয়। ইহাকে ক্বচিৎ জলস্তম্ভ নামে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

(১৩) চিত্রযোগ—নানাপ্রকারে পরের অনিষ্ট-সাধন করা, একেন্দ্রিয়পলিতীকরণ ইত্যাদি। যেমন, কোন এক স্ত্রীলোক পতিসুখে সুখী আছেন, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার পতির সহিত বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে তাঁহার পতি আর তাঁহাকে কখনই ভালবাসিবেন না; সুতরাং তাঁহার দুর্ভাগ্যের আবির্ভাব হইবে। একেন্দ্রিয়পলিতীকরণ হইতেছে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেওয়া। যেমন, অন্ধ বা উন্মত্ত করিয়া দেওয়া ইত্যাদি। ইহা ঔষধ-প্রয়োগে সম্পাদিত হয়। এগুলি ঈর্ষ্যাবশত পরের অহিত-সাধনার্থে ব্যবহার্য। কিন্তু ইহা কৌচুমার যোগমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কুচুমার* ইহাদের উল্লেখ করেন নাই।

(১৪) মালাগ্রথন-বিকল্প—বিভিন্ন প্রকার মালা গাঁথা শিল্প।

(১৫) শেখরকাপীড়-যোজন—ইহাও গ্রথন বিশেষ, কিন্তু যোজনরূপে কলান্তর। শিরোভূষণে

* কুচুমার একজন প্রাচীন কামশাস্ত্র-প্রণেতা।

ন্যায়, অর্থাৎ সিঁথি, পানফুল, তারা, প্রজাপতি ইত্যাদির ন্যায় সমানভাবে শিখাস্থানে পরিধাপনযোগ্য শেখরক এবং মণ্ডলাকারে গ্রথিত কাঠির সাহায্যে পরিধাপনযোগ্য আপীড় নানাবর্ণের পুষ্পদ্বারা বিরচন। এই দুইটি নাগরের প্রধান নেপথ্যাঙ্গ। টুপি, পাগড়ী ইত্যাদি অলঙ্কারকরণ।

(১৬) *নেপথ্য-প্রয়োগ*—দেশকাল ও পাত্র-বিবেচনায় উপযুক্ত বেশভূষা ও তাহার সন্নিবেশ। ইহাই রঙ্গরচনা বা অভিনেতাদিগকে সাজান।

(১৭) কর্ণ-পত্রভঙ্গ—হস্তিদন্ত ও শঙ্খাদি দ্বারা অলঙ্কারের জন্য কর্ণপত্র-বিশেষ নির্মাণ-শিল্প। প্রাচীনকালে হস্তিদন্ত ও শঙ্খদ্বারা বহু সূক্ষ্ম অলঙ্কারাদি নির্মিত হইত।

(১৮) যথাশাস্ত্র বিধানানুসারে নানাবিধ গন্ধদ্রব্যের প্রস্তুতি। বরাহমিহির-রচিত বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থের ৭৭ অধ্যায়ে গন্ধযুক্তির অনেক কথা আছে। তাহার মর্মার্থ এই যে, একলক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশত কুড়ি প্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতি-প্রণালী এই গন্ধযুক্তির ,অন্তর্গত। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রেও এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখা যায়, ব্রহ্মবিদ্যার জন্য দেবর্ষি নারদ ভগবান সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত। সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কি বিদ্যা অবগত আছ? তুমি যাহা জান না তাহার উপদেশ দিব।' নারদ যে যে বিদ্যার উল্লেখ করিলেন তাহার মধ্যে দেবজন বিদ্যা আছে—"দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি।" (ছাঃ উঃ, ৭।১।২)

(১৯) ভূষণযোজন—অলঙ্কারযোগ, ইহা দ্বিবিধ—সংযোজ্য ও অসংযোজ্য। সংযোজ্য—মণিমুক্তা-প্রবালাদি দ্বারা কণ্ঠহার, চন্দ্রহার প্রভৃতি। অসংযোজ্য—কটক, কুণ্ডল ইত্যাদি।

(২০) ঐন্দ্রজাল—ইন্দ্রজাল-বিদ্যার প্রভাবে বিবিধপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার-প্রদর্শন।

(২১) কৌচুমার-যোগ—সৌন্দর্যাদির বৃদ্ধির উপায়-প্রয়োগ। কুরূপাকে সুরূপা করিয়া দেখান, সুরূপাকে অরূপা করিয়া দেখান, বিরক্তকে অনুরক্ত করা ইত্যাদি। যাহা অন্য উপায়ে অসাধ্য তাহা এই শিল্প জানিলে অতি সহজে করা যায়।

(২২) হস্তলাঘব—সর্বকর্মেই হস্তের লঘুতা। ইহার ফলে ঘুঁটিবাজী, তাস-উড়ান প্রভৃতি হইয়া থাকে।

(২৩) বিচিত্রশাকযূষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া—পান, রস, রাগ ও আসবের যোজন। ইহা নামতঃ ভিন্ন হইলেও একই কলা; সর্ববিধ পানাহার-প্রস্তুতির উপদেশ এই কলাতে আছে। একই কলা দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথমতঃ ব্যঞ্জন, ঝোল (যূষ), মিষ্টান্ন, অন্নপিষ্টকাদি প্রস্তুতি-বিষয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ সরবৎ, সির্কা, চাট্‌নী এবং বিবিধ সুস্বাদু আসব (মদ্য) প্রভৃতি প্রস্তুতি-বিষয়ের উপদেশ। একপ্রকার পানাহার পাকসাপেক্ষ। অন্যপ্রকার পাকনিরপেক্ষ। আহার চতুর্বিধ—চর্ব্য, চূষ্য লেহ্য ও পেয়। তদনুসারে একই কলা দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে চর্ব্য, চূষ্য প্রথমভাগে এবং লেহ্য ও পেয় দ্বিতীয় ভাগে বলা হইয়াছে।

(২৪) সূচীবাণ-কর্ম—সূচীদ্বারা যে সন্ধান-করণ (যোড়া দেওয়া) তাহাকে সূচীবাণকর্ম বলে। ইহা তিন প্রকার যথা—সীবন, উতন ও বিরচণ। সীবন—জামা প্রভৃতি সেলাই, উতন—রিপুকরা, বিরচন—কাঁথা, লেপ, তোষক ইত্যাদি। কাপড়ে ফুলকাটা প্রভৃতি বিরচন-মধ্যে পরিগণিত হয়।

(২৫) সূত্রক্রীড়া—নালিকা-মধ্যে সূত্রের সঞ্চার ও তাহাকে অন্যথা প্রদর্শন। ছেদন করিয়া, দগ্ধ করিয়া আবার সেই সূত্রকে

অচ্ছিন্ন ও অদগ্ধভাবে দেখান ব্যক্তিবিশেষ। তাহা অঙ্গুলিবিন্যাস দ্বারা সম্পাদিত হয়।

(২৬) বীণাডমরুকবাদ্য—বাদিত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইলেও বাদ্যমধ্যে তন্ত্রীবাদ্যই প্রধান। তাহার মধ্যে আবার বীণাবাদ্য অন্যতম। ডমরুর আবশ্যক, সেইজন্য এইস্থলে গৃহীত হইয়াছে।

(২৭) প্রহেলিকা—কবিতায় গোপনীয় অর্থের পরিজ্ঞান। এক কথায় হেঁয়ালি-রচনা বলা যাইতে পারে।

(২৮) প্রতিমালা—ইহা অন্ত্যাক্ষরিকা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ক্রীড়ার্থ ও বীজচালনার্থ ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক শ্লোকে যেখানে ক্রমানুসারে অন্তিম অক্ষরের সন্ধান করিয়া পরস্পর শ্লোক পাঠ করা যায়, তাহাকে প্রতিমালা কহে।

(২৯) দুর্বাচকযোগ—দুরুচ্চারণীয় শব্দ ও দুর্বোধ অর্থযুক্ত শ্লোকাদি ব্যবহার। যেমন কাব্যাদর্শে—

দংষ্ট্রাগ্রর্দ্ধ্যা প্রাগ্ যো দ্রাকক্ষামস্বস্তঃস্থামুচ্চিক্ষেপ।
দেবশ্রেটক্ষিদ্দতিকস্তত্যো যুষ্মান্ সোঽব্যাৎ
সর্পাৎ কেতুঃ॥

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন তাম্রফলকাদি হইতে শ্লোকাদির উদ্ধারও দুর্বাচকযোগের অন্তর্ভুক্ত।

(৩০) পুস্তকবাচন—রসময় কাব্যাদির রসভাব-সমুদ্রেক-হেতু শৃঙ্গারাদিরসের স্বরবিন্যাসপূর্বক গান করিয়া বাচন। কথকতা এই শিল্পের অন্তর্গত।

(৩১) নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন—নাটকের অভিনয় ও আখ্যায়িকার্থের নিপুণভাবে বর্ণনা। গদ্যপদ্যাত্মক কাব্যের মধ্যে নাটক বহুপ্রকারে বিবৃত হইয়াছে। নাটকভেদে দশটি রূপক—নাটক, অঙ্ক, বীথী, প্রকরণ, ঈহামৃগ, ডিম, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার এবং প্রহসন। এইগুলি নাটকের প্রকারভেদ।

(৩২) কাব্যসমস্যাপূরণ—এই বাক্যে সমস্যা-পদ সিদ্ধ হয়। যথা কাব্যাদর্শে—"আশ্বাসঞ্জনয়তি রাজমুখ্যমধ্যে" এই পাদটি উদ্যোগপর্বের বিষ্ণুযান-বিষয় অবলম্বন করিয়া অন্য তিনটি পাদদ্বারা সংগ্রথিত করিতে হইবে ঃ

দৌত্যেন দ্বিরদপুরং গতস্য বিষ্ণোঃ
বন্ধার্থং প্রতিবিহিতস্য ধার্তরাষ্ট্রৈ।
রূপাণি ত্রিজগতি ভূতিমন্তি রোষাৎ
আশ্বাসঞ্জনয়তি রাজমুখ্যমধ্যে॥

এখানে বিষ্ণুর বন্ধনার্থ দুর্যোধনাদি দুর্বুদ্ধিগণ একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাগত জনের মধ্যে যতিপাদবাচ্য রামকর্ণাদির এবং রাজমুখ্য বাহ্লীক প্রভৃতির মধ্যে দৌত্য-কর্মের সাধনার্থ হস্তিনায় গত কৃষ্ণের লোকত্রয়ে যে সকল ভূতিমান দেহ বিরাজিত ছিল, তাহা সে স্থলে শীঘ্র হইয়াছিল, অর্থাৎ বিশ্বরূপ প্রকটিত হইয়াছিল।

(৩৩) পট্টিকা-বেত্রবাণবিকল্প—পট্টিকা, ছুরিকা, পট্টিকার বেত্র দ্বারা বাণবিকল্প; খট্টার বা আসন প্রভৃতির বেত্রদ্বারা বাণবিকল্প বয়নপ্রক্রিয়া-বিশেষ।

(৩৪) তক্ষুকর্ম—কুন্দকর্ম, কোন দ্রব্যের অপাকরণ (মলনিবারণ, ক্ষুদ্রীকরণ) ইত্যাদি কার্যে এই শিল্পের প্রয়োজন। কিংবা কার্পাস তুলা হইতে সূত্র-নির্মাণের জন্য ব্যবহার্য।

(৩৫) তক্ষণ—শয্যা ও আসনাদি-নির্মাণার্থ ব্যবহার্য।

(৩৬) বাস্তুবিদ্যা—গৃহনির্মাণ-কার্য, ইহাই বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং বলিয়া অভিহিত।

(৩৭) রূপ্যরত্ন-পরীক্ষা—ধাতব মুদ্রাদি কৃত্রিমতা অকৃত্রিমতাদি-পরীক্ষা।

(৩৮) ধাতুবাদ—স্বর্ণরৌপ্যাদিযোজনা, মৃত্তিক প্রভৃতির পরিজ্ঞান।

(৩৯) মণিরাগাকরজ্ঞান—স্ফটিকাদি মণির রঞ্জ বিজ্ঞান।

(৪০) বৃক্ষায়ুর্বেদ—বৃক্ষচিকিৎসা ও বৃক্ষ-রোপণাদি বিদ্যা।

(৪১) মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি—ক্রীড়ার্থ পরস্পর যুদ্ধশিখান।

(৪২) শুকসারিকা-প্রলাপন—শুক ও সারিকাকে মানুষের ভাষায় পড়াইতে শিখাইলে তাহারা অতি সুন্দরভাবে তাহা আয়ত্ত করিতে পারে।

(৪৩) উৎসাদনে ও কেশমর্দনে কৌশল—উৎসাদন, অঙ্গসংবাহন, কেশমর্দন, বেণীবন্ধন প্রভৃতি। মর্দন দ্বিবিধ—হস্তদ্বারা ও পদদ্বারা। যাহা পদদ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাকে উৎসাদন বলে। আর যাহা হস্তদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে কেশমর্দন বলে। তদ্ভিন্ন অন্য অবশিষ্ট অঙ্গে যে মর্দন করা হয় তাহাকে সংবাহন বলে।

(৪৪) অক্ষরমুষ্টিকা-কথন—অক্ষরগোপন, বর্ণের সাঙ্কেতিক বিন্যাস। ইহা দুই প্রকার—সাভাসা ও নিরাভাসা। তন্মধ্যে সাভাসা—অক্ষরমুদ্রা নামে ব্যবহৃত হয়। এখন সর্টহ্যাণ্ড নামে এই শিল্প পরিচিত।

(৪৫) ম্লেচ্ছিতবিকল্প—যাহা সাধুশব্দ দ্বারা গ্রথিত হইয়াও অক্ষরের কুটিলবিন্যাসে অস্পষ্টার্থ, তাহাকে ম্লেচ্ছিত বলা হয়। ইহা গূঢ় বস্তু জানাইবার সঙ্কেতবিশেষ। (মহাভারতে এই বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারত, আদিপর্ব, বারণাবত-গমন, ১৪৫ অধ্যায়)

(৪৬) দেশভাষা-বিজ্ঞান—নানাদেশীয় ভাষা-জ্ঞান। কোন বস্তুর বিষয় সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য হইলেও তাহাদিগের নিকটেই তাহা অন্য ব্যক্তিকে জানাইতে হইলে বা তদ্দেশীয়ের সহিত ব্যবহার করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাজ্ঞান আবশ্যক।

(৪৭) পুষ্পশকটিকা—কোন পুষ্পের নাম করিতে বলিলে প্রশ্নকর্তা যে পুষ্পের নাম করিবে সেই পুষ্প-অনুসারে তাহার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের শুভাশুভফল নির্দেশক শাস্ত্র হইতে শুভাশুভ ফল বলিবার জন্য সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়।

(৪৮) নিমিত্তজ্ঞান—যে কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের শুভাশুভ বলিতে পারা। ইহা ফলিত জ্যোতিষের অন্তর্গত।

(৪৯) যন্ত্রমাতৃকা—ইহার প্রণেতা বিশ্বকর্মা। ইহাতে দুই প্রকার যন্ত্রের কথা কথিত হইয়াছে। সজীব যন্ত্র— রথ, শকট, তৈল যন্ত্র ইত্যাদি গো, মহিষ, অশ্বাদি দ্বারা পরিচালিত এবং নির্জীব যন্ত্র—বায়ুবেগে, স্রোতবেগে, বাষ্পবেগে ও তড়িদ্বেগে যে সকল যন্ত্র পরিচালিত হয়; যেমন, রণতরী, ব্যোমযান, পুষ্পক, আগ্নেয় রথ, তরণী ইত্যাদি।

(৫০) ধারণমাতৃকা—শ্রুতগ্রন্থের ধারণার্থ শাস্ত্র-বিশেষ—

যস্তু কোষস্তথা দ্রব্যং লক্ষণং কেতুরেব চ।
ইত্যেতে ধারণাদেশাঃ পঞ্চাঙ্গরুচিরং বপুঃ॥

যাহাতে পাঁচ প্রকার বিষয় কথিত হইয়াছে, যাহা জানিলে একবার যে কোন গ্রন্থ শুনিতে পাওয়া যায় তাহার আর বিস্মরণ হইতে পারে না।

(৫১) সংপাঠ্য—সহযোগে পঠন। ক্রীড়া বা বাদের জন্য মিলিত ভাবে পাঠ।

(৫২) মানসী—মনে মনে চিন্তা, তাহা দৃশ্যবিষয় ও অদৃশ্যবিষয়-ভেদে দ্বিবিধ। কেহ ব্যঞ্জন অক্ষরদ্বারা পদ্ম ও উৎপলাদির আকৃতি নির্মাণ করিয়া যথাস্থানে অনুস্বার ও বিসর্গ যোগদ্বারা তাহার অর্থ না বলিয়া একটি শ্লোক বলিল। অন্য ব্যক্তি তাহার মাত্রা, সন্ধি-সংযোগ, অসংযোগ ও ছন্দে বিন্যাসাদি করিয়া অভ্যাসবশতঃ মিতাক্ষরের ন্যায় পাঠ করিবে। ইহাকে দৃশ্যবিষয়া বলে; কারণ, দেখিয়া পাঠ করা হয়। শ্লোকবিন্যাস-

ক্রমে পাঠ করিলে অদৃশ্যবিদ্যা বলে। ইহার অন্যনাম আকাশমানসী।

(৫৩) কাব্যক্রিয়া—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ কাব্য করা।

(৫৪) অভিধান-কোষ—উৎপলমালা, অমরকোষ ইত্যাদি।

(৫৫) ছন্দোজ্ঞান—পিঙ্গলাদি-প্রণীত ছন্দোগ্রন্থের জ্ঞান।

(৫৬) ক্রিয়াকল্প—কাব্য করিতে জানা; অলঙ্কার-বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করা।

(৫৭) ছলিতকযোগ—ইহা পরব্যামোহার্থ প্রযোজ্য। এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, অন্যরূপ দ্বারা বিশেষ ভাব প্রকাশ করিয়া দেবতা ও অন্য ব্যক্তিতে প্রয়োগ দ্বারা উপভোগ করা হয় তাহাকে ছলিতক বলে। যথা শূর্পনখা দিব্যরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিয়াছিল। আর ভীমসেনও ছলিতকযোগ জানিয়াই কীচকের নিকট স্ত্রীরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন।

(৫৮) বস্ত্রগোপন—বস্ত্রদ্বারা অপ্রকাশ্য দেশের অংশ কৌশলে সংবরণ করা। বিশাল বস্ত্রের সম্বরণাদি দ্বারা অল্পীকরণ। ইহাকেই গোপন বলা যায়।

(৫৯) দ্যূতবিশেষ—ইহা নির্জীব দ্যূতবিধান, তাহার মধ্যে প্রাপ্তি আদি পঞ্চদশ অঙ্গ দ্বারা যে মুষ্টিক্ষুল্লকাদি দ্যূতবিশেষ। ইহা তাসখেলা প্রভৃতি।

(৬০) আকর্ষক্রীড়া—পাশক্রীড়া ইহারই অপর নাম।

(৬১) বালক্রীড়নক—গৃহকন্দুক (যাহা এখন বল ও ফুটবল খেলা নামে অভিহিত হয়), কৃত্রিম পুস্তকাদি দ্বারা যে সকল বালকদের ক্রীড়নক।

(৬২) বৈনয়িকী বিদ্যা—আচারশাস্ত্র; হস্তী, ঘোটক, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি জন্তুকে শিক্ষা দ্বারা বিনীত করিতে পারা যায়। ইহা বর্তমানে সার্কাস্-রূপে পরিগণিত।

(৬৩) বৈজয়িকী-বিদ্যা—ইহার ফল বিজয় লাভ করা। ইহা দুই প্রকার যথা—দৈবী ও মানুষী। তন্মধ্যে দৈবী বৈজয়িকী বিদ্যা অপরাজিতাদি তন্ত্রোক্ত বিবিধ প্রকার দ্রষ্টব্য। আর মানুষী সংগ্রাম প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা।

(৬৪) বৈয়াসিকী বিদ্যা—ইহার অর্থ শরীরকে ইচ্ছানুসারে কার্যক্ষমকরণ। মৃগয়াদি ইহারই একটি অঙ্গমাত্র।

এই কলাবিদ্যা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতীয় কলাবিদ্যার মধ্যে প্রায় সকল বিদ্যাই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আজ আমরা বিদেশীয় নানা নামে ভূষিত যে সকল fine artsএর কথা শুনিতে পাই তাহার সকলই এই কলা বিদ্যায় অভিহিত হইয়াছে। কেবলমাত্র যে দর্শন, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতিতে ভারত উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা নহে; কলাবিদ্যাও প্রাচীনযুগে চরম উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে; ভারতবাসী শিক্ষায়, দীক্ষায় শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিগণের অন্যতমরূপে পরিগণিত হইবে, সন্দেহ নাই। ভারতবাসী যদি তাহার সংস্কৃতির সম্পদ-বিষয়ে যথার্থ অবগত হয়, তবেই ইহা সম্ভব হইবে। কলাবিদ্যার পূর্ণ পরিজ্ঞান লাভ করিয়া তাহার প্রয়োগ করিলে শিক্ষাজগতে অভিনব বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইবে। সকলকেই যে এক শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইতে হইবে এমন কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম না রাখিয়া যদি শিক্ষা-বিষয়ে কলাবিদ্যা বহুলভাবে প্রবর্তিত হয় তবে জাতির বিভিন্ন-মুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। মাত্র বিধিবদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়াও দেশের জনগন কলাবিদ্যার প্রভাবে নানা উপায়ে জীবিকা-অর্জনও করিতে পারিবে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি

ইডা আন্‌সেল

[হলিউড বেদান্ত কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত Vedanta and the West পত্রিকার সৌজন্যে। শ্রীমতী সূর্যমুখী দেবী কর্তৃক অনূদিত]।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্তৃক আমেরিকায় প্রথম বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠার একমাত্র জীবিত প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা হিসাবে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ। দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যাবার সময় স্বামী বিবেকানন্দ এঁকে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন যাতে আমেরিকায় তাঁর সহকারী রূপে কাজ করতে পারেন। প্রথমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারত ত্যাগ ক'রে সেখানে যেতে অস্বীকার করেন, কিন্তু শেষে যখন স্বামিজী তাঁকে মিনতি করে বললেন, "হরি ভাই, একা আমি খাটতে খাটতে মরে যাচ্ছি—তুমি কি একটু সাহায্য করবে না?" তখন তিনি যেতে সম্মত হলেন।

১৮৯৯ সালের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ কালিফোর্ণিয়ায় আসেন এবং লস্ এন্‌জেলেস্ শহরে বক্তৃতা দেন। কখনও কখনও তিনি মিড (Mead) ভগিনীত্রয়ের বাড়ীতে থাকতেন। এঁদেরই একজন হচ্ছেন মিসেস্ এলিস্ হান্‌সবারো। স্বামিজীর কাজে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্‌কোতে আসেন। ডক্টর বি, কে, মিলস্ এর ইউনিটেরিয়ান্ চার্চে স্বামিজীর কয়েকটি বক্তৃতা হয়। এইসব ভাষণে খুব একটা উৎসাহের সাড়া পড়ে যায় এবং স্বামিজী অক্‌ল্যাণ্ড, আলামেডা এবং সান্‌ফ্র্যান্‌সিস্‌কোতে পর পর অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। প্রধানতঃ তিনি আলামেডায় 'হোম্ অব ট্রথ্' এ থাকতেন। সানফ্র্যান্‌সিস্‌কোতে একটি ছোট দল গ'ড়ে ওঠে। এঁরা ওখানে থাক্‌বার জন্য স্বামিজীর কাছে প্রার্থনা জানান। কিন্তু স্বামিজী তখন ভারতে ফিরে আস্‌তে অত্যন্ত উদগ্রীব। তিনি বললেন,—"আমি এমন একজন হিন্দু সন্ন্যাসীকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব যাঁর জীবনটি তোমরা দেখতে পাবে আমার উপদেশ-গুলির প্রত্যক্ষ মূর্তি।" তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে মনে করেই এই কথা বলেছিলেন। তুরীয়ানন্দজী তখন নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দকে সাহায্য করছেন।

যাহোক স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন আমাদের কাছে এলেন আমরা কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজীর ঐ উক্তি তাঁকে বলি। তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি হচ্ছি একটি ছোট্ট ডিঙ্গি, বড় জোর দু তিন জন লোককে পার করে দিতে পারি, কিন্তু স্বামিজী হচ্ছেন একটি বিরাট জাহাজ; বিপুল সংসার-জলধিতে হাজার হাজার লোকের তিনি কর্ণধার হতে পারেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দকে ডেট্রয়েটে রেখে বিদায় নেবার সময় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে যে শেষ উপদেশ দিয়ে যান সে কথাও তিনি আমাদের বললেন,—"ভারতকে ভুলে যাও। ঐ অঞ্চলে গিয়ে আশ্রমটি গড়ে তোল। বাদ বাকী মা সম্পূর্ণ করে দেবেন।" পরবর্তী কালে স্বামী

তুরীয়ানন্দ বলেছিলেন যে, তিনি স্বামিজীর একটি কথা রাখতে পারেননি—ভারতকে ভুলে যাওয়া।

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্যানফ্র্যান্সিস্কোতে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই সময়ে সকালে তিনি ধ্যানশিক্ষা দিতেন। সঙ্কল্পিত কাজের কোন্ দিক্‌টা আগে হাত দেওয়া হবে এই নিয়ে সকলের সঙ্গে তখন বিশেষ আলোচনা চলে। শহরের বহু লোক যেখানে আসতে পারে সেই রকম একটা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে কিংবা কতিপয় খুব নিষ্ঠাবান্ ও আগ্রহশীল ধর্মজীবনলাভেচ্ছুর উপকারের জন্য শহর থেকে দূরে একটি আশ্রম শুরু করা হবে? স্বামী তুরীয়ানন্দ মনোযোগ-সহকারে সব রকম আলোচনা শুনে ঠিক করলেন, প্রথমে আশ্রমটাই হওয়া চাই। বললেন,—"মা প্রসন্না হয়েছেন।" সুতরাং ঠিক হল যে মিস্ বুক* আর মিস্ লিডিয়া বেল (Lydia Bell) আশ্রম স্থাপনের প্রস্তাবিত স্থানে কিছুদিন আগেই যাবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সব করে ফেলবেন।

অল্প বয়সে স্বাস্থ্যহানির দরুন স্বাভাবিক সর্বরকম কার্যক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি তেইস বছর বয়সেই একরকম অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলাম। শরীর ছিল খুব কৃশ। কিন্তু এসব অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি আশ্রমে যাবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে অনুমতি চাইলাম। আমার দিকে চেয়ে স্নেহভরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি যেতে চাইছ কেন?"

আমি বললাম,—"মাখন হব বলে।"† তিনি খুব খুশী হয়ে উত্তর দিলেন,—"তুমি যেতে পার তোমার মা যদি অনুমতি দেন। আর দৃঢ় অধ্যবসায় যদি থাকে তো 'মাখন' হয়ে যেতে পার।"

বর্তমানে কয়েকঘন্টার মধ্যেই মোটরকারে স্যানফ্র্যানসিস্কো থেকে শান্তি আশ্রমে যাওয়া যায়। কিন্তু আমি বলছি ১৯০০ খৃঃর কথা। তখন রেলগাড়ীতে যেতে হত স্যান্ জোস্ (San Jose); তারপর চারঘোড়ার গাড়ীতে করে মাউন্ট্ হ্যামিল্টন্ পর্যন্ত—সেখান থেকে ২০ মাইল একটা সরু পার্বত্য পথ ধরে নিজেদের যানবাহনে স্যান্ এন্টন্ ভ্যালিতে পৌঁছুতে হত।

একদিন আমাদের দলটি বিকেলের দিকে স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কো ছাড়েন - রাতে স্যান্-জোসের একটা ছোট হোটেলে কাটিয়ে ভোর চারটার সময় পাহাড়ের অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। দলের সকলেই ছিলেন খুব আমোদপ্রিয় ও উৎসাহী। সারা মনঃপ্রাণে এঁরা ভ্রমণটিকে উপভোগ করছিলেন। যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম পথের দৃশ্য ততই মনোরম এবং পরিবর্তিত হচ্ছিল। সুদৃশ্য গ্রামঅঞ্চলের ভিতর দিয়ে চওড়া রাস্তাটি চলে গেছে। কোথায়ও গোলাবাড়ী, কোথাও ফলের বাগান—এরই মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগ্‌লাম। দুবার পথে ঘোড়া বদল করা হ'ল। বেলা দুটোয় মাউন্ট্ হ্যামিল্টনের শিখরস্থিত লিক অবজারভেটরীতে পৌঁছানো গেল। এখানে আশানিরাশার একটি প্রকাণ্ড

* মিস্ মিনি সি বুক (Minnie C Booke)। সান্ অ্যান্টন ভ্যালিতে একখণ্ড জমি ইনি স্বামী বিবেকানন্দকে দিতে চেয়েছিলেন একটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য।

† পূর্বে একটি বক্তৃতায় স্বামী তুরীয়ানন্দ আত্মানুভূতির ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন—দুধের ভিতর যেমন মাখন আছে কিন্তু মন্থন না করলে তা পাওয়া যায় না, সেই রকম প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন তাঁকে ধ্যান-সহায়ে প্রত্যক্ষ করতে হয়। 'মাখন হওয়া' মানে আমি আত্মজ্ঞানলাভ করা বুঝাতে চেয়েছিলাম।

দ্বন্দ্ব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের দলে সবশুদ্ধ নয় জন লোক—সঙ্গে তাঁবু, খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিসপত্রও প্রচুর। কিন্তু দেখলাম আমাদের জন্যে রয়েছে গদিওয়ালা দুটি সিট্‌যুক্ত ছোট্ট একখানা গাড়ী, চারটি খচ্চর টান্‌ছে। স্যান্ এ্যান্টন্‌ভ্যালির অধিকাংশ জমির মালিক মিঃ পল্ গারবার গাড়ীটির চালক। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর গাড়ীতে ছোট একটা পুঁট্‌লী পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে না। পাহাড়ের অন্যদিকে আমাদের গন্তব্য স্থানের দিকে চেয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দকে খুব চিন্তান্বিত দেখা গেল। তাঁর নৈরাশ্য দেখে মিসেস্ আগ্‌নাসষ্ট্যান্‌লি এগিয়ে এলেন এবং তাঁর কোলের উপর নিজের টাকার থলিটি উজাড় করে তাঁকে ভর্ৎসনার স্বরে বল্লেন—"একটা শিশুকেও যে বিশ্বাসটুকু রেখে চল্‌তে হয় আপনার দেখছি সেটুকুরও অভাব।" তুরীয়ানন্দজী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উত্তর দিলেন,—"তুমি আমার মা, তোমার নাম দিলুম 'শ্রদ্ধা'।"

অবজারভেটরি থেকে কোন গাড়ী ভাড়া পাওয়া সম্ভবপর হল না। কিন্তু তাঁরা দুটো ঘোড়া ধার দিলেন। সুতরাং দলের দুজন লোক—একজন হচ্ছেন মিসেস্ ষ্ট্যান্‌লি, আর একজন ডাঃ এম্ এইচ্ লোগান্—ঘোড়ায় উঠ্‌লেন। বেচারি মিঃ জর্জ রুরব্যাক্ চাপলেন তাঁর বাইসিক্‌লে (বাইসিক্‌লটি লটবহররূপে যাবার কথা ছিল)। দলের বাকী কয়জন কোনও মতে পূর্বোক্ত গাড়ীতে উঠে প'ড়লেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, চালক এবং দুজন মহিলা বসলেন সিট্‌এ। অবশিষ্ট আমরা তিন জন উঁচুর দিকে পা তুলে গাড়ীর মেঝেতে বসলাম। দুজনকে দুপাশে জাপটে ধরে মাঝখানে আমি বসেছিলাম। ওঁরা দুজন আবার গাড়ীর দুটো পাশ চেপে ধ'রে চ'ল্‌ছিলেন। নীচের দিকে নাম্‌তে একটু বেশ আরাম লাগ্‌ছিল, কিন্তু উপরে উঠ্‌বার সময় সাথী দুজনকে জোরে জড়িয়ে ধরতে হচ্ছিল। সরু রাস্তা—ধুলোয় ভর্তি। মাঝে মাঝে গভীর খাদ। চাষ-আবাদহীন আরণ্য অঞ্চল। কিন্তু চারিপাশে নিবিড় সৌন্দর্য। খুবই গরম লাগছিল, জলও পথে নেই। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে নীরবে বসে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। কথাবার্তা চল্‌ছিল খুব কম। বিকেলের শেষাশেষি মিসেস্ ষ্ট্যান্‌লি গরমে মূর্ছিতা হ'য়ে ঘোড়া থেকে প'ড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ খুব উত্তেজনা চল্‌লো। অবশেষে তাঁর সংজ্ঞা এলো। স্বামিজী তাঁকে গাড়ীতে তুলে বসাতে বল্লেন। নিজে উঠলেন ঘোড়ায়। অবশেষে বাদামী রংএর একটি ঘোড়ায় সোজাভাবে উপবিষ্ট গেরুয়াবর্ণের রেশমী সুট পরিহিত স্বামী তুরীয়ানন্দকে পুরোভাগে নিয়ে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছুলাম।

জায়গায় পৌছে আমাদের খুশীর অন্ত নেই। কিন্তু আসার পরই আর এক সমস্যা দেখা দিল। কয়েক বছর মিস্ বুক্ তাঁর এই নিভৃত বাড়ীটিতে আসেন নি। অনেক জিনিস-পত্র সরিয়ে ফেলা হ'য়েছে। মিঃ গারবারের সাহায্যে দুই জন মহিলা সমস্ত উপত্যকাটা ঘুরে কিছু কিছু আসবাবপত্র সংগ্রহ করে ফিরে এলেন। পরিত্যক্ত কয়েকটি কেবিন থেকে এসব সংগৃহীত হল। রাতের খাবার হল ভাত আর লাল চিনি। খেয়ে নিয়ে আমরা আগুনের পাশে গোল হ'য়ে বসলাম। স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সুমিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠনিঃসৃত সংস্কৃত মন্ত্রগুলো শুনতে শুনতে আমরা সব কষ্ট ও ক্লান্তি ভুলে গেলাম। মন্ত্রের ভাবার্থ :--

"সেই পরম পুরুষ যিনি এই বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি ক'রেছেন—তাঁরই জ্যোতির্ময় সত্তার আমরা ধ্যান করি। তিনি আমাদের অন্তরকে আলোকিত করুন।"

একটা গভীর প্রশান্তি আমরা অনুভব করতে লাগলাম। স্নিগ্ধ বাতাস মৃদুভাবে বইছিল। ঘন কাল রাত। উজ্জ্বল তারাগুলি যেন নুয়ে প'ড়ছিল আমাদের কাছে। ফেলে আসা অতীতের বিয়োগান্ত মুহূর্তগুলি—আর মূঢ় আমোদ-প্রমোদের ক্ষণগুলি সব যেন অস্পষ্ট স্বপ্নের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে—আর এই মুহূর্তেই যেন আরম্ভ হয়েছে আমাদের নূতন জীবন!

(ক্রমশঃ)

দর্শন ও ধর্ম

(হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গীতে)

স্বামী নিখিলানন্দ

সংস্কৃত দর্শন-শব্দ দৃশ্ ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। ইহার অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। দৃশ্ ধাতুর অর্থ 'দেখা'। সুতরাং হিন্দু-ঐতিহ্যে দর্শন মানে তত্ত্বের অবান্তর বিবৃতি, অথবা বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববোধের প্রচেষ্টা-মাত্র নহে। ইহার অর্থ দেখা, তত্ত্বের অনুভব এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ইহার প্রয়োগ। পাশ্চাত্ত্য চায় তত্ত্বকে বুদ্ধিগম্য করিতে, প্রাচ্য চায় তত্ত্বে আপনাকে পরিণত করিতে।

সংস্কৃত 'ধর্ম'-শব্দ প্রায়ই 'রিলিজনে'র প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়। ধর্ম ধৃ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ করা। সুতরাং ইহার তাৎপর্য ইংরেজী রিলিজন্-শব্দের তাৎপর্য হইতে ব্যাপকতর। ধর্ম প্রাণীকে ক্রমবিকাশের পথে ধারণ করে, রক্ষা করে। ধর্ম আভ্যন্তর নিয়ামক, বস্তুর সত্তাস্বরূপ; ধর্ম ব্যতীত বস্তুর বর্তমান সত্তা সম্ভব হইত না। যেমন, অগ্নির ধর্ম দহন, জলের ধর্ম প্রবহণ এবং অশ্বের ধর্ম হ্রেষাদি। বৃশ্চিক, ব্যাঘ্র, যোদ্ধা, বণিক্, সাধু—সকলেই স্ব স্ব স্বাভাবিক ক্রিয়াব্যবহারে নিজ নিজ 'ধর্মের' অনুবর্তন করে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকারগণ 'গৃহস্থের ধর্ম,' 'সন্ন্যাসীর ধর্ম' নির্দিষ্ট করিয়াছেন; পরধর্ম যতই মনোরম হউক উহা অনুসরণীয় নয়।[১] ইহাই তাঁহাদের সাবধান বাণী। স্বধর্মের সম্যক্ একনিষ্ঠ অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষ পরমমঙ্গলময় আপ্তব্যকে জীবনে লাভ করে।[২] ক্রমোন্নতির পথে মানুষ ভগবৎসত্তা-সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন, যথাসময়ে সর্বপ্রকার পার্থিব কর্মানুষ্ঠানকে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানের শরণাগতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।[৩]

উপনিষৎ-সম্মত তত্ত্বজিজ্ঞাসার ক্রম হইল—উপযুক্ত গুরু-সন্নিধানে শাস্ত্রবাক্যের শ্রবণ, প্রাপ্ত গুরূপদেশ-অনুধাবনের জন্য যুক্তি-প্রয়োগ এবং অনুভবের সাহায্যে শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য-স্বরূপ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার।[৪]

বেদাদি শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ; ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাঁহাদের উক্তিকে সিদ্ধান্তমুখী সাময়িক অনুমান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রহ্ম দেহাদি-ব্যতিরিক্ত, মন-আদি ব্যতিরিক্ত; সুতরাং যুক্তিগম্য নন। যুক্তির ভিত্তি হইল ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান এবং এই ইন্দ্রিয়জ অনুভবের উপরই যুক্তির নির্ভর। দেখিতে হইবে, শাস্ত্রব্যাখ্যা যেন যুক্তিবিরোধী না হয়। তত্ত্ব-সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া শাস্ত্রবাক্যকে

১ "শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥"
(গীতা, ৩।৩৫)

২ "স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"
(গীতা, ১৮।৪৫)

৩ "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীতা, ১৮।৬৬)

৪ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৪।৫)

অবিচারপূর্বক স্বীকার করা মানুষকে প্রায়ই এক-দেশদর্শী ধর্মান্ধ করিয়া তোলে।[৫]

কিন্তু বিচারও প্রায়ই আমাদের ভোগেচ্ছার যৌক্তিকতা-প্রদর্শনে পরিণত হয়। প্রায়ই দেখা যায়, যাহা আমরা প্রমাণ করিতে চাই, তাহাই আমরা প্রমাণ করি। যুক্তি ভাবাবেগের সহজলভ্য যন্ত্রস্বরূপ। বিরাট বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে যুক্তি যে পর্যাপ্ত নহে, তাহা আজকাল কোন কোন আধুনিক জড়বিজ্ঞানীও স্বীকার করেন। এতদ্ভিন্ন যুক্তিলব্ধ জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়। সুতরাং এইরূপ জ্ঞান বহুত্বের বোধকে বিনাশ করিতে পারে না। এই বহুত্বের আভাস প্রত্যক্ষ; বেদান্তিগণের মতে ইহা অবিদ্যা-সৃষ্ট। হিন্দু দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুকে আর এক প্রকার অনুভূতির অনুশীলন করিতে হইবে—ইহাকে বলে অপরোক্ষানুভূতি। এই প্রত্যক্ষানুভব ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে না। এই প্রকার অপরোক্ষানুভূতিতে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি থাকে না। ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়াকারিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান আপেক্ষিক।[৬]

সকল হিন্দু দার্শনিকগণের অভিমত, প্রত্যক্ষানুভবই ব্রহ্মসত্তার চরম প্রমাণ।[৭] কিন্তু এই অনুভূতি শাস্ত্রপ্রমাণ বা যুক্তি-বিরোধী হইবে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভবের ভিত্তিতেই কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণসহ হইতে পারে; যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কোন আইন কংগ্রেস, শাসনবিভাগ এবং সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদন দ্বারাই বিধিবদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রত্যক্ষানুভব লাভ করিবার জন্য হিন্দু দার্শনিকগণ যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহা যোগনামে অভিহিত। যোগোক্ত নিয়ম প্রধানতঃ—শম-দম, অনাসক্তি এবং চিত্তের একাগ্রতা। যোগাভ্যাস দ্বারা বিচারবৃত্তি বোধিতে পরিণত হয়। এই বোধি দ্বারাই তত্ত্বের অপরোক্ষানুভব হয়। এই অবস্থা মানসবৃত্তির নিরোধ-সাপেক্ষ নয়। লোভ, কাম, অহঙ্কার-রূপ মলনির্মুক্ত চিত্তবৃত্তিকেই বোধি বলা যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন, শুদ্ধমন ও শুদ্ধচৈতন্য বা ব্রহ্ম একই বস্তু।

উপনিষদের মতে ব্রহ্মকে জানার অর্থ ব্রহ্মভূত হওয়া।[৮] যথার্থ দার্শনিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা ও চরিত্রে রূপান্তর উপস্থিত হয়। সুতরাং এই প্রকার জ্ঞানানুসরণের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাদির অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য। কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রয়োগে সাধুতা যথেষ্ট নয়। হিন্দু দার্শনিকগণ জোরের সহিত বলেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সংযমরূপ সাধন-সম্পদে সম্পন্ন হইবেন। কায়-মনোবাক্যে পবিত্রতা, গুরুভক্তি, সত্যানৃতবস্তু-বিবেক, অতত্ত্ব বিষয়ে অনাসক্তি, শীতোষ্ণ, সুখ-

৫ অধ্যাত্ম-শাস্ত্র 'ব্রহ্মসূত্রে' ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বকে শাস্ত্র-বাক্যের ভিত্তিতেই প্রমাণ করা হইয়াছে (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৩); অবশ্য আচার্য শঙ্কর মাণ্ডূক্য উপনিষদের উপর গৌড়পাদ-কৃত কারিকার ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, শাস্ত্রপ্রমাণব্যতিরেকে যুক্তিদ্বারাও ব্রহ্মসত্তা সিদ্ধ হইতে পারে। (মাণ্ডূক্য-কারিকা, ২।১; ৩।১) তিনি শ্রুতিপ্রামাণ্যে অবিশ্বাসী বৌদ্ধ ও জৈন-মত খণ্ডনক্রমে ব্রহ্মসত্তা-প্রতিপাদন করিতে গিয়া মুখ্যতঃ যুক্তি-বিচারের উপর নির্ভর করিয়াছেন।

৬ "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।" (কঠোপনিষৎ, ২।১।১)

৭ জড়বাদী লোকায়তিক চার্বাকমতাবলম্বিগণ প্রত্যক্ষকে বস্তুজ্ঞান-বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের দার্শনিক সম্প্রদায় বহুকাল লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদের রচনা বিচ্ছিন্ন আকারে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সাগ্রহ সত্যকার তত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধিৎসাকে হিন্দুগণ উদারতা-বশতঃ 'দর্শন'-নামে অভিহিত করিয়াছেন।

৮ "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"
(মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৯)

দুঃখ, মান-অপমান এবং জড়জগতের অন্যান্য দ্বন্দ্বসমষ্টির প্রতি কতকটা ঔদাসীন্য; আর্তের প্রতি করুণা এবং পার্থিব জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য অবিচলিত মানসিক দৃঢ়তা—এই সকল গুণাবলীও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অনুশীলনের বিষয়। অবস্তুর প্রতি বিরাগ এবং মুক্তির জন্য সুগভীর আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত নৈতিক নিয়ম-চর্চা মরুভূমিতে জলাভাসের ন্যায় নিতান্ত বাহ্য অবভাস-মাত্র। কেবলমাত্র নৈতিক অনুশীলন দৃঢ়ভিত্তিহীন, ইহা যে কোন সময় মরীচিকার মত বিলীন হইয়া যাইতে পারে।[৯] করুণাহীন জ্ঞান নররক্ত-পিপাসু দেবতার মত হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যজীবনের নৈতিক মূল্য-বিষয়ে উদাসীন আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কার ইহার পরিচয় দেয়। যে জ্ঞানের পরিণতি মনুষ্যসমাজের বিনাশ তাহার যথার্থ মূল্য কি, সে বিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে।

গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের ব্যাখ্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের তিনটি লক্ষণের কথা বলিয়াছেন—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অন্য জ্ঞানের সহিত কোন বিবাদ থাকিবে না, ইহা অন্য জ্ঞানের বিরোধী হইবে না, ইহা সকলের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে।[১০] অল্প জ্ঞানেই বিরোধ, ভূমাতে বিরোধের সম্ভাবনা নাই।[১১] স্বভাবতই ঐক্যাত্মক বলিয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বিরোধ-বিবর্জিত। তত্ত্ববস্তু দ্বৈতহীন এবং সর্ববিসারী। সুতরাং জড় ও চৈতন্য উভয়ই তাহাতে অনুস্যূত। সর্বসংশয় তখনই ছিন্ন হইতে পারে, যখন মানুষ 'পর' ও 'অবর' অর্থাৎ জড় ও চৈতন্য-স্বরূপ সেই পরমতত্ত্বকে জানিতে পারে।[১২]

তত্ত্বসাক্ষাৎকার অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান এই জন্মেই লাভ করিতে হইবে। মৃত্যুর পরে কি ঘটে, তাহা অনুমানের বিষয়। উপনিষদ্ এই জন্মেই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের কথা বলিয়াছেন।[১৩] জ্ঞানেই মুক্তি। আচার্য শঙ্কর জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ এই মর দেহেই মুক্তি হইতে পারে স্বীকার করিয়াছেন। মুক্তপুরুষ 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা' পাপ-পুণ্যাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকিয়া জগতে বাস করেন। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকগণ—তাঁহারা প্রচলিত ধর্মমত দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত—বিদেহ-মুক্তি, অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, জীবাত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে অধিষ্ঠিত আছেন, ততক্ষণ তিনি সম্পূর্ণভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, জরা, মৃত্যুরূপ-উপাধি-মুক্ত হইতে পারেন না। অবশ্য তাঁহারাও বলেন, সমাধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার পার্থিব পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিলাভ করিয়া মুক্তপুরুষ হইতে পারেন, যদিও দেহাপগমে আসিবে তাঁহার

৯ "এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবত্তত্র শমাদের্ভানমাত্রতা।"
(বিবেকচূড়ামণি, ৩০)

১০ "অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্।"
(মাণ্ডুক্যোপনিষদ্-গৌড়পাদ-কারিকা, ৪।২)

১১ "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৩)

১২ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"
(মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮)

১৩ "ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে।"
(কঠোপনিষৎ, ২।৩।৪)

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"
(কেনোপনিষৎ, ২।৫)

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স কৃপণঃ।"
(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।১০)

চরম মুক্তি। বোধিবৃক্ষ-মূলে বুদ্ধ নির্বাণ-লাভ করেন; কিন্তু দেহান্তে লাভ করেন আত্যন্তিক মুক্তি বা পরিনির্বাণ।

বেদান্ত-দর্শনে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম-নামে অভিহিত। বিভিন্ন বৈদান্তিক দার্শনিক ব্রহ্মকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্গুণ, সর্বোপাধিবর্জিত এবং জীব ও জগতের সঙ্গে অভিন্ন। ব্রহ্মই একমাত্র সদ্‌বস্তু। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তন্তর কেহ যদি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি অবিদ্যাগ্রস্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং দ্বৈতবাদী মধ্বের মতে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ। রামানুজ বলেন, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ, জীব ও জগদ্‌রূপেই ব্রহ্ম অভিব্যক্ত; স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ তদ্রূপ ইহারা ব্রহ্মেরই অংশ। কিন্তু মধ্ব জীব ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, তাঁহারা উভয়েই বিদেহমুক্তি স্বীকার করিয়াছেন যদিও তাহা শঙ্করস্বীকৃত নয়। অদ্বৈতবাদ-অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানান্তে জীবের সবিশেষত্ব অপসৃত হয়, কিন্তু দ্বৈতবাদ-মতে অহং-এর নাশ নাই, ইহা বিলয়হীন, অবশ্য ভগবদ্‌জ্ঞানে ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়।

সকল হিন্দু আচার্য বেদকেই স্ব স্ব মতবাদের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষৎসমূহে বৈদিক দর্শন প্রপঞ্চিত। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপনিষদ্ কি বলেন? ইহা নিশ্চিত যে, উপনিষদে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ-সমর্থক বিভিন্ন উক্তি আছে। শঙ্কর-মতে অদ্বয় নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা-প্রতিপাদনেই উপনিষদ্‌বাক্যের তাৎপর্য; উপনিষদ্ সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বৈত-নিরাস করেন;[১৪] অদ্বৈত-নিরাস উপনিষদে দেখা যায় না।

কখনও কখনও এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, অপরোক্ষানুভূতি-সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞগণ কিরূপে আপাততঃ পরস্পরবিরোধী ভাবে একই ব্রহ্মকে বিবৃত করিলেন। উত্তরে বলা যাইতে পারে, ব্রহ্ম-স্বরূপ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, ইহা অনির্বাচ্য; ইহা দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত। দ্বৈত ও অদ্বৈত শব্দদ্বয় পরস্পরাপেক্ষ। ব্রহ্মস্বরূপ স্ব স্ব অনুভূতিতে যেভাবে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে, বিভিন্ন আচার্য সেইভাবেই তাহা বিবৃত করিয়াছেন। যে যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকেই উচ্চতম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।[১৫] ব্রহ্মকে কখনও কখনও চিন্তামণির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পুরাণ-বর্ণিত এই মণিকে যাহারাই দেখিতে আসিত, তাহাদেরই মনের ভাব ইহাতে প্রতিফলিত হইত। অবশ্য অদ্বৈতভাবাত্মক বর্ণনা ব্রহ্মস্বরূপের নিকটতম প্রপঞ্চন বলা যাইতে পারে। অথবা এইরূপও বলা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও শিষ্যগণের বিভিন্ন বোধ-সৌকর্যার্থ ব্রহ্মকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যে শিষ্য জীব ও জগদ্‌বোধসম্পন্ন—জীবজগদাত্মতাপ্রাপ্ত—গুরু তাহাকে দ্বৈতাত্মক উপদেশ দেন; কিন্তু শিষ্য যদি নিয়ত-পরিণামী জগৎসম্বন্ধে সচেতন না থাকে, তাহা হইলে সে ব্রহ্ম, জীব ও জগতের ঐক্যানুভব করে। জাগতিক বা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ উপাধিযুক্ত; কিন্তু অজাগতিক বা পারামার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত।

হিন্দু ঐতিহ্যে ধর্ম ও দর্শন পরস্পরসামঞ্জস্য-হীন। ধর্মে অনুভূতির প্রাধান্য, দর্শনে প্রাধান্য

১৪ "মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"
(কঠোপনিষৎ, ২।১।১১)

১৫ "যং ভাবং দর্শয়েদ্‌যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।
তং চাবতি স ভূত্বাসৌ তদ্‌গ্রহঃ সমুপৈতি তম্॥"
(মাণ্ডূক্যোপনিষদ্-গৌড়পাদ-কারিকা, ২।২৯)

যুক্তির। ধর্মে চরম তত্ত্বকে বলে ঈশ্বর। এই ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা। যদিও বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরের কি কি গুণ আছে এই বিষয়ে একমত নয়, তথাপি সকলেই মনে করে যে, মানুষ ভগবৎসান্নিধ্য দ্বারা অজ্ঞাননির্মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করে। ইহা বেদান্তেরও অভিপ্রেত। ধর্ম বলে, কেবলমাত্র মৃত্যুর পর স্বর্গে জীবনের শ্রেষ্ঠ ঈপ্সিত লাভ করা যায়। অবশ্য ভক্ত এই জীবনেই ভগবানের সান্নিধ্য-সুখ অনুভব করিতে পারেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বহু ভারতীয় আচার্য বিদেহমুক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

ধর্ম সাধনাঙ্গ হিসাবে বিশ্বাসের উপর জোর দেয়; ধর্ম ভগবৎপ্রাপ্তির পথে যুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে না, বরং যুক্তিকে নিন্দাই করে। এই বিশ্বাসৈকনিষ্ঠা বিশেষভাবে ভক্তিমার্গে লক্ষণীয়। এই পথে ভক্ত ভালবাসা দ্বারা সবিশেষ ভগবানের সহিত মিলিত হয়। উপনিষদ্‌ও বলেন, কেবলমাত্র যুক্তিদ্বারা, তর্কের সাহায্যে তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না।[১৬]

বিচার ও বিশ্বাস চিন্তনরত মনের দুইটি বৃত্তি। দুইটি প্রায়ই পরস্পরের পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষানুভূতি বিশ্বাসের ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু এই অনুভবের যুক্তি-বিরোধী হওয়া উচিত নয়; ইহা যৌক্তিকতার সহিত অপরের নিকট উপস্থাপিত হইতে পারে। ধর্মে উচ্ছ্বাস-আবেগের প্রাধান্য; সুতরাং ধর্ম যদি যুক্তিপ্রধান দর্শন দ্বারা দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে ইহা নিছক ভাবপ্রবণতায় পর্যবসিত হয়। ঠিক সেইরূপ ধর্মানুরাগ-বিহীন দর্শনও শুষ্ক বিচার-বিতর্কবহুল জ্ঞানচর্চায় নামিয়া আসিতে পারে। বিশ্বাস মুমুক্ষু মানবকে সত্যান্বেষণ-পথে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার প্রেরণা দান করিয়া থাকে; আবার যুক্তিবিচার তাহাকে অন্ধকার সঙ্কীর্ণপথে লক্ষ্যহীন ভাবে বিঘূর্ণিত হইতে অথবা প্রাণহীন অবাস্তব লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইতে বাধা প্রদান করে। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, ধর্মপথের পথিক একশত লোকের মধ্যে পঁচাত্তরটি লোক ভণ্ড, কপটাচার হইয়া দাঁড়ায়; কুড়িটি হয় অব্যবস্থিতচিত্ত; মাত্র পাঁচ জন ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারে। বেদান্ত বিচার ও বিশ্বাস, দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন করিয়াছে। এই জন্যই বেদান্ত মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট, এই জন্যই ইহা সর্বহিতকর—সর্বজনীন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রগতির সকল স্তরেই ধর্ম এবং দর্শন পরস্পরকে ত্রুটিহীন, ভ্রান্তিহীন করিয়াছে। যেমন, যখনই ধর্ম বাহিরের নাম-রূপ বা নিছক বাহ্য আচারে আবদ্ধ হইয়া সত্য-সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখনই দার্শনিক যুক্তিনিষ্ঠা প্রতিবাদে আপন কণ্ঠস্বর উত্তোলিত করিয়াছে। উপনিষদ্, বুদ্ধ ও শঙ্করের বাণী ধর্মবিশ্বাসের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে দার্শনিক যুক্তিনিষ্ঠার প্রতিবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহারা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, লোক ধর্মস্থানে জন্মগ্রহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে তাহার মৃত্যু হওয়া সঙ্গত নয়। বেদান্ত সত্যই বলেন, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও কৃষ্ণ 'অহম্'-স্বরূপ অনন্ত-সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের ক্ষুদ্র কয়েকটি তরঙ্গ। উপনিষদ্ ও ভগবদ্‌গীতা বলেন, লক্ষ্যে পৌঁছিবার পর সাধক শাস্ত্র-প্রয়োজনের বাহিরে চলিয়া যান।[১৭]

১৬ "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" (কঠোপনিষৎ, ১।২।৯)

১৭ "অত্র·· বেদা অবেদা····· (ভবন্তি)।"
(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।২২)

"যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।" (গীতা, ২।৪৬)

আবার রামানুজ ও চৈতন্যের মত ভগবদ্‌ভক্তের উপদেশ ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে প্রাণহীন শুষ্ক বৈদান্তিক আলোচনার অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর হইতে রক্ষা করিয়াছে। হিন্দু ঐতিহ্যে যথার্থ ধর্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তি ও সত্যকার দার্শনিকের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। শঙ্কর ও রামানুজ ভারতবর্ষে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও দার্শনিক—উভয়রূপেই পূজিত।

ধর্মের সগুণ-সবিশেষ ঈশ্বর এবং বেদান্তের ব্রহ্ম মূলতঃ পৃথক্ বস্তু নন। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন জগৎকারণ-রূপে অভিহিত হন, তখনই তিনি ঈশ্বর, ভগবান্। যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়-ব্যাপারে নিরত, তখন সগুণ-সবিশেষ-রূপে প্রতীয়মান হন। যখন সৃষ্ট্যাদি জগদ্‌ব্যাপার-বর্জিত তখন ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্গুণ। ব্রহ্মশক্তি মায়া ব্রহ্মেই অবস্থান করে; ইহার কোন স্বাধীন, পৃথক্ সত্তা নাই। অদ্বৈতবাদ ব্যাবহারিক বা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সগুণ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিয়া থাকে; তাঁহাকে অন্যান্য সৃষ্ট্যাদি-শক্তিসম্পন্ন জীব হইতে বিলক্ষণ জ্ঞান করে। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মে সর্বপ্রকার ভেদ অপসৃত হইয়া যায়। মৃন্ময় সিংহ মৃন্ময় মূষিক হইতে বিলক্ষণ, যদিও মৃত্তিকাতে বিলয়প্রাপ্ত হইলে তাহারা একই। যখন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন ঈশ্বর, জীব ও জগৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তায় একীভূত হইয়া যায়। আচার্য শঙ্করের মত পুরাদস্তুর অদ্বৈতবাদী পর্যন্ত দেবদেবীর উদ্দেশে প্রাণস্পর্শী স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। ভক্তি ও চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধির নিমিত্ত সাধকগণের জন্য তিনি সগুণ ঈশ্বরোপাসনা সমর্থন করিয়াছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সাথী

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দৃষ্টির অতীত হয়ে তুমি রহ সম্মুখে আমার,
আলোর ছায়ার মত—জীবনের জয়যাত্রা-পথে।
আশার প্রদীপ জ্বালি' আসে যবে অনন্ত আঁধার
জ্যোতির প্রভায় তুমি উদ্ভাসিত কর মনোরথে।

সৃষ্টির প্রথম হ'তে প্রলয়ের সমাপ্তি-রেখায়,
তোমার মঙ্গলধ্বনি নিত্যকাল উঠিছে রণিয়া।
ব্যর্থতার আর্তনাদে যুগান্তের গভীর-ব্যথায়,
উচ্ছ্বসি' উঠিলে প্রিয়, শান্ত কর অশান্ত এ হিয়া।

দিবসের আলো তুমি রজনীর স্তব্ধ অন্ধকার,
অসীম কালের গতি—যাত্রা তার তোমার ইঙ্গিতে।
অশ্রুর প্রবাহ তুমি, তুমি হাসি—রুদ্র-হাহাকার,
সৃষ্টির অপূর্ব রূপ হে সুন্দর তোমার সঙ্গীতে।

চিরন্তন কাল-স্রোতে ভেসে যাবে অনাগত দিন,
তুমি শুধু রবে সাথী—যাত্রা তব বিরাম-বিহীন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সক্রিয় বেদান্ত

শ্রীরঙ্গনাথ রামচন্দ্র দিবাকর

[পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামিজীর জন্মোৎসব-উপলক্ষে বিহারের রাজ্যপাল কর্তৃক প্রদত্ত হিন্দী বক্তৃতার সার-সঙ্কলন। অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত]

বর্তমান ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের নাম জানেন না এরূপ লোক যদি কেহ থাকেন, তিনি নিতান্তই দুর্ভাগ্য। স্বল্পায়ু হইলেও স্বামিজীর জীবন এত উদ্দীপনাদায়ক, কর্ম-ভূয়িষ্ঠ ও কৃতিত্বপূর্ণ ছিল যে ওইটুকু সময়ের মধ্যে এত কাজ তিনি কি করিয়া করিলেন, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

যুগ-প্রয়োজনে ভারতে যে-সকল মহান্ ঋষি এবং সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে তাঁহাদের অন্যতম।

তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসই প্রথম বর্তমানের শিক্ষিত ভারতের বিবেককে দেশের অধ্যাত্ম-সম্পদের দিকে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজেদের অবহেলিত অমূল্য ঐশ্বর্যের প্রতি তিনি দেশ-বাসীর চোখ খুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দও ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা ও সংস্কারের জন্য পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

প্রথম জীবনে বিবেকানন্দ ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার তত অনুরাগ ছিল না। কিন্তু একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য যাদুস্পর্শেই তাঁহার আবেগময়ী ও যোগনিষ্ঠা প্রকৃতি জাগ্রতা হইল এবং কালে তিনি একজন আশ্চর্য শক্তিশালী বেদান্ত-প্রচারক হইয়া উঠিলেন।

বিবেকানন্দের জীবনেও অনেক দুঃখকষ্ট, বিপর্যয় এবং নৈরাশ্য আসিয়াছিল। ফলে আমরা তাঁহাকে কন্যাকুমারীর নির্জন প্রস্তরখণ্ডের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃসঙ্গ ও চিন্তামগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট থাকিতে দেখিতে পাই। তাঁহার নৈরাশ্য ছিল উষার প্রাক্কালীন অন্ধকারের মতো। কিন্তু হঠাৎ অরুণোদয় হইল। তিনি পাইলেন সম্মুখে অগ্রসর হইবার এবং বিদেশে ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিদ্যার ও দর্শনের আলোক-বর্তিকা বহন করিবার প্রেরণা।

বিবেকানন্দই প্রতীচ্যে অধুনাতন প্রাচ্যের সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারক। তাঁহার পর হইতে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে অনেক আশ্রম ও মঠ স্থাপিত হইতে লাগিল—ভারতের কৃতী সন্তানগণ অদ্যাবধি সেই বিজয়-পতাকা সগৌরবে উড্ডীন রাখিয়াছেন।

যে স্পন্দহীন ও কর্মবিমুখ আধ্যাত্মিকতা অন্য সব কিছুর প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবল নিজের ব্যক্তিগত মুক্তির অন্বেষণ করে, বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা সেই আকৃতি লয় নাই। তাঁহার জীবন-লক্ষ্যে অবশ্য ইহাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ঐ স্থানেই তিনি থামেন নাই।

তাঁহার আধ্যাত্মিকতা ভারতের দরিদ্র-নারায়ণগণের বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ সেবায় রূপ পরিগ্রহ করিয়া ছিল। মানুষের প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া যাঁহারা শুধু নিজেদের মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের উপর তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আধ্যাত্মিক শস্ত্রব্যতীত অন্যান্য কার্যকর লৌকিক উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে।

বিবেকানন্দের অগণিত রচনায় বেদান্তের অভীঃ-মন্ত্র এবং স্বদেশ-প্রেমের উদাত্ত আহ্বান ঝঙ্কৃত হইয়াছে—স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী তাঁহার মাতৃভূমিকে শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব হইতে নহে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বন্ধন হইতেও মুক্ত করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। দেশমাতৃকার সেবায় যাঁহাদের বিন্দুমাত্র অনুরাগ আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটই স্বামিজীর বক্তৃতা ও রচনাবলী অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। রামকৃষ্ণ মিশন নামীয় যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ভারতে ও বিদেশে সাত-আট শতের অধিক সন্ন্যাসি-কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে উচ্চ আশা ও আদর্শ পোষণ করিতেন, তাহারই প্রতীক।

দৈব ও পুরুষকার

শ্রীদ্বারকানাথ দে, এম্-এ, বি-এল্

দৈব ও পুরুষকার লইয়া বিতর্ক এ পৃথিবীতে বহুকাল যাবৎ চলিয়াছে। দৈববাদিগণ পুরুষকারের উপর মোটেই গুরুত্ব প্রদান করেন না। তাঁহারা বলেন—"ন চ দৈবাৎ পরং বলম্", "ভাগ্যং (দৈবং) ফলতি সর্বত্র ন চ বিদ্যা ন পৌরুষম্"। পক্ষান্তরে পুরুষকারবাদিগণ দৈবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, মানুষ তাহার নিজের ভাগ্য নিজেই গঠন করে। তাঁহাদের কথা—"উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি"।

শব্দার্থ-মতে দৈব বলিতে বুঝায়—যাহা দেবতা কর্তৃক সংঘটিত। সময় সময় এমন সব ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়, যাহা আমাদের একান্ত অপ্রত্যাশিত বা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। তখন আমরা ঐসবকে ঐশ্বরিক ব্যাপার মনে করি। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়, জাতিগত ব্যাপারেও এরূপ অহরহ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের যে বিখ্যাত ও বিশাল রণতরিবহর ইংলণ্ড আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল এবং যাহার ভয়ে ইংরেজজাতি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অকস্মাৎ উত্থিত প্রচণ্ড ঝটিকার ফলে উহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। যে অপরাজেয় সমরবীর নেপোলিয়ন্ সমস্ত ইউরোপকে সামরিক বলে পদানত করিতে চলিয়াছিলেন, জনৈক সেনানায়কাধীনে পরিচালিত একটি প্রত্যাশিত সৈন্যবাহিনীর সময়মত আবির্ভাবের দৈবাধীন অসমর্থতা হেতু সেই পরাক্রান্ত বীর নেপোলিয়ন্ ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষে বিজিতের লাঞ্ছিত জীবন দীর্ঘকাল যাপনান্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসীর নিকট এই সকলে আশ্চর্যের কিছুই নাই, যেহেতু সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে হয়—তাঁহার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়, সম্ভবও অসম্ভবে পরিণত হয়। সাধারণ কথায় লোকে বলে 'রামের ইচ্ছা'। ঐশী শক্তির নিকট মানুষী শক্তি তুচ্ছ। যাঁহারা আধ্যাত্মিক পথের পথিক এবং ভগবদ্‌ভক্ত, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভরশীল। তাঁহার কৃপাই ভক্তের একমাত্র সম্বল, অন্য বল তাহার নাই। মহাপাপী দস্যু রত্নাকর তাঁহার কৃপায় বাল্মীকি মুনি।

দৈব-সম্পর্কে আমাদের উপরোক্ত আলোচনা ঈশ্বরীয় স্তরের। নিম্নে আমরা যুক্তির স্তরে বিষয়টি বিবেচনা করিব।

মানুষ যুক্তিবাদী। সে প্রত্যেক কার্যের ও ঘটনার পশ্চাতে কারণ অনুসন্ধান করে এবং যে পর্যন্ত সে কারণ আবিষ্কার করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মন তৃপ্ত হয় না। এই কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বৈধ বা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহা যুক্তিবাদীর নিকট গ্রহণীয় নয়। আমরা যেখানে দৈবকে কোনও ঘটনার কারণ বলিয়া নির্দেশ করি, সেখানে যুক্তিবাদীর বিচারে উহা কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সেজন্য দৈবকে 'অদৃষ্ট', 'ভাগ্য', 'অলৌকিক বা আকস্মিক সংঘটন' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে দৈব আমাদের প্রচলিত যুক্তিবাদের বহির্ভূত। কিন্তু তথাপি

দৈবকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে তাহার উদ্যম, চেষ্টা ও কর্ম অনেক সময় এক অজ্ঞাত ও অবোধ্য শক্তি ব্যাহত বা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং ঐ প্রকার শক্তির প্রভাব হইতে সে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতেছে না। আমরা ইহা অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, এ সংসারে কতিপয় লোক আজীবন মূক, বধির, অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও আতুর হইয়া জীবনপাত করিতেছে। আবার সময় সময় দেখি যে, তুল্যবিদ্যা-জ্ঞানগুণবিশিষ্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে সম চেষ্টা ও উদ্যম সত্ত্বেও একজন জীবনে প্রভূত সাফল্যলাভ করিয়াছেন, কিন্তু অপর জন জীবনে অকৃতকার্য ও ব্যর্থমনোরথ। এই প্রকার এবং অনুরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়া শেষ পর্যন্ত আমরা দৈবকে কিরূপে অগ্রাহ্য করি? দৈবের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে না পারিলেই ইহার অস্তিত্ব খণ্ডিত হয় না।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রকারগণ যুক্তিবাদের ভিত্তিতেই দৈবের ব্যাখ্যা করেন। তজ্জন্য তাঁহারা জন্মান্তর ও কর্মবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে জীব মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার এক জন্মের কৃত ভালমন্দ কর্মের ফল কোনও কোনও স্থলে পরবর্তী জন্মে ভোগ করিতে হয়। একজন্মের কৃত কোনও কর্ম যখন পরবর্তী জন্মে ফলপ্রসূ হয়, তখন পূর্ববর্তী জন্মের সেই কর্মই পরবর্তী জন্মে দৈব বলিয়া কথিত হয়। "পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদ্দৈবমিতি উচ্যতে।" সুতরাং যাহা দৈব-নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ তাহা পূর্ববর্তী জন্মের পুরুষকার ব্যতীত কিছুই নয়। এক জন্মের যাহা পুরুষকার তাহাই পরবর্তী জন্মে দৈব এবং একজন্মে যাহা দৈব তাহাই পূর্ববর্তী জন্মের পুরুষকার। এই মতানুসারে দৈব ও পুরুষকার প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন এবং পরস্পর-অবিরোধী। ইহাতে যুক্তিবাদীর কার্যকারণ-সম্বন্ধবিধি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; কেবল ইহার প্রয়োগের পরিধি একজন্মের মধ্যে সীমায়িত না রাখিয়া একাধিক জন্ম বিস্তারিত করা হইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকট উপরোক্ত সমাধান গ্রাহ্য নয়। তবে দৈবের অপর কোনরূপ সুসঙ্গত ব্যাখ্যা আমাদের অবিদিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দৈবের যুক্তিমূলক ব্যাখ্যা সম্ভবপর না হইলেও ইহার অস্তিত্ব আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তবে কোন মতেই দৈবকে স্বীকার করার অর্থ পুরুষ-কারকে অস্বীকার বা খর্ব করা নয়। আমাদের মতে হিন্দুর জন্মান্তর ও কর্মবাদকে গ্রহণ না করিলেও মানবজীবনে দৈব এবং পুরুষকার উভয়ের স্থানই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন দৈববল, তেমনই পুরুষকার। পুরুষকার প্রত্যক্ষ, দৈব অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু উভয়ই বল এবং যাহাই বল তাহারই ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। যদি কোনও ক্ষেত্রে দুইটি বল বিপরীতমুখী হয়, সে ক্ষেত্রে একের ক্রিয়ার অন্যের ক্রিয়াকে প্রতিহত বা ব্যাহত করার চেষ্টাই স্বাভাবিক। স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকা চালাইতে গেলে নাবিকের হস্তবল এবং নদীর স্রোতের বল পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই ভাবে প্রত্যেক মানবের জীবনে দৈব ও পুরুষ-কারের ক্রিয়া যুগপৎ সর্বদা চলিতেছে। পুরুষকারকে ত্যাগ করিলে চলে না। মানব-সমাজের এত উন্নতি পুরুষকার ব্যতীত ঘটিত না। পুরুষকারকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করিয়া লইতে হইবে। দৈবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উদ্যমের সহিত কর্ম করিয়া মানুষকে চলিতে হইবে। পুরুষকার ত্যাগ পূর্বক যাহারা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে তাহারা কর্তব্যজ্ঞানহীন, অলস ও কাপুরুষ। চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলে দোষ নাই, চেষ্টা না করাই দোষের। "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।" জীবনের সার্থকতা কর্মে ফলে নয়। "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।"

বাল্মীকি-রামায়ণ

ডক্টর শ্রীসুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

(১)

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত রামায়ণ-আখ্যান ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। ইউরোপের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের কাছে বাইবেলের আখ্যান যত পরিচিত রামায়ণ-বিষয়ে সাধারণ ভারতবাসীর পরিচয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। "সীতারামকি জয়," এই বুলি সব সময়েই লোকের মুখে; এবং শব-বহনকালে "রামনাম সত্য হৈ," শব্দে চারিদিক কাঁপিয়া উঠে। যীশুখৃষ্ট কে ছিলেন, ইহার উত্তর পাশ্চাত্য দেশের অশিক্ষিত লোক অনেকেই হয়ত কম জানে; কিন্তু রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, ভরত, সুগ্রীব, বিভীষণ, এমন কি কৈকেয়ীর নাম না জানে এমন ভারতবাসী খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত হইবে।

প্রচলিত রামায়ণগুলিতে, বিশেষতঃ বাংলা ও হিন্দি রামায়ণে, যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে মূল রামায়ণের সহিত অনেক স্থলেই তাহার অমিল হইবে। রামায়ণ-মাত্রই বাল্মীকির গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া নিজের গৌরব প্রচার করে। কিন্তু প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত রামায়ণসমূহ বাল্মীকি হইতে হাজার দুই বৎসরেরও বেশী ব্যবধানে রচিত। ইতোমধ্যে জনসাধারণের মন মূল রামায়ণের ঘটনাগুলিকে নানা রঙ-বেরঙ্ দিয়া নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। এই নূতন সৃষ্টির বহু জিনিষ প্রচলিত রামায়ণে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং বাল্মীকি-রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাল্মীকির দেওয়া প্রাচীনকালের সামাজিক পরিবেষ্টনে বারো আনা অংশই বাংলা রামায়ণ হইতে একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে; সজীব চরিত্রগুলি পরিবর্তিত হইয়া কাব্য-সুলভ মনোবৃত্তিতে গঠিত হইয়াছে, এবং ঘটনাসমূহের স্বাভাবিক বর্ণনা বহু অপ্রাকৃত আজগুবি কল্পনায় অতি-রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। দুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

রামের জন্মের ষাট হাজার বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচনা কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত নহে। দস্যু রত্নাকরের ঋষিত্বলাভ ও রামের জন্মের বহু পূর্বে রামায়ণ-রচনা—কৃত্তিবাস বাল্মীকির পরবর্তী সংস্কৃতে রচিত রামায়ণগুলির অতিরঞ্জিত বর্ণনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাল্মীকিতে এমন কথা ত পাওয়া যাইবেই না বরং ঠিক ইহার উল্টা কথাই রহিয়াছে। রামায়ণ-গ্রন্থের আরম্ভই হইয়াছে এই বর্ণনা লইয়া—বাল্মীকি নিজের আশ্রমে বসিয়া নারদকে প্রশ্ন করিতেছেন, সম্প্রতি পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যাঁহাতে বহুমুখীন নানা দুর্লভ গুণসমূহের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়? উত্তরে নারদ অযোধ্যার রাজা ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রামচন্দ্রের নাম করেন। রামচন্দ্র তখন কেবলমাত্র লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং সীতার নির্বাসন তখনও হয় নাই। সীতার নির্বাসন এবং তাহার পরবর্তী ঘটনা-সকল বাল্মীকি নারদের নিকট শুনিতে পা'ন নাই এবং মহর্ষি তাঁহার গ্রন্থ প্রথমে সমাপ্তও করিয়াছিলেন অযোধ্যায় আসিয়া রামের রাজ্যপ্রাপ্তির সাথে সাথে। বাকী ঘটনাগুলি,

যাহা ইহার পরে এবং বাল্মীকির জীবিতকালেই ঘটিয়াছিল, সে সম্বন্ধে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে—

অনাগতং চ যৎ কিঞ্চিদ্ রামস্য বসুধাতলে।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ॥

পৃথিবীতে রামের জীবনের অন্য যে সমস্ত ঘটনা তখনও ঘটে নাই, তাহা ভগবান বাল্মীকি ঋষি পরবর্তী অন্য একখানি কাব্যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

অহল্যার পাষাণ হওয়ার কাহিনী এবং রামের পাদস্পর্শে তাহার স্বীয় দেহপ্রাপ্তি সমস্তই পরবর্তী কালের কল্পনা। বাল্মীকিতে আছে যে, অহল্যার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য স্বামী গৌতম যখন তাঁহাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন অহল্যা প্রাণস্পর্শী অনুতাপের সহিত স্বামীর নিকট কাঁদিয়া পড়িলে গৌতম আজ্ঞা করিলেন যে, অহল্যা যেন উপবাসে কৃশা হইয়া ভূমিশয্যায় একমনে তপস্যা করিতে থাকেন। পরে প্রথিতযশা রাজপুত্র স্বয়ং আসিয়া অহল্যার পাদবন্দনা করিলে তাঁহার পাপ চলিয়া যাইবে। রামচন্দ্রই নিজে আশ্রমে আসিয়া অহল্যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। "রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা"—রামলক্ষ্মণ হৃষ্টচিত্তে এই মনস্বিনীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম জানাইলেন। এই বর্ণনার কোথাও অহল্যার পাষাণে পরিণত হওয়ার কথা নাই, বরং তাহার বিপরীত কথাই আছে। রামচন্দ্র—

দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ॥
প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেঽম্ভসঃ দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্যপ্রভামিব॥

যাহাকে ধূমে পরিবৃত দীপ্ত অগ্নিশিখাস্বরূপা বলিয়া এভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার দেহ আর যাহাই হউক জ্যোতিহীন মলিন পাষাণ হইয়া ছিল না।

(২)

ঘটনার বর্ণনায় ব্যতিক্রম অপেক্ষাও বেশী মারাত্মক হইয়াছে চরিত্রের মূল সুরের আমূল পরিবর্তন। ইহার ফলেই পূতচরিত্র ধর্মনিষ্ঠ দৃঢ়-সঙ্কল্প হনুমানকে আমরা লেজবিশিষ্ট হাস্যরসাত্মক অপ্রাকৃত জন্তু বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতেছি। যাহার প্রথম পরিচয়ে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদ্ অপভাষিতম্,"—অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বলা সত্ত্বেও অপভাষা বা অশিক্ষিতের ভাষা ইহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই,—সেই মারুতিকে আমরা জানি নিতান্ত শিক্ষাবিহীন কিম্ভূতকিমাকার এক জোয়ান জন্তু বলিয়া। রাবণের আলয়ে মদ্যপানে বিভোর অর্ধনগ্না স্ত্রীসমূহ দর্শন করিয়া যাহার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছিল, পাছে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে, সেই হনুমানের যে কোনও মার্জিত রুচি থাকিতে পারে, কৃত্তিবাস পড়িয়া তাহা আমাদের মনেও আসে না। আমরা জানি মাত্র তাহার লেজের বহর ও লঙ্কাদাহরূপ গোঁয়ারতমি।

যে রামচন্দ্র কৃত্তিবাসে সাক্ষাৎ ভগবান্, বাল্মীকি কিন্তু তাঁহার নিন্দার্হ কাজগুলির বিরুদ্ধে শক্ত মন্তব্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চোরের মতন আসিয়া বালিবধ ও সীতার প্রতি সর্বসমক্ষে অনার্যোচিত বর্বর ভাষার প্রয়োগ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাল্মীকি বলিয়াছেন, "অমৃষ্যমাণা তং সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী"—সতী সীতাদেবী সেই পরুষ উক্তি ক্ষমা না করিয়া আগুনে প্রবেশ করিলেন। রামচরিত্র নানা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও মহৎ। এই মহত্ত্বের আস্বাদ হইতে আমরা বঞ্চিত হই, যখন বাংলা রামায়ণে আমরা পূর্ণ অবতার ভাবে তাঁহাকে পূজিত হইতে

দেখি। সমগ্র রামায়ণ বইখানিতে বহু চরিত্রের বহু অসংগতি বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত অসংগতি লইয়াই চরিত্রগুলি জীবন্ত। বাংলা রামায়ণে সমস্তই যেন ব্যক্তিত্বশূন্য কবিত্বের শোভনতায় আবৃত।

(৩)

বাল্মীকি-রামায়ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু পারিপার্শ্বিক ঘটনার উল্লেখ থাকাতে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বুঝিতে আমরা অনেক সাহায্য পাই। কৈকেয়ীকে বিবাহ করার সময় দশরথকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল, এই দ্বিতীয় বিবাহের মহিষীও রাণীর সমস্ত সম্মান পাইবেন এবং তাঁহার গর্ভজাত সন্তানের সমান অধিকার থাকিবে কৌশল্যার সন্তানের মতই সিংহাসন-প্রাপ্তির। সুমিত্রা বা অন্য-কোন রাজপত্নীর সন্তানের সিংহাসনে বসিবার কোন অধিকারই ছিল না।

মন্থরার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বাল্মীকি বলিয়াছেন, "জ্ঞাতিদাসী যতো জাতা সহোঢ়া পরিচারিকা,"—তিনি কৈকেয়ীর জ্ঞাতিবংশীয়া, দাসী বা পরিচারিকা-পদবাচ্যা এবং কৈকেয়ীর সাথে একসঙ্গে দশরথের সহিত বিবাহিতা। কথা-গুলি সেকালের রাজপরিবারের গঠন-সম্বন্ধে বেশ কিছু ধারণা জন্মায়। কোন রাজকন্যার সহিত রাজা বা রাজপুত্রের বিবাহের সময় রাজকন্যার সহচরী অন্যান্য অনেক কন্যাও একই মন্ত্রে রাজার হস্তে সমর্পিতা হইতেন। ইঁহারা বিবাহের পর রাণী আখ্যা পাইতেন না, পরিচারিকা বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং তাঁহাদের সখী রাজমহিষীর নিকট সহচরী অথবা অনেকক্ষেত্রে দাসীর মতন ব্যবহার পাইতেন। এ প্রথা অতি আধুনিক সময়ে দেশীয় রাজাদের মধ্যেও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই অনুসরণে রাজপুতানার এক মহারাজার ২৫৩ জন স্ত্রীর কথা জানিতে পারি। মহারাজ দশরথেরও স্ত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫০। ইহাদের মধ্যে তিনজন ব্যতীত আর প্রায় সকলেই ছিলেন এই পরিচারিকার পদে। কেবল কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা মহিষী-পদবাচ্যা ছিলেন। মন্থরা এই নামটিও বাংলা রামায়ণের প্রচলিত সংস্করণগুলি হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। সে কুব্জা বা কুঁজা ছিল বলিয়া কুব্জা-নামেই ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। কুব্জা এবং বামনিকাদিগকে অনেকসময় আগ্রহ করিয়া রাজান্তঃপুরে স্থান দেওয়া হইত; ইহারা অন্তঃপুরের শোভাসম্পদ বৃদ্ধি করিত, ময়ূর সারিকা প্রভৃতি পাখীদের সাথে একত্রে।

লঙ্কায় রাবণের পুরীর যে বর্ণনা আছে তাহাতেও আমরা মনে করিতে বাধ্য হই যে, আমরা কোন পরাক্রান্ত রাজার রাজধানীতে আসিয়াছি। লঙ্কাদ্বীপের অনেকগুলি পাহাড়ের মধ্যে একটির শীর্ষদেশ কাটিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্যদেশকে এক বিস্তৃত সমভূমিতে পরিণত করা হইয়াছিল। পর্বতনিম্ন হইতে এই সম-ভূমিতে উঠিতে অনেকগুলি সিঁড়ি বাহিয়া আসিতে হয়। এই উচ্চভূমিতে প্রাচীর-বেষ্টিত গর্বিতা লঙ্কাপুরী। প্রাচীরের বহির্ভাগে প্রশস্ত পরিখা, জলে পূর্ণ। তাহার উপর দিয়া "যন্ত্রচালিত সেতু" বা বৃহৎ চারিটি draw bridge ছিল, পুরীর প্রধান চারিটি দ্বারের সহিত সংলগ্ন। কোন শত্রু এই সেতুর উপর উঠিলে যন্ত্রবলে তাহাকে জলের মধ্যে তৎক্ষণাৎ পতিত করা হইত।

প্রত্যুত বানর ও রাক্ষস বলিয়া যাহাদের উল্লেখ আছে, তাহারা কাল্পনিক জীবজন্তু নহে। আর্যাবর্তে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা গৌরবর্ণ আর্য ও কৃষ্ণকায় অশিক্ষিত অনার্যদিগের সমবায়ে গঠিত। ইহাদের মধ্যে রক্তের সংস্রবও

যথেষ্টই ঘটিয়া থাকা স্বাভাবিক। রামের গায়ের রঙ বর্ণনা করিতে গিয়া বাল্মীকি তাঁহাকে বলিয়াছেন "রামমিন্দীবরশ্যামম্"—নীলপদ্মের মত শ্যামল আভাযুক্ত; কিন্তু লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন "সুবর্ণ-চ্ছবি"। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ছাড়া এরূপ বর্ণ-বৈষম্য সম্ভব হয় না। এই আর্য-অনার্য-মিশ্রণে গঠিত সমাজকে বলা হইত মানব-সমাজ—মনুর বিধান মানিয়া যাহারা জীবন-যাপন করিত। এই সমাজের লোকদের বলা হইত, মানব, নর, মানুষ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত এই সমাজ হইতে নিতান্ত আলাদা-ভাবে যে সমস্ত জাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া ছিল, তাহাদিগকে আখ্যা দেওয়া হইত অসুর, রাক্ষস, বানর, পাখী, ভল্লূক, গোলাঙ্গুল, কিন্নর, হয়মুন বলিয়া। এগুলি সমস্তই আলাদা আলাদা জাতি; পশু নয়, মানব-সমাজের বাহিরের মানুষ। মানব বা আর্যসমাজের মানুষদের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় অনেক উন্নত ছিলেন, বিশেষ করিয়া রাক্ষস ও অসুরগণ। অসুর-সভ্যতা বা Assyrian civilization-এর নিদর্শন আমরা আজও দেখিতে পাইয়াছি হরপ্পা এবং মহেন্-জো-দারোর ধ্বংসাবশেষে, যাহা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া মাটির নীচে লুক্কায়িত ছিল।

একথা স্মরণ রাখিলে বাল্মীকি-রামায়ণের ঘটনাগুলি বুঝিতে পারা সহজ হইবে। রাবণের রাজধানী ছিল লঙ্কায়, এবং দক্ষিণ ভারতের বহুস্থলে তাহার প্রতাপ বা military establishments ছিল। জনস্থান বা বর্তমান নাসিকের নিকটবর্তী এমন একটা ফাঁড়িতে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য মোতায়েন থাকিত। বিন্ধ্য পর্বতের সমস্তটা অংশ জুড়িয়াই ছিল রাবণের প্রভাব। তাহার অনুচরগণ মধ্যে মধ্যে মানবসমাজের মধ্যে আসিয়াও উৎপীড়ন চালাইত; মারীচ ও সুবাহু যেমন বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসীদিগের উপর রাবণের আক্রোশ ততটা ছিল না যতটা ছিল মানবসমাজের প্রতি, কারণ 'আর্য' বা মানব-জাতিই ছিল রাক্ষসদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী। সম্ভবতঃ পশ্চিম ভারতের অসুরদিগের সহিত রাক্ষসদিগের অবন্ধুতা ছিল না। আর্যসভ্যতা তখনও আর্যাবর্ত ছাড়িয়া দক্ষিণে বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। প্রয়াগ বা এলাহাবাদের দক্ষিণেই অরণ্য। প্রয়াগ হইতে রামেশ্বর পর্যন্ত কুত্রাপি কোন আর্যজনপদের উল্লেখ রামায়ণে নাই। অরণ্যের মধ্যে বহু মানবেতর জাতি দলবদ্ধ ভাবে বাস করিত। কিন্তু আর্যনিবাসের মধ্যে আমরা শুধু দেখি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি মুনি-ঋষিদের আশ্রম। রাক্ষসেরা সাধারণতঃ ইহাদের কোনও ক্ষতি করিত না, কিন্তু আর্যদিগের সহিত কোন কারণে বিবাদ বাধিলে অথবা এই ঋষিদের পেছনে কোনও ক্ষত্রশক্তি রহিয়াছে জানিতে পারিলে তাহারা মুনিদিগকে সংহার না করিয়া ছাড়িত না। এই জন্যই বহু ঋষি ভয়ে রামের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ রাম হইতে রাক্ষসদের ভয়ের সম্ভাবনা ছিল।

(৪)

আর্য-রামায়ণে আজগুবির স্থান খুব বেশী নাই। সহজ সরল ভাবে ঘটনার স্রোত নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে চলিয়া আসিয়াছে। প্রকৃত ও অপ্রকৃতের একটা খিচুড়ী পাকাইয়া পরবর্তী কালে রামায়ণের আখ্যান-ভাগের যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী বাল্মীকি নহেন।

বর্তমানে প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণে কিন্তু অনেক আজগুবি কাণ্ডের বর্ণনা পাওয়া যাইবে। ইহার প্রধান কারণই রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ-গুলি। অবশ্য মহাভারতের মত রামায়ণে অত

বেশী প্রক্ষেপ নাই। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশের চাপে মূল আখ্যান অনেকস্থলেই খুঁজিয়া পাওয়া ভার। রামায়ণে কিন্তু মূল অংশ অনেকস্থলে অমিশ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যাকাণ্ডের ন্যূনাধিক ছয় হাজার শ্লোকের মধ্যে ছয়টি প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত হইবে। সমস্তটা যেন একই প্রেরণায় লেখা, একই যুগের রচনা এবং একটানা ভাষার স্রোতে ঘটনাগুলি প্রবাহিত। সুন্দরকাণ্ডে ও যুদ্ধকাণ্ডে প্রক্ষেপ রহিয়াছে, তবে খুব বেশী নয়। কিন্তু বালকাণ্ড বা আদিকাণ্ডের অন্ততঃ ½ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষেপের মাত্রা আরও বেশী। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কতকগুলি সর্গ একসঙ্গে প্রক্ষিপ্ত, অরণ্যকাণ্ডেও তাহাই। কিন্তু এই দুই কাণ্ডে মূল আখ্যান-সূত্র ধরিতে কোন কষ্ট পাইতে হয় না, যেমন হয় বালকাণ্ডে ও উত্তরকাণ্ডে। ফলতঃ কাব্যের এই প্রথম ও শেষ ভাগে বাল্মীকির রচনা যে কতখানি তাহাতেই যথেষ্ট সন্দেহ হয়। কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত অংশ হয়ত অনেক প্রাচীন, কিন্তু তাহা যে মূল রামায়ণের মধ্যে প্রক্ষেপ-মাত্র তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ঘটনার অসামঞ্জস্যে ও ভাষার বিভিন্নতায় এবং যতটুকু আজগুবি কাহিনী তাহার পৌনে ষোল আনাই এই সমস্ত প্রক্ষিপ্ত অংশে। জনকপুরে রাম যে ধনু ভগ্ন করেন, তাহা লইয়া শিব ও ইন্দ্রে বিবাদ, ইন্দ্রের পাপ ও তাহার অদ্ভুত শাস্তি, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের অতিদীর্ঘ বিবাদ-বর্ণনা, বানরদিগের সীতান্বেষণের নিমিত্ত যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতি নানান রাজ্য বিচরণ, এ সমস্তই শুধু অপ্রাকৃত নহে, ঘটনার বর্ণনায় নিতান্ত অনাবশ্যক।

এই প্রক্ষিপ্ত অংশের রামায়ণে প্রবেশ কোন সময়ের? কিছু হয়ত খৃষ্ট-জন্মের অনেক পরের, কিন্তু কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত অংশ যে প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। অযোধ্যা হইতে মিথিলা পর্যন্ত বিশ্বামিত্রের সহিত রামলক্ষ্মণের পথভ্রমণের বর্ণনায় বহু আজগুবি বর্ণনার মধ্যেও একটা কথা প্রতিভাত হয়। শোণনদীর তীর ধরিয়া বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে লইয়া যখন গঙ্গার সঙ্গমস্থলে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহারা পাটলিপুত্র নগর দেখিতে পান নাই, অথচ ইহার পূর্বে মগধের রাজধানী পঞ্চগিরিব মধ্যস্থ গিরিব্রজের বর্ণনা রহিয়াছে এবং গঙ্গা পার হওয়ার পরেই বৈশালী নগরীর উল্লেখ আছে। এ দুইটি নগরীর একটিও রামায়ণের যুগে ছিল কিনা সন্দেহ। ইহাদের বর্ণনার সাথে পাটলিপুত্রের বর্ণনা জুড়িয়া দিতে কি দোষ ছিল? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পাটলিপুত্রের সৃষ্টিই হইয়াছে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর সময়ে এবং ইহা একটি মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে তাহারও পরে। রামায়ণের এই প্রক্ষিপ্ত অংশ রচিত হইয়াছে হয় অজাতশত্রুর পূর্বে (যাহার সম্ভাবনা খুব বেশী নয়) নতুবা অন্ততঃ এমন সময় যখন পর্যন্ত পাটলিপুত্রের অতি আধুনিকত্ব-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের জ্ঞান খুব বেশী রকমে বিদ্যমান ছিল। যবদ্বীপ প্রভৃতির বর্ণনাও সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম কি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রক্ষেপ। অধিকাংশ প্রক্ষিপ্ত বর্ণনাই সম্ভবতঃ এই সময়ের হইবে।

(৫)

কিন্তু একথা বলা চলিবে না যে, আর্ষ-রামায়ণের মূল অংশে ঘটনার বর্ণনা সম্পূর্ণ যথাযথ, এবং ইহাতে অপ্রাকৃতের স্থান নাই। রামায়ণ বইখানিকে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাইতেছি, তাহা বাল্মীকির সময় হইতে অনেক পরবর্তী কালের ভাষায় লিখিত বাল্মীকির সময় ভাষার যে কি রূপ ছিল তাহা একটি মাত্র শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পাই—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

উহার ছন্দ অনুষ্টুপ্ হইলেও বৈদিক, কারণ প্রথম পঙ্‌ক্তির ষোলটি অক্ষর একসাথে পড়িয়া যাইতে হয়, অষ্টম অক্ষরের পর না থামিয়া; অবধীঃ ও অগমঃ এই দুই ক্রিয়াপদ বৈদিক, পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার প্রয়োগ কম, এবং শাশ্বতীঃ সমাঃ এই কথাটির বাক্যমধ্যে সংযোগ পরবর্তী সংস্কৃত প্রয়োগ হইতে কিছু আলাদা বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু অযোধ্যাকাণ্ডের (যাহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রায় নাই বলিলেই চলে) যে কোন শ্লোক পরবর্তী কালের সংস্কৃতভাষার সৌষ্ঠবেই রচিত। উদাহরণ স্বরূপ একটি শ্লোক দেওয়া যাইতেছে—

তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্প্যমানৌ চ কামতঃ।
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥

[সেই (কেকয়রাজ্যে) সর্বসুখে লালিত হইয়া নিবাস করার সময়েও (ভরত ও শত্রুঘ্ন) দুই বীর ভ্রাতা (রাম ও লক্ষ্মণের) কথা স্মরণ করিতেন এবং (বিশেষ করিয়া) বৃদ্ধ রাজা (পিতা) দশরথের কথা]

দুইটি শ্লোকের ভাষাগত অসাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। বাল্মীকির অর্ধবৈদিক ভাষা এই ভাবে পুরোপুরি সংস্কৃতে পরিণত হইতে বহু শতাব্দী পার হইয়াছে। রামায়ণ-কাব্য মুখে মুখে চলিয়া আসাতে ক্রমে ক্রমে ভাষার এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভাষার পরিবর্তনের সাথে ঘটনার বর্ণনা ও লোকের কল্পনাও কিছু পরিবর্তিত না হইয়া যায় নাই। সুতরাং সাধারণ লোকের কল্পনার মধ্য দিয়া অনেক কিছুই আমরা বর্তমানের মূল অংশে পাই যাহার জন্য বাল্মীকি হয়ত আদৌ দায়ী নহেন।

তথাপি একথা সত্য যে, পরিবর্তিত মূল অংশও অতি প্রাচীন এবং আমরা আর্ষ রামায়ণ বলিতে ইহাকেই বুঝিব। ইহার মধ্যেই আরও অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি যোজিত হইয়াছে। এই মূল অংশে অপ্রাকৃত কল্পনা অনেক কিছু থাকিলেও একটু সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিলেই বাল্মীকির আদি রচনায় কি ছিল তাহা ধরিতে পারা শক্ত হয় না। বাল্মীকি হনুমান্‌কে অতি শোভন চরিত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন। মূলে যদি কোথাও তাহার লেজের উল্লেখ থাকে (খুব কমই আছে) তাহা বাদ দিয়া হনুমানের স্বরূপ উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে শক্ত হইবে না। এই ভাবে নানা বিভিন্ন অংশে কিছু কিছু পরবর্তী কালের কল্পনার প্রসারকে ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া মূল ঘটনার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি বাদ দিলে মূল রামায়ণ বলিয়া যাহা গ্রহণযোগ্য তাহার প্রায় শতকরা ৯৫ অংশই আসিয়াছে বাল্মীকির রচনা হইতে—সেই বর্ণনা, সেই শ্লোক, সেই বাক্যযোজনা; শুধু কালের পরিবর্তনে ব্যাকরণগত পরিবর্তন কিছু কিছু সাধিত হইয়াছে। এই মূল অংশকেই আমরা সমাদর করিতে বাধ্য এবং ইহাতে যে ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখি, তাহারই রসাস্বাদে আমাদের সাহিত্যে তৃপ্তি এবং জীবনের আদর্শ পূর্ণতা লাভ করে। এই মূল অংশ কখন বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার আলোচনা সম্ভব হইলে পরে করা যাইবে।

ভগবান্ মহাবীর

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

জৈনধর্মের সংস্থাপক ও প্রবর্তকগণকে তীর্থঙ্কর বলে। এইরূপ তীর্থঙ্কর চতুর্বিংশতি জন হইয়াছেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম ও সংঘ প্রবর্তন, নিয়মন ও পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। জৈন-মতে একজন তীর্থঙ্করের আবির্ভাবের পর যে পর্যন্ত অন্য আর একজন আবির্ভূত না হন, সে পর্যন্ত প্রথম আবির্ভূত তীর্থঙ্করের শাসন বলবৎ থাকে, অর্থাৎ তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম ও নিয়ম প্রচলিত থাকে। বর্তমানে চলিতেছে ভগবান্ মহাবীরের শাসন।

খৃঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বিদেহ জনপদের তদানীন্তন রাজধানী বৈশালীর নিকটবর্তী ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা 'জ্ঞাত'-নামক ক্ষত্রিয়-বংশের অধিনায়ক সিদ্ধার্থ ও মাতা রাজ্ঞী ত্রিশলা। ত্রিশলা বৈশালীগণতন্ত্রের মুখ্যাধিপতি মহারাজ চেটকের ভগ্নী ছিলেন। মহাবীরের পিতৃদত্ত নাম 'বর্ধমান'। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিবর্ধন। কুমার বর্ধমানের বয়ঃক্রম যখন ২৮ বৎসর, তখন তাঁহার পিতামাতা উভয়েরই মৃত্যু হয়। তিনি তখনই বৈরাগ্যের প্রেরণায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে উদ্যত হন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আগ্রহে আরও দুই বৎসর গৃহে থাকিয়া যান। অতঃপর ত্রিশ বৎসর বয়সে মার্গশীর্ষ মাসের কৃষ্ণা দশমী তিথিতে ধন, সম্পত্তি, গৃহ, পরিবার প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিজহস্তে শ্রমণদীক্ষা গ্রহণ পূর্বক মাত্র একটি দিব্যবস্ত্র স্কন্ধে ধারণ করিয়া একাকী নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অভিনিষ্ক্রমণের সময় তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল আজ হইতে সমগ্র জীবন প্রাণীর প্রতি সমভাব অবলম্বন করিব এবং মন, বচন ও কায়ের দ্বারা কোনও প্রকার পাপজনক আচরণ করিব না, অন্যের দ্বারা করাইব না বা অন্য কেহ তদ্রূপ আচরণ করিলে তাহা অনুমোদন করিব না। অনন্তর দীক্ষা-গ্রহণান্তে আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধন করিয়া জীবন্মুক্তি-লাভের জন্য কুমার বর্ধমান কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সম্পূর্ণ রিক্ত ও নগ্নাবস্থায় তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে, প্রান্তরে, শ্মশানে, বনে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ বা উৎকট শীত, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব, নানাপ্রকার শারীরিক নির্যাতন তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিত না। দেহাত্মবোধ তাঁহার সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়কে তিনি জয় করিয়াছিলেন। উপকার-অপকার, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু, আদর-অপমান প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ সমভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতেন, স্তাবক ও নির্যাতক—উভয়েই তাঁহার চক্ষে সমভাবে দৃষ্ট হইত। মৌনাবলম্বন পূর্বক ধীরপদবিক্ষেপে ভূমি-সংলগ্ন-দৃষ্টি লইয়া তিনি পরিব্রজন করিতেন। শূন্য ও পরিত্যক্ত গৃহে, শ্মশানে, উদ্যানে বা বৃক্ষতলই ছিল তাহার আবাস, এমন কি দণ্ডায়মানাবস্থায়ই তিনি ধ্যানে লীন থাকিতেন। নিদ্রাকে জয় করিয়া সমস্ত রজনী তাঁহার ধ্যানে কাটিত। রাঢ়দেশ হইতে পশ্চিমে অঙ্গ, মগধ, বিদেহ, কাশী, কোশল প্রভৃতি উত্তর ভারতের জনপদ-সমূহে তিনি পরিব্রজন করিয়াছিলেন।

পর্যটনের সময় স্থানে স্থানে তাঁহার প্রতি যেরূপ ভীষণ নির্যাতন করা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে সত্যই রোমহর্ষণ হয়, কিন্তু তিনি সমস্তই অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিতেন। অবশেষে ঘোরতর তপস্যা ও অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতার জন্য তিনি মহাবীর-আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরাধিক কাল কঠোর সাধনায় অতিবাহিত করিয়া বৈশাখ-মাসের শুক্লপক্ষের পুণ্য দশমী তিথিতে মহাবীর কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, যাহার আলোকে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় পদার্থ প্রকৃত স্বরূপে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তিনি অর্হৎ, জিন, কেবলী, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হইলেন।

এইবার মহাবীরের তীর্থঙ্কর-জীবনের আরম্ভ। সাধক-অবস্থায় তিনি কোনও রূপ উপদেশ-প্রদান বা ধর্মপ্রচার করেন নাই। এখন তিনি ধর্ম-প্রচার ও সংঘস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমেই তিনি আপাতদৃষ্টি-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত বেদবাক্যের সমন্বয়াত্মক ও নবীন অর্থ করিয়া ইন্দ্রভূতি, গৌতম প্রমুখ একাদশ জন বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী প্রগাঢ় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দীক্ষা-প্রদান পূর্বক নির্গ্রন্থ সাধু-সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই একাদশ জন আচার্য সাধু-সংঘের নেতা বা গণধর-পদে স্থাপিত হইলেন। এই একাদশ জনের শিষ্যসংখ্যা ছিল—৪৪০০ জন। তাঁহারাও তাঁহাদের আচার্যগণের সহিত দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সময়েই স্ত্রীগণকে দীক্ষা প্রদান করিয়া সাধ্বী-সংঘের এবং গৃহস্থ পুরুষ ও স্ত্রীগণকে ব্রত ধারণ করাইয়া শ্রাবক ও শ্রাবিকা-সংঘেরও প্রতিষ্ঠা হইল। অতঃপর সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকারূপ চতুর্বিধ সংঘের প্রবর্তন করিয়া ভগবান্ মহাবীর ধর্মপ্রচার করিতে লাগিলেন।

মহাবীর সাধুগণের জন্য অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রত পালন করিবার নিয়ম প্রণয়ন করিলেন, প্রত্যেক সাধুকে মন, বচন ও কায়ের দ্বারা উক্ত পাঁচটি মহাব্রত সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে হইবে। কোনও সাধু কোনও প্রকার হিংসা, অসত্য, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য-সেবন ও ধনধান্যাদিরূপ পরিগ্রহ গ্রহণ বা সঞ্চয় স্বয়ং করিতে পারিবেন না, অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা করাইতে বা অন্য কেহ তদ্রূপ করিলে তাহা অনুমোদন পর্যন্ত করিতে পারিবেন না। সাধ্বী-গণকেও সাধুর অনুরূপ সমস্ত নিয়ম পালন করিতে হইবে। গৃহস্থগণের পক্ষে এইরূপ মহাব্রত সম্পূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাদের জন্য অহিংসাদি ব্রত আংশিক রূপে ও সীমাবদ্ধভাবে পালন করিবার নিয়ম প্রবর্তন করা হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম জন্মোৎসব—বেলুড়মঠে তিথিপূজা ও সাধারণ উৎসবের বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও যথারীতি ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রচুর আনন্দ, কর্মপ্রাণতা এবং উৎসাহমুখর উদ্দীপনার মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিথিপূজা-দিবস ছিল ৩রা ফাল্গুন, রবিবার। সাধারণ উৎসব হইয়াছিল ১০ই ফাল্গুন—পরবর্তী রবিবারে। ৩রা ফাল্গুন ভোর রাত্রি হইতেই উৎসবের এক-টানা কর্মসূচী আরম্ভ হয়—মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা-হোমাদি, ভজন, চণ্ডীপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ

ও ব্যাখ্যান এবং লীলা- ও কালীকীর্তন প্রভৃতি। বহুসহস্র ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। আনুমানিক ৭৫,০০০ সমুৎসুক ধর্মপ্রাণ নরনারীর একত্র সমাবেশ এবং প্রত্যুষ হইতে রাত্রি পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ভক্তিবিনতভাবে তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি দানের দৃশ্য ছিল সত্যই অপরূপ। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত ও স্বামী সৎস্বরূপানন্দ সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

রাত্রে যথাবিধি কালীপূজা ও হোম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। শেষরাত্রে মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজ ১৪ জন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস এবং ২৪ জন ব্রতীকে ব্রহ্মচর্যদীক্ষা-দানে ধন্য করেন।

সাধারণ উৎসবের দিন মন্দিরের পূবাদকের প্রাঙ্গণে সাময়িক ভাবে নির্মিত সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি সুবৃহৎ তৈলচিত্র ও ব্যবহার্য জিনিষপত্র সজ্জিত রাখা হয়। ঐ মণ্ডপে অনেকগুলি কীর্তনের দল সারাদিন ভজন ও কীর্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন। মঠবাড়ীর প্রাঙ্গণেও বিখ্যাত আন্দুল সম্প্রদায়ের কালীকীর্তন হইয়াছিল। প্রধান মন্দিরে দর্শনের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক-দলের দায়িত্বশীল কর্তব্যপালন ও কার্যতৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যাহ্নে বহুসহস্র নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এবারকার উৎসবে অন্যূন চার লক্ষ লোকের সমাবেশ অনুমিত হয়।

কতকগুলি শাখাকেন্দ্র হইতে সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত উৎসবানুষ্ঠানের বিবরণী আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে।

মাদ্রাজ মঠে তিথিপূজার দিন বিশেষ পূজা, হোমাদি এবং প্রায় ১০০০ দরিদ্রনারায়ণ ও ১২০০ ভক্তকে পরিতোষসহকারে ভোজন করান হয়। সায়াহ্নে আরাত্রিকান্তে ভক্ত ও সুধীবৃন্দের সমক্ষে Gospel of Sri Ramakrishna পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সাধারণ উৎসবের দিন সকাল ৮টায় ৪০ জন সাধু ও ভক্তের সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থটির ইংরেজীতে 'প্রবচন' খুব হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। অপরাহ্ণে উপস্থিত ভক্ত ও জনমণ্ডলী প্রসিদ্ধ পাঠক শ্রীআন্নাস্বামীর তামিল ভাষায় সুললিত 'ভক্ত কুচেল' উপাখ্যান শ্রবণ করেন। অতঃপর বিবেকানন্দ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডি এস শর্মার সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। বিভিন্ন বক্তা তামিল, তেলেগু ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বজনীন বাণীর আলোচনা করেন।

বোম্বাই (খার) আশ্রমে তিথিপূজার দিন বিশেষ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তন, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্ণে Sri Ramakrishna, The Great Master গ্রন্থ হইতে পাঠ এবং আলোচনা হয়। ৯ই ফাল্গুন বোম্বাই শহরের সি জে হলে আহূত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন বোম্বে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমোরারজী দেশাই। প্রধান অতিথিরূপে শিক্ষা ও আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীদিনকররাও দেশাই উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি এবং অধ্যক্ষ ডক্টর এস কে মুরঞ্জন, অধ্যক্ষ এন ডি গুরবক্সানি, অধ্যাপক এল্ এইচ্ আজোয়ানী এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

১৭ই ফাল্গুন রবিবার আশ্রমিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিপদে বৃত হ'ন সস্ত্রীক মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীজি এস বাজপেয়ী। রাজ্যপাল মহোদয় তাঁহার ভাষণে জনসাধারণকে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য হইতে সেবাধর্মের প্রেরণা লাভ করিতে বলেন। তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আমাদিগের বৈদেশিক নানা 'ইজ্‌মে'র দিকে ঝুঁকিয়া পড়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইহার বিরাট কর্ম-প্রেরণা নিছক সামাজিক কর্তব্যবোধে জাগরিত এবং সম্প্রসারিত হয় নাই, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে মানবসমাজের প্রতি পরম ভালবাসা।

পুরী (চক্রতীর্থ) মঠে অন্যান্য আনুষঙ্গিক রীতিসহ তিথিপূজার দিন বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম এবং প্রসাদবিতরণ হইয়াছিল। বিকালে স্বামী জগন্নাথানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মেদিনীপুর সেবাশ্রমে তিথিপূজা উপলক্ষে দুই দিন কলিকাতার বিশিষ্ট ধর্মবক্তা শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, সাহিত্যরত্ন মহাশয় 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ'-সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং 'কথামৃত' ব্যাখ্যা করেন।

জামতাড়া (সাঁওতাল পরগণা) আশ্রমে বিশদভাবে পূজা, হোম, ভজন এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবা হইয়াছিল। প্রাতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্য-সজ্জায় মোটরে বসাইয়া কীর্তন-সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করা হয়। জনসভায় স্বামী সংশুদ্ধানন্দ ও স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন।

রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে শহরের ডুরেণ্ডা পল্লীতে ১০ই ফাল্গুন প্রাতে উষাকীর্তন, পূজা ও ভজন, দ্বিপ্রহরে দ্বিসহস্রাধিক দরিদ্র-নারায়ণসেবা এবং অপরাহ্ণে স্বামী সেবাত্মানন্দের পৌরোহিত্যে জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। রাঁচি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনওলকিশোর গৌর ও অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলি ভাষণ দেন। রাত্রে 'ভক্তের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ'-সম্বন্ধে কথকতা এবং স্থানীয় শিশুদের 'লবকুশের যুদ্ধ'-নামক অভিনয় সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

ফরিদপুর আশ্রমে জন্মতিথি-উৎসব সমারোহের সহিত উৎযাপিত হইয়াছে। আলোচনা-সভায় সভাপতি ছিলেন স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আলতাফ গহব। কুষ্টিয়া-পাবনার জেলাজজ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র লাহিড়ী এবং স্থানীয় সাব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র গুহ এবং সভাপতি মহাশয়ের প্রাঞ্জল ও ভাবপূর্ণ অভিভাষণ উপস্থিত সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছিল। ৮ই ফাল্গুন শুক্রবার ফরিদপুর শহর ও পল্লী-অঞ্চল হইতে আগত প্রায় ছয় সহস্র নরনারীর মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে তিথিপূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১১ই ফাল্গুন সকালে বিহার-রাজ্যপাল মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ রামচন্দ্র দিবাকরের সভাপতিত্বে একটি জনসভার আয়োজন হয়। শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীশিবসাগর অগস্তী (হিন্দিতে) এবং এই প্রতি-ষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী বোধাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা-সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষণ দেন। রাজ্যপাল মহোদয় তাঁহার ভাষণে বলেন—তিনি তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-ধারার সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'কথামৃত' প্রভৃতি পুস্তকগুলি পড়িবার আগ্রহে তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি আরও বলেন—আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু কর্মী দেশ ও সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের দ্বারা সমগ্র জগৎ প্রথম ভারতকে শ্রদ্ধাকরিতে

শিখে। বুদ্ধ, মহাবীর, শ্রীরামকৃষ্ণ, গান্ধীজী প্রভৃতি মহাপুরুষদের বাণী শুধু আলোচনা করিলেই চলিবে না—পরন্তু তাঁহাদের উপদেশ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। আজ পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত—একমাত্র ভারতই তাহার আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারের দ্বারা সমগ্র জগতে শান্তি আনিতে সমর্থ। রাজ্যপাল বিদ্যাপীঠের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী, কর্মতৎপরতা, পরিচ্ছন্নতা এবং ত্যাগ, শিক্ষা ও সেবার আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ দেখিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন।

জনশিক্ষা-শিবির—গ্রামোন্নয়নের জন্য সাধারণ কয়েকটি শিল্প, কৃষি এবং স্বাস্থ্য, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহশীল কর্মীরা যাহাতে একসঙ্গে আলোচনা এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নির্দেশ ও পরামর্শ দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠের উদ্যোগে ৩রা ফাল্গুন হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্যন্ত একটি শিক্ষা-শিবির খোলা হইয়াছিল। বিভিন্ন গ্রাম ও প্রতিষ্ঠানের ১৯ জন দূরাগত কর্মী সারদাপীঠে থাকিয়া উহার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁহারা ব্যতীত সারদাপীঠ জনশিক্ষা-বিভাগের যুবক কর্মিবৃন্দ এবং অন্যান্য আরও অনেকে শিবিরের বক্তৃতাদিতে উপস্থিত থাকিতেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুত পান্নালাল বসু মহোদয় এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র, ডাঃ মন্মথনাথ সরকার, কলিকাতা পশুচিকিৎসা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা-বিভাগের শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট্ সমাজসেবা-বিভাগের শ্রীননী দত্ত, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ বিভিন্ন আলোচনা-পরিচালনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত প্রফুল্ল সেন, প্রচার-বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীযুত গোপিকাবিলাস সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্য-বিধানসভার স্পীকার শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় শিবির পরিদর্শন করিয়া শিক্ষার্থিগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রাত্যহিক শিক্ষাপ্রদ নানা সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সাতদিনে দশ হাজারের উপর জনসমাবেশ হইয়াছিল।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী নিখিলানন্দের প্রচার—নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে প্রতি বুধবার ভারতীয় দর্শন ও মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধে শিক্ষা-মূলক ভাষণ দিতেছেন। এই বক্তৃতাগুলি ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত চলিবে। উহাদের ক্রমিক সূচী :—(১) হিন্দুদর্শনের মূলকথা (২) মন এবং উহার শক্তিনিচয় (৩) চেতনার পাঁচটি স্তর (৪) কর্ম এবং নৈষ্কর্ম্য—ভগবদ্গীতার দর্শন (৫) মৌনের সৃজনী শক্তি (৬) আধ্যাত্মিক সাধনারূপে ধ্যান (৭) বুদ্ধবাণী (৮) হিন্দুধর্ম এবং ভাবী ভারত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকগণ ব্যতীত ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতি অনুরাগী জনসাধারণও বক্তৃতাগুলি হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করিতেছেন।

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত-সমিতি—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন্ রাজ্যে অবস্থিত এই শাখা-কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যবিবরণী (অক্টোবর, ১৯৫১ হইতে অক্টোবর, ১৯৫২ পর্যন্ত) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য কালে আশ্রমাধ্যক্ষ

স্বামী দেবাত্মানন্দজী প্রতি রবিবার সকালে ভক্তি-মূলক বিষয়ে আলোচনা ও ধ্যানশিক্ষা দান এবং সন্ধ্যায় মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবার ভগবদ্গীতা-অবলম্বনে 'প্রাত্যহিক জীবনে দর্শন'-সম্পর্কে প্রসঙ্গ হইয়াছিল। বুধবার বেলা ১টায় আরও একটি ক্লাশ হইত। বৃহস্পতিবারে সকলকে যোগ ও ধ্যান-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

ওরেগন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-উপলক্ষে আহূত একটি ধর্মমহাসভার চারিদিন ব্যাপী অধিবেশনে স্বামী দেবাত্মানন্দজী হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। চারিদিনই তিনি সুচিন্তিত ভাষণ দান করেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ধর্মের ক্লাশেও তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

ওরেগন্ শিক্ষা কলেজ হইতেও বক্তৃতার জন্য স্বামী দেবাত্মানন্দজী আমন্ত্রিত হন। সিয়েটল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল যোগদর্শন। লিঙ্কন বিদ্যালয় (সাংবাদিক বিভাগ) এবং লুইস্ ও ক্লার্ক কলেজ হইতে আগত শিক্ষক ও ছাত্রদের বেদান্ত-দর্শন ও ধর্মবিষয়ক মনোজ্ঞ ভাষণে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

গ্রীষ্মকালে হনলুলুর (হাওয়াই দ্বীপ) কতিপয় আগ্রহশীল ব্যক্তির আহ্বানে দেবাত্মানন্দজী মাসাধিককাল সেখানে কাটান এবং 'কর্মজীবনে বেদান্ত-দর্শন' এবং 'ধ্যানযোগ'-সম্বন্ধে ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দেন।

আশ্রমিক ঘরোয়া খবর হিসাবে পূজাদির ও বিভিন্নানুষ্ঠানের কথা উল্লেখযোগ্য। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজা যথাবিধি প্রচুর আনন্দের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, ভগবান বুদ্ধ, ভগবান যীশুখ্রীষ্ট, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের জন্মতিথি ও ইষ্টার দিবস উদ্‌যাপন বর্ষের বিভিন্ন সময়ে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বেদান্ত-কেন্দ্রের পঞ্চবিংশ বার্ষিকীর সময় উপাসনালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের একটি পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপন করা হয়। ইহা নিউইয়র্কের বিখ্যাত মহিলা-ভাস্কর মিস্ ম্যালভিনা হফ্‌ম্যানের নির্মিত। দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনস্ আয়রস্ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দজী বুদ্ধদেবের জন্মদিনে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষণে সকলকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

ফিনিশ্ রাষ্ট্রদূত ও সংস্কৃত ভাষা—গত ২৯শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী) কাশী সরকারী সংস্কৃত কলেজের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মঃ হুগো ভলর্বাঁ বলেন—বহুতর ভাষাসমস্যা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের একান্ত কর্তব্য, এই দেশের প্রাচীন মহান সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন এবং সংরক্ষণের চেষ্টা করা। এই ভাষার ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘরে বাহিরে উহার প্রসার পূর্বক বিশ্বের দরবারে ভারত যাহাতে সংস্কৃত-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয় এই গুরু কার্যভার ভারতবাসীকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংস্কৃত কৃষ্টির মধ্যেই জাতির অমূল্য আধ্যাত্মিক

ভাবরাশি নিহিত আছে। সমগ্র পৃথিবীরই উহা প্রয়োজন।

জীবন ও মৃত্যু-সম্বন্ধে মানব-মনের চিরন্তন প্রশ্নগুলির সমাধান ভারতবাসী যাহা করিয়াছে তাহা গ্রীক দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে এই দেশের মরমীয়া ও ভক্ত সাধকেরা জীবনের দুর্জ্ঞেয় সমস্যাগুলি-সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার কালিদাসপ্রমুখ কবিগণের কতক-গুলি অতুলনীয় নাটক এবং কাব্য বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শতাব্দীর পর শতাব্দী মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন এবং শান্তিদান করিয়াছে।

নয়া দিল্লীর শহরতলীতে উৎসব—নয়া-দিল্লীর বিনয়নগরে ২৯শে ও ৩০শে ফাল্গুন ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন অপরাহ্ণে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পুষ্পমালিকা-সজ্জায় মঞ্চস্থ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর বিশাল প্রতিকৃতির সম্মুখে আরতি এবং স্থানীয় ধর্মসভা কর্তৃক কীর্তন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। অতঃপর পণ্ডিত জগদীশ রাজপ্রভাকরের শ্রীরামচরিতমানস-পাঠ ও ব্যাখ্যা, রামনাম-সংকীর্তন এবং গোস্বামী গণেশদেওজীর সুচিন্তিত ভাষণ সমবেত ভক্ত ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে স্থানীয় বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, সিন্ধি ও মাদ্রাজীদের আবৃত্তি ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার পর বেদমন্ত্রোচ্চারণ ও ভজন-শেষে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সভা-পতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপিকা কমলা গর্গ, অধ্যাপক বি এন চৌধুরী, শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী এবং দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন।

পুরুলিয়ায় স্বামিজীর একনবতিতম জন্মোৎসব—স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তরুণসংঘের উদ্যোগে গত ২৫শে মাঘ পশুপতি গঙ্গাধর সঙ্গীত-বিদ্যালয় ভবনে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে স্বামিজীর জীবনী-সম্বন্ধে রচনা ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ উদ্বোধন-পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দের পৌরোহিত্যে একটি আলোচনা-সভারও অধিবেশন হয়।

আজমীরে অনুষ্ঠান—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মোৎসব এখানে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ৩রা ফাল্গুন বিশেষ পূজাদি, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও বচনামৃত পাঠ, জীবনী ও উপদেশ-আলোচনা এবং ভজনাদি হইয়াছিল।

১০ই ফাল্গুন রবিবার দিবস স্থানীয় টাউন হলে আজমীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। মঞ্চোপরি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামিজীর প্রতিকৃতি পুষ্প-মাল্যাদিতে সুশোভিত করা হইয়াছিল। বৈদিক প্রার্থনা ও ভজনগানের পর শ্রীযুত চন্দ্রগুপ্ত বার্ষ্ণেয় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান্ অবদান দুইটি; প্রথম—স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বিতীয়—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন। স্বামিজী গো-সেবা অপেক্ষা নরনারায়ণ-সেবার উপর সমধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন। স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভি ভি জন বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অনাড়ম্বর ও মৌন তপস্যার জীবন অবশ্য অনুসরণীয়—অন্যথা কেবল বৃথা

বাক্যব্যয় ও ধর্মহীন কপটতায় ভারতবাসীর প্রকৃত কল্যাণ সুদূরপরাহতই থাকিবে। অতঃপর স্বামী আদিভবানন্দ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও জড়-বিজ্ঞানের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও এ্যানি বেশান্তের অবদান আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত ধর্ম-সমন্বয়, নরনারায়ণ-সেবা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী সমগ্র জগতের প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তির নিদান-স্বরূপ। সভাপতি শ্রীযুত উপাধ্যায় তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণে বলেন,—"কারাবাস-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় হয় এবং আমার চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ চিত্তে প্রকৃত শান্তির সঞ্চার হয়। 'যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই এ শরীরে রামকৃষ্ণ'—এক নিরক্ষর ব্যক্তির এই উক্তি প্রথমে তেমন বুঝি নাই। কিন্তু গভীরভাবে অনুধ্যান দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইল, সত্যই পূর্ব পূর্ব যুগে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণে যে সকল মহান্ ঐশ্বরিক শক্তির উন্মেষ হইয়াছিল তাহাই এই নাস্তিকতার যুগে লোকশিক্ষার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রে বিকাশ লাভ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী উচ্চ-নীচ সকলকে সমানভাবে দেখিয়াছেন। আমরাও অপরের দুঃখে মানসিক দুঃখ বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু গরীব মাঝিকে প্রহৃত হইতে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীরেও প্রহার-চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল তাহা সত্যই অলৌকিক। তিনি সিদ্ধাই পছন্দ করিতেন না; যেখানে দুই পয়সা ব্যয়ে নদী পার হওয়া যায় সেখানে কঠোরতা ও সাধনার দ্বারা যোগবলে হাঁটিয়া নদী পার হওয়ার সার্থকতা নাই, কারণ সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন ও বাণী আমরা ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করিয়া যেন ধন্য হই এই প্রার্থনা।"

কয়েকটি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—আমেদাবাদে উৎসবের আয়োজন করেন স্থানীয় বিবেকানন্দ-মণ্ডলী পাঠচক্র। অন্যান্য কার্যসূচী ব্যতীত সন্ধ্যায় একটি সম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও ত্যাগের আদর্শ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

রামগড়ে (হাজারিবাগ) স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উৎসাহে বিশেষপূজা ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জনসভায় পৌরোহিত্য করেন রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্যানাটোরিয়ামের অধ্যক্ষ স্বামী বেদান্তানন্দ।

পাবনায় (পূর্ব-পাকিস্থান) শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১১৮তম জন্মতিথি-স্মরণে আহূত সভায় অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, শ্রীঅমর মৈত্র, শ্রীজগদিন্দ্র মৈত্র, ডাঃ দ্বিজদাস বাগ্‌চি, অধ্যাপক শ্রীনলিনী রায় এবং শ্রীরাধাচরণ দাস, সাহিত্যরত্ন পাঠ ও আলোচনা করেন।

মেদিনীপুর জেলার খেপুত গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজা বিশেষ উৎসাহ ও আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। কীর্তন, গীতাপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও আলোচনা এবং প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় (পূর্বপাকিস্থান) স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উৎসবে প্রায় তিন সহস্র নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক হরিজন অন্য সকলের সঙ্গে বসিয়া খিচুরী মিষ্টান্নাদি প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

গত ৯ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে কলিকাতা বদ্রিদাস টেম্পল্ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরবাটীতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে একটি আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে পৌরোহিত্য করেন বেলুড়মঠের স্বামী সাধনানন্দ। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ছিলেন অন্যতম বক্তা। সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন গীত হয়।

পরলোকে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র—কলিকাতা পৌরসভার মেয়র শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের পরলোক-গমনে বাংলার একজন একনিষ্ঠ প্রাচীন দেশকর্মীর অভাব হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সময় হইতে তিনি দেশের স্বাধীনতা এবং উন্নতির জন্য নানাক্ষেত্রে যে অকুণ্ঠিত উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়। আমরা তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

"হে রাম, শরণাগত"

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং
যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ।
যন্নামসাররসিকো ভগবান্ পুরারি-
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি ॥

যস্যাবতারচরিতানি বিরিঞ্চিলোকে
গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাদ্যাঃ।
আনন্দজাশ্রুপরিষিক্তকুচাগ্রসীমা
বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রপদ্যে ॥
(অহল্যা-স্তোত্র, অধ্যাত্মরামায়ণ)

যাঁহার চরণ-কমল-কণিকা
বেদচয় ফিরে সন্ধানে
নাভি-শতদলে ব্রহ্মা জাগেন
অখিল-সৃষ্টি-সংজ্ঞানে—

ত্রিপুরনাশন শঙ্কর যাঁর
নামরসপানে উন্মনা
অবিরত সেই শ্রীরামচন্দ্রে
রাখিনু চিত্ত-ভাবনা।

বিরিঞ্চি-লোকে মহিমা যাঁহার
অবতার-লীলা-ব্যাখ্যানী
গান নারদাদি ঋষি-দেবগণ
গান পদ্মজ-শূলপাণি—

গান বাগ্‌দেবী প্রেমবারি ছুটে
বক্ষের সীমা লঙ্ঘিয়া
সেই রঘুবরে লইনু শরণ
শ্রীপদযুগ্ম বন্দিয়া।

"হে রাম শরণাগত, শরণাগত! এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কোরো না।"
—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি

কথাপ্রসঙ্গে

'রামকৃষ্ণ—ফ্যাশান্'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উপলক্ষে গতমাসে কলিকাতাব অনতিদূরবর্তী নানাস্থানে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। বর্তমান কালের নাস্তিকতা, বিদ্বেষ ও নির্লজ্জ ভোগোন্মত্ততার প্রতিষেধকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভগবন্ময় বিশ্বহিতরত নিষ্কলুষ জীবন ও উদার শিক্ষার যত প্রচার ও সমাদর হয় ততই মঙ্গল, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু অনেক ভাল জিনিসও যেমন যথার্থ প্রেরণার অভাবে প্রাণহীন হইয়া পড়ে, আকাঙ্ক্ষিত সুফল প্রসব করে না—সেইরূপ গতানুগতিক আলেখ্য-সজ্জা, নগর-সংকীর্তন, পূজা-হোমাদি খিচুড়ী-প্রসাদ-বিতরণ এবং আলোচনাসভার পারম্পর্যই কিছু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিবার্ষিকীকে সার্থক করে না—যদি না উৎসবের পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ভাব ও আদর্শের জীবন্ত বিগ্রহ, সেইগুলি উৎসব-উৎসাহীরা জীবনে সাধিবার চেষ্টা করেন। এই খাঁটি সত্যকথাটি অভিনব ইঙ্গিতপূর্ণ একটি উক্তির মাধ্যমে দুই স্থানের উৎসব-সভায় জনৈক চিন্তাশীল বক্তার (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ) ভাষণে শুনিয়া আমাদের খুব ভাল লাগিল। বক্তা 'রামকৃষ্ণ-ফ্যাশান্' হইতে শ্রোতৃমণ্ডলীকে সাবধান হইবার কথা বলিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্য ঈশ্বরপ্রেম, সকল স্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি প্রভৃতি গভীরভাবে যদি অনুশীলন করিতে পারি তবেই তাঁহার নাম করা সার্থক—নতুবা রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ করিয়া আসর জমানো একটি 'ফ্যাশান্' বা হুজুগ—সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র ইহাই ছিল তাঁহার কথার তাৎপর্য।

'ফ্যাশান্' মাত্রই একটি হালকা অহমিকার দ্যোতক। উহার পশ্চাতে কোন গভীর ভাব বা মনন নাই। কোন কোন 'ফ্যাশান্' অনিষ্টকরও বটে। লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে ইহা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে 'ফ্যাশান্' শুধু অনিষ্টকরই নয়, মারাত্মক। শুভ ও সত্যকে জীবনে পরিণত করিতে যে পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হয় উহা যখন আমরা এড়াইতে চাই তখনই হয় 'ফ্যাশান্' এর উদ্ভব। মনকে আমরা চোখ ঠারি দিয়া বুঝাই আমরা তো সত্যেরই পতাকা বহন করিতেছি—কিন্তু বস্তুতঃ আমরা নিজেদের এবং বাহিরের লোককেও প্রবঞ্চনা করি। 'ফ্যাশান্' দিয়া আমরা আমাদের সাধনা ও অনুভূতিব দৈন্যকে ঢাকিতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ছিল সর্বপ্রকার 'ফ্যাশানের' জ্বলন্ত প্রতিবাদ। লোক দেখানো কিছু তিনি জানিতেন না, করিতে পারিতেন না। আচারবৃত্তে একটুও আড়ম্বর ছিল না বলিয়াই আবার অনেকে তাঁহাকে ভুলও বুঝিত; ভাবিত, এ আবার কি রকম সাধু! কেহ কেহ তাঁহার অতি-সহজতাকে সভ্যতার অভাব ধারণায় তাঁহাকে উপহাস ও অবজ্ঞাও করিয়াছে। তিনি কিন্তু লোকের নিন্দা ও প্রশংসার অপেক্ষা না করিয়া অহরহঃ মাতৃপ্রেমে বিভোর হইয়া দিন কাটাইতেন। মায়ের

শিশু—বলিতেন,—"আমি মা ছাড়া আর কিছু জানি না," "মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না।"

এই সরল, সহজ, সত্যমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া যদি কোন নূতন 'ফ্যাশান্' গড়িয়া উঠে তাহা হইলে সত্যই তাহা পরিতাপের বিষয়। ভাবী কালের হুজুগকারিগণের তাঁহাকে লইয়া এই 'ফ্যাশান্' তিনি নিজেও বোধ করি তাঁহার জীবৎকালে দূর-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বেকার একটি স্বগতোক্তি হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়:

"শরীরটা কিছুদিন থাকতো, লোকদের চৈতন্য হোতো। * * * তা রাখবে না। * সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যানজপ নেই।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩।১৪।২)

এখন যে লোক ধর্মপ্রচার করিতেছে তাহা কিরূপ মনে করেন এই প্রশ্নের উত্তরে একদিন বলিয়াছিলেন—"দুই শত লোকের সঞ্চয়, হাজার লোকের নিমন্ত্রণ, অল্পসাধনে গুরু-গিরি ও প্রচার।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উহাতে আগাগোড়া সাধনের উপর—মন মুখ এক করিয়া ধর্মতত্ত্ব জীবনে অনুভব করিবার উপর ঝোঁক। সাধনায় শৈথিল্য দেখিলে কখনও কখনও তিনি কঠোর ভর্ৎসনা করিতেন:

"সালিশী, মোড়লী এ সব তো অনেক হোলো। তোমার ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দিবার সময় হয়েছে। পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও। লোকে না হয় জানুক যে ঈশান* এখন পাগল হয়েছে, আর পারে না। * * কোশাকুশি ছুড়ে ফেলে দাও।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২।১১।৬)

"সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক বৈরাগ্য নাই, দু চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।" (ঐ)

স্বামী বিবেকানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগিগণকে বার বার সাবধান করিয়া দিয়াছেন—ঠাকুরের অদ্ভুত জীবনের শিক্ষা কার্যতঃ অনুসরণ করাই তাঁহাকে প্রকৃত ভক্তি করা। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী একবার অনেকগুলি ভক্তের নাম সন্নিবিষ্ট করিয়া একটি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-স্তোত্র লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইলে স্বামিজী উহার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্যের ছাপ যাঁহার জীবনে পড়ে নাই তিনি কখনও ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত নামের যোগ্য নন্।

(স্বামি-শিষ্য সংবাদ, ২।২৩)

আমেরিকা হইতে স্বামিজী তাঁহার গুরু-ভ্রাতাগণকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যেও দেখিতে পাই তিনি শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষার তাৎপর্যের গভীর বিশ্লেষণ করিতেছেন,—তাঁহার শিক্ষার ভ্রান্ত অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে গুরুভাইদের সাবধান করিয়া দিতেছেন। 'রামকৃষ্ণ ফ্যাশান্'-বিষয়ে স্বামিজীর সুস্পষ্ট নির্দেশ বিশেষ লক্ষ্য করিবার। নাম নয়—কাজ, উচ্ছ্বাস নয়—জীবন, আলস্য নয়—আত্মপ্রত্যয়, মূঢ়তা—নয় সমীক্ষা, দল নয়—সমদৃষ্টি, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণপতাকাবাহীদের স্বামিজী বলিতে চাহিয়াছিলেন। আজিও ইহাই আমাদের আরও গভীরভাবে মনে রাখিতে হইবে। নচেৎ 'রামকৃষ্ণ ফ্যাশান্'-এর অভিঘাত শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমাকে ম্লান করিবে সন্দেহ নাই।

• • •

আর এক জাতীয় 'রামকৃষ্ণ ফ্যাশান্' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহার সম্বন্ধেও কিছু

* ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত।

সতর্কতা আবশ্যক। এই 'ফ্যাশানের' লক্ষণ হইতেছে কোনও কোনও ব্যক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভক্তরূপে নয়, সাধনার প্রেরণাদাতা রূপেও নয়—একেবারে ভগবানরূপে, শ্রীরামকৃষ্ণের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করিবার নায়করূপে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-ভঙ্গী, কথা, ভাষা (নর্তন, রোমাঞ্চ, অশ্রু প্রভৃতিও) সবই এই সকল আধুনিক অবতারে নূতন করিয়া প্রকটিত। নূতন কর্মনীতি; নূতন ভবিষ্যদ্বাণীও বিঘোষিত!

সহজে যদি দুর্লভকে পাওয়া যায় তাহা হইলে সে সুযোগ ছাড়ে কে? বিনা ভাড়ায় যদি সুরম্য প্রাসাদে বাস করিবার নিমন্ত্রণ আসে তো উহা প্রত্যাখ্যান করা যায় কি? তাই এই নূতন 'ফ্যাশান্'এ আকৃষ্ট হইবার লোকেরও কিছু কমতি দেখিতেছি না। কোন্ শান্তিঃপুরের কুটিরছায়ায় কোন্ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য তুলসী-গঙ্গাজলের পূজা এবং 'এস, এস' হুঙ্কার দিয়া এই সকল অবতারকে পৃথিবীপৃষ্ঠে নামাইয়া আনিতেছেন জানি না। আমরা শুধু ভগবান যীশুখ্রীষ্টের সেই বিখ্যাত উপদেশটি উদ্ধৃত করিয়া এই নূতন 'রামকৃষ্ণ ফ্যাশান্' হইতে সতর্ক হইতে সকলকে অনুরোধ জানাই। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—Beware of false prophets.

বিশ্বধর্মের মর্মকথা

ইতিহাসে এমন এক একটি সময় আসিয়াছে যখন এক একটি ধর্মকে প্রবলশক্তিশালী হইয়া ব্যাপক প্রসারলাভ করিতে দেখা গিয়াছে—দিকে দিকে সহস্র সহস্র নরনারীর ভক্তি উহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। দল-বৃদ্ধিরূপ মানুষের মনের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিটি (অথবা দুর্বলতা?) তখন সক্রিয় হইয়া ঐ ধর্মের পতাকাবাহীদের হৃদয়ে স্বভাবতই এই বিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছে যে, তাঁহাদের এই সবল ধর্মটিকে বিশ্বের সকল নরনারীর উপর চাপাইতে পারিলে সমগ্র মানবজাতি এক অখণ্ড পরিবারে পরিণত হইবে। এইভাবে দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম—বিভিন্ন সময়ে 'বিশ্বধর্মে'র আসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রচেষ্টায় মানুষের শুভও হইয়াছে, অশুভও হইয়াছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টাটি তাহার লক্ষ্যে পৌছিতে পারে নাই। 'বিশ্বধর্ম' মানুষের কাছে একটি স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে।

এখনও মানুষ ঐ স্বপ্ন ছাড়িতে পারে নাই। 'এক পৃথিবী,' 'এক সমাজ,' 'এক রাষ্ট্রে'র ন্যায় 'এক ধর্ম'রূপ শ্লোগানটিও মানুষের কল্পনাকে মাঝে মাঝে বেশ দোলা দিয়া যায়। পৃথিবী যে এক এবং তাহাতে যে এক মানুষজাতি বাস করে (শারীরতত্ত্ব, সামাজিক লেন-দেন এবং মানসিক আশা আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়া) তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং এইজন্য সকল মানুষের জন্য এক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা একদিন বাস্তব হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু 'একধর্ম'—কল্পনাটির কথা বোধ করি আলাদা। ধর্ম মানুষের অন্তরের একটি অতীন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। উহার পরিপূর্তি সব মানুষের একই রীতিতে হইবার নয়। নিজের নিজের সংস্কার-বিবেক-বিচার-আবেগের গঠনানুযায়ী মানুষের ধর্মসাধনা বহু বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা কিছু দোষের নয়। দোষ শুধু এইটিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারা। স্বামী বিবেকানন্দ কোন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন —পৃথিবীতে যতগুলি মানুষ, প্রত্যেকের জন্য যদি এক একটি আলাদা ধর্ম থাকিত তাহা হইলে আমি খুশী হইতাম। ধর্ম-সাধনার বৈজ্ঞানিক প্রণালীটির দিকে তাকাইয়াই স্বামিজী উক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন। বহুধর্ম থাকুক ক্ষতি নাই—কিন্তু বহুধর্ম দ্বারা মানুষ যে একই লক্ষ্যে

পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে এইটি বুঝিতে না পারিলে সমূহ ক্ষতি আছে। এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবন ও শিক্ষা দ্বারা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করিয়াই বিশ্বধর্মের মর্মকথা উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। বিশ্বধর্ম অর্থে একটি কোন নির্দিষ্ট ধর্ম নয়, যত শক্তিশালীই ঐ ধর্ম হউক না কেন। সারা পৃথিবীকে গির্জায় লইয়া যাওয়া, সব দেশের মানুষকে কলমা পড়ানো, সকল নরনারীর মনে চতুরার্যসত্যের ছাপ দেওয়া—ইহার নাম যদি বিশ্বধর্ম হয় তবে উহার ভিত্ হইবে বালুকার উপর স্থাপিত। উহা ধসিয়া পড়িবেই। বস্তুতঃ বিশ্বধর্ম একটি দৃষ্টিভঙ্গী। সকল মানুষের মধ্যে শাশ্বত দেবতা বসিয়া আছেন—সকল মানুষের অন্তরেই পরিপূর্ণতা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে—অনন্ত ভঙ্গীতে, অসংখ্য পথে উহাকে বিকাশ করিবার চেষ্টা মানুষ করিয়া চলিতেছে এবং চলিবে—এই সত্যটি উপলব্ধি করিবার নামই বিশ্বধর্ম। হিন্দু জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পারসিক, মুসলমান এবং আরও যত ধর্মাবলম্বী আছেন সকলেই নিজ নিজ ধর্মে সুস্থির থাকিয়া বিশ্বধর্মের পতাকা বহিতে পারেন।

'ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ'

'গল্পভারতী' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'স্বামী বিবেকানন্দ'—প্রবন্ধে লিখিতেছেন :—

"স্বামিজীর জন্মতিথিতে অর্ধশতাব্দী পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, এই দুর্ভাগা ছত্রভঙ্গ সমাজকে তিনি যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রায় সেইখানেই আছে। রাজনৈতিক আন্দোলন, শাসক ও শাসিতের সংঘর্ষ, দুই দুইটা মহাযুদ্ধ, বৃটিশ প্রতাপের বিলয়, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ, পরিবর্তন কিছু কম হইল না। কিন্তু ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ, ভদ্রলোকের ভারতবর্ষই রহিয়া গেল; লক্ষ কোটি নরনারী তাহাদের দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য হইয়া, সহিষ্ণু ভারবাহী বলদের মত সূতিকাগার হইতে শ্মশান পর্যন্ত মন্থরপদে চলিয়াছে. চোখে নৈরাশ্যের নিষ্প্রভ দৃষ্টি, শতাব্দীর দুর্বহ বোঝায় মেরুদণ্ড বক্র।"

এই মর্মান্তিক অবস্থার কারণ কি? কারণ—আমরা আগের কাজ আগে করি নাই– ভিত না গাঁথিয়া সৌধ নির্মাণ করিয়াছি। 'ভদ্রলোক' লইয়া জাতি নয়—লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক লইয়া জাতি। আমরা যত আন্দোলন করিয়াছি উহা প্রধানতঃ 'ভদ্রলোকের' আন্দোলন। জাতির শেষোক্ত বৃহৎ অংশকে যখন ডাকিয়াছি—হুজুগে মাতাইয়া, তাহাদের নিরক্ষরতা এবং শিক্ষাহীনতা ভাঙ্গাইয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছি। তাহারা গোলামীও বুঝে নাই, আজাদীও বুঝে নাই—বুঝিবার মত শিক্ষা-দীক্ষা আমরা দি নাই। উহারা আমাদের অভিযানে জয় দিয়াছে, জেল খাটিয়াছে, সংখ্যা-দ্বারা আমাদের দল বাড়াইয়াছে। আমরা পরাধীনতার সময়ে ভদ্রলোক বনিয়াছিলাম তাহাদেরই পরিশ্রমের মূল্যে, জীবনের মূল্যে; আবার এখন স্বাধীন হইয়া ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ উপভোগ করিতেছি তাহাদেরই শক্তি ও কৃচ্ছ্রতার বিনিময়ে। তাহাদের যদি যথেষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা থাকিত তাহা হইলে আমাদের এই নিষ্ঠুর অত্যাচার বেশীদিন চলিত না। আমাদের জাতীয় সরকার গণজীবনের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য সজাগ রহিয়াছেন—কার্যতঃ নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে উহার চেষ্টাও করিতেছেন, কিন্তু এখানেও আগের কাজ আগে হইতেছে না। তাহাদিগকে নাবালক রাখিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া যাওয়া একটি কথা, আর তাহাদিগকে সাবালক করিয়া দিয়া তাহাদের নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিজেদেরই

মিটাইয়া লইতে দেওয়া আর একটি কথা। যতশীঘ্র সম্ভব শেষের অবস্থাটিকে সম্ভবপর করিয়া তোলা প্রয়োজন। স্বামিজী বুকফাটা স্বরে চিৎকার করিয়া গিয়াছেন—শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। একটি ব্যাপক শিক্ষার অভিযান সর্বাগ্রে প্রয়োজন—শুধু মধ্যবিত্তের মধ্যে নয়—মাঠে, বাটে, দোকানে, কল-কারখানায়, প্রকৃত জাতি যেখানে উঠিতেছে, বসিতেছে, চলিতেছে। জাতির চোখ খুলুক—তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে কে শত্রু কে মিত্র, কোন্ পথে গেলে মঙ্গল, কোনপথে গিরি-খাত।

'ভদ্রলোক' সমাজ-শীর্ষদের নিকট হইতে প্রত্যাশা কম। কাঞ্চন-তৃষ্ণা তাঁহাদিগের মনুষ্যত্বকে বিশুষ্ক করিয়া দিয়াছে। টাকা-টাকা-টাকা, পদোন্নতি ও মান পরাধীনতার সময় সাহেবদের ডাণ্ডার ভয়ে কিছুটা ঘুমাইয়াছিল। এখন আজাদী আসিয়া সে ঘুম ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আরও কত পাওয়া যায়, আরও কত উঠা যায় ইহাই এখন হইয়াছে 'ভদ্রলোকে'র জপ-মন্ত্র। এ তৃষ্ণা যাইবার নয়। এ তৃষ্ণা ছাপাইয়া 'গণ'দের জন্য কিছু করিবার ঝোঁক সহজে উঠিবার কথা নয়।

আশা তরুণদের নিকট—এখনও যাহাদের মন কোমল আছে—হৃদয়ের সহানুভূতি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরে নাই। জাতীয় প্রতিরক্ষা-বাহিনী গঠন করিবার পূর্বে এই তরুণদের দিয়া একটি জাতীয় গণশিক্ষা-প্রচার বাহিনী গঠন করা চলে না কি? গ্রামে গ্রামে, বস্তিতে বস্তিতে, হাটের বটতলায়? 'গণে'র চোখ খুলিলে গণশক্তি সুদৃঢ় হইবে—সেই সুদৃঢ় গণশক্তির উপরই শান্তি-সমৃদ্ধি-কল্যাণময় ভারতবর্ষের হইবে প্রকৃত প্রতিষ্ঠা—'ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ' নয়—সনাতন চিরন্তন বিশাল ভারতবর্ষ।

সন্ন্যাসের পরিসংখ্যান'

প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকার দোলসংখ্যায় 'সন্ন্যাস' নাম দিয়া একটি সরস ব্যঙ্গ-নিবন্ধ লিখিয়াছেন। শেষ লাইনগুলি:

"সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসগ্রহণের মূলতত্ত্ব গুহায় নিহিত। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান রচনা করা প্রয়োজন। দেশে যে সাধু-সন্ন্যাসী বাড়িয়াই চলিয়াছে, ইহার কারণ কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি উক্তি হইতে বোধ করি শরদিন্দু বাবুর প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। উহা উদ্ধৃত করিতেছি:

"বৈরাগ্য তিন চার প্রকার। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশীদিন থাকে না। হয় ত কর্ম নাই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো, 'আমার একটি কর্ম হইয়াছে, কিছুদিন পরে বাড়ী যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না।' ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মনে আসক্তি, আর বাহিরে গেরুয়া। বড় ভয়ঙ্কর।"

সাধু 'সাজিলে' যে এই দেশে দুমুঠা খাইতে পাওয়া যায়, অনেক জায়গায় মানসম্ভ্রমও জুটে, ইহা তো সর্বজনবিদিত। দেশের ক্রমবর্ধমান অন্নসমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা এবং বেকারসমস্যার চাপে অনেকে যে রোজগারের পন্থারূপে 'সন্ন্যাসীগিরি'কেই অবলম্বন করিবে ইহা বিচিত্র কি? এই ধরনের সন্ন্যাসের পরিসংখ্যান লওয়া খুব কঠিন কথা নয়, যদি সন্ন্যাসগ্রহণের মূল-তত্ত্বটির দিকে 'গুহায় নিহিত' বলিয়া চোখ বুজিয়া না থাকি।

মনুষ্য-জীবনের পরম লক্ষ্য যে শ্রীভগবান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই যে সাধক সর্ব-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, উহা যে একটা অলস ফাঁকি নয়, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাপৃতি—এ কথা ভারতবর্ষের অশিক্ষিত কৃষক-মুটে-মজুরও জানে, এবং জানে বলিয়াই আসল ও মেকীর পার্থক্য অনেক সময়েই তাহারা সহজেই বুঝিয়া লয়। পক্ষান্তরে উচ্চশিক্ষিত আমরা আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-বিচার-সহায়ে 'পরিসংখ্যান' করিতে গিয়া বহুক্ষেত্রে মুস্কিলে পড়িয়া যাই। আমরা আসল নকল দুটিই বাদ দিয়া বসি! গৈরিক এড়াইয়া এড়াইয়া পরিশেষে হয়তো একদিন সাদা কাপড়ের হাতেই চরম ঠকিয়া মরি—ধর্মের নামেই। অতএব সন্ন্যাসের পরি-সংখ্যান রচনা করা ভালই, প্রয়োজনীয়ও বটে, তবে মনে হয়, খুব হুশিয়ার হইয়া উহা করা বাঞ্ছনীয়।

কঠোপনিষদ্

(পূর্বানুবৃত্তি)

'বনফুল'

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

শ্রেয় হ'তে প্রেয় ভিন্ন, অথচ উভয়ে
পুরুষে আবদ্ধ করে বহুবিধ ভাবে
শ্রেয়োবদ্ধ হ'ন যিনি মঙ্গল তাঁহার
প্রেয়কামী হ'লে পরে পরমার্থ যাবে ॥১॥

শ্রেয় প্রেয় দুইই আসে জীবনে সবার
ধীমান বিচার করি শ্রেয়কেই লয় বরি'
বৈষয়িক স্বল্পবুদ্ধি প্রেয় করে সার ॥২॥

নচিকেতা, তুমি প্রিয় – প্রিয়রূপী কামনা সকল
ত্যজিয়াছ বিচার করিয়'
যে বিষয়াকীর্ণ মার্গে বহুলোক হ'ল নিমজ্জিত
তুমি তাহা থাকনি ধরিয়া ॥৩॥

অবিদ্যা ও বিদ্যা এরা অতি ভিন্নমুখী
বহমান বিপরীত ধারে
নচিকেতা তুমি জানি, বিদ্যা-অভিলাষী—
প্রলুব্ধ করেনি শত কামনা তোমারে ॥৪॥

অবিদ্যা অন্তরমাঝে সদা বর্ত্তমান
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে নিজেদের ভাবে জ্ঞানবান
অন্ধ-নীত অন্ধ সম মূঢ় জেনো তারা
ভ্রান্ত পথে সদা ভ্রাম্যমাণ ॥৫॥

বিত্তমূঢ় ভ্রান্তিময় অজ্ঞান-জীবনে
সাধনার জ্যোতি নাই, দৃষ্টি অতি ক্ষীণ
ইহলোকই আছে শুধু, আর কিছু নাই
এই ভাবি হয় তারা বারম্বার আমার অধীন ॥৬॥

যার কথা বহুলোকে পায় না শুনিতে
শুনিয়াও মর্ম্মে নাহি করে অনুভব
কুশলীরা পায় তাহা, দুর্লভ আচার্য্য তার,
আচার্য্য-উপদিষ্ট জ্ঞাতাও দুর্লভ ॥৭॥

হীনবুদ্ধি এঁরে কভু ভালভাবে পারে না বুঝাতে
তাহাদের কাছে ইনি শুধু নানা চিন্তার বিষয়,
অভেদদর্শীর বাক্যে স্থির ইনি তর্কের অতীত
সূক্ষ্ম তর্ক সূক্ষ্মতরে অবসান হয় ॥৮॥

যে বুদ্ধি পেয়েছ তুমি তর্কে তাহা কখনও মেলে না
সদ্‌গুরুর উপদেশে সুজ্ঞান সম্ভব প্রিয়তম
বুঝিয়াছি নচিকেতা সত্যনিষ্ঠ হইয়াছ তুমি
সর্ব্বদা জিজ্ঞাসু যেন পাই তোমা সম ॥৯॥

যেহেতু জেনেছি আমি ধনরত্ন অনিত্য সকলই
নিত্যের সন্ধান দেয় অনিত্যেব হেন সাধ্য নাই
অনিত্য আহুতি দিয়া নাচিকেত অগ্নিমুখে
নিত্য লভিয়াছি আমি তাই ॥১০॥

কামনার পরিতৃপ্তি, প্রতিষ্ঠা ধরার
যজ্ঞের অনন্ত ফল, অভয়ের পার
সুখৈশ্বর্য্য সুমহান সুবিস্তীর্ণ অবস্থান
ধৈর্য্য ভরে ধীরচিত্তে করিয়া বিচার
নচিকেতা, করিয়াছ সব পরিহার ॥১১॥

দুর্নিরীক্ষ্য গুহাবাসী গহ্বর-বিলীন
নিগূঢ় অন্তরতম দেব সনাতন
অধ্যাত্ম-যোগের বলে জানিয়া তাঁহারে
ধীরগণ হর্ষ-শোক করেন বর্জ্জন ॥১২॥

মানুষ এ আত্মতত্ত্ব পূর্ণভাবে করিয়া গ্রহণ
স্থূল ত্যজি' সূক্ষ্ম ধর্ম্ম করিল বরণ
উপভোগ করে তাহা
সত্য উপভোগ্য যাহা,
তব লাগি নচিকেতা উন্মুক্ত সত্যের সদন ॥১৩॥

[নচিকেতা বলিলেন]
ধর্ম্মাধর্ম্ম নয় যাহা, নয় যাহা কৃত বা অকৃত
ভূত ভবিষ্যৎ নয়, যা তব প্রত্যক্ষীভূত
তাই তবে করুন বিবৃত ॥১৪॥

[যম বলিলেন]
সর্ব্ববেদ যেই সত্য করেন মনন
সকল তপস্যা করে যাহার বর্ণন
যারে ইচ্ছা করি লোকে হয় ব্রহ্মচারী
সংক্ষেপে কহিতেছি—'ওম্' নাম তারই ॥১৫॥

ব্রহ্মসম এ অক্ষর, পরম ইহাই
এই অক্ষরকে জানি' যিনি যাহা চান
তিনি পান তাই ॥১৬॥

ইনিই আশ্রয় শ্রেষ্ঠ, পরম আশ্রয়
যে জানে সে ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হয় ॥১৭॥

অজাত অমৃত ইনি সদা জ্ঞানময়
কোন কিছু হ'তে ইনি উদ্ভূত ন'ন
ইঁহা হ'তে উৎপন্ন হয় নাকো কিছু কোন দিন
শাশ্বত সনাতন চিরন্তন ইনি জন্মহীন
দেহের নিধনে এঁর হয় না নিধন ॥১৮॥

হন্তা যদি মনে করে হত্যা করিলাম
হত যদি ভাবে মনে হইল মরণ
উভয়েই ভ্রান্ত তবে ; হত ইনি হন না যে,
করেন না কখনও হনন ॥১৯॥

অণু হ'তে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান
এই আত্মা প্রাণীদের নিহিত গুহায়
ইহার মহিমা শুধু নিষ্কাম বিগতশোক
বিশুদ্ধ চরিত্রবলে দেখিবারে পায় ॥২০॥

আসীন থাকিয়া যিনি সুদূরেতে করেন ভ্রমণ
সর্ব্বগামী অথচ শয়ান
হৃষ্ট ও অহৃষ্ট সেই দেবতার কহ
মোরা ছাড়া কে জানে সন্ধান ॥২১॥

শরীরেতে অশরীরী নাস্তিতেও অস্তিত্ব যাঁহার
সে মহান বিপুল আত্মার করিয়া মনন
ধীরগণ বীতশোক হন ॥২২॥

বেদ অধ্যয়ন করি বুদ্ধিবলে শাস্ত্র পড়ি
এ আত্মার মেলে না সন্ধান
ইনি যাঁরে বর দেন তিনি শুধু পান।
তাঁহারই সকাশ
স্বীয় তনু করেন প্রকাশ ॥২৩॥

অসংযমী দুশ্চরিত্র অস্থির অসমাহিত
অধীর অশান্ত চিত্ত যিনি
জ্ঞানী হইলেও এঁরে পাবেন না তিনি ॥২৪॥

অন্ন যাঁর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
মৃত্যু যাঁর ব্যঞ্জনোপচার
সে আত্মা আছেন যেথা
কেবা জানে কিবা রূপ তার ॥২৫॥

(ক্রমশঃ)

ত্যাগ

স্বামী বিরজানন্দ

(লোকান্তরিত লেখকের অপ্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এম্-এ কর্তৃক অনূদিত।)

ত্যাগের প্রেরণা কী অপরিসীম মহত্ত্বমণ্ডিত!

মানবের কল্পনায় কী সুমধুর সঙ্গীত-সুধাই না বর্ষণ করছে প্রাচীন ঋষিদের অনুশীলিত এই দিব্য ভাবটি। এ যেন পরমেশ্বরের প্রেম-আহ্বান, সুকোমল স্পর্শে ভাগ্য-লাঞ্ছিত, দুঃখ-পীড়িত মানবাত্মাকে মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করছে। সহস্র সহস্র জন্মের পুঞ্জীভূত মালিন্যের নিরাময়, সুখকর মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এমন আর কি আছে? উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় প্রভৃতি অজস্র দ্বৈত সংগ্রামের অবসানে জন্মলাভ করে যে অচঞ্চল সংপ্রাপ্তি—সকল খণ্ডিত সত্যে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে যে একক সার তত্ত্ব—অপূর্ণ মানুষকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেয় যে অদ্বিতীয় লক্ষ্য—সকল ধর্ম-চিন্তা ও জীবনের যা মর্মবাণী—তা ত্যাগ ছাড়া আর কি হতে পারে? ত্যাগই সেই সুদৃঢ় ভিত, যার উপর গড়ে ওঠে আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিশাল সৌধ। ত্যাগই শান্তি এবং পরম বিশ্রামের উৎস। ত্যাগই সেই বিরাট শক্তি যা এই বিশ্বজগৎকে বিশ্লেষ থেকে ধরে রাখে।

মানবাত্মা এ সংসারভূমিতে বারবার আবির্ভূত হয় অসংখ্য অতীত জন্মের সঞ্চিত সংস্কারের প্রকাশ ও সক্রিয়তার জন্যে। প্রচণ্ড শক্তি অজ্ঞানতার, তাই তো এ সংসারে ভোগ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই মানুষকে জন্মাবার পর থেকে দুর্নিবার আকর্ষণে অনবরত টানতে থাকে। কিন্তু, তারপর? তারপর সে কি পায়?

যযাতি একদিন আফশোষ করে বলেছিলেন—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে অগ্নি কখনও নির্বাপিত করা যায় না, তা বরং বেড়েই ওঠে। সেইরূপ ভোগতৃষ্ণা ভোগের দ্বারা মেটে না, অধিকতর প্রবর্ধিত হয় মাত্র। রাজচক্রবর্তী যযাতির এই অভিজ্ঞতার কাহিনী মহাভারতের অমৃতগাথায় বর্ণিত আছে। মহারাজ যযাতি কামকাঞ্চন-সহায়ে লভ্য সকল প্রকার ভোগ-সুখে নিমজ্জিত ছিলেন, এমন সময় মহর্ষি শুক্রের অভিশাপে তাঁকে জরাগ্রস্ত হতে হল। জরা যে সকল ভোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করল তাদের জন্য তাঁর অন্তরে দুরন্ত কামনা প্রতিনিয়ত তাঁকে বহ্নি-প্রদাহের মত দগ্ধ করতে লাগল। তখন তিনি আপন পুত্রগণকে ডেকে তাদের যৌবন তাঁকে দিয়ে তাঁর জরাভার গ্রহণ করতে বললেন। প্রথম চারপুত্র এ অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। কিন্তু পঞ্চম পুত্র পুরু জানাল সম্মতি। নবযৌবন-সম্পন্ন যযাতি তখন সহস্র বৎসর ধরে এ জীবনের যাবতীয় ভোগসুখ-আস্বাদনে রত থাকলেন। অবশেষে একদিন মোহজাল ছিন্ন হল, ভোগে এল তাঁর বিরক্তি। পুত্রকে ডেকে তিনি

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটি বললেন। ভাবলেন—এমন যদি কোনও ভাগ্যবান থাকেন যিনি একক স্বর্গ-মর্ত্যের যাবতীয় বিত্ত ও সুন্দরীদের করায়ত্ত করতে সক্ষম তাহলেও তিনি পরিতৃপ্তি পাবেন না—তৃষ্ণা তাঁর মিটবে না। এই তো এত ভোগ করলাম, কিন্তু ভোগ-তৃষ্ণা আমার দিন দিন বর্ধিতই হচ্ছে! অতএব আর নয়। এবার ভোগবাসনা ছুঁড়ে ফেলে দেব, ব্রহ্মে মনকে নিবিষ্ট কোরব।

এই হচ্ছে ত্যাগ।

আমাদের দৃষ্টি বহির্মুখী, বহিঃপ্রকৃতির বস্তু-সমূহকে ভালবাসাই আমাদের স্বভাব। ক্রমাগত মানুষ তার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে এগুলিকে আঁকড়ে ধরে ধরে অবশেষে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। নিজেকে সে আর কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারে না। ক্রমশই সে মায়ামোহে ডুবতে থাকে। কখনও ঢেউয়ের আবর্তের শিখরে থাকে, কখনও আবার তলিয়ে যায় সমুদ্রের কোন্ গভীর নিম্নে। প্রাপ্য তার আসে সীমাহীন গভীর বেদনায়ই, সুখের ভাগ যা থাকে তা সামান্যই। কিন্তু এমনই প্রচণ্ড শক্তি মায়ার যে নিজেকে এ মোহ থেকে মুক্ত করে নিতে কিছুতেই সে পেরে ওঠে না। হঠাৎ উপস্থিত হয় বজ্রকঠিন আঘাত। নির্দয় মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় প্রেমময়ী পত্নী ও স্নেহপুত্তলী সন্তান-সন্ততিদের। তাদের সে প্রাণাপেক্ষাও বেশী ভালবেসেছিল। তাদের সত্তায় সে মিলিয়ে দিয়েছিল আপন সত্তা। কী কঠিনই না বাজে সে আঘাত! মৃতদের স্মরণ করে বয়ে যায় অশ্রুর বন্যা—প্রাণে ওঠে সর্বদা হাহাকার, রাত্রিদিন ভরে যায় বিরাট শূন্যতায়, আশাহীন অন্ধকার ঢেকে রাখে তার চারিপাশ, সম্মুখে প্রসারিত যে ভবিষ্যৎ তাও সে দেখে অন্ধকারময়। তার চোখে জগৎসংসার শুধু নৈরাশ্যময়, শুধু কষ্টময় বলে প্রতিভাত হয়। এ ঘোর দুঃখ-রাত্রির কি অবসান নেই? হঠাৎ এক টুকরো আলোর ঝলক দেখা দেয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারের বক্ষ চিরে। মনে ঝঙ্কার ওঠে : আমার জীবন, আমার সর্বস্ব দিয়ে আমি এই ক্ষণভঙ্গুর, অপম্রিয়মাণ বস্তুগুলিতে তন্ময় হয়েছিলাম। কাকে আমি ভাবছিলাম আপন? এতদিন কি একটি ছলনা-ময় স্বপ্ন দেখ্ছিলাম? যথেষ্ট হয়েছে, আর না।

এই হচ্ছে ত্যাগ।

সর্বগ্রাসী মৃত্যু সকলের কাছেই হাজির হয়, কাউকে বাদ দেয় না। ধনি-নির্ধন, জ্ঞানি-অজ্ঞানী, সাধু-অসাধু, রাজা-ভিখারী—মৃত্যুর শীতল স্পর্শ কেউ এড়াতে পারে না। কে জানে কখন সে এসে দুয়ারে দাঁড়াবে? তোমার আমার অপেক্ষা করবে না সে। যে কোনও মুহূর্তে এসে হানা দিতে পারে। কার জন্যে তুমি তোমার সমস্ত জীবন ও শক্তি ক্ষয় করে কুবেরের ধনসম্পদ সংগ্রহ করবে, নির্মাণ করবে গগনচুম্বী প্রাসাদ, ছুটবে নামের পেছনে, যশের পেছনে? সব কিছুই কি এখানে ক্ষণ-স্থায়ী নশ্বর নয়? সবই চলমান, মৃত অতীতের গর্ভে ক্রমবিলীয়মান। যে পন্থায় তুমি গৌরব অর্জন কর সে পথ যে তোমায় শেষ পর্যন্ত পৌছে দেবে শ্মশানে। এই ভাবে মৃত্যুর চিন্তা তোমায় মোহমুক্ত করবে এবং পরিশেষে আনবে এই সত্যানুভূতি যে সবই বৃথা, সবই অসার। একমাত্র ভগবানই সত্য, তাঁর প্রেম এবং সেবাই হচ্ছে একমাত্র সার কাজ।

এরই নাম ত্যাগ।

প্রকৃতিতে দুটি বিরুদ্ধ শক্তির খেলা পরি-লক্ষিত হয়—একটি কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে, আর একটি কেন্দ্র থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত করতে সচেষ্ট। একটিকে আমরা আখ্যা দিতে পারি প্রবৃত্তি বলে, অপরটিকে

বলতে পারি নিবৃত্তি। একটি হচ্ছে ক্রিয়া, অপরটি প্রতিক্রিয়া। এমন কোনও মানুষ নেই যে এই দুই শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়। এই মুহূর্তে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় উল্লসিত হয়ে উঠছি—পরমুহূর্তেই আবার নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ছি। এই মুহূর্তে আভাস পেলাম যেন এক আলোক-রাজ্যের, আবার পরমুহূর্তে সম্মুখীন হলাম এক অন্ধকারময় অতলস্পর্শী গহ্বরের। আজ দেখছি সকলের উপর বিপুল প্রভাব আমার, কাল আমি সর্বজন-পরিত্যক্ত হচ্ছি—বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, স্বজনহীন অবস্থা, কেউ চিনতে চায় না, কেউ গ্রাহ্য করে না। আজ ছুটছি বিশ্বপ্রকৃতির সুখসামগ্রীর ছায়ার পিছনে। এই আপাতসত্য হতে সুখ পাবার অসম্ভব কল্পনার বশে উন্মাদ হয়ে কাল অনুভব করছি এ সকল প্রয়াস বৃথা, এ প্রয়াস সফল হয় না। ছায়াকে ধরা যায় না।

মানুষ এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার চাকায় প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হচ্ছে। এই নিষ্পেষণ তার অস্তিত্বকে যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। কতদিন আর নিজের সঙ্গে ছলনা ও বঞ্চনা করবে সে? কতকাল আর এ দুর্ভোগ ভোগ করবে? দুর্ভোগের ত একটা সীমা আছে। কিন্তু, এ দুর্ভোগের কি ফল? এর ফলে তার প্রাণে জাগে দারুণ বিতৃষ্ণা। মানবাত্মা সকল প্রকার আসক্তি হতে আসে পিছিয়ে।

এই হচ্ছে ত্যাগ।

মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা কি দেখতে পাই? কি খোঁজে মানুষ? নিশ্চিতই সুখ খুঁজে খুঁজে বেড়ায় সে জীবনভোর। তার বেঁচে থাকার একমাত্র লক্ষ্যই সুখলাভ। জনবহুল কর্মব্যস্ত শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে দেখতে পাবে কি তাড়া সকলের, কি ঠেলাঠেলি নানাগঠনের, নানাপ্রকৃতির মানুষের মধ্যে। তাদের মুখ দেখে যদি তাদের মনকে পড়তে পারতে, দেখতে পেতে যে সকলেই ছুটে বেড়াচ্ছে কিঞ্চিৎ সুখের আশায়। নিজ নিজ মানসিক প্রবৃত্তি-অনুযায়ী ধরছে একবার এটা, আবার সেটা। মনে মনে যে সুখের কল্পনা আছে, তাকেই ক্রমাগত এ বস্তুতে সে বস্তুতে প্রক্ষেপ করছে। এই সুখের আশাতেই পুরুষ ভালবাসে নারীকে। তাকে ঘিরে কল্পনায় গড়ে তোলে সুখের স্বর্গলোক—সেখানে বিচ্ছেদ নেই, অভাব নেই, দুঃখ নেই। মৃত্যুকে পর্যন্ত ভুলে যায় সে এ অবস্থায়। সে যখন তার প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করে রয়েছে, তখন একথা তার মনে থাকে না যে নিজেই সে ইতঃপূর্বে মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছে। তার মনপ্রাণ সে উজাড় করে দেয় তার প্রিয়ার কাছে, বিনিময়ে চায় যে তার প্রিয়তমা একান্তরূপে তারই হবে। কিন্তু এ স্বার্থপূর্ণ সংসারে তা তো হয় না। তার ভালবাসা প্রতিদান না পেয়ে পর্যবসিত হয় নিদারুণ তিক্ততায়, স্বার্থের সংঘাতে তার বুকে এসে শুধু বাজতে থাকে তীব্র বিষময় বেদনা—ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তার সুখের কল্পলোক। এন্টনী সুখের সন্ধান করেছিল প্রেমের মধ্যে, ব্রুটাস যশগৌরবের ভিতর, আর সীজার আধিপত্যের মধ্যে। প্রথমোক্ত জন বিনিময়ে পেয়েছিল লাঞ্ছনা, দ্বিতীয় ব্যক্তি তিক্ততা, আর শেষোক্ত জন অকৃতজ্ঞতা—এবং পরিণামে সকলেই হল ধ্বংস। হায়রে অবিশ্বাসী মানুষের মন! বদ্ধজীব তুমি, মুক্তি প্রার্থনা করছ আর এক জন বদ্ধজীবের কাছে! তুমি কি জান না সুখদুঃখ এ জগতে বস্তুতঃ একই? সুখদুঃখের তারতম্য প্রকার-ভেদে হয়নি,

হয়েছে মাত্রাভেদে। এ দ্বৈতজগতে কোথায় সুখ? প্রকৃত সুখ দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে লভ্য। জেনো, অবিচ্ছিন্ন আনন্দ ও সুখের উৎস একমাত্র ভগবান। তাঁর আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমার আশা পূর্ণ হবে,—সুখ পাবে, আনন্দ পাবে।

এই হচ্ছে ত্যাগ।

মানুষের অভাব কখনও মেটে না। কিছু বা মিটলো—কিম্বা বর্তমান সব চাহিদাগুলোরই পূরণ হল—কিন্তু পরক্ষণেই দেখা দেয় নতুন নতুন অভাব। এইভাবে ক্রমাগত অভাবের আর বিরামও নেই, শেষও নেই। একেবারে রক্তবীজের রক্তকণার মত, প্রতিকণা মাটিতে পড়বামাত্র সহস্র রক্তবীজের সৃষ্টি, অবশেষে অসুরের সংখ্যা আর গোনা যায় না। এই অগণন অসুরের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হওয়া অসম্ভব। যত বেশী অভাব উৎপন্ন হয় তত বেশী দুর্গতি হয় মানুষের, তার দুঃখের আর অবধি থাকে না। যে ব্যক্তি অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। প্রকৃত ধনী সেই যার কোনও অভাব নেই। সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হয়েও যদি কোনও ব্যক্তি নিত্য অভাব-বোধে তাড়িত হয়, তবে তার চেয়ে দীনদরিদ্র আর কে আছে জগতে? একবার এক সম্রাট এক সন্ন্যাসীর গুহায় এসেছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখে তিনি অনুরোধ করলেন, "আপনার যা অভাব আছে আমার কাছ থেকে চেয়ে মিটিয়ে নিন।" সন্ন্যাসী উঠেই রাজার কাছে জানতে চাইলেন "আচ্ছা, আপনি কি কোনও কিছুর অভাব বোধ করেন?" রাজা জানালেন, "হ্যাঁ। আমারও অভাব আছে।" সন্ন্যাসী তখন তাঁকে বললেন—"আপনি এখান থেকে যেতে পারেন। ভিখারীর কাছ থেকে আমি ভিক্ষা করি না।" অভাব অপূর্ণতা-প্রসূত, আত্মার পূর্ণস্বরূপে যে প্রতিষ্ঠিত তার আর কিসের অভাব? নিজেকে পূর্ণস্বরূপ আত্মারূপে উপলব্ধি করাই ত্যাগের মূলকথা।

মানুষ কর্ম করতে এ পৃথিবীতে জন্ম নেয়। কোনও কাজ না করে মানুষ মুহূর্তমাত্রও থাকতে পারে না। কিন্তু সহস্র কামনা জুড়ে মানুষ কর্ম করে। এ করব তা করব, এই ফল লাভ করব, সেই ফল লাভ করব—এই তার ভাবনা। এর অনিবার্য ফল হল, বন্ধন ও দুঃখ। অহং-বোধ থেকেই আসে কর্মফলের প্রতি আসক্তি। আসক্তি মানুষের হৃদয়-দুয়ার রুদ্ধ করে দেয়, তাকে সঙ্কুচিত করে, দুর্বল করে তোলে তাকে। অনাসক্তি করে আত্মাকে নির্মল। সেইজন্য অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে হয়। কর্মযোগের এই হল মূলকথা। গীতায় এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কর্মে তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়।"

এই হচ্ছে ত্যাগ।

অজস্র দুঃখের আকর এই সংসার—বহু বিপদ এখানে আকীর্ণ—বহু মলিনতায় পরিপূর্ণ এই পৃথিবী। জগৎ মনের একটি ভ্রান্তিমাত্র —শুধু মায়ার খেলা। আমরা প্রত্যেকেই এই আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে চলেছি।

কবি বলেছেন,

"Lo! as the wind is, so is mortal life,
A moan, a sigh, a sob, a storm, a strife!"

"শোন শোন বন্ধু! এ মর জীবন বায়ুর ন্যায় অস্থির। এ যেন মুহূর্তের শোকোচ্ছ্বাস, একটী মাত্র টানা দীর্ঘশ্বাস। একসময়ে চাপা কান্না, হঠাৎ আসা যেন ঝড়, হঠাৎ ওঠা একটি দ্বন্দ্ব।" বস্তুতঃ জীবন একটি কারাগার।

শাশ্বত আত্মা, স্বরূপতঃ যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ জড়-বস্তুর গণ্ডীর দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে কি? আমাদের এর সীমা পার হয়ে যেতে হবে বহুদূর। কারণ, কালের গণ্ডী পার হয়ে, কার্যকারণের গণ্ডী পার হয়ে আত্মার স্বরূপ-স্থিতি। তাইত মানবাত্মাকে স্থানকালের গণ্ডী, কার্যকারণের গণ্ডী ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে হয় যেমন করে নাকি প্রস্তর-অভ্যন্তরস্থ এক বিন্দু জল কালে বিশাল পর্বতকে উৎপাটিত করে। এই যে সকল গণ্ডী ভেদ করে যাওয়া, এই যে সাহসভরে এগিয়ে আসা প্রকৃতির রহস্যময় মুখাবরণ ছিন্ন করে ফেলে দিতে, এরই নাম ত্যাগ।

এইগুলি হচ্ছে ত্যাগের মূলকথা। এ কথা বলে দেওয়া বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে এসকলই হচ্ছে অন্তঃপ্রকৃতির কার্য, মানবের মনের উৎকর্ষ-সাধনের পরিণতি। ত্যাগ মানে নয় কাষায়-বস্ত্র, মুণ্ডিত শির বা সন্ন্যাসের বাহ্যাড়ম্বর। ত্যাগের প্রকৃত মর্ম ক্ষুদ্রকে অসীমে বিলীন করা। চৈতন্যদীপ্ত দিব্যসত্তার মধ্যে—আপনার ব্যক্তিসত্তাকে চিরতরে বিসর্জন দেওয়া। এমনকি অতুল ঐশ্বর্য পরিত্যাগ এবং ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণও প্রকৃত ত্যাগ আখ্যা পেতে পারে না যদি পূর্বজীবনের পদমর্যাদাবোধ থেকে যায় মনের মধ্যে। ক্ষুদ্র অহংকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলেই মানবাত্মা পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

প্রাণের মধ্যে এই প্রকৃত ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত হবার পরই সত্যিকারের বেঁচে থাকা হয় সুরু। ত্যাগের প্রতিষ্ঠার পরই প্রকৃত ধর্মজীবনেরও হয় আরম্ভ। ত্যাগের দ্বারাই লোভ ও স্বার্থবুদ্ধিরূপ আগাছার উচ্ছেদ হয়, পরাজ্ঞান-লাভে প্রস্তুতি আসে মনে। ত্যাগ বিনা মুক্তিলাভ অসম্ভব। বেদ বলেছেন,—ন প্রজয়া ন ধনেন ন চেজ্যয়া, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। ভর্তৃহরি বলছেন,—সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।

এ জগতে সব কিছুই মানুষের কাছে আনে ভয়, এক মাত্র বৈরাগ্যই হচ্ছে অভয়।

প্রাচীনকালে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা আর্য-জীবনকে বিভক্ত করেছিলেন চারভাগে। চারভাগের প্রথম ছাত্রাবস্থা—ব্রহ্মচর্য আশ্রম। দ্বিতীয় গার্হস্থ্য—এ অবস্থায় সংসারধর্ম পালনীয়। তৃতীয় বানপ্রস্থাশ্রম—সস্ত্রীক বনগমন করে ঈশ্বরচিন্তা করবে মানুষ। চতুর্থ অবস্থা পূর্ণত্যাগের—সন্ন্যাসাশ্রম নামে অভিহিত। এই পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্বতই প্রতিভাত হয় যে প্রত্যেক পূর্ববর্তী অবস্থা পরবর্তী উচ্চাবস্থার প্রস্তুতি। জীবনের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে সর্বত্যাগ বা পূর্ণসন্ন্যাস।

এই ত্যাগের মহান আদর্শ ভারতীয় ধর্ম ও ভারতীয় জীবনের চিরন্তন মর্মবাণী। এদেশের সকল শাস্ত্রেরই প্রধান কথা এই ত্যাগ। পূর্বোক্ত অনন্যসাধারণ ঋষিদত্ত জীবন-পরিকল্পনা, যা এককালে আর্য ঋষিরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, একদিন আশ্চর্য ফল প্রসব করেছিল—ভারতকে এবং ভারতীয় জাতিকে বিশ্বের দরবারে উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

জগতে এ পর্যন্ত যত মহৎকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, ত্যাগের ভাব ব্যতীত তাদের কোনটিই সম্ভবপর হয় নি। জগতে যে সকল মহাপ্রাণ আচার্য মানুষকে উন্নতির পথে নির্দেশ দিয়েছেন, সকলেই জাগতিক সুখসম্পদ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন কৃচ্ছ্রতা। অবোধ জ্ঞানহীনের কাছ থেকে মাথা পেতে নিয়েছেন আঘাত। এই সকল দেব-মানবের নাম আজ মানুষের হৃদয়-মন্দিরে অমর হয়ে রয়েছে—এখনও মানুষ গভীর প্রেমে তাঁদের স্মরণ করছে। ইতিহাস তার

অসংখ্য সাক্ষ্য বহন করে। পবিত্রতা-ঘন-বিগ্রহ শুকদেব, দার্শনিক তত্ত্বের জন্মদাতা মহামুনি কপিল, প্রেমাবতার খৃষ্ট, রাজবংশ-সম্ভূত ভগবান বুদ্ধ, যাঁর মনীষার প্রশংসায় আজও বিদ্বৎসমাজ মুখর সেই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর, ভক্তিপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং সর্বশেষে উল্লেখ করলেও যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, যিনি চরিত্রবিভায় ও মাধুর্যে অতিক্রম করেছেন পূর্বাচার্যদের, যিনি তাঁদের সমষ্টিমূর্তি, যাঁর মধ্য দিয়ে পূর্বাচার্যগণ আমাদের কাছে অধিকতর বোধগম্য হয়েছেন—সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এই সকল বিশ্বনেতা আচার্যগণের সকলেই ছিলেন ত্যাগব্রতী। যীশুখ্রীষ্ট তাঁর জীবন দিয়েছিলেন ক্রুশে, কিন্তু ভেবে দেখুন, তাঁর আত্মাহুতির যজ্ঞাগ্নি থেকে পরে কত শত অনুগামী উৎপন্ন হয়েছিলেন। এমনই বিপুল প্রভাব ত্যাগের ? ত্যাগ কর, সব কিছু পাবে। জগৎকে আজ এই কথা অনুধাবন করতে হবে। আজ যদি মানুষ অগ্রগতি চায় এই মহান আদর্শেই তাকে দীক্ষা নিতে হবে—আজ দিকে দিকে এই শিক্ষার প্রদীপ্ত আলোকই ছড়িয়ে দিতে হবে।

পরিশেষে, আমার পুণ্য মাতৃভূমির উদ্দেশে রেখে যাই বন্দনা-গান। স্মরণ করি একদা এই ভূমিই জন্ম দিয়েছে শুক, কপিল, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণকে। এর শীর্ষদেশে স্মরণাতীত কাল হতে দণ্ডায়মান ঐ মহান হিমালয়, তার তুষারমণ্ডিত শিখরমালা স্পর্শ করেছে আকাশকে, তার জনহীন গুহা, নীরব জলাশয়ে আভাস পাওয়া যায় পরমৈশ্বর্যময় এক জীবনের। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে এই হিমগিরিই বৈরাগীর অন্তরের দীপ্তরাগ-রেখার প্রতিচ্ছবি। এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে, এই পুণ্যচবিখানি সম্মুখে পেয়ে, এই সকল মহৎ জীবন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এ কি সম্ভব যে আমরা হব আত্মবিস্মৃত ? আমাদের পিতৃপিতামহদের প্রতি করব বিশ্বাসঘাতকতা ? আমাদের হাত হতে চ্যুত হবে গৌরবমণ্ডিত অতীতকালের সেই পতাকা, —বিজয়ী ভারতবর্ষের সেই জয়চিহ্ন ? মনে হয় এই দেশে সে অশুভ দিন কখনও আসবে না। উত্তরবংশীয়েরা, তোমরা অবহিত হও, তোমাদের মনশ্চক্ষু সেই মহান আদর্শে স্থিরনিবদ্ধ কর, লাভ কর তোমরা ত্যাগ-লভ্য সেই পূর্ণতা।

আশা

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু

প্রেমের খেলায় ডাকিবে মোরে
আশা ছিল যে মনে
ভরিবে প্রাণ লীলা-মধুর রসে।
তোমারি কাজ জীবন ভরে
সাধিতে প্রাণে প্রাণে
প্রেমের গান শ্রবণে যেন পশে।
তোমার পথ ধূলির পরে
লুটায়ে দিতে হিয়া
প্রাণের ফুল ফুটাবে কবে প্রভু ?
লীলার ছলে পরশ ক'রে
পূরাবে মধু দিয়া
দিয়েছ যত ভরে নি হিয়া তবু।

তোমার পূজা-বেদীর তলে
দূর্বাদলের মত
মিশিয়া রব নম্র নত হয়ে।
সে দিন শুধু নয়ন-জলে
সাধিব প্রেম-ব্রত
তব চরণ-স্বর্ণরেণু লয়ে।
দিবস নিশি ভরিয়া কবে
বাজিবে মনোবীণ
যে সুরে রয় তোমারি জয়গান।
আমারে তুমি পাঠালে ভবে
করিয়া দীন হীন
রাজাধিরাজ, করো জীবনদান।

স্বামিজীর সান্নিধ্যে

৺শচীন্দ্রকুমার বসু

(স্বর্গীয় লেখকের কতকগুলি পুরাতন পত্র হইতে সঙ্কলিত। ১৩৫৯ সালের মাঘ ও চৈত্র সংখ্যার উদ্বোধনে এই সঙ্কলনের পূর্বাংশ প্রকাশ করা হইয়াছিল।—উ: সং)

৬ই নভেম্বর, ১৮৯৮। সন্ধ্যার পর কলিকাতা বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামিজী ও রাখাল মহারাজ কথাবার্তা বলিতেছিলেন। স্বামিজী বলিলেন,—"দেখ রাখাল, আমি আগে মনে করতুম, বুঝি child-marriage (বাল্য-বিবাহ) ভাল, ছেলেবেলা থেকে একটা acquaintance (পরিচয়) হয়ে love (ভালবাসা)-টা deep (গাঢ়) হয়। এখন আমার সে mistakeটা (ভুল) একেবারে গেছে; কারণ ও system (রীতি)-এর principle (আদর্শগত ভাব)-টাই খারাপ। গোলামীর উপর যে relation (সম্বন্ধ)-টা based (স্থাপিত) সেটা আবার কখন ভাল হতে পারে? যেখানে মেয়েদের liberty (স্বাধীনতা) নেই, সে জাত কখনো prosper (উন্নতিলাভ) করতে পারে? এ দেশের যত law (আইনকানুন), যত love (ভালবাসা), যত স্মৃতি সমস্ত মেয়েদের দাবিয়ে রাখবার জন্য হয়েছে। ওঃ, বলতে আমার গা শিউরে উঠছে—এই দেশ আজ দুই হাজার বছর জগদম্বার অপমান করছে; সেই পাপে এত ভুগছে; তবু চৈতন্য নেই। যদি ভাল চাস্, জগদম্বার অপমান আর করিসনি। না কথা শুনিস, খা জুতো, খা লাথি! রুষ আসুক, জার্মেণী আসুক, জাতের পর জাত আসুক, অনন্তকাল পায়ে থ্যাৎলাক্। লোকদের একটা false idea of chastity-তে (সতীত্বের ভ্রান্ত ধারণা) মাথাটা খেয়েছে—ঘোরতর selfishness (স্বার্থপরতা)-এর manifestation (প্রকাশ) বই আর কিছু নয়।"

আমি।—কেন মহারাজ, ওদের দেশে তো স্বাধীনতা আছে, তবু ওদের দেশেও এত ব্যভিচার কেন?

স্বামিজী।—তা কি আমি বলছি, ওদের দেশে সব ভাল? তবে ওদের দেশে এতটা brutality (পাশবিকতা) নেই, ওরই মধ্যে কেমন একটা poetry (কবিত্ব) আছে। তুই যেমন বালক! কোন দেশটা ভাল আছে বল তো!···এখন একটু চুপ কর দেখি, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা, সতী সতী করে ঢের চেঁচিয়েছ, বাঁশ দিয়ে হাজার হাজার বিধবা পুড়িয়েছ। একটু ক্ষান্ত হও দেখি, এখন জন কতক 'সতা' হও দেখি—আমি বুঝি।···যত খারাপ মেয়েমানুষ, যত দোষ করেছে, যত কাম, passion (আসক্তি) মেয়েমানুষের—না?···hypocrites and selfish to the backbone (ভণ্ড ও স্বার্থপরের দল)। ছাড় দেখি জগদম্বার অপমান—দেশটা হুড়্ হুড়্ করে এখনি উঠে পড়বে।······রাম! রাম! এখন marriage (বিবাহ) মানে একটা মেয়েমানুষকে চিরকালের জন্য গোলাম বা বাঁদী করা।·· তাদেরও কোন education (শিক্ষা) নেই—হাজার হাজার বছর ঐ করে

করে মনে করছে—We are doomed for that (আমরা ঐরূপ নিয়তি নিয়ে জন্মেছি)··· ওদের দেশে এখনও রাখাল,··· poetry (কবিত্ব) আছে ।· আর দেখনা, এই সব মেয়েরা যারা এখানে এসেছে এদের কাকেও মা বলি, কাকেও বোনের মত দেখি—এদের কারও কোন কুভাব একদিনের তরে হয় ? Chastity ! chastity আর কিছু নয়—আমার ভোগ্যা স্ত্রী···আমি যথেচ্ছ ভোগ কোরব !

পরদিবস অর্থাৎ মঙ্গলবার, যাইয়া দেখি স্বামিজী বসিয়া আছেন।···স্বামিজী বলিতেছেন, বাংলাদেশে যেমন তরকারী-ব্যবস্থা এমন কোথাও নেই ; তবে North-West-এ (উত্তর-পশ্চিম) রাজপুতানায় বেশ আহারের ব্যবস্থা আছে।

আমি।—মহারাজ, ওরা কি খেতে জানে ? সব তরকারিতে টক দেয়।

স্বামিজী।—তুমি বালকের মত কথা কইছ যে। কতকগুলি লোকদের দিয়ে তুমি সমস্ত জাতটা judge (বিচার) করবে ? Civilization (সভ্যতা) তো ওদের দেশেই ছিল—Bengal (বাংলায়)-এ কোন কালে ছিল ? ওদের দেশে বড় লোকের বাড়ী খাও তোমার ভ্রম ঘুচে যাবে।···আর তোমার পোলাওটা কি ? Long before (অনেক আগে) 'পাক-রাজেশ্বর' গ্রন্থে পলান্নের উল্লেখ আছে ; মুসলমানরা আমাদের copy (নকল) করেছে। আকবরের আইন-ই-আকবরীতে কি রকম করে হিন্দুর পলান্ন প্রভৃতি রাঁধতে হয় তার রীতিমত বর্ণনা আছে। Bengal-এ (বাংলা) আবার civilization (সভ্যতা) কবে হল ? আমি তোদের রোজ রোজ বলছি—Cape Comorin (কন্যাকুমারী) থেকে একটা লাইন যদি আলমোড়া অবধি টানা যায়, তাহলে পূর্বদিকটা একেবারে অনার্য, অসভ্য ; চেহারাও সব কেলে কেলে ভূত, আবার বেদ-বিগর্হিত অবরোধ-প্রথা, বিধবা পোড়ান প্রভৃতি অনার্যপ্রথা, কুলগুরু—। আর পশ্চিম দিকটা—সভ্য, আর্য, manly (তেজস্বী) কি আশ্চর্য ! ······পশ্চিমদিকের মানুষ সব সুন্দর—স্ত্রীলোক সব beautiful (রূপসী)—গ্রামগুলি type of cleanliness (পরিচ্ছন্নতার আদর্শ)—বেশ healthy flourishing (স্বাস্থ্যকর ও সমৃদ্ধ)। ধর্মও দেখ, বাংলায় কিচ্ছু নেই। ত্যাগী কটা জন্মেছে ?

* * *

মিস্ নোব্‌ল্ স্বামিজীর সহিত ২০শে জুন তারিখে গোলকুণ্ডা জাহাজে চড়িয়া বিলাত গিয়াছেন। আমি অবশ্য প্রিন্সেপ্ ঘাটে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মঠের সন্ন্যাসিগণের নিকট অনেকটা সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ বক্তৃতা কালীঘাটে মায়ের নাটমন্দিরে হইয়াছিল। স্বামিজী এই বক্তৃতায় (বিষয়—কালী) সভাপতিত্ব করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল—হালদারেরা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহাদের তখন স্বামিজীর উপর বিশেষ ভক্তি হইয়াছিল। তাহার কারণ, ইহার এক সপ্তাহ পূর্বে স্বামিজী সহসা কালীঘাটে মায়ের শ্রীমন্দিরে যাইবার ইচ্ছা করিয়া ২।৩ জন মহারাজ ও মিস্ নোব্‌ল্ সহ তথায় যাইলেন—হালদারেরা সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। মায়ের মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিল। মায়ের প্রসন্ন শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিয়া বিবেকানন্দের হৃদয়ে ভাবসাগর উথলিয়া পড়িল। বেদান্তের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া ভাবরাশি ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল—বিশাল লোচনদ্বয় আরক্তিম হইল, দরদর বেগে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল—আর কমনীয় কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল অনর্গল সুন্দর স্তবরাজি ; হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ—তিনি অঞ্জলি ভরিয়া

চন্দনচর্চিত জবাকমল মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন, সকলকে দিতে বলিলেন। কালীঘাট-বাসী সকলে তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। মিস্ নোব্‌ল তথায় তৎপরে বক্তৃতা দিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল। নির্দিষ্ট দিনে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—অবশ্য স্বামিজীকে দেখিতে ও শুনিতে। আমিও গিয়াছিলাম, মানিক দাদাও গিয়াছিলেন; কিন্তু যখন অসুস্থতার দরুন স্বামিজী আসিতে পারিবেন না এই খবর আসিল তখন সকলে খুব নিরাশ হইলেন। যাহা হউক ঠিক ৬ টার সময় মিস্ নোব্‌ল খালি পায়ে নাটমন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং প্রায় আধঘন্টা বলিলেন, বক্তৃতার পর সকলে খুব সাধুবাদ দিলেন।

মিস্ নোব্‌ল-এর নাকি ভারি তিতিক্ষা ছিল—মাছ-মাংস খাইতেন না। একখানি কি দুইখানি পাউরুটি ও ফলমূলাদি খাইয়াই জীবন-ধারণ করিতেন। মাতাঠাকুরাণীর প্রতি তাঁহার খুব ভক্তি। তাঁহার স্কুল টাকার অভাবে কিছুই চলিতেছে না। এবার নাকি বিলাতে টাকা তুলিবার উদ্দেশ্যেই যাইতেছেন।

মঠের উজ্জ্বলতম জ্যোতি কিছু দিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে—বেলুড় মঠ একেবারে শ্রীহীন। যাইবার আগের দিবস মঠে স্বামিজীর বক্তৃতা হইয়াছিল। শুনিয়া সকলের ধমনীতে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইল। সকলেরই অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য মনে হইল যে আমরা মানুষ। স্বামিজী খুব উৎসাহের ভরে বলিলেন, "বাবা সব, তোরা মানুষ হ—এই আমি চাই। ইহার কিছুমাত্র সফল হলেও আমার জন্ম সার্থক হবে।" সকলকে বলিলেন, "তোমাদিগকে অধিক আর কি বলিব? তোমরা সকলে সেই মহাপুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) পদাঙ্ক অনুসরণ করবার জন্য যত্নবান হও—জীবনে কর্মের ও বৈরাগ্যের সমাবেশ কর।" তাহার পরদিন কলিকাতায় আসিলেন। বেলা তিনটার সময় প্রিন্সেপ্ ঘাটে যাইবেন স্থির হইল। তাঁহার জন্য কোন গাড়ী যাইলে ভাল হয় এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল—কোন স্থিরতা হয় নাই; সৌভাগ্যক্রমে গর্গের (মহিষাদলের রাজা) Bruham ও Arab pairs শ্যামবাজার stable হইতে আনাইয়াছিলাম। স্বামিজী দয়া করিয়া তাহাতে গেলেন। স্বামিজী এবারে সমুদ্রযাত্রার পোষাক বদলাইয়াছিলেন—আসাম সিল্ক্ এর কোট এবং ১০।১২ টাকা দামের Cabin shoe আর Night cap, হরি মহারাজেরও এই ব্যবস্থা। But to tell you the truth he was not looking well. ঘাটে plague এর examination হইয়াছিল—খুব কড়া পরীক্ষা। প্রায় ৪০।৫০ জন লোক সমবেত ছিলেন। বেলা ৫ টার সময় লঞ্চ্ আসিল। আমাদের নয়নাভিরাম স্বামিজী তাহাতে উঠিলেন সকলের নিকট বিদায়-গ্রহণ করিলেন। হরি মহারাজের মুখের ভাব খুব গম্ভীর হইয়াছিল। মঠের সকলেই সেখানে উপস্থিত। গঙ্গাধর মহারাজ মহুলা হইতে আসিয়াছিলেন। লঞ্চ্ ছাড়িবার সময় সকলেরই চোখ ছলছল করিতে লাগিল—কাহারও কাহারও বা চোখ জলে ভরিয়া গেল। তৎপর সেই ৫০ জন লোক এক-সঙ্গে স্বামিজীর উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। গঙ্গাতীরে সেই দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাইয়াছিল। অপরাপর সাহেবেরা অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল। তাঁহাদের তিন জনেরই প্রথম শ্রেণীর টিকিট। ক্রমে লঞ্চ্ ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা গেল সকলে রুমাল প্রভৃতি ঘুরাইতে লাগিলেন। ক্রমে লঞ্চ্ যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ—"বিসর্জ্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে।"...

ধর্ম্মসমন্বয়-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

রেজাউল করীম

পৃথিবীতে নানাধর্ম্ম প্রচলিত আছে। সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধন—আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও ঐহিক। শুধু মানুষের নহে মনুষ্যেতর জীবেরও কল্যাণ-সাধন ধর্ম্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। আদিযুগে যখন মানুষের শৈশব-অবস্থা তখনও মানুষ এই সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াছে। যে যুগে তাহার যতটুকু বুদ্ধি ছিল সে তদনুসারেই এই সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এই বোধ-শক্তি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে। মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে যে, সে ক্ষুদ্র শক্তি তাহার নিতান্ত সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক শক্তি নানাভাবে মানুষকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু তবুও অসহায়তা বোধ করিলেও মানুষ এই বিরুদ্ধ শক্তি দেখিয়া বিচলিত হয় নাই। সকল শক্তির কেন্দ্রকেই সে অনুসন্ধান করিয়াছে। সে দেখিয়াছে ও উপলব্ধি করিয়াছে যে, প্রাকৃতিক শক্তির উর্দ্ধে একটা অনন্ত শক্তি আছে। তাহার সন্ধান পাইলেই তাহার সকল অসুবিধা দূর হইবে, তাহার শান্তি আসিবে। এই অনন্ত শক্তির মূল উৎস সন্ধান করিতে গিয়া মানুষ ঈশ্বর-আবিষ্কার করিয়াছে। কতক অন্তরের অনুভূতি, কতক প্রয়োজনের তাগিদ, আর কতক অভিজ্ঞতা হইতে সে বুঝিয়াছে ঈশ্বরই চরম সত্য, ঈশ্বরই পরম মঙ্গলময়, আর ঈশ্বরই মানব-জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। পরম শক্তিমান, কল্যাণময় ও সদাচিন্ময় ঈশ্বর-আবিষ্কার সীমাবদ্ধ মানুষের চরম আবিষ্কার। মানুষ ক্ষুদ্র, আর ঈশ্বর বিরাট ও মহৎ। ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিয়া মানুষ সমুদয় সৃষ্ট জীবের উর্দ্ধে স্থান পাইয়াছে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীবের পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান অর্জ্জন করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি ও প্রতিভা নিহিত আছে যে, কেবলমাত্র তাহারই পক্ষে ঈশ্বর-জ্ঞানলাভ সম্ভব হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে মানুষ বুঝিল যে, ঈশ্বর-প্রাপ্তিই চরম প্রাপ্তি। ঈশ্বর-লাভ ব্যতীত জগতে মানব-জীবনের আর কোন সার্থকতা নাই।

পৃথিবীতে যুগে যুগে ঋষি মুনি সাধু সজ্জন সেণ্ট পয়গম্বর আসিয়াছেন। তাঁহারা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন ও সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরলাভের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা দিয়াছেন। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জন-সাধারণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, ঈশ্বর-চিন্তাই আসল বস্তু। ঈশ্বরগত প্রাণ লইয়া জীবন গঠন করিলে প্রকৃত শান্তি ও পরমার্থ পাওয়া যাইবে; এতদ্ব্যতীত মানুষ পশুর তুল্য।

মানুষ ঈশ্বরকে বুঝিল। কাহার কাহার ঈশ্বর-দর্শনও হইল। ইহা ত কতিপয় সাধকের ব্যাপার। কেমন করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে ঈশ্বর-দর্শন হয়, আর কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে পাওয়া যায় ইহাই হইল সমস্যা।

ঈশ্বর-দর্শনের উপায় অনুসন্ধানেরই অন্য নাম ধর্ম্ম। প্রাচীন কালের আদিম মানুষ—যাহাদের আমরা অসভ্য বলি, তাহাদের মধ্যেও ঈশ্বর-সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল। আর তাঁহাকে পাওয়ার জন্য তাহারাও একটা পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল। সাঁওতালগণ যাঁহাকে বলে 'মাবাং বুরু' তিনিও ঈশ্বর। সাঁওতাল-গণের পূজা-পদ্ধতি ও আচার-নিষ্ঠাকেও 'ধর্ম্ম' না বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই ভাবে মানুষ সত্যের পথে যেমন যেমন অগ্রসর হইয়াছে তাহার ঈশ্বর-প্রাপ্তির পন্থারও তেমনি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মানুষের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। সে এক স্তর হইতে উন্নততর স্তরে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু তবুও শ্রদ্ধার সহিত সে যাহাই নিবেদন করিয়াছে তাহা সেই ঈশ্বরের উদ্দেশেই করিয়াছে। এই সত্য-নিষ্ঠার পন্থাই ত ধর্ম্ম। কেহ আগে উন্নত হইয়াছে, কেহ পরে উন্নত হইয়াছে—সকলেই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রাপ্তির পন্থা হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। সুতরাং সকল ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বর-প্রাপ্তি। প্রশ্ন এই যে, তাহাই যদি হয় তবে জগতে এত ধর্ম্ম কেন? আর বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে এত রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বা কেন? দেশকালপাত্র-ভেদে মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ বিভিন্ন হইবেই। ধর্ম্মের বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই আছে পার্থক্য, কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে কোনই পার্থক্য নাই। আর রেষারেষি সে ত সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ধর্ম্মবোধ না থাকিলে ইহা চরম আকার ধারণ করিত। ধর্ম্মবোধই মানুষের শয়তানী প্রবৃত্তিকে চরম আকার ধারণ করিতে দেয় নাই। ধর্ম্মবোধ যখন পূর্ণ ও চরম হইবে, তখনই মানুষ প্রকৃত দেবত্বে উন্নীত হইবে। বিভিন্ন মানুষের আকার, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে বহু পার্থক্য আছে। ধর্ম্মের বাহিরের ব্যাপারে সেই প্রকার পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মূল লক্ষ্য-সম্বন্ধে কোথাও কোন গণ্ডগোল নাই। লক্ষ্য এক, পন্থা বিভিন্ন—ইহাই ত সৃষ্টির নিয়ম। প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের বিধি-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে মৌলিক ঐক্যের যোগসূত্র আছে। আচার-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে, পূজা-প্রণালীর মধ্যে বিভিন্নতা আছে, কিন্তু মূল লক্ষ্য-বিষয়ে কোথাও কোন বিরোধ নাই। সেইজন্য আমরা আশা করি, পৃথিবীতে এই ধর্ম্ম-সমন্বয়ের সম্ভাবনা একেবারেই কল্পনাতীত ব্যাপার নহে।

বর্ত্তমান জগতে যে কয়েকটি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাদের সকলের মধ্যেই মৌলিক ঐক্য দেখা যাইবে। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্ম্ম—এ গুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে একই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সৎ কর্ম্মের দ্বারা ও মানব-সেবার দ্বারা ঈশ্বরলাভ ও আত্ম-শুদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা—এইগুলিই হইল প্রত্যেক ধর্ম্মের মৌলিক নীতি। এই দিক দিয়া এই সব ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বড়ই আনন্দের কথা যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই ভাবেই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন—শুধু প্রচারই নহে, তিনি নিজের জীবনে সে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী তাঁহারা অপরকে ধর্ম্মান্তরিত করার নীতি স্বীকার করেন না। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেই মুক্তি আছে, প্রত্যেক পদ্ধতিতেই ঈশ্বর

পাওয়া যায় ও মানুষের সেবা করিবার সুযোগ আছে। আজ রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে সখ্যের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ ধর্ম্মকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করেন ও উদারতার সহিত সকল ধর্ম্মকে সত্যের বিভিন্ন দিক বলিয়া স্বীকার করেন, তবে সব বিরোধের মূল কারণ দূর হইয়া যাইবে। সাধারণ লোক ধর্ম্মের মূলনীতি জানে না বলিয়াই যত গণ্ডগোল ও কোলাহল। আমি ত নিজে বিশ্বাস করি যে, মুসলিম হইয়াও হিন্দু, খৃষ্টান বা অন্য কোন ধর্ম্মের সার সত্য গ্রহণ করিলে আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোনই অঙ্গহানি হয় না। বরং হৃদয় আরও প্রসারিত হয়। সেই জন্য একথা জোর গলায় বলিতে পারি যে, এক জন লোক একই সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সবই। আমি কোরআন মানি, সুতরাং আমি মুসলমান। আমি বেদ-উপনিষদ-গীতা মানি, সুতরাং আমি হিন্দু; আর বাইবেল মানি, সুতরাং আমি খৃষ্টান। বেদ-গীতা-বাইবেল মানিলে আমার কোরআনকে কোনক্রমেই অমান্য করা হয় না। রাজনৈতিক কূটচালের দ্বারা নহে, এই ধর্ম্মবোধের দ্বারাই ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে সত্যকার সৌহৃদ্য স্থাপিত হইবে—এ বিশ্বাস আমার আছে।

দুঃখের বিষয় যে, সাধারণ মানুষ উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মকে দেখে না। মনে করে যে, প্রত্যেকটি ধর্ম্মই অপরের বিরোধী। বিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্য মানুষ ঈশ্বর-ভজনা করে না। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান এই নীতি স্বীকার না করিলেই বরং ঈশ্বরের মহতী মর্য্যাদার অবমাননা করা হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই উদার ধর্ম্ম-বোধের আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে যে তত্ত্ব বিশ্বকে দিয়াছেন, তাহাতে সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। তাই দেখি ইউরোপের মত ভারতে ধর্ম্মের জন্য রক্তবন্যা বহে নাই। ভারতবর্ষ উদারভাবে সকল বিরোধীকে স্বীকার করিয়াছে। বিশেষ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কোন দিন exclusive salvation নীতি স্বীকার করে নাই। সব ধর্ম্মেই মুক্তি আছে—যত মত তত পথ—ইহা শুধু রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা নহে, ইহাই ভারতের শাশ্বত নীতি। উদারভাবে ইসলাম ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার মূলনীতির সহিত হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যেমন বহু মুসলমানই হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থাদি পাঠ করেন নাই, সেইরূপ বহু হিন্দুও ইসলামের প্রামাণিক কেতাবের কোনই সংবাদ রাখেন না। সাধারণের জ্ঞান এ বিষয়ে এত সীমাবদ্ধ যে, ইহা তাহাদের ধারণার মধ্যেও আসে না কেমন করিয়া এই দুই ধর্ম্মের মূলনীতি এক হইতে পারে। এই অজ্ঞানতা দূর করিবার দিন আসিয়াছে। বারান্তরে ইসলাম ধর্ম্মের মূলনীতি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইব যে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। বিরোধ হইতে আসে ধ্বংস। কিন্তু সমন্বয়ের পথই মুক্তির পথ। যাঁহারা বিরোধের কারণগুলি খুঁজিয়া বেড়ান তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান কাহারও বন্ধু নহেন। মৈত্রী ও ঐক্যের যোগসূত্র যাঁহারা খোঁজেন তাঁহারাই মানবদরদী—তাঁহারাই হিন্দু-মুসলমান সকলের বন্ধু।

লীলা

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

শ্যাম সুন্দর মুরতি সুঠাম রাজে মন্দিরমাঝে—
আজিকার মত হয়ে গেছে শেষ তাহার আরতি সাঁঝে।
দেবালয়ে যারা এসেছিল তা'রা ঠাকুর প্রণাম করি',
যে যাহার ঘরে চলে গেছে সবে নিজ নিজ পথ ধরি'।
মর্ম্মরে গাঁথা রোয়াকে উছলে চাঁদের জোছনা রাশি,
সৌম্য আননে পূজারী বসিয়া, অধরে দিব্য হাসি,
পুঞ্জিত জ্যোতি উন্নত ভালে, নয়ন আবেশময়,
দেখে মনে হয় এ মুরতি যেন মর জগতের নয়।
হেনকালে এক ভক্ত নমিয়া মৃন্ময় দেবতায়,
দাঁড়াল আসিয়া পূজারী যেখানে বসে ছিল নিরালায়।
স্মিত মুখে তারে শুধালে পূজারী, "কিছু কি বলিবে মোরে?"
"যুগল চরণে প্রণাম করিব", কহিল সে করজোড়ে।
সঙ্কোচ-ভরে পূজারী কহিল, "তুমি কি জান না ভাই,
দেউলে দেবতা ছাড়া কাহারেও প্রণাম করিতে নাই?"
ভক্ত কহিল, "তা'রি লাগি' দেব এসেছি তোমার কাছে—
হৃদয় লুটায়ে প্রণাম করিব মনে বড় সাধ আছে।
নাহিক শক্তি প্রাণবান্ করি মৃন্ময় দেবতারে
নিত্য আসিয়া গতানুগতিক প্রণতি জানাই তা'রে।
ভরে নাকো মন, হৃদয়ের কোণে শূন্যতা রয়ে যায়,
বেদনার ভারে অবিরত মন করে শুধু হায় হায়।
হাসি' কহে দেব 'ওরে ও অবোধ, দেখ্ না ওদিকে চেয়ে,
আমি যে রয়েছি প্রাণবান্ হয়ে পূজারী-হৃদয় ছেয়ে।
এমন শুদ্ধ যোগ্য আধার কোথা পাবো আর বল্?
তাহারে পূজিস্ আজি থেকে, পাবি আমারে পূজার ফল!'
প্রাণের মাঝারে দেবতার বাণী মিথ্যা কভু সে নয়,—
তোমাতেই মোর শ্যামসুন্দর চির বিরাজিত রয়।
তাইতো এসেছি নমিতে হে দেব তোমার চরণতলে,
ঐ পদে আজি অঞ্জলি দিব মোর প্রাণ-শতদলে।"
শুনি' ভাবাবেশে ধীরে পূজারীর মুদিল নয়ন দু'টি,
হৃদয়-যমুনা উজান বহিল সকল বাঁধন টুটি',
প্লাবনের বেগে কপোল বহিয়া নামিল অশ্রুধার,
বলিল, "ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, তব লীলা বোঝা ভার।
ইঙ্গিত তব বুঝিয়াছি, আজি সফল জীবন মম,
সাধনায় আজি সিদ্ধি দানিলে হে আমার প্রিয়তম।
এতদিন পরে বুঝিলাম দেব তুমি আর নহ দূরে,
চিরসুন্দর শ্যামসুন্দর বসেছ হৃদয় জুড়ে।"

সানফ্রান্সিস্‌কোয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সানফ্রান্সিস্কোয় পৌঁছেই কনসালের কাছে শুনলাম, এখানে রামকৃষ্ণদেবের দুটি মন্দির আছে, অধ্যক্ষ অশোকানন্দ স্বামী। অশোকানন্দকে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করলাম: তিনি সাদরে নিমন্ত্রণ করলেন মন্দিরে। পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সেক্রেটারিকে—মিষ্টভাষিণী আমেরিকান মহিলা।

প্রকাণ্ড মোটর। কার মোটর জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীমতী বললেন তাঁর নিজের। ইনি কত যে করেছেন মিশনের জন্যে! ঠাকুরের কাজ এই ভাবেই হ'য়ে যাবে। "গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ" সবাই এগিয়ে আসে দেবকার্যে জোগান দিতে, মানুষ তো কোন্ ছার!

শ্রীমতী আমাদের নানা কথাই বললেন: অশোকানন্দ স্বামীকে কত কর্ম করতে হয়েছে। আজ একুশ বৎসর তিনি প্রবাসী—কিসের জন্যে? ঠাকুরের কাজে। স্বাস্থ্য তাঁর ভালো নয়—অত্যধিক পরিশ্রমে খানিকটা স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে বৈ কি। কিন্তু মুখে তাঁর অনুযোগ নেই। জিজ্ঞাসা করলাম: "দেশের জন্যে মন কেমন করে না?"

"করে বৈ কি। কিন্তু ঠাকুরের কাজ যে!"

অলডাস্ হাক্সলির একটি চিঠির কথা মনে পড়ল—আমাকে অনেক দিন আগে লেখা। তাতে তিনি লিখেছিলেন এই ভাবের একটি কথা যে, আমেরিকায় রকমারি কসরৎদার আসে সত্যের নাম নিয়ে—কিন্তু তবু সত্য সাধু বিরল হ'লেও আছে এখনো। যেমন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু।

এঁরা সত্যই সাধু। যাঁরা আজকের দিনে ধর্মের নামে হাসেন, বলেন ধর্ম হ'ল মেকি টাকা—তাঁদের ব্যঙ্গ অনেক সময়ে তীক্ষ্ণ হ'লেও লক্ষ্যবেধে অপারগ। কারণ হসনীয় হ'ল অধর্ম—ধর্ম বরণীয়—যেহেতু সেই থাকে ধারণ ক'রে। যেখানে শুভকর্মের আন্তরিক প্রয়াস সেখানে ধার্মিক পানই পান অন্তরদেবতার আশীর্বাদ। আর একথার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ—বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু তা ব'লে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের পথ যে কুসুমাস্তৃত এমন কথা বলা যায় না। অশোকানন্দ বলছিলেন: "প্রথম দিকে লোক আসত না, কিম্বা যারা আসত তারা ধর্মার্থী নয়—ভোজবাজি-অর্থী। তবু বলব একদল লোক আছেই এখানে যারা চায় সত্যের দিশা, ধর্মের বরাভয়। এ যদি না হ'ত তাহ'লে এখানে কিছুতেই আমরা আপ্তকাম হ'তে পারতাম না।"

আর আপ্তকাম হয়েছেন বৈ কি। স্বচক্ষে দেখে এলাম কী সুন্দর দুটি আশ্রম। একটির প্রতিষ্ঠা সানফ্রান্সিস্কোর আগেই হয়েছিল, বুঝি ১৯০৫ সালে—সেটির সমাপন হয় ১৯০৮ এ। আর একটির প্রতিষ্ঠা সানফ্রান্সিস্কোর প্রতিবেশী শহর বার্কলিতে।

প্রথমে অশোকানন্দ নিয়ে গেলেন বার্কলিতে। সেখানে দেখলাম একটি খুব বড় না হ'লেও বেশ বড় বাড়ি। হাল আমলের চমৎকার আসবাব-পত্র, হীটিং, চেয়ার, ঝাড়লণ্ঠন, লাইব্রেরি, লেকচার হল, সুন্দর বাগান—কী নয়? লেকচার হলের একদিকে দোতলায় ছোট একটি ঘর

মতন, সেখানে মস্ত পিয়ানো। প্রতি মাসে এখানে ধর্মসঙ্গীত হয় বক্তৃতার আগে বা পরে। নিচে হলের সামনেই মঞ্চ ও বেদী। মঞ্চে বক্তা বক্তৃতা করেন বেদীর সামনেই। বেদীর উপরে একদিকে ঠাকুরের ছবি, অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের। মধ্যে সুন্দর ক'রে ওঁ আঁকা বড় হরফে।

ঠাকুরের ছবির সামনে ইন্দিরা, অশোকানন্দ ও আমি প্রণাম করলাম—বেদীমূলে। মন ভরে উঠল। বললাম অশোকানন্দকে: "এখানকার আবহাওয়াই আলাদা।"

অশোকানন্দ বললেন গাঢ়কণ্ঠে: "দিলীপবাবু, যখন এ মন্দিরটি গ'ড়ে তুলি তখন প্রথমদিকে যে হৃদয়ে সংশয়গ্রন্থি ছিল না এমন কথা বলব না। কারণ মনে হয়েছিল ঠাকুরের মূর্তি তো স্থাপন করা হ'ল—কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে তো? কিন্তু তারপরেই গ্রন্থিমোচন হ'ল—স্পষ্ট অনুভব করলাম তাঁর আবির্ভাব। আর শুধু আমি নই অনেকেই শিহরিত হ'য়ে উঠলেন সে আবির্ভাবের অপার দাক্ষিণ্যে। শুধু বাহ্য প্রসাদ নয়—সে প্রসাদ স্বাদন করবার সময় মনে হ'ল সত্যিই প্রসাদ—জীবন্ত প্রসাদ!"

আমি বললাম: "সত্যের প্রতিষ্ঠা এমনি ভাবেই হ'য়ে থাকে। সুরু হয় ধীরে ধীরে—কিন্তু যা গ'ড়ে ওঠে সে-বস্তু বালুচরে তাসের স্তূপ নয়—খৃষ্টদেব যাকে বলতেন পাষাণভিত্তির 'পরে নির্মিত নিলয়। আপনারা ধন্য যে ঠাকুরের মহিমা রক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন নিঃস্বার্থ কর্মযোগে। জগতে নানা ভেক নিয়ে নানা দল নানা মন্ত্রপাঠ করে। সত্য নিষ্ঠা ভক্তি ও জ্ঞানের বাণী প্রচার করেন যাঁরা তাঁদের সংখ্যা কম। কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে সত্যের মহিমা নির্ণয় করা যায় না। ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়ে যাঁরা কাজে এগোন তাঁদের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী কাজই হয়, ক্ষণিক আড়ম্বরের জাহিরিপনা নয়।"

ধর্ম-সম্বন্ধে মন্দিরে অনেক কথা হল। মন ভরে উঠল এ আবহে ধর্মালোচনা করতে পেরে। মনে হ'ল বিদেশে পেয়েছি স্বদেশের আস্বাদ—সাত সাগরের পারে ঠাকুরের পরিচিত কৃপাস্পর্শ।

তারপর অশোকানন্দ নিয়ে এলেন সান-ফ্রান্সিস্কোর মঠে। এখানে কয়েক জন ব্রহ্মচারী থাকেন। বাইরে থেকে দেখতে চমৎকার এ-অট্টালিকাটি। ভিতরেও শান্তির আবহ। দেখলাম, সেখানে আরো দুটি আমেরিকান মহিলাকে—তাঁরা মিশনের ছাপা খাম নিয়ে ব'সে কর্মনিরত। সাদর অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। সেখানে ব'সে আরো অনেক কথাবার্তাই হ'ল। অশোকানন্দকে বললাম কথায় কথায়: "আমাকে আপনাদের একজন মনে করবেন—বাইরের লোক নয়।"

অশোকানন্দ বললেন: "তা জানি দিলীপ বাবু।" আমি বললাম: "শুনুন: তের বৎসর বয়সে আমি প্রথম পড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। প্রথম বেরিয়েছিল তিনটী খণ্ড। পরে চতুর্থ খণ্ড। আরো পরে পঞ্চম খণ্ড। প্রথম তিনটি খণ্ড আমি অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশবার পড়েছি, চতুর্থ পঞ্চম খণ্ড বোধ হয় বিশ ত্রিশ বার এখনো প্রায়ই পড়ি। আমার ধর্মজীবনের সূচনা হয় এই মহাগ্রন্থ থেকে। আমার কাছে তাই এ-গ্রন্থ গুরুগ্রন্থই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যেতাম স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে, শ্রীম-র কাছে, স্বামী সারদানন্দের কাছে, শ্রীমা সারদামণির কাছে, শিবানন্দের কাছে। তাঁদের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। আর একথা আমি প্রমাণ করতে না পারলেও বলবই বলব যে, তাঁদের সে পরম আশীর্বাদ আমাকে

নানা দুঃসময়ে বল দিয়েছে। মনঃকষ্টে সান্ত্বনা, শঙ্কায় অভয়, নির্ভরসায় বিশ্বাস। তাই কোনো সময়ে আমাদের আশ্রমে পরমহংসদেব-সম্বন্ধে কোনো গুরুভাইয়ের মুখে অশ্রদ্ধার কথা শুনে আমি হয়েছিলাম মর্মাহত। তিনি বলেছিলেন—কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করতে পারব না। আমি লিখেছিলাম শ্রীঅরবিন্দকে —শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে আপনার উচ্চধারণার কথা আমি পড়েছি আপনার 'সিন্থেসিস্ অব্ যোগ' বইটিতে। আপনার সে-ধারণা কি বদ্‌লে গেছে—নৈলে আপনার শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে এমন অশ্রদ্ধার কথা বলেন কেমন ক'রে? তাতে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "আমার সে ধারণা বদলায় নি একটুও। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার টোনে (tone) আমি কথা বলব কেমন ক'রে? আমার ধর্মের সঙ্গে কি বর্ণপরিচয়ও হয় নি? শ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্মজগতে ছোট করা হবে এই কথা বলার সামিল যে শেক্সপীয়র তৃতীয় শ্রেণীর কবি; নিউটন এক জন গড়পড়তা অধ্যাপক।"

চিঠিটা হাতের কাছে নেই—স্মৃতি-শক্তির উপরে ভর ক'রে তার মর্মার্থ দিলাম অশোকানন্দকে।

বিদায় নিলাম যখন তখন মন ভ'রে উঠেছে আমার। মনে হ'ল ভারত অধঃপতিত বলে কে যেখানে আজও মহাপুরুষদের জন্ম হয়, যাঁরা ধারণ ক'রে আছেন ভারতের সনাতন ঐতিহ্যকে? সানফ্রান্সিস্কোয় এসে যেন ভারতের ধর্মবাণীকে শুনলাম নূতন শ্রুতি দিয়ে। মনে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যদ্বাণী:

"অন্য অনেক ধর্ম আসবে যাবে, কিন্তু হিন্দুধর্ম সনাতন।"

গান

শান্তশীল দাশ

আমার আমি এই কথাটি
যতই ভাবি মনে মনে,
বন্ধু, তুমি সে-ভুল ভেঙে দাও।
আঘাত হানি বারে বারে,
অভিমানী সেই আমারে
মিথ্যা মোহের বাঁধন হ'তে
বন্ধু হে বাঁচাও।
ভাঙন-গড়ন আমার হাতে
শক্তি যে অপার—
বারে বারেই ধূলায় লোটে
এ-মোর অহংকার।
যতই আমি তোমায় ভুলি,
ততই কাছে নাও যে তুলি;
অভিমানের সকল বেদন
বন্ধু হে ঘোচাও।

উপনিষৎ ও ভারতীয় কৃষ্টি

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

যুগে যুগে ভারতীয় উপনিষৎ পৃথিবীবাসী সকলকেই কর্মে উৎসাহিত, জ্ঞানে প্রোদ্দীপ্ত, নিরাশায় আশা প্রদান করে এসেছে। আল বেরুণী এক হাজার বৎসর আগে উপনিষৎ-পাঠে ধন্য হয়েছিলেন। দারা শুকোহ উপনিষদের যে ফার্সী অনুবাদ করেন, তার ল্যাটিন অনুবাদ করেন পুনরায় Anquetil du perron নামক ফরাসী পণ্ডিত ও ধর্মযাজক। তিনি একেবারে ভারতীয় ঋষির মত ছিলেন, এবং তিনি উপনিষৎপাঠে কত বিমুগ্ধ, উপকৃত, জীবনে কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন, তার বিবরণ অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন E Windisch তাঁর Die altindischen Religions ur Kunden and die Christliche Mission এবং Geschichte der Sanscrit-philologie নামক গ্রন্থে। Perron গ্রন্থের নামকরণ করেন Oupnek'hat. এই উপনিষদ্-গ্রন্থের অনুবাদের অনুবাদ পড়েই জার্মানদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋষি দার্শনিক বলেছেন, "The Upanishats present the fruit of the highest human knowledge and have almost superhuman conceptions whose originators can hardly be regarded as men." তিনি আরো বলেছেন, তাঁর দেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার তাঁর দেশের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের কারণ; উপনিষৎই মূলসংস্কৃত; উপনিষদ্-গ্রন্থ ব্যতীত জগতে শ্রেষ্ঠ আনন্দপ্রদ ও চিত্তোদ্বেলক গ্রন্থ আর নাই এবং এই উপনিষদ্ জীবন ও মৃত্যুর চির সান্ত্বনা।

দুঃখের বিষয়, সমস্ত জগৎ যে উপনিষদের আলোতে ভাস্বর, নিখিল বিশ্ব যার রসসুধাপানে অমর, আমাদের দেশবাসীরা সে আলোর প্রকৃত সন্ধান রাখেন না এবং সে অমৃতভাণ্ডারের চাবিস্বরূপ সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁদের সত্যিকার কোনও দরদ, কোনও প্রাণের টান নেই।

উপনিষদের মধ্যেও বহু স্তর আছে। অনেকগুলি অতি প্রাচীন; কতকগুলি বহু পরবর্তী কালের। এমনকি, সম্রাট আকবরের সময়েও সেখ ভিখন (মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, পরে মুসলমান-ধর্মাবলম্বী) আল্লোপনিষৎ তৈরী করে গেছেন। ভগবান্ আদি শঙ্করাচার্য যে দ্বাদশটি উপনিষদ্-গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছেন, সেগুলিই অতি-প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আমি আজ শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত ঈশা ও বৃহদারণ্যকের বাণী পর্যালোচনা করছি।

ঈশোপনিষৎ

ঈশা উপনিষদ্ মাত্র ১৮টী কবিতার সমাহার। তা হ'লেও বিষয়বস্তুর অপূর্ব অবতারণার জন্য এ গ্রন্থ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনগ্রন্থরূপে যুগে যুগে সমাদৃত হয়েছে।

ঈশা উপনিষদের বক্তব্য বিষয় মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। (১) ব্রহ্মজ্ঞান ও তার ফল (১-৮); (২) জ্ঞান ও

কর্মের সমুচ্চয় (৯-১৪); (৩) সূর্য-মণ্ডলবাসী পুরুষ (১৫-১৬); ও (৪) মৃত্যুকালীন চিন্তা ও অগ্নিস্তুতি (১৭-১৮)।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এই অপূর্ব শ্লোকটী নিয়ে এই গ্রন্থের প্রারম্ভ। অর্থাৎ "এই জগতে যা' কিছু বিদ্যমান, তা' সমস্তই ঈশ্বরময়, এরূপ জেনে বিষয়বস্তু ত্যাগ করতে হ'বে এবং সেই বিষয়বস্তু ত্যাগ করে পরমাত্মাকে সম্ভোগ করতে হ'বে। কারো ধনে কখনো আকাঙ্ক্ষা করা চল্‌বে না।"

এ গ্রন্থে এটাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, যেন কর্ম করেই মানুষ ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকতে চায়। এরূপ নিষ্কাম কর্ম করলে মানুষ কর্মলিপ্ত হবে না। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি এই সমুদয়ের অন্তরে আছেন, তিনি এই সমুদয়ের বাইরেও আছেন। (৫) যিনি আত্মাতে সমুদয় বস্তু দেখেন এবং সমুদয় বস্তুতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাকেও ঘৃণা করেন না। (৬)

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫
যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬

জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়ের বিষয়ে বলতে গিয়ে ঈশোপনিষদ্ বলেছেন—যারা অবিদ্যার অর্থাৎ কেবল কর্মের অনুসরণ করে, তারা অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যারা কেবল জ্ঞানে রত, তারা তদপেক্ষাও গভীর-তর অন্ধকারে প্রবেশ করে। (৯) যিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয়কে একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলে জানেন, তিনি কর্ম দ্বারা মৃত্যু (অর্থাৎ প্রকৃত জীবন) থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব (আধ্যাত্মিক জীবন) লাভ করেন। (১১)

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥" ১১॥

অন্যান্য উপনিষদের মত এই ক্ষুদ্র অথচ অপূর্ব সুন্দর উপনিষদ্ সমাপ্ত হয়েছে একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর জয়গাথায়। উপনিষদের ঋষি প্রারম্ভে যে ঈশ্বর দ্বারা জগতের সব কিছু আচ্ছাদনীয় বলে ঘোষণা করেছেন, সমাপ্তিতে সেই পরম কল্যাণময় দেবতার সহিত নিজের একত্ব, অভিন্নত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছেন। সেইজন্য তিনি উল্লসিত চিত্তে বল্‌ছেন—

"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥" ১৬॥

অর্থাৎ "হে জগতের পোষক, হে একাকী গমনশীল, হে সকল প্রাণীর সংযমকর্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য, তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর। তোমার যে অতি শোভনরূপ, তা আমি তোমার প্রসাদে দেখি। ঐ যে সূর্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ, তিনি আমি।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপনিষৎ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অজাতশত্রু, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, আরুনি, উষস্ত, প্রবাহণ প্রভৃতি অনেক ঋষিরই নামোল্লেখ আছে। সুপ্রসিদ্ধা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মনোহর আখ্যায়িকাও এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যাজ্ঞবল্ক্যই এ উপনিষদের প্রধান ঋষি। এই উপনিষদের গভীরতম তত্ত্বগুলি প্রধানতঃ তাঁরই নামে ব্যাখ্যাত। পরবর্তী দার্শনিক চিন্তায় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রভাব অতি গভীর ও ব্যাপক।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম দর্শনলাভ করি। এই ব্রাহ্মণটীর স্ফূর্ততররূপ চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে প্রকটিত হয়েছে। মহর্ষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক হয়ে তদীয় পত্নীদ্বয়ের মধ্যে সম্পত্তিবিভাগ করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বল্লেন: "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্"—অর্থাৎ যার দ্বারা আমার অমৃতত্বলাভ না হয়, তার দ্বারা আমি কি করবো? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বল্লেন—"তুমি প্রিয়াই ছিলে, (এখন) প্রিয়ত্ব বর্ধিত করলে।" এই প্রিয়ত্বের কথা থেকেই আত্মোপদেশের আরম্ভ। প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে অন্যান্য নানা কথার মধ্যে একস্থানে যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত আত্মতত্ত্বের সারসংগ্রহ করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বল্ছেন—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা [স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো—তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত] স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥" অর্থাৎ "এই যে অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, এই সমুদয় অপেক্ষাই প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে প্রিয়তর বলে মনে করে, তাকে যদি কোন (আত্মজ্ঞ) ব্যক্তি বলে—'তোমার প্রিয় বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হবে'—সে এ প্রকার বল্তে সমর্থ এবং এ প্রকার ঘট্‌বেই। সুতরাং আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করবে। যে আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করে, তার প্রিয়বস্তু নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। "মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে এ মতই দৃষ্টান্ত সহ প্রপঞ্চিত হয়েছে। আমরা যে স্ত্রী-পুত্রাদি আপনজনকে প্রীতি করি, তার কারণ কি? যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌ছেন—আত্মপ্রীতিই মূল প্রীতি; আত্মা স্বভাবতই আপনাকে প্রীতি করে। জাগতিক বস্তুসমূহের মধ্যে যে যতই বেশী নিজেকে দেখ্‌তে পায়, সে সে পরিমাণেই আত্মপ্রীতি উপলব্ধি করে; সকলকে ভালবাসে। প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যার পর আবার যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌ছেন—"এ আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, মনন করতে হ'বে, নিশ্চিত রূপ ধ্যান করতে হ'বে। অয়ি মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা এ সমুদয় অবগত হওয়া যায়।" আত্মার স্বরূপ উল্লেখপূর্বক যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে আত্মাকে ছেড়ে কোন বস্তুকে সম্যক্‌রূপে জান্‌তে চেষ্টা করলে সেই বস্তু অনুসন্ধিৎসুকে বঞ্চিত করে, পরিত্যাগ করে। "যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-জাতিকে আত্মা থেকে পৃথক্ বলে মনে করে, ব্রাহ্মণ-জাতি তাকে পৃথক বলে মনে করবে বা পরিত্যাগ করবে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়-জাতিকে আত্মা থেকে পৃথক্ বলে মনে করে, ক্ষত্রিয়-জাতি তাকে পরিত্যাগ করবে···। যে ব্যক্তি সমুদয় বস্তুকে আত্মা থেকে পৃথক্ বলে মনে করে, সমুদয় বস্তু তাকে পৃথক্ বলে মনে করবে। এই ব্রাহ্মণ-জাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই ভূতসমূহ, এই সমুদয় বস্তু—(এই সমস্ত তাহা) যাহা এই আত্মা—"ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং যদয়মাত্মা।" (২।৪।৬) বিষয়কে বিষয়ী থেকে স্বতন্ত্র মনে করা যে প্রমাদমূলক, তা' প্রতিপন্ন করার জন্য ঋষি তাড্যমান দুন্দুভি, বাদ্যমান শঙ্খ ও বীণা এবং অগ্নি থেকে নির্গত ধূমের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দুন্দুভি প্রভৃতিও

তাদের বাধক, বা অগ্নি থেকে যেমন ধূমের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, তেমনি বিষয়ী আত্মা থেকেও বিষয়ের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। দৃষ্টান্তান্তর প্রদান-ব্যপদেশে যাজ্ঞবল্ক্য সমুদ্র ও জলের, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয় ও চক্ষু-রসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং কর্ম ও গতি প্রভৃতি ও কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন। ফলতঃ, আত্মা সর্বব্যাপী। দৃষ্টান্তস্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হলে জলেই বিলীন হয়ে যায়, তাকে আর পৃথক্ করে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়, (কিন্তু) যে কোন স্থল থেকে জল গ্রহণ করা যায়, তা' লবণ-ময়ই, তেমনি এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানময়।" আত্মার সর্বব্যাপিত্ব প্রদর্শন ব্যতীত এই দৃষ্টান্তের আরো একটা উদ্দেশ্য এই যে, আত্মা অসীমরূপে, সমষ্টিরূপে, সর্বদা বিরাজমান বটে, কিন্তু আত্মার যে ব্যষ্টিরূপে সসীমরূপে প্রকাশ—যাকে আমরা জীবাত্মা বলি, সে প্রকাশ অস্থায়ী। আত্মা বিজ্ঞানময় বটেন, কিন্তু তাঁর বিজ্ঞান অভেদ-বিজ্ঞান, বিষয়-বিষয়ি-ভেদশূন্য বিজ্ঞান। অতঃপর যাজ্ঞ-বল্ক্য আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, জীবদ্দশায় জ্ঞানে বিষয়-বিষয়ীর, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ থাকে, কিন্তু মৃত্যুর অবস্থায় তা থাকে না। বিষয়ের সহিত ভেদ থাকলে বিষয়ীকে জানার প্রশ্ন আসে। কিন্তু যে অবস্থায় বিষয়জগৎ থাকে না, কেবল আত্মাই থাকেন, সে অবস্থায় আত্মা কিরূপে জ্ঞানগোচর হবেন? সেজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বল্ছেন—"যে স্থলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্তু রয়েছে, সেই স্থলে একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে অভিবাদন করে, একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন জ্ঞানীর নিকট সমুদায়ই আত্মা হয়ে যায়, তখন কে কাকে আঘ্রাণ করবে, কে কাকে দর্শন করবে, কে কাকে শ্রবণ করবে, কে কাকে অভি-বাদন করবে, কে কাকে মনন করবে, এবং কে কাকে জান্‌বে? যা দ্বারা এ সমুদায়কে জানা যায়, তাকে কিরূপে জান্‌বে? বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জান্‌বে?"

পুনরায় আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে জনক-যজ্ঞভূমিতে যাজ্ঞবল্ক্যের সাক্ষাৎ পাই। এখানে তিনি বচক্নু ঋষির কন্যা গার্গী বাচক্নবীর সঙ্গে কথোপকথনে নিরত। গার্গী প্রশ্ন করলেন—কিসে সমুদায় ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—'আকাশ'। পুনরায় গার্গী জিজ্ঞাসা করলেন—'আকাশ কিসে ওত-প্রোতভাবে বিরাজমান?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—'অক্ষর পুরুষে' এবং অক্ষর পুরুষের অভাবাত্মক ও ভাবাত্মক লক্ষণ দুইই বর্ণনা করলেন। গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদের শেষ মীমাংসা এই—এই অক্ষরকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দর্শন করেন। তাঁকে শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু তিনি শ্রবণ করেন। তাঁকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি মনন করেন। তাঁকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি জানেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা নাই। এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বর্তমান রয়েছে।

সপ্তমাধ্যায়ে উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীকে জানেন কি না। যাজ্ঞবল্ক্য পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে নানা ভৌতিক বস্তু, এবং প্রাণ, মন, বিজ্ঞানাদি আধ্যাত্মিক বস্তুর উল্লেখ করে এই সকল বস্তুর সঙ্গে অন্তর্যামী আত্মার ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদন করেন। কিন্তু উপদেশ করেছেন যাজ্ঞবল্ক্য উপসংহারে অদ্বৈতবাদের। বলেছেন—"তিনি অদৃষ্ট কিন্তু সকলের দ্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু সকলের শ্রোতা; ইত্যাদি। ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত, ইনি ভিন্ন আর সমুদায় আর্ত। বৃহদারণ্যক বল্‌ছেন—এখানে আরুণি বিরত হলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

স্বামী শান্তানন্দ

১৩১৬ সাল, জ্যৈষ্ঠমাস চলিতেছে। আমি পুণ্যধাম বারাণসীতে রহিয়াছি। শ্রীশ্রীমায়ের চরণ দর্শন করিবার একান্ত ইচ্ছায় ঐ মাসের শেষাশেষি একদিন কলিকাতা রওনা হইলাম। সেই সময় 'ব্রহ্মবাদিন্'[১] মহাশয় কাশী অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মণিকর্ণিকার ঘাটে চলিয়া যাইতেন এবং সমস্ত রাত্র সেখানে জপ-ধ্যানে কাটাইয়া আবার প্রাতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন। আমি যখন কলিকাতায় আসি তিনি আমাকে একান্তে বলিলেন,—মাকে একটু জিজ্ঞাসা করিবেন আর কতদিনে আমার উপর তাঁহার কৃপা হইবে।

যথাসময়ে নির্বিঘ্নে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী পৌছিলাম—পূজনীয় শরৎ মহারাজের দর্শন-লাভ হইল। বলিলেন,—মায়ের পানিবসন্ত হইয়াছে, দূর হইতে দর্শন করিয়াই চলিয়া আসিও।

আমি উপরে উঠিয়া গেলাম। মায়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, মায়ের শুইবার খাটখানি সরানো হইয়াছে, ঘরের মেঝেতে বিছানা পাতা—মা শুইয়া রহিয়াছেন। প্রণাম করিবার সময় করুণাময়ী মা আমাকে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন,—আমার পায়ের কাপড়টা সরিয়ে দাওতো। আদেশ পালন করিতে হইল। শ্রীচরণস্পর্শে ধন্য হইলাম। ইহার কিছুকাল পরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ আমাকে মায়ের সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

মায়ের শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। আরোগ্য-স্নানের দিন আমাকে বলিলেন, —আমার শরীরটা খুব দুর্বল; মা শীতলার উপোস্ করতে পারবো না—আমার হয়ে তুমিই উপোসটা করে মায়ের পূজো দিয়ে এসো। তাঁহার কথামত কাশীপুরে ৺শীতলার মন্দিরে চলিয়া গেলাম এবং পূজান্তে প্রসাদ ও চরণামৃত আনিয়া মাকে দিলাম।

এই অসুখে মা বেশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। একটু ভাল হইলে পর তাঁহাকে নিবেদন করিলাম,—মা, আমি যখন ৺কাশী থেকে এখানে চলে আসি, ব্রহ্মবাদিন্ তখন আমাকে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন, কতদিনে তাঁর উপর আপনার কৃপা হবে। মা এতক্ষণ স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা কহিতেছিলেন, কিন্তু এই কথা শুনিবামাত্র মা খুব গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন,—দেখ, ঋষিরা ঊর্ধ্বদিকে পা আর অধোদিকে মাথা করে হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা করতেন, তাতেও কারও ওপর কখনও তাঁর কৃপা হতো, আবার কখনও হতো না। সে যে একটু কঠোর করছে বলেই তাঁর কৃপা হবে এর কোন মানে নেই। কঠোরতা করে কেউ তাঁকে পায় না; তাঁর দয়াতেই তাঁকে পাওয়া যায়। তুমি এই কথাটা তাঁকে লিখে দাও।

মায়ের শরীর খুব দুর্বল। শরীর সারাইবার জন্য তাঁকে মধ্যে মধ্যে গড়ের মাঠ, হাওড়া,

১ ইহার পূর্বাশ্রমের নাম বঙ্কুবাবু, পূর্বে সব্‌রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

গঙ্গার ধার প্রভৃতি স্থানে বৈকালবেলা বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত। সাধারণতঃ ললিত চাটুজ্যে মহাশয়ের[২] ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতেন। দেহে ক্রমশঃ খানিকটা বল পাওয়ার পরেই মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা পুনরায় আরম্ভ করিলেন। পূজার ফুল ফল ইত্যাদি সমস্ত কিছু আমরাই জোগাড় করিয়া দিতাম। মা ঠাকুর-পূজাটি সাধ্যমত নিজেই করিতে চাহিতেন—অপর কাহাকেও করিতে দিতেন না। এমন কি ঠাকুর-ঘরের মেঝে পর্যন্ত মুছিতে গেলে তিনি বলিয়া উঠিতেন,—না, না, তোমরা কেন, আমিই করব। মায়ের পূজার বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি আসনে বসিয়া আচমন সারিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোটি কুশী হইতে গঙ্গাজল দিয়া স্নান করাইতেন এবং সযত্নে মুছাইয়া দিয়া কপালে চন্দনের টিপ পরাইবার পর ধীরে ধীরে সিংহাসনে বসাইয়া দিতেন। ইহার পর গোপাল প্রভৃতি দেবতাদের বিগ্রহ-গুলি তাম্রকুণ্ডে রাখিয়া একযোগে স্নানান্তে ভাল করিয়া মুছিয়া রাখিতেন। ক্রমে ঠাকুরকে অর্ঘ্য ও পুষ্পাদিতে সাজাইবার পর নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া মাও ধ্যানস্থা হইতেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই অবস্থাতেই কাটিয়া যাইত—কেহ গা টিপিয়া দিলে তবে উঠিতে পারিতেন। পূজান্তে আসন ত্যাগ করিবার পর মা ঠোঙ্গাতে সকলের জন্য প্রসাদ ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখিতেন। বাড়ীর পাচক ও চাকরের ভাগটি একট ভাল হইত—মা বলিতেন, ওরা সব খাটে খোটে, ওদের একটু ভাল খাওয়া দরকার। সামান্য একটু প্রসাদ খাইয়া মা চলিতেন গঙ্গাস্নানে—সঙ্গে গোলাপ মা প্রভৃতি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্নানাদি সারিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন—ঐসময় গোলাপ মা পরের দিনের পূজার জন্য ছোট এক ঘড়া গঙ্গাজল আনিতেন। গঙ্গা হইতে ফিরিয়া মা দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের ভোগের জন্য নিয়মিত পান সাজিতে বসিতেন।

ভোগ রান্না হইয়া গেলে মা নিজেই ঠাকুরকে ঘরেই নিবেদন করিতেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ডান দিকের বড় ঘরে আমরা সকলে প্রসাদ পাইতাম—মা মেয়ে ভক্তদের সহিত ঠাকুরের ঘরে পাশের প্রকোষ্ঠে বসিতেন। আহারান্তে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর মায়ের নিত্যকর্ম ছিল কাপড় কাচিয়া বেলা চারটার সময় ঠাকুর তোলা। শনি মঙ্গলবারে বৈকাল ৫টা হইতে ৬টা পর্যন্ত ভক্তদের দর্শনের জন্য মা খাটের উপর বসিয়া থাকিতেন—পা দুটি ঝুলান, সর্বাঙ্গ চাদরাবৃত। ভক্তেরা একে একে মাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেন। যদি কাহারও বিশেষ বক্তব্য বা জিজ্ঞাস্য কিছু থাকিত, তবে তিনি শেষভাগে প্রণাম করিয়া মায়ের সহিত কথাবার্তা কহিতেন। আগত প্রত্যেককেই কিছু প্রসাদ দেওয়া মায়ের আদেশ ছিল। একদিন প্রসাদ কম পড়িয়া গেলে আমি বলিয়াছিলাম—প্রসাদ তো একটু একট খেলেই হবে। মা আমার কথা শুনিবা মাত্র উত্তর করিলেন,—না, না, তুমি বাজার থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে এসো, আমি ঠাকুরকে নিবেদন করে দোব; আগে খেলে দেলে তবে তো টান হবে, ভক্তি হবে।

নিম্নে শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি ভ্রমণের বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে :

১৩১৬ সালের ৩রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার মা

২ মায়ের মন্ত্রশিষ্য, জন্ ডিকিন্‌সন্ কোম্পানীর বড়বাবু ছিলেন।

ললিতবাবুর গাড়ীতে গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার কয়েক জন আত্মীয়া ও গোলাপ মা। ফিরিতে রাত সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছিল।

দুদিন পরে শনিবার অপরাহ্নে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের অধ্যক্ষ যোগবিনোদ স্বামীর[৩] একান্ত ইচ্ছা ও উৎসাহে মা যোগোদ্যান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ললিতবাবুর গাড়ী এবং আরও কয়েকখানি গাড়ী ছিল। যোগীন মা, গোলাপ মা, এবং মায়ের আত্মীয়েরা ছিলেন। সাধুদের মধ্যে আমি এবং আরও দু'এক জন ছিলেন মনে পড়ে। পৌঁছাইতে একঘণ্টা লাগিয়া গেল। যোগোদ্যানে যোগবিনোদ স্বামী এবং আরও অনেক ভক্ত মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মা ভক্তদের সম্মুখে অবগুণ্ঠনবৃতা থাকিলেও যোগবিনোদ স্বামীর নিকট ঘোমটা দিতেন না। প্রথমেই ঠাকুরঘরে যাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও প্রণামাদি সারিয়া মন্দির-সংলগ্ন বাগানখানি পরিদর্শনান্তে ঠাকুরঘরের পূর্বদিকস্থ দ্বিতল বাড়ীটির উপরের ঘরটিতে বসিলেন। স্ত্রীপুরুষ সমস্ত ভক্তেরা মাকে প্রণাম করিলেন। কিঞ্চিৎ জলযোগ ও বিশ্রাম করিয়া রাত ৭॥০টায় উদ্বোধনের বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন।

পরবর্তী শনিবারে (১২ই ভাদ্র, ১৩০৬) মা বৈকালে তাঁহার কয়েকটি আত্মীয়া ও গোলাপ মা সমভিব্যাহারে ললিতবাবুর গাড়ীতে প্রথমে শ্রীশ্রীপরেশনাথের মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর মন্দির-দর্শনান্তে সেখানকার পুষ্করিণীর লাল মাছগুলির খেলা দেখিয়া মা পুলকিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন,—দেখ, মাছগুলি কেমন আনন্দে খেলছে। মন্দিরের পার্শ্বস্থিত সুন্দর বাগানটি দর্শনে মা খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখান হইতে পুনরায় যাত্রা করা হইল। গাড়ী সার্কুলার রোড, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট ধরিয়া চলিয়া অবশেষে আসিয়া পড়িল হাওড়ার পুলে। গাড়ী করিয়া ব্রীজের উপর বেড়াইবার পর গঙ্গার তীরবর্তী রাস্তায় মা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন তখন ৭টা বাজিয়া গিয়াছে।

১৪ই ভাদ্র সোমবার মা রামরাজাতলা বেড়াইতে যান। মায়ের সাথী গোলাপ মা ও যোগীনমা যথারীতি একত্র গাড়ীতে চলিলেন। তবে সেইদিন সঙ্গের লোকজন বেশি হওয়ায় আরও কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হয়। হাওড়ার পুল, খুরুট পার হইয়া বৈকাল ৪টায় নির্বিঘ্নে রামরাজাতলা পৌঁছান গেল। আধঘণ্টার মধ্যেই মা দর্শনাদি শেষ করিয়া ঠাকুর দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অবশেষে বেলা ৫টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত শ্রীনবগোপাল ঘোষের রামকৃষ্ণপুরস্থিত বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মা ঠাকুরঘরে যাইয়া বসিলেন; অতঃপর নবগোপালবাবুর স্ত্রীর ইচ্ছা বুঝিয়া বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব করিবার সম্মতি দিলেন। ওখানে সেদিন মায়ের খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আহারাদি-সমাপনান্তে ফিরিবার জন্য রওনা হইয়া রাত্রি নয়টার সময় বাগবাজারে পৌঁছিলেন।

সে বৎসর জন্মাষ্টমী পড়িয়াছিল ২১শে ভাদ্র। ঐদিন মা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যাবির্ভাব-উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। যোগেন-মা, গোলাপমা, মায়ের কয়েক জন আত্মীয়া, এবং আরও কয়েক জন সাধু সঙ্গে ছিলেন। 'উদ্বোধন' হইতে বেলা সওয়া দুইটায় বাহির হইয়া একঘণ্টা পরে কাঁকুড়গাছি উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন ও প্রণামাদি সারিয়া মন্দিরসন্নিহিত বাগানটি পরিদর্শনান্তে মা ঠাকুরঘরের পিছনের বাড়ীটির

৩ ইনি মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের শিষ্য ছিলেন।

দোতলার ঘরটিতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। উৎসবোপলক্ষ্যে বহু ভক্ত এবং লোকজনের সমাবেশ হইয়াছিল। উপস্থিত অনেক পুরুষ ও স্ত্রীভক্তেরা মাকে দর্শন করিলেন।

সেদিন বেশ বৃষ্টি পড়ায় আশ্রমের ভিতরের রাস্তাটিতে যেমন কাদা তেমন পিছল হইয়াছিল। মায়ের ঐরূপ কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে হাঁটিতে অসুবিধা হইবে ভাবিয়া একজন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসি-সন্তান মাকে সাহায্য করিতে ধরিবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় মা শশব্যস্তে উত্তর করিলেন—না, না, না, এমনিই যেতে পারব, ধরবার কোন দরকার নেই; এখানে কত লোকজন—ভক্তেরা রয়েছে, দেখলে কি মনে করবে? মা ছিলেন সত্যই খুব লজ্জাশীলা; কোন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী সন্তানও হাত ধরিয়া সাহায্য করিবে, ইহাও তাঁহার মনোমত হইত না। এমনও দেখা যাইত—কোন ভক্ত বা আশ্রিত ব্যক্তি হয়ত তাঁহাকে দিবার উদ্দেশ্যে পুষ্পমালা লইয়া আসিয়াছেন, মা কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে মালাখানি গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে নিজের গলায় পরিলেন।

এই সময় নাট্যাচার্য শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার পরিচালিত নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য শ্রীশ্রীমাকে বার বার অনুরোধ করেন; মা অবশেষে থিয়েটার দেখিতে রাজী হইলেন। অপরাহ্নে ডাঃ কাঞ্জিলাল, ললিত-বাবু, কয়েক জন সন্ন্যাসী প্রভৃতির সহিত মা যখন মিনার্ভা রঙ্গালয়ে পৌছিলেন তখন ৬টা। সেদিন অভিনয় দেখিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। মাকে রয়াল বক্সএ বসানো হইয়াছিল। গিরীশবাবু অন্যান্য দিন অপেক্ষা সেদিন আরও পূর্বে অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলেন। অভিনীত নাটক দুইটি ছিল —'পাণ্ডবগৌরব' ও 'রঙ্গরাজ'।

পাণ্ডবগৌরব-নাটকে শেষদৃশ্যের মহামায়ার আবির্ভাবের সময় সমবেত ভাবে এই গানটি গীত হইতে লাগিল:

হের হরমনোমোহিনী কে বলে রে কালো মেয়ে,
মায়ের রূপে ভুবন আলো চোখ থাকে ত
দেখনা চেয়ে।
বিমল হাসি ক্ষরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী,
কমলভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে বিভোর ভোলা
চরণ পেয়ে॥

শ্রীশ্রীকালী-দর্শনে এবং এই সংগীতশ্রবণে মা ক্রমে গভীর সমাধিস্থা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মায়ের প্রীতির জন্য গিরীশবাবু স্বয়ং এই নাটকে কঞ্চুকীর ভূমিকা গ্রহণ করেন—তবে রঙ্গমঞ্চে নামা এই তাঁহার শেষ। অভিনয়-শেষে মায়ের বাড়ী ফিরিতে রাত্রি দেড়টা হইয়াছিল।

ওরে যাত্রী

শ্রীপিনাকিরঞ্জন কর্ম্মকার, কবিশ্রী

মৃত্যু-লহরী উঠিয়াছে ফুলি'
রে জীবন সাবধান,
কাণ্ডারী তোরে খুঁজে নিতে হ'বে
মুক্তির সন্ধান।
পড়ুক বজ্র, চলুক্ ঝঞ্ঝা,
পূর্ণ হউক্ মুক্তিপণ যা,
স্বার্থের গ্লানি এক সাথে সবে
তরঙ্গে কর দান।

কাণ্ডারী তোরে খুঁজে নিতে হ'বে
মুক্তির সন্ধান।
কণ্টক-ভরা দুস্তর পথে
হ'তে হবে আগুয়ান
মন্থন করি' কালসমুদ্র
মুক্তি অমৃত আন্।
বাজাও তূর্য্য, চলুক্ ঘূর্ণি
কান্তার-মরু-পাহাড় চূর্ণি,
কাণ্ডারী তোর মৃত্যুঞ্জয়ী
বাজারে বাজা বিষাণ॥

গাথার দুইটি (ঋক্ শ্লোক)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

পার্শীদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ আবেস্তা' নামে পরিচিত। তন্মধ্যে 'আবেস্তা' শব্দটীকে প্রধান (বিশেষ্য), এবং 'জেন্দ' শব্দটীকে গৌণ (বিশেষণ) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন জেন্দ শব্দের অর্থ 'ভাষ্য' (ব্যাখ্যা); কেহ কেহ বলেন, জেন্দ-শব্দের অর্থ 'জেন্দ নামক ভাষা'। অতএব 'জেন্দ আবেস্তা'র অর্থ দাঁড়ায় সভাষ্য আবেস্তা, অথবা জেন্দ ভাষায় লিখিত আবেস্তা। আবেস্তা শব্দের অর্থ উপাসনার গ্রন্থ। আবেস্তা শব্দটী জেন্দ অথবা পুরাতন পার্শী ভাষার শব্দ। পুরাতন পার্শীর সহিত বৈদিক সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ অতীব নিকট। লৌকিক সংস্কৃতের সহিত পালিভাষার যে সম্পর্ক, বৈদিক সংস্কৃতের সহিত পুরাতন পার্শী অথবা জেন্দেরও সেই সম্পর্ক। অর্থাৎ বৈদিক ভাষাকে জেন্দের 'সংস্কৃত' (reformed) রূপ, কিম্বা জেন্দকে বৈদিক ভাষার 'বিকৃত' (degraded) রূপ বলা যাইতে পারে। 'আবেস্তা' শব্দটীর বৈদিক রূপ, 'উপস্থা'। [উপ—স্থা+ক্বিপ্ = উপস্থা]। উপস্থা-শব্দের অর্থ উপাসনা। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, 'উপান্মন্ত্রকরণে' (১-৩-২৫) অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণ অর্থে উপ পূর্বক স্থা ধাতু আত্মনেপদী হয়। ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম 'উপস্থা'র অর্থ মন্ত্রোচ্চারণ। ব্রাহ্মণ বালক আহ্নিক সন্ধ্যায় মন্ত্র পড়ে, "সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ", অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসনায় এই মন্ত্র (উপ্ উ ত্যম্ জাতবেদসং) পড়িতে হয়। 'উপস্থান' অথবা 'উপস্থা'র অর্থ উপাসনা। 'আবেস্তা' শব্দটী শুনিতে অদ্ভুত শুনায়, কিন্তু 'উপস্থা' আমাদের শাস্ত্রের নিজের ভাষা। সেইরূপ পার্শীদিগকে দেখিতে পর দেখায়, কিন্তু তাহারা আমাদের নিতান্ত আপনার জন।

আমাদের বেদ যেমন চারি ভাগে বিভক্ত, ঋক্, যজুস্, সাম এবং অথর্ব, আবেস্তা অথবা উপস্থাও তেমন চারিখণ্ডে বিভক্ত, যস্ন (যজ্ঞ), যস্ত (ইষ্ট), বিস্পেরেদ (বিশ্বরত্ন) এবং বেন্দিদাদ্ (বিদৈবদাত)। যস্নে মন্ত্রের, যস্তে উপাখ্যানের বিস্পেরেদে স্তোত্রের এবং বেন্দিদাদে বিধি-নিষেধের প্রাধান্য। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই যেমন প্রাচীন এবং প্রধান, উপস্থার মধ্যে যস্নই তেমন প্রাচীন এবং প্রধান।

যস্নগ্রন্থে বাহাত্তরটি অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে সতেরটী অধ্যায় (২৮—৩৪)=৭+(৪৩—৫১)=৯+(৫১)=১=১৭ গাথা নামে অভিহিত হয়। গাথা যস্নের পবিত্রতম অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। গাথা ভগবান জরথুস্ত্রের শ্রীমুখ-বাণী বলিয়া বিখ্যাত।

ভগবান জরথুস্ত্র জগতের অন্যতম আদিম ধর্মগুরু। রচনাকাল-বিচারে যস্ন এবং ঋগ্বেদের অন্তিম মণ্ডলগুলি সমসাময়িক, পণ্ডিতগণ এরূপ বলিয়া থাকেন। যস্নে "অহুর" অর্থাৎ "অসুর"-পূজার বিধান বলবৎ। ঋগ্বেদের সময়েও অসুর-পূজা ভারতে পরিত্যক্ত হয় নাই। তাই মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন "নমোভির্ দেবং অসুরং দুবস্য" (ঋগ্বেদ, ৫-৪২-১১)—যিনি দেবও বটেন, অসুরও বটেন, নমস্কার দ্বারা সেই রুদ্রের পূজা কর।

ভগবান জরথুস্ত্র ভক্তিযোগের প্রচারক,

অর্থাৎ তিনি জ্ঞানযোগের লক্ষ্য নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা না করিয়া সগুণ অথবা শক্তিমান ব্রহ্মের আরাধনা করিয়াছেন। শক্তিমান ব্রহ্মের নাম দিয়াছেন তিনি "মঝ্‌দা" অর্থাৎ সর্ব-বিধাতা। "মঝ্‌দা" শব্দটী 'মস্' উপসর্গের সহিত 'ধা'-ধাতুর যোগে গঠিত হইয়াছে। মস্ শব্দের অর্থ 'সম্পূর্ণরূপে', অথবা 'সকল'। ধা ধাতুর অর্থ বিধান করা, নিষ্পন্ন করা। মঝ্‌দা অর্থ সর্বময় কর্তা। কেহ কেহ "ধা" ধাতু হইতে গঠিত হইয়াছে মনে না করিয়া মঝ্‌দা শব্দটী 'ধ্যৈ' ধাতু হইতে গঠিত হইয়াছে এমন মনে করেন। ধ্যৈ ধাতুর অর্থ ধ্যান করা বা জানা। তাহা হইলে মঝ্‌দা শব্দের অর্থ হয় সর্বজ্ঞ।

ভগবান জরথুস্ত্র পরমেশ্বরকে সগুণ বলিয়াছেন, কিন্তু সাকার বলেন নাই। তিনি মূর্তিপূজার প্রবল বিরোধী ছিলেন। ভগবান জরথুস্ত্রই এই জগতে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন।

ইসলাম তন্ত্রই মূর্তিপূজাব উৎকট প্রতিষেধক। কিন্তু ইসলাম এবং খ্রীষ্টান পন্থা ইহারা উভয়েই ইহুদি ধর্ম হইতে নিরাকারোপাসনায় দীক্ষা লাভ করে। অতএব ইহুদিপন্থাকেই নিরাকারোপাসনার আবিষ্কর্তা বলিয়া অনেকে প্রচার করেন। পরন্তু ইতিহাস এই দাবী সমর্থন করে না।

ইহুদিগণ পূর্বে মূর্তিপূজক ছিল। বাআল, আষ্টরথ প্রভৃতি দেববিগ্রহ-সকল ইহুদি-মন্দিরে পূজিত হইত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সম্রাট নেবুকাদনাজের রাজত্বকালে, তাঁহার রাজধানী বেবিলনে ইহুদি পুরোহিতগণ পার্শীদিগের সংস্পর্শে আসে, এবং পার্শীদিগের অনুকরণে নবী এজেকিয়েলের নেতৃত্বে মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করে।* ভগবান জরথুস্ত্রই নিরাকারোপসনার প্রথম প্রচারক ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, ভগবান জরথুস্ত্রকে ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য্য সমাজ প্রভৃতি নিরাকারোপাসক সম্প্রদায়গুলির আদিম গুরু বলা যাইতে পারে।

আমরা গাথা হইতে দুইটী শ্লোক নিম্নে আহরণ করিয়া দিলাম। বৈদিক ঋকের সহিত গাথার ভাষাগত সাদৃশ্য কত প্রবল, ইহা হইতে তাহা অঞ্জসা প্রতীত হইবে।

(১) কদা মঝ্‌দা মাং নরোইশ্ নরো বীশেন্তে
কদা অজেন্ মূথ্রেম্ অহ্যা মগহ্যা।
যা অংগ্রয়া করপনো উরুপয়েইন্তী
যা দ্বা থ্রতু দুশে-থ্‌ষথ্রা দস্যুনাম্॥
(যস্ন - সূক্ত—৪৮—ঋক্—১০)

অন্বয়:—হে মঝ্‌দা, কদা নরোইস্ নরঃ মাং বিশতে (হে মঝ্‌দা, কবে নরের নর আমাতে প্রবেশ করিবে)? কদা মূর্তম্ অস্য মঘস্য অহন্ (কবে মূর্ত্তিকে এই মঘ হইতে অপসারিত করিতে পারিব)? যাং কল্পাঃ অং গ্রাঃ আরোপয়ন্তি (কল্পসূত্র-পরায়ণ আঙ্গিরসগণ যাহা আরোপিত করে)। যা চ দুষ-ক্ষথাণান্ দস্যুনাম্ থ্রতু (যাহা দুর্দান্ত দস্যুদিগের [যোগ্য] ক্রিয়া বটে)।

টীকা:—নরোইস্ নরঃ=নরের নর, নরোত্তম নারায়ণ। মঘস্য = মঘাত। পঞ্চমীস্থলে ষষ্ঠী। অজেন্ = অহন্ = হনানি।

অনুবাদ:—হে মঝ্‌দা নরের নর (নারায়ণ) কবে আমার অন্তরে আবির্ভূত হইবেন? কবে আমি এই সংঘ হইতে মূর্তিপূজা দূর করিতে পারিব? যে মূর্তিপূজা কল্পসূত্রাশ্রিত আঙ্গিরসগণ উদ্ভাবন করিয়াছে, আর যাহা (কেবল) দুর্দান্ত অনার্য্যদিগের (যোগ্য) কাজ বটে।

তাৎপর্য্য:—ভগবান জরথুস্ত্র বলিলেন যে, আঙ্গিরসের (বৃহস্পতির) শিষ্যগণ কল্পসূত্রে

* Macdonell, Comparative Religion, p. 128

অবলম্বন করিয়া মূর্তিপূজার উদ্ভাবন করিয়াছে। ইহা অসভ্য দস্যুদিগের যোগ্য কাজ—সুসভ্য আর্য্যদিগের পক্ষে মূর্তিপূজা শোভা পায় না। পুরুষোত্তম যাহাতে অন্তরে আবির্ভূত হন মঘবদ্দিগের (পার্শীদিগের) পক্ষে তাহাই করণীয়।

মন্তব্য :—মূর্তিপূজা উপলক্ষ্যেই মূল আর্যগণ হিন্দু ও পার্শী এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিন্দুগণ মূর্তিপূজার অনুরাগী ছিলেন। অথর্ব বেদের অঙ্গিরস শাখা তাঁহাদের গুরুগ্রন্থ। পার্শীগণ নিরাকারোপাসনা পছন্দ করিতেন। অথর্ব বেদের ভার্গব শাখা তাঁহাদের গুরুগ্রন্থ। অঙ্গিরস এবং ভার্গব এই দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া অথর্ব বেদের অপর নাম ভৃগ্ব্-অঙ্গিরসী সংহিতা (গোপথ ব্রাহ্মণ)—১-৩-৪)

মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান জরথুস্ত্রের প্রতি আমরা যেন বিদ্বিষ্ট না হই। ঋগ্বেদও বলিয়াছেন :—

অপাদ্ অশীর্ষা গূহমানো অন্ত।
আযোযুবানঃ বৃষভস্য নীড়ে॥

(ঋগ্বেদ, ৪-১-১১)

তাঁহার পা নাই, মাথা নাই। নিজের অবয়বগুলি গোপন করিয়া তিনি শক্তির কেন্দ্রে বসিয়া আছেন।

(২) মঝ্দাও সথাবে মইরিস্তো
যা জী বাবেরেজোই পইরিচিথীত্।
দত্রবাইস্ চা মষ্যাইশ্ চা
যা চা বরেষইতে আইপিচিথীত্।
হেবো বীচিরো অহুরো
অথা নে অংহত্ যথা হেবো বসত্॥

(যস্ন—সূক্ত-২৮, ঋক্ ৫)

অন্বয় :—মঝ্দাঃ সকৃত্বঃ সনরিষ্ঠঃ (মঝ্দাই একমাত্র স্মরণীয়)। দেবৈঃ মনুষ্যৈঃ চ পরি-চি-থাত্ যা হি বাবৃজ্যতে (দেব এবং মনুষ্যগণ কর্তৃক ইতঃপূর্বে যাহা কৃত হইয়াছে)। যা চ অপি-চি থাত্ বৃষ্যতে (এবং অতঃপর যাহা কৃত হইবে)। স্বঃ অহুরঃ [তেষাং] বিচিরঃ (সেই অহুর [মঝ্দা] তাহাদের বিচারক)। অথা নঃ অংহত্ (আমাদের তেমন হউক) যথা স্বঃ বশত্ (যেমন তিনি চান)।

টীকা—বৃজ্—করণে। বৃজ্+যঙ্+লট্ তে বাবৃজ্যতে।

অনুবাদ :—মঝ্দাই একমাত্র পূজনীয়। দেব এবং মনুষ্যগণ পূর্বে যাহা করিয়াছে, কিম্বা পরে যাহা করিবে, তিনি তাহার বিচারক। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, আমাদের তাহাই হউক।

তাৎপর্য :—যে জন যেমন কার্য করে, সে তেমন ফল পায়। ইহা মঝ্দারই বিধান। মহেশ্বর মঝ্দা এই ন্যায্য বিধানের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা অপেক্ষা সঙ্গত বিধান আর কী হইতে পারে? তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া বুঝিতে পারিয়া মঝ্দাতে আত্মসমর্পণ করাই জীবনের পূর্ণ সার্থকতা।

মন্তব্য :—মুসলমানগণ বলেন একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা হজরত মহম্মদের প্রধান কীর্তি। মুসলমানদিগের যাহা গায়ত্রী (কলিমা = মূলমন্ত্র), তাহা বলে "লা ইলাহি ইল আল্লা"। লা (নাই) ইলাহি (পূজা) ইল (বিনা) আল্লা (আল্লা)—আল্লা ব্যতীত আর কেহ পূজার পাত্র নহে। ভগবান জরথুস্ত্রই প্রথম বলিয়া গিয়াছেন "মঝ্দাত্ সথারে মাইরিস্তো"—মঝ্দা কেবল পূজ্যতম। ভগবান জরথুস্ত্রের এই বাণী বিকশিত করিয়াই শ্বেতাশ্বতর মুনি বলিয়াছেন "একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩-২)—রুদ্র একজনই, দ্বিতীয় আর একজন রুদ্র নাই। ইহারই নাম একেশ্বরবাদ।

[জরত্+উষ্ট্র=জরথুস্ত্র (জেন ভাষার সন্ধি সূত্র-অনুযায়ী)। যাহার উষ্ট্রটী হিরণ্যবর্ণ ছিল। শ্বেত+অশ্বতর=শ্বেতাশ্বতর। যাহার অশ্বতরটী শ্বেত বর্ণ ছিল। তদানীন্তন মহামুনিগণ বাহনপ্রিয় ছিলেন।]

পূর্বেই বলিয়াছি ভগবান জরথুস্ত্র ভক্তিযোগের অবতার। ভক্তির সার হইল প্রপত্তি কিম্বা আত্মসমর্পণ। যীশুখ্রীষ্টের ভাষায় Thy will be done.

তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।

(রবীন্দ্রনাথ)

জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমরা যেন ভগবান জরথুস্ত্রের বাণী স্মরণ করি—

অথা নে অংহত্ যথা হেবো বসত্।
[অথা নঃ অসত্ যথা স্বঃ বশত্
তেমন আমাদের হউক যেমন তিনি চান]

অনুধ্যান

(এক)

লোকধর্ম্মস্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীগোপীনাথ সেন

অন্ধতমসাচ্ছন্ন মানুষ নিজেদের আহার-বিহার ব্যতীত কিছুই জানে না। তাহারা ক্ষণিক সুখভোগের জন্য যে কোন হীনকর্ম্ম করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট ধর্ম্মকর্ম্ম কেবল ধন-যশ-পুত্রের জন্য প্রার্থনা। বিষয়ী মানবমন কচুরি পানার বন, যতই পরিষ্কার করা যাক না কেন, পুনরায় বিষয়চিন্তায় ভরিয়া উঠে। ইহার শিকড় এরূপ দৃঢ় যে উহাকে উৎপাটন করা শক্ত, যতক্ষণ না কোন যথার্থ প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। বিষয়-মোহাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের জন্য এইরূপ এক ঔষধ লইয়া আসিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উহা অবলম্বনে প্রথমতঃ মানুষ ভক্তিমার্গে আস্থিত থাকিয়া ক্রমশঃ সংসার-ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। পরিবর্ত্তনশীল সংসারে প্রতিনিয়ত যাঁহারা নৈরাশ্যের আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইতেছেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের লোক-ধর্ম্মসম্বন্ধে পথনির্দ্দেশ অতি অপূর্ব্ব।

ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে যে বাণী আছে, তাহার যথাযথ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সহজসাধ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সাধারণ মানুষের কল্যাণে অর্পিত হইয়াছে। ইহাই আধুনিক কালের সহজ অধ্যাত্ম-শাস্ত্র। তিনি দিনের পর দিন যাহা শিষ্যদের উপদেশ দিতেন তাহা পাঠ করিলে জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরদর্শনের উপায়-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাকে দেখা যায়।' 'ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন।···বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে, কখনও হেঁসালে, কখনও মাটীর উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।' সেইরূপ ভক্তের আকুল আহ্বানে ত্রিভুবন-স্বামী না সাড়া দিয়া থাকিতে পারেন না।

কবীর বলিয়াছেন—'শাস্ত্র পড়িয়া লোকে ইঁট পাথর হইয়া যায়।' তাহাদের অবস্থা একচক্ষু হরিণের মত। তীরবেগে একদিকেই দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়াইতে থাকে। মনে করে তাহারা আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে উপস্থিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের হেয় জ্ঞান করে। তাহারা সহজ মানব-ধর্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন না। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু শাস্ত্রকে কঠিন পদার্থ না করিয়া সহজ উপায়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার শিক্ষা জনগণের প্রাণে সাড়া জাগায়। যে ব্যক্তি লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ

করিবেন তাঁহার কর্ত্তব্য নিজেকে জনগণের মধ্যে মিশাইয়া দেওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি লোকশিক্ষা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'লোকশিক্ষা যে দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না আবার অন্যলোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে!' প্রত্যেক জন-শিক্ষকের কর্ত্তব্য যাহা উপদেশ দিবেন তাহা নিজ জীবনে আচরণ করিবেন। তাহা না হইলে অন্ধের হাতী দেখার মত হইবে।

গৃহস্থদের সংসারধর্ম্মপালন যেরূপ কর্ত্তব্য, তেমন সন্ন্যাসিগণের সেইরূপ জীবের মঙ্গল ও সেবা করা কর্ত্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়কেই তাঁহাদের স্বধর্ম্ম-সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতেন। সংসারীদের গল্পচ্ছলে বলিতেন, "জনকরাজা নির্জ্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক একবার নির্জ্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিন দিনও কাঁদা যায় সেও ভাল।'

ভক্তি-সম্বন্ধে তিনি বলিতেন 'ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়।' ইহার অর্থ গভীর; কারণ সরল না হইলে সহজে বিশ্বাস করা যায় না, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন অনেক তফাৎ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মের তত্ত্ব নিজে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন—আর তাহাই সরল ভাবে সকলের উপযোগী করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তাই তিনি লোকধর্ম্মস্রষ্টা।

(দুই)

প্রেমমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

দরদী দার্শনিক মিষ্টার একহার্ট আপন মনের দরদ ও মাধুরী মিশিয়ে বলেছেন,—"ভগবান মানুষ হন, মানুষকে ভগবানে রূপায়িত করবার আকুল পিপাসা নিয়ে।" জীবের স্বাভাবিকী ব্রাহ্মীস্থিতি সে যখন বিস্মৃত হয়, তখনই ভগবানের আরেক-বার নতুন করে অবতরণ ঘটে মানুষের ছোট্ট বামন কলেবরের মাঝে জীবের প্রাণের তারে জীবন-সাধনার সুর চড়া পর্দায় বেঁধে দেবার জন্য।

মানুষ ভগবান হয় প্রেমের দ্বারা যেহেতু ভগবান "ভক্তিসূত্রের" অনুযায়ী "সা পরমপ্রেমরূপা" এবং "God is love personified". যেখানে হৃদয়ের সম্প্রসারণ নেই, চোখের আলোয় স্বচ্ছতা নেই, চিন্তা দৈন্যে ভরা, সেখানে কি প্রেমপ্রসূন ম্লান হয়ে ঢলে পড়ে যায় না মাটির বুকে, স্বার্থসংঘাতে নিঠুর পীড়নে প্রপীড়িত হয়ে? এই প্রেমপ্রস্রবিণী বাংলার এই প্রেমঝরা মাটিতেও উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্টি, ধর্ম ও আচারগত সৌভ্রাত্রের অভাব প্রাদুর্ভূত হয়েছিল দিকে দিকে; হানাহানি ডাক দিয়েছিল মানুষের পশুকে। প্রেমলতিকা সৌহার্দ-সিঞ্চনের অভাবে যেন স্বীয় তনু-কারায় অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। আর বঙ্গ-জনমনও সংকীর্ণতার অন্ধদোলায় দোলায়িত না হয়ে সর্বজনীনতার

প্রজ্ঞাঘন আলোয় গিয়ে মুক্তি-নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবার জন্য হয়ে উঠেছিল উন্মুখ, একান্ত উদ্‌গ্রীব।

এই যখন সময় তখন করুণাঘনতনু—"ভাস্বর ভাব সাগর চির উন্মদ প্রেমপাথার" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমময় সত্যের উদ্ভিন্ন আলোকে বাংলার দিক্‌চক্রবাল অনুরঞ্জিত করে এলেন বাংলার কোলে—ঠিক অন্যান্য বারের মত যুগ-প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে। স্বীয় সাধনদীপ্ত উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়ে বল্লেন, ভগবান লাভই চরম পুরুষার্থ, আর প্রেম বা ভালবাসার দ্বারাই ভগবান লাভ করা যায়। তিন টান এক হলে ভগবান দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের ছেলের উপর, আর সতীর পতির উপর টান। অথবা "রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো শ্রীকৃষ্ণের উপর যেরূপ টান বা অনুরাগ ছিল গোপীদের সেই টানটুকু নাও।" এইরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ্‌তে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-পুরুষই—প্রেমের ধারক, বাহক ও সংস্থাপক হিসেবে।

আচট্‌কা দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সীমায়িত জীবনের মাঝে যে অব্যয় "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষে"র রূপ রং ও রেখাটি ফুটে ওঠে তাতে মনে হয় তিনিই তো পরাৎপর, সারাৎসার "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। তবে কেন তাঁর এ কৃচ্ছ্র তপশ্চর্যা? "লোক-বত্তু লীলাকৈবল্যম্‌"—ধরণীর ধূলিপথে যে কেহই আসুন না কেন সকলকারই জীবসাধারণের মত বাস করতে হয়। অথবা এই ঘটনার প্রচ্ছদপটে আরেকটি ইংগিতের ছাদিত রূপধারারও হদিস্‌ মিলে, যেটি হচ্ছে যিনি যতই মহান হন না কেন প্রত্যেকের পক্ষেই সাধনদুয়ার দিয়ে "তমসঃ পরস্তাৎ" অবগম্য "নান্যঃ পন্থাঃ"। এই অমর তত্ত্ব ও তথ্যটিই জীব-মানসপটে মুদ্রিত করেছেন তিনি নিজ জীবনের সাধন-তুলিকা দিয়ে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "The story of Ramakrishna Paramahamsa's life is a story of religion in practice." আর স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, "Religion is realisation, not talk nor doctrine, nor theories however beautiful they may be. It is being and becoming not hearing or acknowledging ; but it is the whole human soul becoming changed into what it believes."

এ সব ছেড়ে দিয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটি মীরার ভাষায় বলা যায়, 'সাধন করনা চাহিয়ে মনুয়া ভজন করনা চাহিয়ে।"

মানবের সহজ ভাব প্রেমের স্বরূপধর্ম কি এবং কিরূপে তার সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিপূর্ণ সার্থকতা ঘট্‌তে পারে, তা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনতরুর পাতায়, তার শিরায় উপশিরায়। তাঁর মতে প্রেম আজকের দুনিয়ার দার্শনিক মতানুবর্তী "Happiness of misunderstanding" নহে ; পরন্তু মানবীয় খণ্ড-প্রেম, অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন প্রেমের প্রতিভাগ বা ছায়া; কিন্তু এই ছায়াকেই কায়ারূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যদি আমাদের নিষ্পন্দ গতিহারা পথ-হারা প্রেমকে যো সো করে সর্বমালিন্য-বিরহিত প্রেমের খনি ঈশ্বরের অভিমুখী করে দেখা যায় যুগযুগান্তের মরমিয়াদেরই মত। তাঁর মতে আমিত্বের বেড়াজাল ধূলিসাৎ না করা পর্যন্ত প্রেমের পূজারী "কষিত কাঞ্চন" প্রেমফুলহারের বদলে দুঃখ-হাহাকারের তীব্র কশাঘাতই লা[ভ] করে থাকেন।

বিপুল অজানার নাম-না-জানা আহ্বান সা[ড়া] দিয়েছে মানবের চেতনায়। এই রূপ-রস-গ[ন্ধ] বৈচিত্র্যে ভরা বিশ্বের নানা কিছু দোল দিয়ে মানবের আন্তর মানসটিকে। জ্যোছ্‌নামত্তা শা[ন্ত] রাতে তটিনী-তীরে পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রিকাধারা প[ান] করতে করতে মানব্‌ চিন্তা করে ফেলে [ও]

অজ্ঞান্তে, কোথায় এর আদিম সত্যিকার উৎস আবার নিথর তমসার জমাট বিভীষিকা এসে হানা দেয় মানব মনে ; মানব-মন তথনও জিজ্ঞাসা করে—কারণ। ভোরের গগনে উষার রক্তলেখা যখন লিখে দিয়ে যায় নিতুই নতুন-রূপে নবীনের জয়গান তথনও মানব অপার বিস্ময়ে বলে ওঠে,—কেন। প্রশ্নের অন্ত নেই অথবা বলা যায় "অন্ত নাই গো অন্ত নাই, বারে বারে নূতন প্রশ্ন তাই", চিন্তাসায়রে থেই হারিয়ে ফেলে মানুষ ছোটে দরদী বন্ধু রহস্যমর্মবিদ্‌দের কাছে। আর যুগের ইতিহাসও বল্‌ছে শ্রীরামকৃষ্ণও মরমী—দরদী ; তাই তিনিও অজানিত্তের সন্ধানে ছুটে চলা মানব-যাত্রিদলকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছেন আর আবেগভরে অশ্রু বিসর্জন করে বলেছেন,—ওরে আয় কে কোথায় আছিস! আমি তোদের প্রশ্নের মীমাংসা করে দেব। করেছেনও তিনি সত্যই।

শুধু একবার অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে ভগবানকে ডাক্‌লেই তিনি সাড়া দিবেন। তখনই সাধকের অরুণোদয় হবে। তবে ব্যাকুলতার মধ্যে খাদ বা ভেজাল থাক্‌লে আর চলিষ্ণু জগতে 'অচলম্ অব্যয়ম্'-কে পাওয়া যায় না, কারণ "সে যে কড়ার কড়া তস্য কড়া কড়ায় গণ্ডায় বুঝে লবে।"

(তিন)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঈশ্বরলাভের উপায়

শ্রীরঞ্জিতকুমার আচার্য

ঈশ্বরলাভের সহজতম উপায় নির্দেশ-প্রসংগে ঠাকুর ভক্তি, বিশ্বাস আর ব্যাকুলতার স্থান দিয়েছেন সবার উপরে। তিনি বল্‌তেন, "ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসংগ, ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়কাজের ভিতর দিনরাত থাক্‌লে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন। যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেল্‌বে। * * * ধ্যান করবে মনে কোণে, বনে আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ কিনা অনিত্য, এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে। আর এই পথের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় হচ্ছে অটুট বিশ্বাস আর তাঁর রাতুল চরণে অচলা ও অহৈতুকী ভক্তি। ঠাকুর বল্‌তেন, "বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর বড় জিনিষ নেই। বিশ্বাসের কত জোর তা' তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লংকায় যেতে সেতু বাঁধ্‌তে হল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্র-পারে গিয়ে পড়ল। যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের জোরে ভারী ভারী পাপ হতে উদ্ধার পেতে পারে।" এইরূপে বিশ্বাস যদি মানবের মনের মর্মস্থলে স্থান লাভ করতে পারে তবে সংগে সংগে দেখা

দিবে শুদ্ধা ভক্তি, তাঁর পরম পুণ্যময় নামে অকৃত্রিম অনুরাগ আর আকর্ষণ। ক্রমে সেই মন্দাকিনীর ন্যায়—পূত পীযূষধারার ন্যায় অচলা ভক্তি রূপান্তরিত হবে ব্যাকুলতায়। ঠাকুরের অমর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, "ব্যাকুলতা হলে অরুণ উদয় হল, তার পর সূর্য দেখা দিবে। * * * ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে; মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা এই তিনজনের টান্ একত্র করলে যতখানি হয় ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়। ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। বিড়ালের ছাঁ কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে। কখনও হেঁশালে, কখন মাটীর উপর কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।" তবে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে সংসারী জীব কি তাঁর ধ্যান-ধারণা করতে পারে? তাঁর দর্শন পেতে পারে কিংবা তাঁর অশেষ আশিস লাভে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারে? ঠাকুরের বাণী হতে আমরা তার সহজ ও সরল উত্তর লাভ করতে পারি, যাতে সংসারী জীবের অন্তরেও নব আশা, অনুপ্রেরণা বা উদ্যম জেগে উঠবে। "সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখ্‌তে হবে। স্ত্রী-পুত্র, মা-বাপ সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জান্‌বে যে তাঁরা তোমার কেউ নয়। * * * ঈশ্বর লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরো জড়িয়ে পড়বে। বিপদ-শোক-তাপ এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাংগ্‌তে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরের ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়। * * * তোমরা সংসার করছ এতে দোষ নাই, তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে, তা না হলে হবে না, এক হাতে কর্ম করো আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো, কর্ম শেষ হলে দু'হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।" তবে এখন কথা হচ্ছে কর্ম কিরূপভাবে করা উচিত। সংসার-কর্ম, বিষয়কর্ম করতে করতে মানুষ হয়ত ভুলে যেতে পারে তাঁর পরম মধুময়, শান্তিপ্রদায়ক অমৃতময় নাম। বেশী কর্ম জুটলে সংসারের মোহাচ্ছন্ন জীব সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে তাঁর সত্য, শাশ্বত, সনাতন অস্তিত্বে। তবে তা'র ত্রুটিবিহীন উপায় হচ্ছে নিষ্কামভাবে কর্ম করে যাওয়া—'মা ফলেষু কদাচন'।

"ঈশ্বর কর্তা, তিনি সব কিছু, আমি তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ, তিনি সব করছেন, আমি কিছু করছি না—এই বোধ অন্তরের মধ্যে জাগাতে হবে, কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারে কয় জন? 'অহংকার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'—অহংকারে অন্ধ হয়ে মানুষ নিজেকে কর্মকর্তা বলে মনে করে। অন্তরে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ গ্রহণ ক'রে সংসার-সমরাংগনে অবতরণ করলেও মানব-মনের অগোচরে অনেক সময় সকাম হয়ে পড়ে, হয়তো দান-দক্ষিণা, সদাব্রত ইত্যাদি করতে গিয়ে লোকমান্য, দেশপূজ্য হবার উদ্ভট প্রয়াস মনের গহনে জেগে উঠে। ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত স্বচ্ছ হৃদয়াকাশ ছেয়ে ফেলে এই

দুর্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষায়। তবে কি তার কোন উপায় নেই? সংসারে বদ্ধ জীব কি তবে ভববন্ধন হতে মুক্ত হতে পারবে না? অজ্ঞান-অন্ধকারে কি আশার অরুণোদয় হবে না? নিরঞ্জন জ্যোতির্ময়ের পরশ কি লাভ করতে পারবে না? না, সত্যিই তা' নয়। 'নিরাশ-হৃদি-পূর্ণেন্দু' শ্রীশ্রীঠাকুর দিয়েছেন তার পথনির্দেশ তাঁর সুললিত সুরধারার মধ্য দিয়ে। "কর্মযোগ বড় কঠিন, শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে তা' করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশী কর্ম চলে না • • • কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তি-যোগই যুগধর্ম। ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তাঁকে অবশ্য পাবে।" এই হচ্ছে ঠাকুরের বাণী সংসার-সাগরে বিভ্রান্ত, পথহারা, মানবের প্রতি। কাজেই 'ডাকো তাঁরে ডাকো' হৃদয় খুলে আন্তরিকতা মিশিয়ে; যেন আমার ডাকে তাঁর সিংহাসন কেঁপে উঠে, তাঁকে অস্থির করে তোলে। জোর করে নিয়ে এসো মনের মণিকোঠায়, জ্বলন্ত বিশ্বাসের রজ্জুতে বেঁধে, যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো' এইরূপ ডাকাতপড়া ভাব। আজ তাই কবি রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলিয়ে গাই—

"তুমি যদি দেখা না দাও
কর আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদলবেলা।"

বাজিয়ে বেণু নাচছে রাখাল

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বাজিয়ে বেণু নাচছে রাখাল—ভবের রাখাল রে,
নাচের তালের ঝঙ্কারে তার নাচায় সকল্‌রে।
নীল আকাশের অসীম নীলায়
কেমন মধুর সে রূপ ঝলায়,
ভুবনমোহন শ্যামলরূপে রূপের নাকাল রে,
বাজিয়ে বেণু নাচছে রাখাল—ভবের রাখাল রে,

নাচছে রাখাল গাছের ছায়ে—গাছের পাতায় রে,
এই জীবনের গহন কোণে—নয়ন-তারায় রে।
ফিরছে নেচে কথায় কথায়,
সবার সুখে, সবার ব্যথায়,
স্বপ্ন ঘুমে যায় সে চুমে—হৃদয় মাতায় রে,
নাচছে রাখাল গাছের ছায়ে—গাছের পাতায় রে।

নাচের আসর বিরাট হ'লেও বিরাট কে কয় রে,
বিশ্বজোড়া হস্ত যে তার—বিরাট সে নয় রে।
শক্তি তাহার বিশ্বজোড়া
জীবন-ভুবন আকুল করা,
জীবন চেয়েও মহৎ অভয় স্মরণ সে হয় রে,
নাচের আসর বিরাট হ'লেও বিরাট কে কয় রে।

তাহার মোহন নাচের তালে জীবন-মরণ রে,
কেমন ক'রে ভুলব সে মোর হৃদয়হরণ রে?
জগৎ-জীবন অন্তরালে
থাক্‌ সে আকুল নাচের তালে,
ভুলতে নারি সেই সুমধুর জগৎ-স্মরণরে,
তাহার মোহন নাচের তালে জীবন-মরণ রে।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

শ্রীরসরাজ চৌধুরী

[গত মাসের উদ্বোধনে শ্রীদ্বারকানাথ দের 'দৈব ও পুরুষকার' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত একই বিষয়ের বর্তমান আলোচনাটি পাঠক-পাঠিকাগণের মনন উদ্রিক্ত করিবে, সন্দেহ নাই। —উঃ সঃ]

পুনর্জন্মবাদে অবিশ্বাসী পাশ্চাত্ত্য এবং তাদেরই মুখে ঝাল খেতে অভ্যস্ত এদেশে অনেকেই বেশ একটা মুরব্বিয়ানা সুরে বলে থাকেন যে, আমরা হিন্দুরা হচ্ছি ঘোর অদৃষ্টবাদী—fatalist ; দৈবের উপর নির্ভরশীলতা আমাদের মজ্জাগত, দৈবকেই জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান নির্ণায়ক মনে করে আমরা পুরুষকারের অপমান করি।

কয়েক শত বৎসর পূর্বে যখন ইউরোপে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও শিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস শিথিল হয়ে এল এবং উপনিবেশস্থাপন, বাণিজ্য-বিস্তার ও অন্য জাতির শাসন ও শোষণ দ্বারা সকলেরই অর্থোপার্জন অতি সুগম হয়ে উঠ্‌ল তখনই তারা স্থির করে ফেল্‌ল যে অদৃষ্ট একটা বাজে কথা, পুরুষকারের আশ্রয় নিলে অসাধ্য সাধন করা যায়। এই ভাবটা এদেশে অনেকে কথাবার্তায় প্রকাশ করেন।

কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে জন্মান্তরবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার কর্মসূত্র অর্থাৎ কর্মের সহিত ফলের অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ জন্মান্তরবাদের প্রধান অঙ্গ। এই ফল-ভোগকেই অদৃষ্ট বলা হয়। অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করে নিজের ক্ষমতা-প্রয়োগের নাম পুরুষকার। এখন প্রশ্ন এই, অদৃষ্ট বড়, না পুরুষকার বড়, অর্থাৎ পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধ খণ্ডন করা যায় কিনা। এই প্রশ্ন নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীর (agnostic) জন্য নয়, যারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাদের জন্যই।

উত্তর এই যে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র ছাড়া প্রারব্ধ অমোঘ, অখণ্ডনীয়; পুরুষকার তার কাছে দুর্বল, পঙ্গু। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্বপূর্ব জন্মের সংস্কার ও কর্মানুযায়ী এই জীবনের প্রতিচিত্র (blue print) তৈরী হয়ে যায়; এবং একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া এই প্রতিচিত্রের মুখ্য নক্সার কোন প্রকারই পরিবর্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে পুরুষকারের ক্ষমতার যে আশ্বাসবাণী আছে, তা একমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে পুরুষকারের প্রাধান্য দেখাতে গিয়ে কালকের বদহজম আজকে উপবাসদ্বারা ক্ষয় করান, অমাত্যগণের হস্তি-প্রেরণদ্বারা ভিক্ষুকপুত্রকে রাজাসনে বসান, ঔষধপ্রয়োগে রোগের উপশম, অঙ্গ-পরিচালনা ও স্থানান্তরে গমন, লেখনীচালন দ্বারা লিপিকার্য সম্পাদন প্রভৃতি যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তদ্দ্বারা চেষ্টায় উৎসাহ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভাগ্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে নিছক্ ঐহিক ব্যাপারে অভীষ্ট-কামনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

প্রারব্ধকে এড়িয়ে চলার শক্তি মানুষের নেই যদি না সে ভগবানকে আবেদন জানায়। তূণীর থেকে যে বাণ ছাড়া হয়ে গেছে তিনি ব্যতীত কেউ উহাকে রুখতে পারে না। যার ভাগ্যে সুখ, উন্নতি বা অর্থাগম নেই, সে প্রাণান্ত চেষ্টা করলেও তা পাবে না। আর এগুলো যার প্রাপ্য, বিনা আয়াসে তার করতলগত হবেই। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, যখন ভাগ্যে দেয় তখন সে রকম বুদ্ধিও যোগায়। পুরুষকার দ্বারা ঐহিক সুখ আনা যায় না বা ঐহিক দুঃখের নিরাকরণ হয় না। হয় না বলেই, মানুষ নানা দৈবদুর্বিপাকে জর্জরিত হয়ে ক্ষোভের সহিত কবি শেলীর ভাষায় আক্ষেপ করে – হায়, আমার বেলাই অন্য ব্যবস্থা – "To me that cup (of happiness) has been dealt in another measure." শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান অনিবার্য দৈব-বিড়ম্বনারই দৃষ্টান্ত।

কোটীপতি মটরগাড়ীব্যবসায়ী হেন্‌রি ফোর্ডের মতে কৃতকার্যতার মন্ত্র হলো—শতকরা ৯৯ ভাগ মাথার ঘাম পায় ফেলা (perspiration) অর্থাৎ পুরুষকার, আর একভাগ প্রেরণা (inspiration); সুখে দিন কাটাচ্ছেন এদেশে এমন অনেকে এই কথাটা আওড়ান, কিন্তু ইহা একটা সিদ্ধান্ত (theory) মাত্র। কারও ব্যক্তিগত জীবনে দৈবানুগ্রহে সাফল্য-লাভকে একটা সিদ্ধান্ত বলে খাড়া করলেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সে সিদ্ধান্তের সার্বত্রিক সত্যতা প্রমাণিত হয় না।

মুলকথা এই যে, একমাত্র বিধাতাই যন্ত্রী, যাঁর অভিপ্রায়েই মন পর্যন্ত স্ব-কার্যে নিযুক্ত হয়, তিনিই নিজের বিধান ইচ্ছানুরূপ বদলাতে পারেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়:

"জ্ঞানবল, ভক্তিবল, কিছুই তাঁর কৃপা ভিন্ন হবার নয়……(এমন কি) তাঁকে ডাকবার ইচ্ছাও তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না (যমেবৈষ বৃণুতে… · তৎপ্রসাদাৎ)……ত্যাগ করতে হলে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়…… তাঁর শরণাগত হলে পূর্বজন্মে অনেক কর্মপাশ কেটে যায়….. তিনি কপালমোচন।"

শ্রীশ্রীমাও বলেছেন: জপতপ করলে প্রারব্ধ অনেকটা খণ্ডন হয়, যেমন একজনের পা কেটে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হলো। গরুড়-পুরাণেও আছে: ধ্যানেন সদৃশং নাস্তি শোধনং পাপকর্মণাম্— ধ্যান দ্বারাই পাপ ক্ষয় হয়। ঋষি অরবিন্দের মতেও "আধ্যাত্মিক শক্তি গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে সূচিত প্রারব্ধ বা নিম্নতর শক্তিকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয়, যদি সেই আধ্যাত্মিক শক্তির কার্যকরী হওয়ার সময় এসে থাকে (অর্থাৎ পুরুষকার প্রয়োগ দ্বারা সাধনভজনের ফলে ভগবান কৃপা করেন)। যদি আধ্যাত্মিকতার দিকে মনের গতিব পবিবর্তন আমুল হয়, তবে প্রারব্ধের শক্তি অবিলম্বেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পরিবর্তনটা আমুল না হয়ে অংশতঃ হলে প্রারব্ধের ফল যতটা অনিবার্য হওয়ার কথা ততটা হয় না।" (শ্রীদিলীপ রায়ের Among the Great, ৩০৯-১০ পৃঃ)

যে অনুপাতে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া যায়, প্রতিকূল প্রারব্ধ সত্ত্বেও সেই অনুপাতে শ্রীভগবানকে তাঁর যোগক্ষেমের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দেখা যায়। অনাশঙ্কিত অথবা অপরিহার্য বিপদ থেকে অভাবনীয় উপায়ে ভক্তের রক্ষার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নহে। শুনা যায়, ভগবান নাকি বলেন "যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ।" কিন্তু কে জানে তাকে লঘু দুঃখদৈন্য দিয়েই ভগবান হয় ত তার জন্মজন্মান্তরে ভোগ্য সঞ্চিত গুরু পাপকর্মের নাগপাশ এই জন্মেই কাটিয়ে দিচ্ছেন।

পুরুষকার-প্রয়োগে চরিত্রগঠন বা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন ও অপকর্মে বিরতি এসব সম্ভব এবং এই প্রয়োগ ও কর্মবলে তার ফলও অবশ্যম্ভাবী। এই কর্ম একটা উত্তম বিনিয়োগ (investment) মাত্র, পরজন্মে তার সুখভোগ হবেই, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রারব্ধকে আংশিক ভাবেও খণ্ডন করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের 'চালক' কবিতার এই পঙ্‌ক্তি-গুলি স্মরণীয় :

"অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি॥"

দুরদৃষ্টকে শনির দৃষ্টি বলা হয়। কিন্তু জীবনে ইহার উপকারিতাও কম নয়। দুঃখের চরম হলে অনেকে কুকর্মে রত হয় বা আত্মহত্যা করে। আবার অনেকের চৈতন্যোদয়ও হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলেন, আর্তও আমার ভজনা করে। স্বামিজীর অম্বাস্তোত্রম্-এ আছে :

"পূর্ণজ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হতে সুখ নাই,
দুঃখপথ দিয়া মোর করে ধরি চলিছ।

একমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনেই পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধকে নাকচ করা যায়। এখানেই যোগ-বাশিষ্ঠের "হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণ্য চ অঙ্গান্যঙ্গৈঃ সমমাক্রম্য ইত্যাদি দ্বারা অর্থাৎ প্রাণপণে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ দ্বারা মনকে বশে এনে ঈশ্বরের কৃপা লাভ সম্ভব। "তুমি তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে গেলে, তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন।"

স্বামী শুভানন্দের পুণ্যস্মৃতি

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল

সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ব হইতে চলিল স্বামী শুভানন্দের সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের তারিখ হইতে। আমি তখন প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কলিকাতায় কলেজের পূজার ছুটি হইয়াছে। কাশীধামে গিয়াছি। একদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া রামাপুরায় সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। তখন সেবাশ্রম রামাপুরায় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত। মাসিক ভাড়া দশ টাকা। সাক্ষাৎ হইবার পর প্রাথমিক পরিচয়-অন্তে তিনি আমাকে আমার অনুরোধ অনুযায়ী আশ্রমের ভিতরের দিকে লইয়া গিয়া সব দেখাইলেন। তিনি তখন আশ্রমের সহকারী সম্পাদক। পদে সহকারী সম্পাদক হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি-ই ছিলেন আশ্রমের প্রাণ। তখন তিনি শ্রীচারুচন্দ্র দাস। তাহার বহুপরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুকনো চেহারা, বেশভূষার বিন্দুমাত্র পারিপাট্য নাই, কেশবিন্যাসের ধার ধারেন না—প্রথম দর্শনে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য-গুলি আমার কিশোর-চিত্তে রেখাপাত করিল। পরিচয় গাঢ় হইতে বিলম্ব হইল না। প্রতিদিন প্রায় দু'বেলা সকালে বিকালে সেবাশ্রমে তাঁহার কাছে গিয়া বসিতাম। তিনি হোমিওপ্যাথি

জানিতেন। সকালে সেবাশ্রমে বহিরাগত (outdoor) রোগীদিগকে তিনি-ই যথোপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া সেবাশ্রমে রক্ষিত হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। কি আদর্শে যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহা এক অপরাহ্নের একটি ছোট ঘটনা বিবৃত করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। সেই অপরাহ্নে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার অনুরোধ, তাঁহার জন্য একটি ভাড়াটিয়া বাড়ী খুঁজিয়া দিতে হইবে। তিনি বলিলেন একজন কর্ম্মীকে ডাকিয়া "যাও, এপাড়ায় কিম্বা বাঙ্গালী টোলায় যেখানে যেখানে ভাড়াটিয়া বাড়ী পাবার সম্ভাবনা, খোঁজ করো।" চারুচন্দ্রের সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, "আচ্ছা, চারুবাবু, বাড়ী খোঁজ করা ত পাণ্ডারা-ই করতে পারে, এর জন্য সেবাশ্রমে আসবার কি প্রয়োজন?" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, কি বলছো, স্বামিজী আমাদের সর্ব্বপ্রকারে জীবের সেবা করতে বলে গিয়েছেন। ভদ্রলোকের দরকার বাড়ীর, ওষুধের নয়, বাড়ী খুঁজে দিয়েই ওঁর সেবা করতে হবে, এটা Home of Service, —এটা ত সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় কিম্বা হাসপাতাল নয়।" একমাস পরে কাশীত্যাগ করিলাম। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার সহিত দিনের পর দিন কাটাইয়াছি। এক ঘরে শয়ন, এক কম্বলে তিনি, আর এক কম্বলে আমি। একত্রে রাত্রিতে ভোজন। তখন দিনের বেলায় সেবাশ্রমের কার্য্য শেষ করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য তিনি বাসায় যাইতেন, ভোজনান্তে বাসা হইতে ফিরিয়া আসিতেন। রাত্রিতে সেবাশ্রমেই আহার ও শয়ন করিতেন। ভোজনান্তে ফিরিয়া আসিয়া কখন স্বামিজীর কোন রচনাপাঠ, কখন গিরিশচন্দ্রের কোন নাটক পাঠ করিতেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার রচিত নসীরাম, পূর্ণচন্দ্র, বিল্বমঙ্গল— এইসব নাটক তিনি পড়িতে ভালবাসিতেন এবং আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি একদিন যে গৃহে গিরিশচন্দ্র শঙ্করাচার্য্য-সম্বন্ধে নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সেই গৃহটি আমাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁর বাহিরের আবরণটি ছিল কঠোর। আশ্রম-কর্ম্মিগণের কার্য্যে কোন ত্রুটি দেখিলে রীতিমত বকিতেন। মহান আদর্শ যে আশ্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই রকম আশ্রম পরিচালনা করিতে হইলে সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের কত যত্ন করিয়া পাইপাইএর হিসাব রাখিতে হয়, কত বিবেচনা করিয়া প্রতিটি পয়সা ব্যয় করিতে হয়, তাহা দিনের পর দিন স্বচক্ষে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমি শিখিয়াছি। একদিন একটি পথচারী ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার নিকট সেবাশ্রমে ভিক্ষা চাহিল। তিনি বাক্স হইতে একটি আধলা বাহির করিয়া ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন খরচের খাতা খুলিয়া সেই দানের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিলেন, যেহেতু সেই অর্দ্ধ পয়সাটি সেবাশ্রমের অর্থ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। সেবাশ্রমের কার্য্য-প্রয়োজনে কোথাও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাইতে হইলে তিনি সচরাচর হাঁটিয়াই যাইতেন। পশ্চিমের সুলভতম যান একাও ব্যবহার করিতেন না। একবার কোন একজন তাঁহাকে একা করিয়া সেবাশ্রমের প্রয়োজনার্থে কোন জায়গায় যাইতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছিলেন, "না, না, সে হতেই পারে না, জীবনে একভাবে এতদিন চলে এসেছি, সেই ভাবেই চলবো, shareএর একা হলেও ত চা'রটে পয়সা লাগবে। কৃপণ গৃহী তাহার সঞ্চিত অর্থকে ব্যয় করিবার সময় যেমন কুণ্ঠিত হয়, তিনি

সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত সেবাশ্রমের অর্থ, সেবাশ্রমেরই প্রয়োজনে অথচ নিজের একটু সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয় করিতে তেমনি কুণ্ঠিত হইতেন।

কুচবিহার রাজ্যের একজন দরিদ্র পেনসন-ভোগী কর্ম্মচারী একবার তাঁহার সমগ্র জীবনের সঞ্চিত অর্থ সেবাশ্রমে দান করিয়াছিলেন। সেই অর্থের পরিমাণ দুই সহস্র টাকা। তিনি এই সাত্ত্বিক দানের খুব প্রশংসা করিতেন। অপর পক্ষে, সেবাশ্রমের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কোন গণ্যমান্য লোক প্রশংসা করিলে তিনি রীতিমত কুণ্ঠিত হইতেন, কোন প্রকার বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করিলে আন্তরিক বিরক্ত হইতেন। একবার, ই এ মলোনী, যতদূর মনে পড়ে তিনি তখন বারাণসী বিভাগের কমিশনার, সেবাশ্রমের বার্ষিক সভায় সভাপতি এবং রাজা মাধোলাল (তখন তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছেন কিনা স্মরণ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু তাহার কিছু পূর্ব্বে C. S. I. উপাধি পাইয়াছেন, ইহা স্মরণ আছে) সেবাশ্রমের স্থানীয় কমিটির সভাপতি। হঠাৎ মাধোলালজীর কি খেয়াল হইল, সেবাশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মিগণকে এক একটি সুবর্ণপদক উপহার দিবেন। তিনি কে কে প্রধান কর্ম্মী, তাঁহাদের নাম জানিবার জন্য চিঠি লিখিলেন। চিঠিখানি পড়িয়াই চারুচন্দ্রের মুখে বিরক্তি ও ক্রোধের ভাব প্রকাশিত হইল। বলিয়া উঠিলেন "কে চায় তাঁর মেডাল? কিসের মেডাল? সোনা দিয়ে কি করবো? স্বামীজি কি সোনার মেডেলের লোভে, লোকের প্রশংসা পাবার লোভে, আমাদের দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতে বলে গিয়েছেন?"

সে সময়ে লাক্সায় সেবাশ্রমের নিজের গৃহ নির্ম্মাণ চলিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন। সুতরাং সেবাশ্রমের হিতার্থে অর্থাৎ মাধোলালজী যাহাতে অস্বীকৃতির দ্বারা অপমানিত বোধ না করেন বা ক্রোধান্বিত না হন, চারুচন্দ্র নিজেদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহার বিশিষ্ট সহকর্ম্মিবৃন্দের নামগুলি লিখিয়া মাধোলালজীকে পাঠাইলেন এবং সভার অধিবেশন-কালে সভাপতি মলোনী সাহেবের হস্ত হইতে তিনিও তাঁহার কয়েক জন বিশিষ্ট সহকর্ম্মী মাধোলালজী-প্রদত্ত সুবর্ণ-পদকগুলি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ঐ গ্রহণ করা পর্য্যন্ত—তারপর সেই সুবর্ণপদকগুলির কোন ব্যবহার কোন দিন তিনি কিম্বা তাঁহার সহকর্ম্মিবৃন্দ করেন নাই।

ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও, এইখানে একটি কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সময় চারুচন্দ্রের একটি মুদ্রাদোষ ছিল। তিনি কথা বলিতে বলিতে প্রায়ই বলিয়া উঠিতেন, "কি বলেন, দুর্লভবাবু?" কিম্বা "কি বলেন মশাই?" যদিও দুর্লভবাবু হয়ত সেই কথোপকথনের স্থানের ত্রিসীমানার মধ্যে নাই!

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে চারুচন্দ্রের রীতি ছিল, প্রতি বৎসর মহাষ্টমীর দিন প্রাতে সেবাশ্রমে হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিতরণ বন্ধ রাখিয়া সঙ্গীদের লইয়া কাশীধামের পুণ্যস্থানগুলি দর্শন করা। মহাত্মা তুলসীদাসের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত স্থানে তাঁহার সঙ্গিরূপে ঐদিনে যখন গিয়াছি, তখন তিনি তুলসীদাসের কথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। প্রচণ্ড কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার দৈনন্দিন সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা এবং বার্ষিক কাশীধামের পুণ্য-স্থানগুলির পরিক্রমা বাদ যাইত না।

সে সময়ে সেবাশ্রম পরিচালনা করিতে

কত দিক, কত বিষয়, বিবেচনা করিয়া চলিতে হইত, তাহার একটি উদাহরণ দিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। আবাসিক (indoor) রোগি-শ্রেণীভুক্ত হইতে কেহ আসিলে যেদিন সে আসিত, সেই দিনই তাহার কি আছে সেই সম্বন্ধে একটি উক্তি লিপিবদ্ধ করিতে হইত। একটি বাঁধানো খাতায় লেখা হইত এবং দুই জন ভদ্রলোককে সেই লিপিবদ্ধ উক্তির সাক্ষিস্বরূপ সহি করিতে হইত। আমি যখন তাঁহার কাছে থাকিতাম, তখন অনেক সময় আমি এই লিপিবদ্ধ করার কাজটি করিতাম এবং কেদার বাবা (স্বামী অচলানন্দ) ও আমি বহুবার ঐ সব লিপিবদ্ধ উক্তির সাক্ষিস্বরূপ সহি করিয়াছি। আমি একদিন চারুচন্দ্রের নিকট এই কাজটির প্রয়োজন কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কাশী ত চেন না, এই রোগীদের ভিতর কেহ মারা গেলে তখনই পুলিশ এসে বলবে, 'এর অনেক টাকা ছিল, অনেক জিনিষ ছিল, সেসব কোথায় গেল, কে নিলো?' তাই আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হয়, এই রকম স্থলে যদি রোগী পূর্ব্বাহ্ণেই নিজেই উক্তি করিয়া থাকে যে আমার পরণের ধুতি ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং সেই উক্তি যদি লিপিবদ্ধ থাকে এবং তা'র উপর যদি সেই লিপিবদ্ধ উক্তির তলায় দুইজন ভদ্রলোকের স্বাক্ষর থাকে, তবে পুলিশ কিম্বা মৃত ব্যক্তির দেশের আত্মীয়স্বজন কেহ কোন গোলমাল করিতে পারে না।" আবার, সরকারী হাসপাতাল দুইটির ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারদ্বয়ের সহিতও সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাব রাখিতে হইত, কারণ সেবাশ্রমে তদানীন্তন ক্ষুদ্রপরিসর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বহু আবাসিক রোগীর স্থান হইত না, তখন তাহাদিগকে হয় ভেলুপুরা হাসপাতালে নয়ত Prince of Wales Hospitalএ পাঠাইতে হইত। লোকগুরু বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ পতাকা-বাহীদের অন্যতম এই চারুচন্দ্র কর্ম্মের কৌশল সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। কাহাকে দিয়া কোন কাজ হইতে পারে এবং কতটুকু হইতে পারে এবং কোন সময়ে হইতে পারে, তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিতেন এবং তদনুযায়ী কাজও করিতেন। এই ক্ষীণস্বাস্থ্য অথচ নিরলস, নিরভিমান অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান, নীরব অথচ কঠোর কর্ম্মীর জীবন হইতে বর্ত্তমান ভারতের বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মিগণ বহু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

আমার সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হয় বোধ হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পূজার ছুটির সময়। তখন তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া কাশীধামের সিগরা মহল্লায় শ্রীগিরীশ্বর মহাদেবের মন্দির-সংলগ্ন গুহায় কঠোর তপস্যা করিতেছেন। আমি প্রণাম করিলাম। মৃদু হাসিয়া শ্রীগিরীশ্বর মহাদেবের প্রসাদ আনিয়া আমার হাতে দিলেন। গুহার অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তথায় ধ্যান-ধারণার কত সুবিধা বর্ত্তমান, তাহা আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম, মশামাছির আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, যাহাতে সাধনাকালীন সাধকচিত্তে তজ্জনিত বিক্ষেপ উপস্থিত না হয় তাহার অতি সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যিনি ছিলেন গুহার সংস্কারকর্ত্তা। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী শুভানন্দ বলিলেন, "দেখ, একটি জিনিষ আমি অনেকদিন ভেবেছি, উত্তরাখণ্ডে যুবক বাঙ্গালী সাধুরা প্রথম তপস্যা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত খাদ্য সদাব্রতের ঐ আধ-পোড়া আধকাঁচা রুটি আর উরত-কা দাল দিনের পর দিন খেয়ে খেয়ে প্রথমেই পড়ে অসুখে, হয় আমাশয় নয় রক্তামাশয়, তখন আর তপস্যা, ধ্যান, ধারণায় মন যায় না, সব মন গিয়ে পড়ে দেহের উপর। এর কি কোন একটা ব্যবস্থা, দুটি ভাতের ব্যবস্থা ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী ধনীরা সমবেতভাবে চেষ্টা করে করতে পারেন না?" সন্ধ্যা আগতপ্রায়, প্রণাম করিয়া চলিলাম। তা'রপর একদিন উদ্বোধনে পড়িলাম, কোন সাল মনে নাই, কনখলে তাঁহার অভাবনীয় ভাবে দেহত্যাগের বিবরণ। চক্ষু হইল সজল! থাক্ সে কথা।

কল্যাণ কোন্ পথে

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

বাংলা-সাহিত্য বাঙ্গালীর সত্যই বড় গর্বের বস্তু ছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবি হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আধুনিক মনীষিগণের সাধনা বঙ্গসাহিত্যকে যে অতুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়াছিল, তাহার জন্য শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও বাঙ্গালীর মর্যাদা অসাধারণরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। সোনার বাংলার অর্ধাংশেরও অনেক অধিক এক্ষণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পদানত, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরের বিবিধ প্রদেশে কেবলমাত্র উদরসর্বস্ব হইয়া কোন প্রকারে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় রত; আর ক্ষীণকায়া পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত প্রাচীন আদর্শের প্রভাব-মুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় এমনই কূপমণ্ডূকে পরিণত যে, বাংলার বাহিরের কোন অবাঙ্গালীর নিকট বাংলাভাষা এক্ষণে আর আকর্ষণের বস্তু নহে। পলাশীর যুদ্ধ বা মেবারপতন ও চন্দ্রগুপ্তের মত কাব্য ও নাটক এখন আর হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় না; বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করিবার জন্যই অবাঙ্গালীগণ এখন অতিমাত্র ব্যগ্র। ইহার উপর বাঙ্গালীর ভোগবাদ, নারীপ্রগতি, ও বিলাসবিহ্বলতা বাংলা ভাষার সমাধিশয্যা রচনায় নিযুক্ত। বাংলার যে গ্রন্থকার আত্মস্বার্থের জন্য ভোগবাদের প্রশস্তি কীর্তন করিবেন, পবিত্র বিবাহ-বন্ধনকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া অবাধ প্রেমের স্তুতিগীতি গাহিবেন, তাঁহার জয়ধ্বনিতেই শুধু বাংলার আকাশ-বাতাস কম্পিত হইয়া উঠিবে না, তাঁহার অর্থভাণ্ডারও দেখিতে দেখিতে ফাঁপিয়া উঠিবে। এইরূপ সাহিত্যের জন্য যদি অবাঙ্গালী কোন আগ্রহ বোধ না করে তবে তাহাকে দোষ দিবারই বা কি আছে? বাঙ্গালী স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরে; কিন্তু সেকথা সে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। বাংলার বহু সাময়িক পত্রিকা ও বহু গ্রন্থকারই এই দুঃখ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে তাঁহাদের বিক্রয়ের বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র পূর্ববঙ্গ হাত ছাড়া হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের দুর্দশার আর সীমা নাই। ফলকথা, পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীর সহানুভূতি ও সাহায্যে যাঁহাদের এতদিন চলিত, তাঁহাদের আর এক্ষণে চলে না। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে তিলে তিলে দেহক্ষয় করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সাহিত্যিকগণ সে দিকে একবার দৃকপাতও করেন নাই। তাহার কারণ তাঁহার কবিতায় মনুষ্যত্বের প্রবোধনা থাকিলেও ভোগবাদের স্তুতিকীর্তন নাই। কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী এজন্য অনুতাপ করিয়া এই জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন? আত্মদোষ সব শোধন না করিয়া পরের উপর দোষারোপ করিতেই তাঁহারা ভালবাসেন। যত দোষ নন্দ ঘোষ বলিয়া, অর্থাৎ অবাঙ্গালীর উপর সব দোষ চাপাইয়া দিয়া বাঙ্গালী নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন।

মিথিলা হইতে রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বহু কথ্য ভাষা থাকা সত্ত্বেও উহার সাহিত্যিক ভাষা হিন্দী কেমন করিয়া হইল বাঙ্গালী তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? আবার বাংলার মাসিক পত্রিকাগুলি যেখানে পাতায় পাতায় সদ্যস্নাতা ও অভিসারিণী প্রভৃতি চিত্রগুলি ছাপিয়া এবং শ্লীল অশ্লীল সর্বপ্রকারের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ছয় সাত হাজারের বেশী গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারেন না, সেখানে ক্ষুদ্র গোরক্ষপুরে ক্ষুদ্র "কল্যাণ" পত্রিকা বাহিরের বিজ্ঞাপন গ্রহণ না করিয়াও এবং গল্প উপন্যাস ও অপৌরাণিক চিত্র না ছাপিয়াও কেমন করিয়া ষাট হাজারের মত গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারেন তাহাও কি কখনো তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ধর্মের কাহিনী এবং পৌরাণিক চিত্রগুলি সম্বল করিয়া এই পত্রিকাখানি অসাধ্য সাধনের মত যাহা করিতেছেন, বাঙ্গালী তাহা কি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন? আপনি অগাধ মাতৃভক্তিতে অভিষিক্ত হইয়া "মাতৃপূজা" লিখিলেন, কিন্তু বাঙ্গালার সমালোচক অমনি বলিয়া বসিলেন, এ চিত্র নিতান্তই সেকেলে, বর্তমানে ইহা একেবারেই অচল। অতএব সচল চিত্র যদি আপনি অঙ্কিত করিতে পারেন তবেই আপনি সাহিত্যক্ষেত্রে সচল হইবেন, নতুবা চিরদিন অচল হইয়াই থাকিতে হইবে। বাঙ্গালী যতই দিন দিন দুর্দশার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, ততই জোর গলায় বলিতেছেন—"আমার মত সাহিত্যসৃষ্টি কেহ করিতে পারে না। আমার সাহিত্য পড়িয়া কত বাল-বিধবা পতনের হাত হইতে রক্ষা পাইল; কত পতিতা পাপের পঙ্ক হইতে বাহির হইয়া পুণ্যের জীবন গ্রহণ করিল; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভণ্ডামি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আমার সাহিত্যসমাজকে পুণ্যের জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।" কিন্তু বাঙ্গালী বুকে হাত দিয়া বলিবেন কি, তাঁহারা আজ কোথায়? সত্যই কি তাঁহারা পুণ্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন? পাপ-ব্যবসায় কি সত্যই বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে? না, নিত্য নূতন পোষাকে অঙ্গাবৃত করিয়া এই দুষ্ট-বৃত্তি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে ক্ষীণমূল করিয়া ফেলিতেছে? যে জাতি ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া কঙ্কালসার, যক্ষ্মার আক্রমণে যাহার জীবনীশক্তি স্তিমিতপ্রায়, দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অনাহার বা অর্ধাহারে যে জাতি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতনোন্মুখ সে জাতি দিবারাত্রি প্রেমচর্চায় মাতিয়া থাকে ইহাকে আশ্চর্য বলিব না ত জগতে আশ্চর্য আর কি আছে? বাঙ্গালী-মানসিকতা বর্তমানে কোন স্তরে নামিয়া আসিয়াছে তাহা বাঙ্গালী জন-সাধারণ বিশেষতঃ বাঙ্গালীর তরুণ-তরুণীরা ভাবিয়া দেখিবেন কি? বাঙ্গালীর বিস্ময়কর জাগৃতি সম্ভব হইয়াছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দিব্যদৃষ্টিপ্রসূত সাহিত্যের অবদানে, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জ্ঞানঘন দিব্যবাণীর প্রেরণায়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বিরাট পুরুষগণের চারিত্রিক মহিমায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর সে দিন আর নাই। বাঙ্গালীর আদর্শে আজিকার অবাঙ্গালী আর বিন্দুমাত্র পরিচালিত হয় না। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর আর প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই। বাঙ্গালীকে যদি আবার উঠিতে হয়, ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ লইয়াই তাঁহাকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, এবং তাহার সাহিত্যকেও সেইভাবেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। 'আনন্দমঠ' যদি বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে

পারে, তবে এইরূপ সাহিত্য বাঙ্গালীর কেন মনোরঞ্জন করিবে না? আর কেবল কাব্য, উপন্যাসই যে বাঙ্গালীকে পাঠ করিতে হইবে তাহাও নয়। উত্তর ভারতের অসংখ্য নরনারী আজও গোস্বামী তুলসীদাসকৃত হিন্দী রামায়ণ পরম ভক্তিভরে পাঠ করিয়া থাকে। কোন কাব্য বা উপন্যাসের সাধ্য নাই যে এই রামায়ণের স্থান গ্রহণ করিতে পারে। ফলকথা বাঙ্গালীকে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া চলিতে হইবে। সাহিত্যের দিব্যবাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইলে জাতির জয়যাত্রা কথনই সফল হইতে পারে না। কিন্তু সেই দিব্যবাণী বুঝিতে হইলে দিব্য কর্ণেরও একান্তই প্রয়োজন। কাচ ও কাঞ্চনের প্রভেদ-জ্ঞান বিলুপ্ত না হয়, দুগ্ধ ফেলিয়া কেহ সুরার আদর না করে সেজন্য জাতিকে বিশেষভাবেই সতর্ক থাকিতে হইবে। তবেই বঙ্কিমচন্দ্রের মত দিব্য মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ আবার আবির্ভূত হইয়া দিগ্‌ভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতিকে পথের সঙ্কেত প্রদান করিবেন। অতএব বাঙ্গালী জাতির পুনরুত্থানের জন্য সমগ্র জাতির মধ্যে সৎসাহিত্যের সমাদর হওয়া একান্তই প্রয়োজন। বর্তমানে সমগ্র জাতিটাই যেন দারুণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যেমন করিয়াই হউক এই মোহ-ঘোর কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে জাতির কিছুতেই কল্যাণ নাই। বাঙ্গালী জাতি যদি এখনও জাগ্রত না হন, হয়ত বিধাতার দিব্য বিধানে আরও কঠিন আঘাত তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে। অতএব বাঁচিতে হইলে এখন হইতেই তাঁহাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। সৎসাহিত্যের—সংযম ও পবিত্রতা-মূলক পুস্তক সমূহের সম্যক আদর যেমন তাঁহাদিগকে করিতে হইবে, অসৎ সাহিত্যকেও তেমনি সম্মার্জনী-প্রহারে দূর করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ব্যষ্টি মানব অপেক্ষা সমষ্টি মানবের দ্বারা—বাংলার বিবিধ প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারাই এ কার্য অধিকতর সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভবপর। কোথাও সাহিত্যিক প্রতিভা অনাদরে বা হতাদরে শুষ্ক কোরকের ন্যায় অকালে ঝরিয়া না পড়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে সেদিকে বিশেষভাবেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অনুকূল বায়ু পাইলে প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র দেশকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে, উহার অভাবে তেমনি অকালে নিভিয়া যাইতেও পারে। আর প্রতিভার এইরূপ অকাল নির্বাণ যে দেশ ও জাতির পক্ষে একান্তই অকল্যাণকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বাংলার সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠানগুলি এই দিক দিয়া যাহাতে তাঁহাদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে পারেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই একান্ত প্রয়োজন।

"আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক বাঁচতে পারবে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এদেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

গানে রামপ্রসাদ—লেখক : শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা—(৮।/০+৮০)। মূল্য একটাকা।

সাধক রামপ্রসাদ-সম্পর্কিত একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা। লেখক অবতরণিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র ৯২-সংখ্যক 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক প্রচারিত রামপ্রসাদের দ্বৈতব্যক্তিত্ববিষয়ক মতবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মূল প্রবন্ধে রামপ্রসাদের বিদ্যাশিক্ষা, গান ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি রচনা, বাল্য ও গার্হস্থ্য জীবন এবং ধর্ম সাধনা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ-ক্রমে ত্রিবিধ তান্ত্রিক সাধনার সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিশিষ্টে রামপ্রসাদের দুইটি দুরূহ প্রহেলিকা-জাতীয় গানের আধ্যাত্মিক অর্থের উদ্ধার করিয়াছেন। তৃতীয় পরিশিষ্টে ৫৩ হইতে ৮০ পৃষ্ঠায় রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ ৫১টি গান প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তিকাখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, রামপ্রসাদের জীবনী উদ্ধারে জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর উপর বিশেষ নির্ভর না করিয়া লেখক রামপ্রসাদের গানের সাক্ষ্যের উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও উদ্যম সাধু ও প্রশংসনীয়—বঙ্গের অলঙ্কার, মহাপুরুষ, সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষা। আমরা এইজাতীয় পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী (অধ্যাপক)

শ্রীমদ্ভাগবত (পরিচয় ও আলোচনা) —অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ: জীবন ও সাধনা' এবং 'স্মৃতিকথা' প্রণেতা) ও শ্রীপ্রণতি সান্যাল বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান—১০, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা—৬৪৮+১৩+।/০; মূল্য—ছয় টাকা।

সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া লেখা শ্রীমদ্-ভাগবত শাস্ত্রের এই সহজ সরস এবং তথ্যপূর্ণ পরিচয়- ও আলোচনা-গ্রন্থটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ভাগবতের ১২টি স্কন্ধেরই ধারাবাহিক বিষয়বস্তু এবং প্রত্যেক স্কন্ধের অনেকগুলি মূল সংস্কৃত শ্লোক সরল ব্যাখ্যা সহ পুস্তকে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। শ্লোকগুলির নির্বাচনে গ্রন্থকর্তার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। ভাষা স্বচ্ছ ও সজীব। আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত, টীকা-টিপ্পনীর জটিলতা-নির্মুক্ত এবং আগাগোড়া একটি সশ্রদ্ধ ভক্তির আবেদনে ভরপুর বলিয়া প্রাণস্পর্শী। বাংলা ধর্মসাহিত্যে বইটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইবার যোগ্যতা রাখে।

সমাধান (দ্বিতীয়খণ্ড)—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা : ২৮৯; মূল্য—৩৲ টাকা।

বহু ধর্ম-ও দার্শনিক-গ্রন্থের প্রণেতা প্রবীণ গ্রন্থকারের এই বইখানিতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে ৯টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। সব লেখা-গুলির মধ্যেই প্রখর শাস্ত্রজ্ঞান এবং সত্যসন্ধানী মৌলিক মনন-ধারা সুপরিস্ফুট।

বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন পত্রিকা (১৩৫৯)—শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, এম-এ, বি-টি কতৃক বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন, ১০৭ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আদর্শে গঠিত হাওড়ার সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশনের এই ষষ্ঠবিংশতি বার্ষিক প্রকাশন পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। ছাত্র লেখকদের লেখা প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাধারার অভিনবত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তরুণ বন্ধুদের অভিনন্দন জানাই।

Maha Bodhi Society Diamond Jubilee Souvenir—

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটস্থ মহাবোধি সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন আটপেজী পৃষ্ঠা ২১৬; মূল্য—৬৲ টাকা।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ প্রচারক ভিক্ষু অনাগারিক ধর্মপাল কর্তৃক ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫১ সালে উহার হীরকজয়ন্তী পূর্ণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারকগ্রন্থটির সম্পাদন করিয়াছেন ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাত জন মনীষী। বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারের জন্য দেবচরিত্র এবং অদ্ভুতকর্মা ধর্মপালের অকুণ্ঠ পরিশ্রম অতীব বিস্ময়কর। গ্রন্থের প্রথম ১৩২ পৃষ্ঠায় তাঁহার বিশদ জীবনী এবং মহাবোধি সোসাইটির বিস্তারিত ইতিহাস ও কার্যবিবরণী দেওয়া হইয়াছে। বাকী অংশে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের লেখা বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী নেহেরু এবং দেশের ও বিদেশের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাণী পুস্তকে সম্বলিত হইয়াছে। এই তথ্যবহুল স্মৃতি-গ্রন্থ বিদ্যা- ও ধর্মোৎসাহীদের নিকট সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী স্বয়মানন্দের দেহত্যাগ—পরমপূজনীয় শ্রীমৎ শিবানন্দ (মহাপুরুষ) মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী স্বয়মানন্দ ৭৪ বৎসর বয়সে গত ২১শে চৈত্র বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পূর্বাশ্রমে পার্শীসম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহার নাম ছিল দিনশা কাপাডিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। কিছুকাল মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন—পরে বরাবর বেলুড়মঠেই থাকিতেন। তাঁহার বৈরাগ্য, ধ্যান-নিষ্ঠা এবং তিতিক্ষা সকলকেই মুগ্ধ করিত। এই অনাড়ম্বর সন্ন্যাসীর লোকান্তরিত আত্মা শ্রীগুরুর অভয় পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

মূর্তিপ্রতিষ্ঠা—গত ২রা ও ১১ই চৈত্র যথাক্রমে পাটনা এবং শিলং আশ্রমের মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। উভয় স্থানেই এতদুপলক্ষে কয়েকদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং নানা কেন্দ্র হইতে আগত বহু সন্ন্যাসীর উপস্থিতি ও ধর্মালোচনায় স্থানীয় ভক্ত এবং বন্ধুগণ প্রভৃত আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন।

পাটনা আশ্রমে উৎসবসমারোহ এক সপ্তাহ ধরিয়া চলে। মূর্তি-প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন ৮কাশীর পণ্ডিতগণ কর্তৃক বৈদিক হোম (হরিহর যজ্ঞ) উদ্‌যাপিত হয়। ৩রা হইতে ৬ই চৈত্র পর্যন্ত একটানা কর্মসূচী ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামী ওঙ্কারানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী তেজসানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ, বিচারপতি এস্‌, কে, দাস এবং বিচারক এস্‌, সি, মিশ্র মহাশয় বিভিন্ন দিন মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

স্বামী মাধবানন্দ ৩রা চৈত্র তাঁহার ভাষণে বলেন, যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন মহামানব। তাঁহার জীবনী ও বাণী জানা এবং উহা নিজেদের বাস্তব জীবনে অনুশীলন করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। বেদান্তের শিক্ষাসমূহ তাঁহার উপদেশের মধ্যে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়, আর এই শিক্ষাগুলিই ভারতীয় সংস্কৃতির সার কথা। আজ মানুষ পার্থিব ভোগ-সুখের এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির অভিমুখে খুব বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে কিন্তু এই পথে তাহার কোনদিনই শান্তি আসিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেখাইয়া গেলেন যে কেবলমাত্র পার্থিব সমস্ত কিছুর ত্যাগেই আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর।

বিচারক এস্‌, কে, দাস বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন: শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর দূরের ঈশ্বর নন্‌। সেই ঈশ্বর হইতেছেন আমাদের দেহমন্দিরের দেবতা—আমাদের গৃহ, আমাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে অনুস্যূত ঈশ্বর। শুধু পুরুষ নয় নারীকেও তিনি ইষ্টের প্রকাশ বলিয়া দেখিতেন। সমস্ত স্ত্রীলোককে দৈহিক লালসার দৃষ্টিতে না দেখিয়া গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে তিনি আমাদের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

৫ই চৈত্র, ছাত্রদের একটি সভা হয়। সভাপতি ছিলেন বিহার রাজ্যের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ। বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর রায় বাহাদুর শ্যামনন্দন সহায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ পূর্বক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। তাঁহারা বিদ্যার্থীদের সম্বোধন করিয়া বলেন, তাহারা যদি নিজেদের জীবনটীকে উচ্চভাবে গড়িয়া তুলিতে চায় এবং দেশের ও সমাজের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই যদি তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করা তাহাদের কর্তব্য। ৬ই চৈত্র, অনুষ্ঠিত মহিলাসভায় স্থানীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং স্বামী ওঙ্কারানন্দ আমাদের দেশে নারীগণের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভাগলপুরের শ্রীউদয়নারায়ণ ঠাকুরের হিন্দী-কথকতা এবং স্বামী ওঙ্কারানন্দের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ উৎসবের প্রাণবন্ত অঙ্গ ছিল। ৮ই চৈত্র শেষদিনে প্রায় দুই হাজার দরিদ্র-নারায়নকে বসাইয়া খাওয়ানো হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ১১৮ তম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সংবাদ আমরা গতমাসে কতকগুলি কেন্দ্র হইতে পাইয়াছি। সংক্ষেপে উহা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

১লা চৈত্র এই উৎসব টাকী (২৪ পরগণা) আশ্রমে বেশ সমারোহেই উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রাতে ভজন, কথামৃত-ও চণ্ডী-পাঠ, পূজা এবং প্রায় ৪০০০ নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল। অপরাহ্ণে একটি মহতী জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী-বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীস্মরজিৎ দত্ত এবং সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুধাংশু-কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়। পরিশেষে বিদ্যালয়ের

ছাত্রগণ কর্তৃক নাটকাভিনয়ের পর, দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

মেদিনীপুর সেবাশ্রমে উৎসব চলে ১০ই হইতে ১৮ই ফাল্গুন অবধি। পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, ভজন-কীর্তন, বিশিষ্ট সঙ্গীতগণের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত, মাইকযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর বক্তৃতালোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ, রামরসায়ন গান এবং ত্রি-সহস্রাধিক নরনারায়ণসেবা প্রথম দিবসের কর্মপর্বের অঙ্গ ছিল। দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ দিবস ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজী ও শ্রীশ্রীসারদামণিদেবী সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা চলে। বক্তৃতা করেন স্বামী পূর্ণানন্দ, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশুভেন্দু কুমার রায় ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ।

গড়বেতা (মেদিনীপুর) আশ্রমে বিশেষ পূজাদি সহ অনুষ্ঠান পালিত হয় ৮ই চৈত্র। প্রায় দেড়হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদদানে তৃপ্ত করা হইয়াছিল। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার নীলমাধব সেন। বক্তৃতা দেন রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ ও উদ্বোধন পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দজী।

হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ট, পূর্বপাকিস্তান) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২০শে ফাল্গুন হইতে পাঁচ দিবস ব্যাপী উৎসবের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ, আলোচনা এবং ছাত্রসভায় ছাত্র-ছাত্রীগণের আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে স্বামী রামেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী, ও পণ্ডিত রাসমোহন চক্রবর্তীর ভাষণ এবং রামায়ণ গান ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা সমবেত সকলকেই আনন্দ দান করিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতের উতকামণ্ড (নীলগিরি) আশ্রমের উৎসবের উদ্‌যাপন নির্বিঘ্নেই শেষ হইয়াছে। প্রায় ৩৫০০ জন নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। ১৮টি ভজনগায়কদল ভজনে পর পর অংশ গ্রহণ করিয়া আশ্রম মুখরিত রাখেন। আহূত জনসভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ব্যাঙ্গালোর আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী। স্বামী অজয়ানন্দ ছিলেন অন্যতম বক্তা।

জামসেদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দুই দিনই আশ্রম প্রাঙ্গণে আহূত জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী-সম্বন্ধে ভাষণ দেন হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী, আরা জৈন কলেজের অধ্যাপক শ্রীশিববালক রায় এবং উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। দ্বিতীয় দিবস সারাদিনব্যাপী পূজা, নাম-সংকীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ)তে অনুষ্ঠান—গত ৮ই চৈত্র সারগাছি আশ্রমে পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা-উৎসবসুসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ৺চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি সারাদিন অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সারদেশানন্দ পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দজী মহারাজের জীবনী পাঠ করেন। অপরাহ্নে জনসভায় স্বামী প্রেমেশানন্দজী ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বক্তৃতা দেন। প্রায় ১২শত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উৎসবের রন্ধন, পরিবেশন ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ নিজেরাই করিয়াছেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের অনেক মন্ত্রশিষ্য এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক—(১) গীতাসার সংগ্রহ (দ্বিতীয় সংস্করণ)—স্বামী প্রেমেশানন্দ সম্পাদিত। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিলং মূল্য একটাকা চার আনা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একশত সুনির্বাচিত শ্লোকের মূল, অন্বয় শব্দার্থ, বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ, টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা।

(২) Golden Jubilee Souvenir o the R. K. Mission Sister Nivedit Girls School—ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠি বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং ইংরেজী বাঙ্গলা অনেকগুলি সুলিখিত রচনা দ্বা সমৃদ্ধ।

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—গত ৩১শে ফাল্গুন ইছাপুর প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ১১৮তম জন্মমহোৎসব অনাড়ম্বর অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ভোরে প্রভাত ফেরী সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ, সঙ্ঘগৃহে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং দ্বিপ্রহরে দুই সহস্রাধিক লোককে প্রসাদ বিতরণের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। অপরাহ্নে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পৌরোহিত্যে একটি জনসভায় পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী এবং সাংবাদিক শ্রীঅমর নন্দী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে এতদুপলক্ষে ২৪শে ফাল্গুন যথাবিধি পূজাপাঠাদি এবং নগর সংকীর্তনের আয়োজন হইয়াছিল। রেডিও শিল্পী শ্রীহরিদাস করের সুললিত কীর্তন এবং বেল-ঘরিয়া সুহৃৎ সম্মিলনীর শিবদুর্গা-ভজন সকলকে প্রভূত আনন্দ দান করিয়াছিল। বৈকালে একটি জনসভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি ছিলেন সুকবি শ্রীনরেন দেব। সন্ধ্যায় সুগায়ক শ্রীঅনুপম ঘটক মহাশয়ের ছাত্রীবৃন্দের মধুর ভজন উপস্থিত সকলকেই পরিতৃপ্ত করিয়াছিল।

হরিশপুর (হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১৭ই ফাল্গুন পুণ্য জন্মতিথি দিবস যথাবিধি উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্নে প্রায় এক হাজার গ্রামবাসীর সম্মেলনে বেলুড়মঠের ব্রহ্মচারী অভয়-চৈতন্য 'আমি কি চাই' বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

গত ১৫ই চৈত্র বাটানগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উৎসবে নগরসংকীর্তন এবং পূজাপাঠাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া এবং তিন হাজার নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্বামী বীতশোকানন্দের (বেলুড় মঠ) সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভায় সভাপতি এবং স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠাকুরের সম্বন্ধে ভাষণ আলোচনা করেন।

বেলঘরিয়ার দেশপ্রিয় নগরে গত ২৪শে ফাল্গুন পূজাদি সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হয়। পূর্বদিবস সন্ধ্যায় প্রারব্ধ সংকীর্তনের সমাপ্তি এই দিন মধ্যাহ্নে হইয়াছিল। কীর্তনান্তে খিচুড়ী প্রসাদ বিতরণ এবং বৈকালে একটি জনসভার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীমনকুমার সেন, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, সাহিত্যরত্ন এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলোচনা করেন।

গত ৩রা ফাল্গুন মথুরাপুর (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে প্রাতে ঠাকুরের তিথিপূজা, চণ্ডীপাঠ, এবং হোমাদির পর নাম-সংকীর্তন ও বৈকালে সুরশিল্পী শ্রীবিমলকুমারের ভজন গানের অনুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যারতির পর পণ্ডিত চারুচন্দ্র বিদ্যার্ণব বেদান্ত-শাস্ত্রী চিত্তাকর্ষক ভাষায় সমবেত শ্রোতাদিগকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'একাদশী মাহাত্ম্য' শ্রবণ করাইয়া বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন।

১৬ই ফাল্গুন অপরাহ্নে "পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অনুপম ভাবে ও ভাষায় অপরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া সমবেত মাতৃমণ্ডলী ও সজ্জনবৃন্দকে রামকৃষ্ণ-ভাব-সমুদ্র-মন্থনে অমৃত পরিবেশন দ্বারা পরম আপ্যায়িত করেন। পর দিবস সন্ধ্যার পর "বিবেকানন্দ সোসাইটী" কর্তৃক

ছায়াচিত্রে ঠাকুর স্বামিজীর জীবনী প্রদর্শিত হয়।

২৪শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীনীলমণি চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভার অনুষ্ঠান হয়।

ভদ্রকালী গ্রামস্থিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য-বালিকাশ্রমে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বারেও শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের শুভাবির্ভাব স্মরণে ২৪শে মাঘ (৭ই ফেব্রুয়ারী) হইতে ৪ঠা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত মহোৎসব সুসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিথি পূজার দিনআশ্রম বালিকাগণ ব্রাহ্মমুহূর্তে সমবেত-প্রার্থনানন্তর মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া আশ্রমের বহিস্থ প্রাঙ্গণে সাময়িক নির্মিত মণ্ডপে স্থাপিত শ্রীশ্রীঠাকুরের বৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করে। অতঃপর সুমধুর শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্তন আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি ও চণ্ডীপাঠ শেষ হইয়া গেলে মধ্যাহ্নে সমাগত তিন চারি শত নর নারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে আশ্রমে দশদিন যাবৎ প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল।

পাকিস্তানে উৎসব—বিগত ২৭শে হইতে ২৯শে ফাল্গুন কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব ও আশ্রমের সাধারণ বার্ষিক উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় দিবস বেলুড় মঠের স্বামী রামেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ এবং অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী মহোদয়গণ ঠাকুরের জীবনী বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। চতুর্থ দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া কীর্তন সহকারে প্রায় অর্ধেক সহর প্রদক্ষিণ করা হয়। দুপুরে সুললিত কণ্ঠে লীলাকীর্তন চলিতে থাকে এবং সমগ্র আশ্রমপ্রাঙ্গন আনন্দমুখরিত হইয়া উঠে। দশহাজার নরনারী আশ্রমে সমবেত হইয়াছিল। আট হাজারের অধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। ৩১শে ফাল্গুন সায়াহ্নে আশ্রম প্রাঙ্গণে বৈদিক 'জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ, বাংলাভাষায় নাট্যাকারে অভিনীত হয়।

যশোহরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জয়ন্তী উৎসব ১৩ই চৈত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রভাতে মঙ্গল আরতি, ভজনগান, পূজা ও বেলা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্র দ্বিপ্রহর পর্যন্ত প্রায় তিন সহস্র নব-নারীকে পরিতোষ সহকারে প্রসাদ-দান এবং বৈকালে একটী সভার অধিবেশন হয়। দৌলতপুব কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীভুবনমোহন মজুমদার মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি এবং ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যকামানন্দ বক্তৃতা দেন। সভান্তে স্থানীয় যুবকসম্প্রদায় কর্তৃক শারীরকৌশল প্রদর্শিত হয়। সন্ধ্যারতিব পর রামায়ণ গানের ব্যবস্থা ছিল। শহরেব অনেকদূর হইতেও বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার ধূমগ্রামে (পোঃ মহাজনহাট) স্থানীয় বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক ১৫ই এবং ১৬ই চৈত্র দুই দিন ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শোভাযাত্রা, সংকীর্তন, ধর্মালোচনা, পূজাহোমাদি এবং জনসভা কর্মসূচীর অঙ্গীভূত ছিল।

মহাব্রত

চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ। দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিয়োসানকল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুন্নং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেথ।

(বুদ্ধবাণী--বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ১।১১)

হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতকারী বহুজনের শান্তিবিধায়ী ব্রত ধারণ করিয়া তোমরা দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর। জগতের প্রতি অনুকম্পায় তোমাদের হৃদয় বিগলিত হউক। দেব ও মনুষ্যগণের প্রয়োজন, মঙ্গল ও সুখ সাধন করিয়া চল। দুই জনে একদিকে যাইও না। (জানিও যাহা বলিবে বা করিবে তাহা গ্রহণ ও সমর্থন করিবার লোকের অভাব হইবে না)। হে ভিক্ষুগণ, আদিতে যাহার কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পরিশেষেও যাহার কল্যাণ সেই পরম শ্রেয়স্কর ধর্মের যথামর্ম যথানিবদ্ধ প্রচার কর। পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যমণ্ডিত পুণ্যময় জীবনের মহিমা কীর্তন কর।

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা
নহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥

(শঙ্করাচার্য—বিবেকচূড়ামণি, ৩৭)

শান্তচিত্ত উদারহৃদয় এমন সব সাধুপুরুষ পৃথিবীতে রহিয়াছেন বসন্ত ঋতুর ন্যায় লোকহিত সাধন করিয়া চলাই যাঁহাদের জীবন-ব্রত। এই ভীষণ ভবসমুদ্র তাঁহারা নিজেরা (সাধনবলে) পার হইয়াছেন—অপরেও যাহাতে উহা অতিক্রম করিতে পারে সেই দিকেই নিয়োজিত হয় তাঁহাদের অহৈতুকী চেষ্টা।

কথাপ্রসঙ্গে

বুদ্ধ ও শঙ্কর

আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় (১৪ই জ্যৈষ্ঠ) ভগবান বুদ্ধদেবের পুণ্যজন্ম, সম্বোধিলাভ এবং মহাপরিনির্বাণ স্মরণে আমরা তাঁহার উদ্দেশে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করিব। তথাগতের জীবন ও উপদেশে এমন একটি উদার সর্বজনীনতা আছে যে উহাকে কোন নির্দিষ্ট দেশে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করিয়া রাখা চলে না। বুদ্ধবাণী বিশ্বের সকল ধর্মাবলম্বীকেই সত্য, শান্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। উহা প্রত্যেক অধ্যাত্ম-সাধনপথে সমন্বিত হইতে পারে এবং হওয়া প্রয়োজনও। শত শত বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীর দেশ ও জাতিসমূহ যখন ভৌগোলিক কারণে পরস্পর অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল তখনই বৌদ্ধ শ্রমণগণ এদেশ হইতে শাস্তার অভিনব ধর্মালোক দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, মরুভূমি, অরণ্যানীর বাধা অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। আজ জগতের মানুষের কাছে ভৌগোলিক এবং ভাষা- ও কৃষ্টিগত বাধা অনেক কম। অতএব সত্য, মৈত্রী ও শান্তির অনুশীলনে সমাহিত ভারতের যে সনাতন বৃহৎ মন বুদ্ধ ও বুদ্ধবাণীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল উহার সংস্পর্শলাভ সকল দেশের মানুষের পক্ষে আজ বহুতর সহজ। যদিও বর্তমান মানুষের জটিল জীবনধারা ঐ সংস্পর্শলাভের অনুকূল নয়, তথাপি বিবিধ ঘাতপ্রতিঘাত ও সঙ্কটে পড়িয়া মানুষ ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছে তাহার কল্যাণের অন্য দ্বিতীয় পন্থাও নাই। বাহির হইতে তাহাকে ভিতরে তাকাইতে হইবে —উদ্দাম ভোগোন্মত্ততাকে সংযত করিয়া শম, দম, সন্তোষাদির অনুশীলন করিতে হইবে। তাহার জাগতিক জীবনের সংহতির জন্যই ইহার প্রয়োজন আছে। আলেকজাণ্ডার, সিজার, নেপোলিয়ন, হিটলারকে 'হিরো' করিয়া মানুষের যে অগ্রগতি—উহার ব্যর্থতা বিশ্বমানব মর্মে মর্মে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'হিরোর' আসনে তাই আজ বসানো প্রয়োজন জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কাম, সত্যদ্রষ্টা, বিশ্ববন্ধু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে। গৌতম বুদ্ধ এমনই একজন হৃদয়মন-আকর্ষণকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ। শত শত বৎসর পূর্বেকার মত পুনর্বার মানুষের হৃদয়মন্দিরে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন আসিয়াছে।

এ কথার তাৎপর্য অবশ্যই ইহা নয় যে, জগতে সকলকেই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান বুদ্ধ ভারতের যে শ্রেয়োধর্মী বিশ্বহিতরত পরম-সত্যানুসন্ধানী শাশ্বত আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতীক, ঐ আদর্শের সমাদর উত্তরোত্তর এই যুগে অপরিহার্য।

* * *

আগামী ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ভগবান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব-তিথি (বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী)। ভারতের ধর্মসংস্কৃতির এক সঙ্কটময় ক্ষণে ভারতের ভগবান এই বালসন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কালগতির অব্যর্থ নিয়মে দেড়-হাজার বৎসরে ভারত-ধর্মে যে বিকৃতি এবং দুর্বলতা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা অপনোদন করিয়া জনগণকে বেদান্তের বিশুদ্ধমার্গে লইয়া গিয়াছিলেন। শঙ্কর শুধু একজন অদ্বিতীয় দার্শনিকই ছিলেন না—তাঁহার বত্রিশ বৎসরের

জীবন ছিল লোককল্যাণের জন্য, অবিশ্রান্ত নিঃস্বার্থ কর্মে পরিপূর্ণ। ঔপনিষদ সত্য যাহাতে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে গভীর-ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয় সেদিকে ছিল তাঁহার প্রখর দৃষ্টি। অদ্বৈতজ্ঞান সর্বাবগাহী চরম সার্থকতম জ্ঞান। কিন্তু উহাকে লাভ করিতে গেলে যে ধাপগুলি অতিক্রম করিতে হয় তাহা শঙ্কর আদৌ অবহেলা করেন নাই। তাই অদ্বৈত-মতসংস্থাপক আচার্যকে আমরা উপাসনা, ভক্তি, পূজার্চনা প্রভৃতিরও উৎসাহী প্রচারকরূপে দেখিতে পাই। সমগ্র হিন্দুধর্ম আচার্যের শিক্ষায় সবল যুক্তিপ্রতিষ্ঠ হইয়া অভিনবরূপে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্মে শঙ্কর যে প্রাণশক্তি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন আজিও তাহার ক্রিয়া চলিতেছে। হিন্দুজাতি শঙ্কর-মনীষার নিকট সকল কালের জন্য ঋণী থাকিবে।

শুধু কি হিন্দুজাতি? স্বামী বিবেকানন্দ একস্থানে বলিয়াছেন—"এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের লেখায় আধুনিক সভ্য-জগৎ বিস্মিত হইয়া আছে।" সত্যই বিস্মিত হইবার কথা। 'আধুনিক সভ্যজগৎ' বিজ্ঞান ও যুক্তির জগৎ। এই জগতে যদি ধর্মের কোন স্থান করিতে হয় তাহা হইলে ধর্মকে বিজ্ঞান ও যুক্তির চ্যালেঞ্জ মিটাইতে হইবে। আচার্য শঙ্করের লেখায় দেখিতে পাই তিনি বেদান্তকে ঐরূপই বিজ্ঞান ও যুক্তির অভিঘাত হইতে অতি সক্ষমভাবে রক্ষা করিয়াছেন। এই জন্যই শাঙ্কর-বেদান্ত আজ আধুনিক শিক্ষিত মনের বিস্ময় ও আকর্ষণের বস্তু।

ভারতে খ্রীষ্টান মিশনরী

কিছুদিন আগে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কাটজু রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারতে বৈদেশিক খ্রীষ্টান মিশনরীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন। মিশনরীরা এদেশে তাঁহাদের সেবা ও শিক্ষাপ্রচারমূলক কাজ করুন, আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহারা এদেশের লোককে নানা ফন্দী-ফিকির দ্বারা ধর্মান্তরিত করিয়া যে খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করেন উহা বাঞ্ছনীয় নয়—ডক্টর কাটজুর কথার তাৎপর্য বোধ করি ছিল ইহাই। কিন্তু তাঁহার ঐ উক্তিতে মিশনরী এবং দেশের খ্রীষ্টানসম্প্রদায়েরও অনেকে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সংবাদপত্রে বহু সমালোচনাত্মক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং ডক্টর কাটজুর পক্ষ লইয়াও অনেকে প্রত্যুত্তর দিতেছেন। কোন কোন পাদ্রী হুমকি দিয়াছেন, যদি এই-ভাবে মিশনরীদের কার্যে বাধা দিতে চাও তাহা হইলে এদেশের হিন্দুপ্রচারক যাঁহারা বিদেশে প্রচার কাজ করিতেছেন—তাঁহাদিগকেও পাল্টা বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি বলিয়াছেন—"খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসানুযায়ী প্রত্যেক খ্রীষ্টানই একজন ধর্ম-প্রচারক। নিজের বিশ্বাস ও অনুভূতিসমূহের অংশীদার অপরকেও করিতে হইবে—ধর্মনিষ্ঠ খ্রীষ্টানের ইহাই লক্ষ্য। * * * অন্যান্য দেশ হইতে আধ্যাত্মিক প্রভাব আসিতে বাধা দেওয়া হইবে কেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। * * * আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মত কি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক করিয়া ফেলিতেছি না?" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ২৫শে এপ্রিল)

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"ভারত-বাসী যেদিন পাশ্চাত্ত্যের পদতলে ধর্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে।" অতএব হিন্দুভারত যদি বিদেশের 'আধ্যাত্মিক প্রভাব' লাভ করিতে উৎসাহ কম দেখায়, তাহা দূষণীয় নয়। এদেশে উহার প্রয়োজনও নাই। কেহ যদি স্বেচ্ছায় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে

তাহাতে বলিবার কিছু নাই—কিন্তু পৌত্তলিকতার নিন্দা করিয়া, পরিত্রাতা যীশু হইতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের বহু কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়া, বহুতর আর্থিক ও সামাজিক প্রলোভন দেখাইয়া দরিদ্র, অশিক্ষিত, অনুন্নত লোকদিগকে খ্রীষ্টধর্মে টানিয়া আনা এদেশে এখন আর কেহই সহ্য করিবে না। 'আধ্যাত্মিক প্রভাব' দান করিতেই কি এই ভাবে লোককে খ্রীষ্টান করা হয়, না অন্য কোন মতলব পশ্চাতে থাকে তাহা ধর্মযাজকগণই বুকে হাত দিয়া বলুন। এ দেশে যাঁহারা খ্রীষ্টান আছেন তাঁহাদের ধর্মানুশীলনে কোনও প্রকার বাধা কেহই কখনো দেয় নাই এবং দিবেও না। এ বিষয়ে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কোনও প্রকার আশঙ্কা ডক্টর কাটজুর উপরোক্ত বিবৃতি হইতে উদিত হওয়া সঙ্গত নয়।

ভারতবর্ষে বৈদেশিক মিশনরীদের খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার এবং ইউরোপ-আমেরিকায় হিন্দুসন্ন্যাসি-গণের বেদান্ত-প্রচার একার্থক নয়। ইউরোপ-আমেরিকায় যাঁহারা বেদান্ত শুনিতে আসেন, বেদান্তে আকৃষ্ট হন তাঁহারা অশিক্ষিত দরিদ্র বুদ্ধিবিচারহীন মূক জনসাধারণ নন্—তাঁহারা সমাজের সুসভ্য উচ্চশিক্ষিত নরনারী—টাকা, পোষাক, চাকুরী বা সামাজিক মানের লোভে আসেন না—আসেন অন্তরের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণায়, সত্যের সন্ধানে, শান্তির সন্ধানে। তাঁহারা দেখেন, খ্রীষ্টের যথার্থ আলোক আজ খ্রীষ্টান চার্চে পাওয়া সুকঠিন—বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই তাঁহারা প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম প্রতিফলিত দেখিয়া মুগ্ধ হন। এ দেশের সন্ন্যাসীরা তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম ছাড়িতে বলেন না—প্রকৃত খ্রীষ্টান হইতে বলেন। তাহা ছাড়া সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে হিসাবে আমরা 'খ্রীষ্টধর্ম', 'ইসলামধর্ম', এমন কি 'হিন্দুধর্ম' শব্দের প্রয়োগ করি—বেদান্ত সেই হিসাবে কোন 'ধর্মমত' নয়। বেদান্ত একটি বিজ্ঞান—যাহা সকল ধর্মের লোককে ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য ও সাধন কি তাহা বুঝাইয়া দেয়। শারীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান যেমন সকল মানুষের জন্য—বেদান্তও সেইরূপ সকল মানুষের জন্য। উহা মানুষের অন্তরতম প্রকৃতির বিজ্ঞান। পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীকে নিজেদেরই সামাজিক ও আত্মিক কল্যাণের জন্য বেদান্তের সার্বভৌমিক সত্যের শ্রবণ ও অনুশীলন করিতে হইবে। না করিলে তাঁহাদেরই লোকসান।

"ছত্রিশ কোটি দেবতা"

১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর দক্ষিণ-ভারতের রামেশ্বরের শিব-মন্দিরে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে বলিয়াছিলেন,—

"সকল উপাসনার সার এই—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। যিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। * * যে ব্যক্তি জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেবা করে তাহার প্রতি শিব, যে কেবল মন্দিরেই তাঁহাকে দর্শন করে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন। * * যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে।"

ইংরেজের অধীনতার সময়ে দেশের কর্মিগণের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর। রাজনীতি-বিযুক্ত গঠনমূলক সেবা দ্বারা জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনের মান উন্নয়নের দিকে তেমন প্রত্যক্ষ মনোযোগ দেওয়া তখন সম্ভবপর হয় নাই। দিতে পারিলে বোধ করি খুব ভাল হইত, কেননা উহাই ছিল জাতীয় প্রগতির গোড়াকার কাজ। আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ

করিয়াও যে সকল জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতেছি তাহাদের অনেকগুলিই ঠেকিতেছে ঐ গোড়াকার গলদে। যাহাদের লইয়া জাতি অগ্রসর হইবে তাহারাই পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদিগকে দাঁড়াইবার, চলিবার সামর্থ্য আগে দিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সেবার অভিযান। সেবার বিপুল ক্ষেত্র বিশাল ভারতবর্ষ জুড়িয়া পড়িয়া আছে। কোন্ রাজনৈতিক দল দেশ শাসন করিতেছেন, তাঁহারা কি কি ভুল ত্রুটি করিতেছেন, তাঁহাদের বৈদেশিক নীতি কি—এই সকল লইয়া বাদবিতণ্ডা বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেরই করিবার প্রয়োজন নাই। যতবেশী সম্ভব বলিষ্ঠ, উৎসাহী ও সহানুভূতি-সম্পন্ন যুবকগণ বরং এখন জনসেবার বাস্তবক্ষেত্রে যদি লাগিয়া যান—তাঁহাদের কায়িক ও মানসিক শক্তি 'গণকে' গড়িয়া তুলিতে নিয়োজিত করেন তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পরিকল্পিত ধাপগুলি আমরা এক এক করিয়া উঠিতে পারিব। ৬৬ বৎসর পূর্বে আমাদের স্বদেশমন্ত্রের পুরোধা যে জীবরূপী শিব সেবার আদর্শ আমাদের দিয়া গিয়াছেন তাহা কর্মে মূর্ত হইয়া উঠিতে আর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। নান্যঃ পন্থাঃ। বড়ই আনন্দের বিষয় মহাত্মা গান্ধীর উপযুক্ত শিষ্য অক্লান্ত দেশ-সেবক আচার্য বিনোবা ভাবে তাঁহার সাম্প্রতিক ভূদান-যজ্ঞের সফরে জনসেবার এই আদর্শের কথা প্রাণবন্ত ভাষায় সকলকে শুনাইতেছেন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি হরিজন পত্রিকা (১১ই এপ্রিল) হইতে লওয়া:—

"ডোমচাচি (হাজারীবাগ) গ্রামে বিনোবাজী বলিতে-ছিলেন যে, ভগবান কাশী, মথুরা এবং রামেশ্বরেই নাই। তিনি এখানেও আছেন। তারপর বিনোবাজী একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে মানে কোথায়? সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, সকলের হৃদয়ে। ইহা শুনিয়া বিনোবাজী খুশী হইলেন এবং বলিলেন, ভারতের ছোট্ট একটি গ্রামের ছেলেও বুঝিতে পারে যে, ভগবান শুধু মন্দির বা মসজিদে থাকেন না, তিনি সকলের হৃদয়ে বাস করেন।"

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুরও কিছুদিন পূর্বেকার একটি ভাষণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৭ই বৈশাখ শোলাপুর শহরে বিখ্যাত বিঠোবা মন্দিরে বিঠোবা এবং রুক্মিণীর প্রাচীন মূর্তিগুলি পরিদর্শনের পর তিনি বলেন—

"পূজা-অর্চনার দিকে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি কিন্তু একটি অতি-বৃহৎ মন্দিরে আরাধনায় ব্যাপৃত রহিয়াছি। ঐ মন্দিরের নাম ভারত—যেখানে আছে ৩৬ কোটি দেবতার মূর্তি। আমার এই ৩৬ কোটি দেবতার পূজার একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাদিগকে সুষ্ঠুতর এবং পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করিতে সাহায্য করা।"

ভগবান তথাগত ও তাঁহার ধর্ম

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

বৈশাখী পূর্ণিমা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় তিথি। এই পবিত্র দিনটি তিন প্রকারে জয়যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই শুভ তিথিতে ভগবান তথাগত খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে কপিলবাস্তু নগরের লুম্বিনী উদ্যানে জন্ম পরিগ্রহ, এই তিথিতেই পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে মগধ রাজ্যের উরুবেল নামক স্থানে বোধিদ্রুমমূলে সম্যক্ সম্বোধিলাভ, আবার এই তিথিতেই অশীতিবৎসর বয়ঃক্রমকালে কুশীনগরের উপবর্তনে শালবনে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

এই সর্বলোকানুকম্পী, লোকোত্তর মহাপুরুষের

আবির্ভাব-সময়ে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের প্রবল গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশের হিন্দু আর্যগণ যে-সকল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান নির্বিচারে মানিয়া আসিতেছিলেন, কালক্রমে সেগুলি এরূপ প্রাণহীন, নীরস ও আড়ম্বরবহুল হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহারা আর কাহারও চিত্তে ধর্মবোধের সঞ্চার করিত না। তদুপরি জাতি-বৈষম্যের বাড়াবাড়ির দরুন সর্বসাধারণের মনে এই ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে লাগিল যে, যাজক পুরোহিতই প্রতিনিধি-স্বরূপ ভগবানের পূজার্চনা করিবেন, ব্যক্তিগত ক্লেশ ও তপশ্চর্যা স্বীকার করিয়া তাহাদের নিজেদের ধ্যান-ধারণার কোনও আবশ্যকতা নাই। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোক ঐ তত্ত্বের কোন সন্ধান রাখিত না এবং রাখিবার কোন সুযোগ ও সুবিধা পাইত না। মানুষের স্বাভাবিক সরল চিত্ত এই সকল সাম্যনীতিবিগর্হিত সমাজ-ব্যবস্থা বেশীদিন নীরবে সহ্য করিতে পারিল না। ভিতরে ভিতরে একটা চঞ্চল বিদ্রোহের ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। ভগবান বুদ্ধই এই আলোড়নকারী বিদ্রোহের অগ্রণী হইয়া আবির্ভূত হইলেন। এই জন্যই আমরা তৎপ্রচারিত ধর্মকে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'rebel-child of Hinduism' অর্থাৎ হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান বলিয়া থাকি।

লোকে তাঁহাকে বেদবিরোধীই বলুক আর নাস্তিকই বলুক, তিনি সেই নিন্দা, গঞ্জনা ও বিরূপ মনোভাবকে বরণ করিয়াই বিদ্রোহের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। তিনি অতি সহজ কথায় সত্য-প্রচারের দ্বারা লোকের হৃদয়-মন জয় করিয়া লইলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল প্রেমময়, সমুদ্রের ন্যায় বিশাল এবং আকাশের মতো অনন্তবিস্তৃত। প্রেমের এই বিশালতা ও গভীরতায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—"মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন। ঠিক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমিত দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মনে অমিত করুণা দেখাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।" তিনি সামাজিক জাতি-ব্যবস্থার ক্ষুদ্র গণ্ডি ভাঙ্গিয়া ছোট-বড় সকলকে স্নেহকণ্ঠে নিজ সমীপে আহ্বান এবং ধর্মের উদার মহৎ ক্ষেত্র প্রদর্শন করেন। তাঁহার বাণী সর্বজনের হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর ছিল বলিয়া উহা কতিপয় মুষ্টিমেয় শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বজ্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের ধর্ম হইল। গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের বিনাশ এবং দুঃখ-ধ্বংসের উপায়—এই চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধ বা জ্ঞানী বা তথাগত নাম ধারণ করেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবের সমস্ত ব্যাপারই দুঃখময়। এই দুঃখের কারণ নিশ্চয়ই আছে। দুঃখের কারণ কি? দুঃখের কারণ —তৃষ্ণা বা বাসনা, অবিদ্যা বা অজ্ঞান। তৃষ্ণা বা বাসনার আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের নাশ হয়—কারণের নাশে কার্যের বিনাশ। বাসনা বা তৃষা দূর করিবার উপায় কি? তৃষ্ণানাশের উপায় আটটি :—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। দুঃখ-পরিহারের এই আটটি উপায়কে আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। সম্যক্ দৃষ্টি—জগৎকে চঞ্চল, দুঃখাত্মক, অনাত্মরূপে ধারণা করিয়া জীবনের লক্ষ্যের দিকে সর্বদা

দৃষ্টি। সম্যক্ সংকল্প—গতানুগতিক জীবনধারা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ-বর্জনের সংকল্প। সম্যক বাক্—মিথ্যা, পরনিন্দা, কর্কশবাক্য ও অসার আলাপ-পরিত্যাগ। সম্যক্ কর্মান্ত—প্রাণিহিংসাবর্জন, অচৌর্য ও অব্যভিচার। সম্যক্ আজীব—সৎপথে জীবিকার্জনের চেষ্টা। সম্যক্ ব্যায়াম—যে সকল অসদ্‌গুণ চরিত্রে এখনও দেখা দেয় নাই, সেইগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে আক্রমণ করিতে না পারে; যে-সকল অসদ্‌গুণ ভাগ্যদোষে পূর্বে অসতর্কতা নিবন্ধন আসিয়াছে সে-গুলি যাহাতে চলিয়া যায়; যে-সকল সদ্‌গুণ আয়ত্ত করা হয় নাই তাহাদের অর্জন; যে-সকল সদ্‌গুণ চরিত্রে আসিয়াছে তাহাদের পরিরক্ষণ—এই চারিটি বিষয়ে দৃঢ় চেষ্টা। সম্যক্ স্মৃতি—সংসার-প্রবাহ সংসার-প্রকৃতি ও সংসার-পরিণামের ধ্যান। সম্যক্ সমাধি—তৃষ্ণানাশের উপায়গুলি যথাযথ অনুশীলনের ফলে বাসনার আত্যন্তিক বিনাশ এবং নির্বাণের পরমানন্দ সম্ভোগের অবস্থা।

তত্ত্বজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৌতম বলিয়াছিলেন, "হে দেহরূপ গৃহের নির্মাত্রি তৃষ্ণে, অন্বেষণ করিতে করিতে আজ তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। তুমি পুনঃ আর গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না। গৃহের স্তম্ভ ও উহার পার্শ্বদণ্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন করিয়াছি। আমার সংস্কারবিহীন চিত্ত তৃষ্ণার ক্ষয়সাধন করিয়াছে।" (ধম্মপদ)

বুদ্ধ যে ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তত্ত্বের দিক দিয়া তাহার মধ্যে তিনি কোন মৌলিকত্বই দাবী করিতে পারেন না। সূত্রপিটকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি একটি প্রাচীন পথ আবিষ্কার করিয়াছি। পুরাকালের মহাজ্ঞানিগণ এই পথেই যাতায়াত করিতেন। এই পথে বিহার করিয়া আমি জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বুঝিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ভিক্ষুদের এবং শ্রাবকদের নিকট প্রচার করিয়াছি।" কাজেই তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বুদ্ধদেব কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতি পূর্বগ দার্শনিকগণের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং যে ভাবে বলিয়াছেন তাহা অপূর্ব। পণ্ডিত মোক্ষমূলর 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্রের' ভূমিকায় বলিয়াছেন—"Never in the history of the world had a scheme of salvation been put forth so simple in its nature, so free from any superhuman agency." অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ মুক্তির বাণী এমন সরলভাবে, এমন অতিপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব বর্জন করিয়া বিবৃত করেন নাই।

বৌদ্ধসাধনার চরম পরিণতি 'নির্বাণ'কে পণ্ডিতগণ তিনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন: (১) নির্বাণ—শূন্য, বিনাশ, মহাবিনাশ, অহং-বোধের বিলোপ সাধন করিয়া গভীর শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জন; (২) নির্বাণ—এক পরম রহস্য, যাহার স্বরূপ বুদ্ধ খোলাখুলি বলেন নাই; (৩) নির্বাণ—মানবজীবনের এক গৌরবময়, সুখকর, ও কল্যাণকর পরিণাম। এই নির্বাণের অবস্থা আর যাহাই হউক, উহা শুষ্ক 'শূন্য' নহে, 'না' নহে—উহা আনন্দ, আশা, অভয় ও অশোক; উহা অনির্বচনীয়—বেদ যে পদার্থের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বাক্য মনের সহিত যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ।" উহা সেই "অবাঙ্‌মনসোগোচরং" ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই অবস্থাটি অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত। এই শূন্যতা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই চরম অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্‌দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই

এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই—সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।" হিন্দুর ব্রহ্মানুভূতি, ভগবদ্দর্শন, মুক্তি বা মোক্ষের অবস্থা, আর বৌদ্ধের নির্বাণের অবস্থা একই।

বুদ্ধ হিন্দুদের অপৌরুষেয় অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাণী 'বেদে'র কর্ম-কাণ্ডান্তর্গত যাগযজ্ঞক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার এবং যজ্ঞে পশুবধ নিবারণ করিয়াছিলেন, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, ঈশ্বর আছেন কি নাই তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই ও বলিতে চাহেন নাই এবং তদানীন্তন জাতিবৈষম্যের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির বিষময় ফল দেখিয়া হিন্দুশাস্ত্রসমর্থিত 'চাতুর্বর্ণ্য' সমাজ-বিধানের বিরোধী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ডের সারাংশের সহিত তাঁহার ধর্মের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। এতদ্দেশে সাধারণতঃ যাহারা ঈশ্বর ও পরলোকে অবিশ্বাসী এবং প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম অনুসরণ করে তাহাদিগকেই ভোগবাদী নাস্তিক বলে। চার্বাক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চিত্তবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য সুখের অন্বেষণ করাই ভোগবাদী নাস্তিকদের নিরন্তর চেষ্টা। বুদ্ধ কিন্তু সম্পূর্ণ নিবৃত্তিমূলক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন—বাসনা- ও তৃষ্ণা-ত্যাগের দ্বারা সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলে পরিণামে নির্বাণের বিমল আনন্দ সম্ভোগ হয়। ইহাই বৌদ্ধসাধনায় চরম লক্ষ্য এবং মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য। বুদ্ধকে জড়বাদী নাস্তিক বলা যায় না—তিনি নিবৃত্তিমার্গী অজ্ঞেয়বাদী। ঈশ্বর-সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ বলিতেন—"সকল শাস্ত্রই যদি বলে ঈশ্বর শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ, তবে মানুষের প্রথমে শুদ্ধ ও শিব-স্বরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে সে জানিতে পারিবে ঈশ্বর কি বস্তু।" ইহা নিছক অদ্বৈতানুভূতির কথা, নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বের কথা। বুদ্ধ ঈশ্বর-সম্বন্ধে নিরুত্তর ও নীরব থাকিতেন বলিয়া একথা বলা চলে না যে, তিনি ঈশ্বরকে অস্বীকার অবিশ্বাস করিতেন। এই নীরবতার দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কতকগুলি সত্য আছে যাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না, কেবল প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়ীভূত, তৎসম্বন্ধে সংযতবাক্ হইয়া থাকাই সরলতা ও ধর্মপরায়ণতার পরিচায়ক। যে চরম সত্য বাক্য-মন-চিন্তার অতীত, যাহার সম্বন্ধে মুখে কোনও উপদেশ দেওয়া চলে না বলিয়া উপনিষদ ঘোষণা করিয়াছেন, বুদ্ধও সেই চরম সত্য-সম্বন্ধেই নীরব থাকিতেন। আমেরিকায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে আদৌ বিশ্বাস না করে, যদি সে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতে গমন না করে, তথাপি সে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভে সমর্থ হয়। সৎকর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, সাধন না করিয়া, কেবল মুখে ধর্মের কথা আওড়াইলেই এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইলেই ধর্ম হয় না।"

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুভারত বুদ্ধকে তাহার ধর্ম সংস্কৃতির মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বহু পুরাণে বুদ্ধ ঈশ্বরাবতার রূপে বর্ণিত। বুদ্ধ কিন্তু নিজেকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া কখনও ঘোষণা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "কেহই তোমাকে মুক্ত হইবার জন্য সাহায্য করিতে পারে না—নিজের সাহায্য নিজে কর—নিজ চেষ্টাদ্বারা নিজ মুক্তি-সাধনের চেষ্টা কর। বুদ্ধ শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি—তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিতে পারিবে।"

অঙ্গুলিমাল

(বৌদ্ধ-গাথা)

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

শ্রাবস্তীপুরে অঙ্গুলিমাল দস্যু ভয়ঙ্কর—
দিনে আর রাতে করিত ডাকাতি, ছিল নাকো ভয়-ডর।
হিংসার বশে সাধিত হত্যা, নির্দয় লুণ্ঠন,
নর-অঙ্গুলি গাঁথিয়া রচিত কণ্ঠের আভরণ!
ধন আর প্রাণ রক্ষার লাগি' সারা শ্রাবস্তী-বাসী,
জানালো তাদের মনের দুঃখ নৃপতি-সকাশে আসি।
মন্ত্রীরে ডাকি প্রজা-সমক্ষে কহিলা প্রসেনজিৎ—
"দস্যুরে আমি করিবারে চাই দণ্ডিত সমুচিত!
রাজ্য আমার শান্তি-ভ্রষ্ট, নহে সুখী কা'রো প্রাণ,
নিদারুণ এক আতংক মাঝে হেরি সবে ম্রিয়মাণ!
নগর-রক্ষী কি হেতু রয়েছে, কি করিছে সেনাদল?
তুচ্ছ দস্যু দমন করিতে হয়েছে কি হীনবল?
পাঠাও এখনি প্রহরী সেনানী চাই আমি প্রতিকার,
নির্মম হাতে শেষ কর তার পাশব-অত্যাচার!"
দিকে দিকে ফিরে রাজ-অনুচর, সেনা-সামন্ত কত,
অঙ্গুলিমাল তাদের নিকটে করিল না শির নত!
নৈশ আঁধারে লুকায়ে নিজেরে অবাধে যায় ও আসে,
হিংসা-অগ্নি জ্বালে সব ঠাঁই, সব লোক মরে ত্রাসে!
দস্যুর ভয়ে রাজা অস্থির—মন সদা শংকিত
নিখিলরাজ্য ভরে হাহাকারে জনগণ লাঞ্ছিত!

জেতবন মাঝে বুদ্ধ আসীন—শান্তির পরিবেশ,
ভক্ত-নিচয় ঘিরিয়া তাঁহারে শুনিতেছে উপদেশ।
হেনকালে আসে শ্রাবস্তীবাসী নরনারীগণ সবে,
বুদ্ধ-চরণে নিবেদিল ব্যথা করুণ-আর্ত-রবে—
"অতি বলবান অঙ্গুলিমাল, দুরন্ত তস্কর—
সারা শ্রাবস্তী করিয়া তুলেছে অশান্তি-জর্জর।
রাজার শাসনে নাহি পায় ত্রাস, বাধাহীন তার গতি,
করে অন্যায় আচরণ যত নিয়ত মোদের প্রতি

প্রতিকার তুমি কর মহাভাগ, নহিলে উপায় নাই,
তোমার চরণে জানাতে বেদনা সমাগত মোরা তাই!"
কন তথাগত মধুর বাক্যে সবারে অভয় দানি'—
"ফিরে যাও গৃহে, নাহিক চিন্তা, যাবে অশান্তি-গ্লানি।"

নগরীপ্রান্তে নির্জন এক অরণ্যে নিরালায়,
অঙ্গুলিমাল করিত বসতি সুখে সদা নির্ভয়!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে একদা বুদ্ধ সেই ঠাঁই উপনীত,
নেহারি তাঁহারে হইল দস্যু বিস্মিত সচকিত।
সম্ভাষি তাঁরে কহে তস্কর—"কোথা যাও, স্থির হও!"
কহেন শাস্তা—"স্থির আমি আছি, স্থির তুমি কভু নও!"
কহিল দস্যু—"তোমার কথার অর্থ বুঝি না কিছু,
জীবন দানিতে কেন মিছামিছি এলে মরণের পিছু?"
কহিলেন প্রভু,—"অহিংসা মাঝে স্থির আমি চিরকাল,
হিংসা-ধর্মে অস্থির-মন, তুমি অঙ্গুলিমাল!
জীবন তোমার পদ্ম-পত্রে জল-বিন্দুর মত,
করেছো হত্যা শত-সহস্র, তবু তুমি ব্যথাহত!
জীবনে শান্তি পাও নাই কভু, পাইবে না কোন কালে,
হিংসার পথ ভ'রে থাকে শুধু চির-অশান্তি-জালে!
অগ্নিতে যদি দাও ঘৃতাহুতি, নিভে কি গো শিখা তার?
লেলিহান শিখা শুধু শতগুণ তেজ করে বিস্তার!
কাঙালের মত কি খুঁজিছ তুমি? চাহ কোন্ বৈভব?
জ্ঞানের বিত্তে ভরি লও প্রাণ, সেই তব গৌরব!"
বুদ্ধ-বাক্যে স্তম্ভিত হল কঠোর দস্যু-প্রাণ,
অমিত দম্ভ একটি নিমেষে হয়ে গেল হতমান!
উদ্যত-ফণা ভুজংগ যেন হয়ে নির্জীব-পারা,
অবনত মাথে লুটায়ে প'ড়িল তেজ-বিক্রম-হারা!

বুদ্ধ সকাশে আসি একদিন নৃপতি প্রসেনজিৎ,
পূজিলা তাঁহার চরণ-পদ্ম গাহি বন্দনা-গীত।
নৃপতিরে ডাকি কহেন বুদ্ধ,—"শুন অদ্ভুত কথা,
দস্যু আজিকে বন্দী আমার—নাহি করে দস্যুতা!
যে ছিল ভীষণ অতি-চঞ্চল দুর্জয় এতকাল,
সম্মুখে হের স্থির প্রশান্ত সেই অঙ্গুলিমাল!"

বিস্মিত-আঁখি ভূপাল তখন, মুখে নাহি সরে বাণী,
ইন্দ্রজালের মত হয় বোধ, মন নাহি লয় মানি!
কহিলা দস্যু নমি নৃপতিরে—"মিথ্যা বিভব লাগি,
এতদিন আমি ছিলাম ভ্রান্ত, হয়ে তার অনুরাগী!
এবার চিনেছি মহাবৈভবে, তারি তরে করি লোভ,
শাস্তা-চরণে বিকায়েছি মোরে, নাহি আর কোন ক্ষোভ!"
কহিলেন রাজা—"যাহা প্রয়োজন, পাবে তুমি মোর কাছে,"
কহিলা দস্যু—"ভিক্ষুজীবনে অভাব কি আর আছে?
হস্ত পাতিলে ভিক্ষা-অন্ন পাব আমি সব ঠাঁই,
কাষায়-বস্ত্র? সেও জুটে যাবে, অভাব আর ত' নাই!"

বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ

শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত

উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে তরঙ্গ-চঞ্চলা মহাসাগর, ভৌগোলিক ভারতবর্ষও যেন সুগভীর ধ্যানের সামগ্রী। কিন্তু ভারতবর্ষের আর একটি মানসমূর্তি আছে—সে মূর্তি ধ্যানস্থ বুদ্ধের। ভারতবর্ষের প্রাণশিল্পীর যুগ যুগ সাধনার ফলে গড়ে উঠেছে এই মূর্তি।

বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে বলতে গেলে ভারতবাসীর মনে যোগাসনে উপবিষ্ট, নিমীলিত নয়ন, নির্বিকল্প-সমাধিমগ্ন এক যোগিপুরুষের ছবি ভেসে ওঠে। বরাভয়মুদ্রা তাঁর হাতে, জলদগম্ভীর-স্বরে যেন তিনি বলছেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' ধর্মপিপাসু ভারতবাসীর মনে এই বুদ্ধমূর্তি একটি চিরকালের প্রেরণা, আর ধর্ম-জিজ্ঞাসুর মনে বুদ্ধদেব একটি পরম জিজ্ঞাসা। ভারতবর্ষে ধর্মের বহু মত ও পথ রয়েছে, কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে জীবনকেই ভারতবর্ষ সব সময় উঁচু স্থান দিয়েছে। তাই বুদ্ধদেবকে সে অতি সহজেই অবতারের আসনে বসিয়ে বলতে পেরেছে,'কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর,—জয় জগদীশ হরে।' যেখানে ভাস্বর জীবন—অতলস্পর্শ হৃদয়, মত ও পথের বিভিন্নতা সেখানে নিতান্তই গৌণ।

বুদ্ধদেবের মূর্তি ও জীবন তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই বিবেকানন্দের বালকমনকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। যে বিচারশীল বিবেকী মন আপন ইষ্টদেবের মধ্যে সামান্যতম দোষও সহ্য করতে পারে না, সামান্য দোষের জন্য প্রিয়তম বিগ্রহকে বিসর্জন করতেও যে বালকমন কুণ্ঠিত হয় নি, বুদ্ধদেবের জীবনসলিলে অবগাহন করতে গিয়ে সে মন কোথাও বাধা পায়নি একথা মনে করবার কারণ আছে। বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস, তীব্রত্যাগ-বৈরাগ্য, মানবজাতির দুঃখ, জরা-মৃত্যুর জন্য তীব্র বেদনাবোধ, বিশেষ করে বুদ্ধদেবের সেই সংকল্প,—'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু'…বিবেকানন্দের

মনে একটা গভীর দাগ কেটে দিয়েছিল। বুদ্ধদেবের ধ্যান করতে করতে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন, ধ্যানাবস্থায় বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস-মূর্তি কতবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত। একবার ধ্যানাবস্থায় গৈরিকমণ্ডিত দণ্ড-কমণ্ডলুহাতে বুদ্ধদেবের দর্শন পেয়েছিলেন; আর একবার বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধধ্যানে তন্ময় হয়ে তীব্র বিরহে পার্শ্বস্থ গুরুভাইয়ের গলা জড়িয়ে তিনি কেঁদে উঠলেন—সবই তো রয়েছে ভাই, কিন্তু সেই নায়কশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম কোথায়! পরবর্তী কালেও বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে বলতে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না।

বুদ্ধদেবের জীবন ছিল অনুভূতির জীবন। তাই তাঁর জীবনে শুষ্ক দর্শনের ও তর্কের স্থান অল্প। নিজের অনুভূতিলব্ধ সত্যকে তিনি জীবন দিয়ে প্রচার করেছিলেন। স্বামিজীর ভাষায় বুদ্ধবাণী হ'ল, "প্রথমে গভীর যুক্তি-বিচারের মধ্য দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান কর, আর সেই বিশ্লেষণের পর যদি দেখ যে উহা বিশ্বের সকলের পক্ষে হিতকর তাহলে ঐ সত্যে বিশ্বাস স্থাপন কর ও জীবনে উহা রূপায়িত করে তোল এবং অপরকেও উহা জীবনে গ্রহণ করতে সাহায্য কর।" বুদ্ধ ছিলেন পুরোপুরি খাঁটি লোক—"an absolutely sane man"—"বুদ্ধদেব একজন দেহধারী মানুষমাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঘনীভূত অনুভূতি। তোমাদের সকলকেই সেই অনুভূতির ভিতর প্রবেশ করতে হবে।"

স্বামিজী তাঁর বক্তৃতাবলীর অনেক স্থানে বুদ্ধদেবকে একজন আদর্শ কর্মযোগিরূপে দেখিয়েছেন। আবার অন্যত্র তাঁকে কর্মনিষ্ঠ জ্ঞানী (working jnani) বলে বর্ণনা করেছেন। ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করাই কর্মযোগীর লক্ষ্য, আর জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-অনুভূতিই জ্ঞানীর চরমাকাঙ্ক্ষা। বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে জ্ঞানীর চরম অনুভূতি নির্বিকল্প সমাধি বা নির্বাণ লাভ করেছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন এই অনুভূতিকে সর্বসাধারণের সামগ্রী করে তুলতে। মানবজাতির দুঃখানুভূতিই তাঁকে একদিন গৃহত্যাগী করেছিল; শুধু নিজের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা তিনি কখনও করেননি। তাই তাঁর সাধনোত্তর জীবন সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি ও স্বার্থহীন ভালবাসায় মহীয়ান্ হয়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, "তাঁর সাধুত্ব অন্য কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল না। উহা সাধুত্বের জন্যই সাধুত্ব। তাঁর প্রেম ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কাম।" ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর প্রেমের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে—সমস্ত পৃথিবীতে। বিশেষ করে তাঁর ভালবাসা ছিল অজ্ঞান, দরিদ্র, অসহায়দের জন্য। তাই তাঁর ভাষা ছিল সর্বসাধারণের প্রাণের ভাষা—"আমি দরিদ্র ও জনসাধারণের জন্য। আমাকে জন-সাধারণের মর্মকথা জনসাধারণের ভাষায় বলতে দাও।" তাই বোধ হয় বুদ্ধদেবের সমস্ত বাণী সে যুগের কথ্যভাষা পালিতে লিখিত। কিন্তু তাঁর এই প্রেমের পেছনে ছিল না কোন অর্থ, মান বা সম্মানের অভিসন্ধি। তাঁর এই প্রেমের উৎস পরিপূর্ণ জ্ঞান থেকে। তাই 'কর্মনিষ্ঠ জ্ঞানী'ই বুদ্ধদেবের যোগ্যতম পরিচয়।

বুদ্ধদেবের এই অসীম হৃদয়বত্তাই স্বামিজীকে মুগ্ধ করেছিল। যে সাধনপথে তিনি নির্বাণ লাভ করলেন সে পথ তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন সর্বসাধারণের জন্য। অমৃতে সকলেরই সমান অধিকার. কোন জাতিবিশেষের তাতে একচেটিয়া দাবী থাকতে পারে না। স্বামিজী তাই বললেন, "যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল

কথায়, চলতি ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ব কি? তাঁহার মহত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁর অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব আছে তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে। কিন্তু নাই তাঁহার heart যাহা জগতে আর হইল না।" একটি খুব চমৎকার উপমা দিয়েছেন স্বামিজী—"বুদ্ধদেব যেন ধর্ম-জগতের ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটনের সমস্ত চেষ্টা যেমন আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশে উৎসর্গিত, বুদ্ধদেবের অধিকৃত ধর্মরাজ্যও ছিল জনসাধারণের জন্য। নিজের জন্য তিনি কিছুই চাননি।" যে জ্ঞান ছিল গুহার অন্ধকারে, বনানীর শান্ত নীরবতায়, তাকে বুদ্ধদেব নিয়ে এলেন সর্ব-সাধারণের মর্মদেশে। আর জীবন দিয়ে প্রচার করলেন কি করে সেই জ্ঞানকে প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগান যায়। কথাপ্রসংগে উল্লেখযোগ্য, এই 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনা' স্বামিজীরও জীবন-দর্শনের মূলবাণী ছিল। Practical Vedanta—কর্মে পরিণত জ্ঞান—ব্যক্তিজীবনে, সমাজ-জীবনে, জাতীয় জীবনে তার বিকাশ—এই ছিল স্বামিজীর স্বপ্ন। তাই এইদিক দিয়ে বুদ্ধদেব স্বামিজীর পথপ্রদর্শক, স্বামিজী তাঁর উত্তরসাধক। বুদ্ধদেবের মধ্যে বেদান্তের পরিপূর্তি লক্ষ্য করে ভক্তিতদ্গতচিত্তে বললেন,—"ভগবান বুদ্ধই সর্ব-প্রথম সেই বেদান্তকে বাস্তবভূমিতে নিয়ে আসেন ও কিভাবে তাকে জনগণের প্রাত্যহিক জীবনে প্রবর্তিত করা যায় তার নির্দেশ দেন। এক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বেদান্তের জীবন্ত মূর্তি।"

স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন মূর্তিমান বেদতত্ত্ব। 'Absolutely sane man'—পুরোপুরি খাঁটি লোক—বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে স্বামিজীর এই উক্তি শুধু ভক্তির উচ্ছ্বাসমাত্র নয়। যে যুগে আধ্যাত্মিকতা ও অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভেদ বুঝতে সাধারণ লোক ভুলে গেছে, বুদ্ধদেবই প্রথমে বললেন, 'ধর্মের সঙ্গে যাদুবিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই।' এইরূপে সর্বসমক্ষে অলৌকিক শক্তি দেখানোর অপরাধে জনৈক শিষ্যকে তিনি চিরদিনের মত বহিষ্কৃত করে একটা অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাছাড়া কী সংস্কার-মুক্ত মন ও বিনয় ছিল তাঁর! জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের আতিথ্য তিনি গ্রহণ করতেন। সকলের প্রার্থনা পূরণ করতেন। জীবনের অবসান হবে জেনেও তিনি সানন্দে পারিয়ার অন্নগ্রহণ করলেন, আর তাঁকে মুক্তিদানের জন্যে জানালেন কৃতজ্ঞতা। জীবনের শেষ ঘটনাটি এমনি করে অপূর্ব করুণায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠল। আবার রাজগীরের ছাগদের জীবনরক্ষার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চাইলেন। এতখানি করুণা, এত পৌরুষ, এত প্রেম বুদ্ধদেবের জীবনেই সম্ভব হয়েছিল।

বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের এই উদ্বেল ভক্তির আর একটি গুপ্ত কারণ ভগিনী নিবেদিতা নির্দেশ করেছেন। প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের যে দিব্যজীবন স্বামিজী স্বচক্ষে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন যে প্রেম, বীর্য ও সত্যের সংহত মূর্তি, বুদ্ধের জীবনের সংগে তা অবিকল মিলে যেত। এই অভেদ উপলব্ধি করেই বোধ হয় স্বামিজী বলেছিলেন,—'বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই, তিনি নিজে ঈশ্বর, খুব বিশ্বাস করি।' নিবেদিতার কথায় বলতে হয়, *"In Buddha he saw Ramakrishna Paramhansa, in Ramakrishna he saw Buddha."* (বুদ্ধদেবের মধ্যে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখতে পেতেন, আর রামকৃষ্ণের মধ্যে উপলব্ধি করতেন বুদ্ধকে)। বুদ্ধদেব যুগপ্রয়োজনে বেদের কর্মবাদ অর্থাৎ বাহ্যোপকরণের সাহায্যে অন্তরশুদ্ধি করা—এঁর

প্রতিবাদ করেন। বাহ্যকর্মবাদের পরিবর্তে আন্তরকর্মবাদের প্রচার করলেন। প্রচার করলেন চতুর্বিধ সত্য—(১) পৃথিবীতে জীবন দুঃখময়, (২) বাসনাই দুঃখের জনক, (৩) বাসনার অবলুপ্তিই দুঃখজয়ের মূল উপায়, (৪) প্রকৃত ধর্মজীবন-যাপনের ফলেই বাসনার বিনাশ হয়। এই বাসনার অবলুপ্তির জন্য তিনি প্রচার করলেন 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'—সৎশ্রদ্ধা, সৎসংকল্প, সদ্বাক্য, সৎকার্য, সৎচেষ্টা, সৎ-চিন্তা, সৎসংযম ও সৎসমাধি। বুদ্ধদেব নৈতিকতার অন্তরের ও বাহিরের দুটো দিকের উপর সমান জোর দিতেন। তাঁর এই নীতিবাদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেবের নীতিবাদকে লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "বুদ্ধদেবই জগৎকে দিয়েছিলেন নৈতিকতার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ধারা।"

কিন্তু বুদ্ধদেব সর্বসাধারণের জন্য মোক্ষধর্ম প্রচার করে একদিক দিয়ে ভারতবর্ষের খুব ক্ষতি করেছিলেন বলে স্বামিজী মনে করতেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—উন্নতির এই বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেই মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে, ধর্ম-অর্থ-কাম বাদ দিয়ে বাসনার নিবৃত্তি বা মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "সর্বসাধারণকে একই মোক্ষপথ অনুসরণ করানোর কেন এই প্রচেষ্টা? এই দিক দিয়ে দেখলে বুদ্ধদেবের শিক্ষা আমাদের জাতির ক্ষতি করেছে, যেমন খ্রীষ্ট অনিষ্ট করেছিলেন গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতার।" বৈদিক ধর্মেরও লক্ষ্য মোক্ষ কিন্তু বৈদিক ধর্মের পথ বিভিন্ন। জাতিধর্ম বা স্বধর্ম-সাধনের দ্বারা অন্তরশুদ্ধি হলেই সে মোক্ষধর্মের অধিকারী হবে। কিন্তু বুদ্ধদেব যোগ্যতা বিচার না করে সকলের জন্য মোক্ষধর্ম প্রচার করার ফলে দেশে উত্তর কালে নানাপ্রকার ব্যভিচার দেখা দিল। জনসাধারণ ক্রমশঃ নির্বীর্য কাপুরুষ হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য স্বামিজী বিশেষ করে পরবর্তী বৌদ্ধমতাবলম্বীদেরই এই সকল অধঃপতনের জন্য দায়ী করেছিলেন ও বলেছিলেন—"অত্যধিক দর্শনচিন্তার ফলে তাঁরা হৃদয়ের বিস্তার অনেকটা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ক্রমে 'বামাচার'রূপ নৈতিক অধঃপতন বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে বৌদ্ধধর্মকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে গেল।" বুদ্ধদেব ছিলেন হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমন্বয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিস্থল যে অপারহৃদয়বত্তা, তার অভাবে বৌদ্ধধর্মের অন্তিমকাল এ দেশে স্বাভাবিক ভাবে ঘনিয়ে এল।

এদেশে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির আরও একটি কারণ স্বামিজী নির্দেশ করেছেন। বৈচিত্র্যের দেশ এই ভারতবর্ষ, আবার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সেই এককে উপলব্ধিই ভারতবর্ষের সাধনা। তাই ভারতবর্ষে অসংখ্য মত ও পথ দেখা যায়। এক গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মোক্ষলাভের তিনটি প্রধান পথ—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের নির্দেশ করেছেন। ভারতবর্ষ যেমন নিরাকার মেনেছে, সাকারকেও স্বীকার করেছে। সাকার ঈশ্বর ছাড়া প্রেমভক্তি লাভ করা কঠিন, আর ভক্তিপথই এদেশের প্রাণের পথ। কিন্তু বুদ্ধদেব সেই প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেন। তাই ভারতবর্ষ বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধদেবকে গ্রহণ করলেও প্রাণের মধ্যে বুদ্ধবাণীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাই তারা বুদ্ধদেবকে অবতাররূপে গ্রহণ করলেও, বৌদ্ধধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করল। স্বামিজীর ভাষায় "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে মানুষমাত্রেই—স্ত্রী বা পুরুষ—অতিযত্নে আঁকড়ে থাকে, বৌদ্ধেরা গণমানস থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের হ'ল স্বাভাবিক মৃত্যু।"

তবু স্বামিজী বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের পরিপূরক বলে মনে করতেন এবং যুগপ্রয়োজনে

বৌদ্ধধর্মের সার্থকতাও তিনি স্বীকার করতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও অভাব ছিল হৃদয়ের, বুদ্ধদেব সেই অভাব পূরণ করেছিলেন। ধর্মজীবনে তিনি নিয়ে এলেন অতলগভীর হৃদয়। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের মেধা ও বুদ্ধদেবের হৃদয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ ভারতের ধর্ম। স্বামিজী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ। তার জন্যই ভারতবর্ষ আজ ত্রিশ কোটি ভিক্ষুকে অধ্যুষিত। তার জন্যই ভারতবর্ষ গত একশত বৎসর বিদেশীর পদানত। আজ আমাদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের সুতীক্ষ্ণ মেধার সঙ্গে মহামানব বুদ্ধদেবের অপূর্ব হৃদয়, উদার প্রাণ, এবং অদ্ভুত মানবিকতার সমন্বয় সাধন করতে হবে।"

বোধ করি এই মিলনমন্ত্রের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তার নবজাগৃতি সম্ভবপর।

পরমহংস*

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য, এম্‌-এ, পি-আর্‌-এস্‌, দর্শনসাগর

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেব ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনেক ওলট-পালট ঘটে গেছে। কিন্তু ঐতিহ্য হিসাবে আমরা পেয়েছি ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা, যোগের প্রতি সম্ভ্রম ও সন্ন্যাসের প্রতি ভক্তি। যাঁরা ইহজীবনটাকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করেন নি, যাঁরা চঞ্চল মনকে সংযত করে আত্মজ্ঞান লাভ করতে যত্ন করেছেন এবং যাঁরা আত্মীয়স্বজনের মায়া ও সংসারের বন্ধন কাটাতে পেরেছেন তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক আদর্শ হিসাবে ধরে নিয়ে জনসাধারণ নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছে এবং যখন তাতে অসমর্থ হয়েছে তখন তারা নিজেদের ব্যর্থতাকে গৌরবের মুকুট পরায়নি। মানুষের মনের কোণে কোথায় এমন একটা অসম্পূর্ণতার অস্বস্তি লুকোনো আছে যাতে সে নিজের অজ্ঞতা, অক্ষমতা বা অধঃপতনকে বরণ করে নিতে পারেনি—তাদের বিরুদ্ধে সে লড়াই করেছে এবং যাঁরা সেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন তাঁদের সান্নিধ্য ও সহায়তা পেয়ে কৃতার্থ মনে করেছে এবং দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁদের অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছে। মহাপ্রাণ মহামানবকে যুগে যুগে সমাজ ভগবানের মূর্ত বিকাশরূপে দেখেছে, ঈশ্বরের বিভূতি তাঁতে লক্ষ্য করেছে, এমন কি অবতার বলে পূজা করেছে। সসীমের মধ্যে অসীমের আবির্ভাব তাকে যুগপৎ চমৎকৃত, সন্ত্রস্ত ও আকৃষ্ট করেছে।

নৈসর্গিক জগতের গতানুগতিকতার ধারা ঐশীশক্তির স্ফুরণ ও বৃদ্ধিতে খাটে না। তাই ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট সাধকের শিক্ষাদীক্ষার ক্রম ও প্রণালী কোনও বাঁধাধরা নিয়মে চলে না। তাঁদের অনেকেই প্রকৃতির পাঠশালাতেই তাঁদের শিক্ষা সমাপন করেছেন, মানুষের শাস্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার সুবিধা বা প্রয়োজন তাঁদের অনেকের জীবনে দেখা দেয়নি। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই কেন না, মৌলিক সত্য যাঁরা

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে।

আবিষ্কার করেন সেই সব মন্ত্রদ্রষ্টারা অনুপ্রেরণা লাভ করেন বিশ্বের খোলা পুঁথির পাতা থেকে—যেখানে সঙ্কীর্ণতার অবসর নেই, বিভিন্ন মতের দ্বন্দ্ব নেই, স্বার্থের গন্ধ নেই, অচলতার বন্ধন নেই। জগৎ চলে সকল গণ্ডীর বাঁধ ভেঙ্গে, ঘটনা-প্রবাহকে চলিষ্ণু রেখে ও বৈচিত্র্যকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে।

হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম গড়ে উঠেছিল প্রকৃতিকে অনুকরণ করে। যারা স্বার্থ ও স্বজন নিয়ে থাকবে তারা থাকবে নীচে, আর যাঁরা সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন তাঁরা থাকবেন উপরে। [যারা চাইবে ভূতি ও প্রেয়স্ তারা সম্ভূতি ও শ্রেয়সের উপাসকদের সমান পর্যায় বা মর্যাদা লাভ করবে না।] যাদের শক্তি বাহুতে, তারা যাঁদের শক্তি মনে তাঁদের সামিল হবে না। প্রবৃত্তির বিস্তৃত মার্গ যারা বেছে নেবে, তারা নিবৃত্তির সঙ্কীর্ণ মার্গের যাত্রীদের পিছনে পড়ে থাকবে।

কিন্তু মনতো ছোট বড় দুইই নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে পারে। তাই যাঁরা বৃহৎকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন তাঁরাই হবেন বড়। ব্রহ্মই বৃহত্তম বস্তু—তাই ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ যিনি তিনিই হবেন সকলের চেয়ে বড়। কৃচ্ছ্রসাধন না করলেও তিনি সন্ন্যাসী—ক্ষুদ্রতার দ্যোতক জাতিবর্ণের চিহ্ন তিনি দেহে ধারণ করেন না, তাঁর না আছে শিখা না আছে যজ্ঞোপবীত। বৈরাগ্যসাধন ছাড়া এ অবস্থায় সহজে পৌছান যায় না। [যিনি কুটীচক তাঁর গতি ভুবর্লোক ; যিনি বহূদক তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন ; যিনি হংস তাঁর তপোলোকে অবস্থান, আর যিনি পরমহংস তিনি সত্যলোকের অধিবাসী। যাঁরা তুরীয়াতীত ও অবধূত, তাঁরা নিজের আত্মাতেই পরমপদ লাভ করেন এ কল্পনাও কখন কখন করা হয়েছে ; কিন্তু সাধারণতঃ হংস-পদবী লাভ করাই সন্ন্যাসের কাম্য বলে বিবেচিত হয়েছে।] জীবজগতে হংস যেমন মৃণালবন্ধন ছিন্ন করে আকাশে উড়ে যায়, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞ সংসারের মায়াপাশ কেটে চলে যান। হংস ক্ষীরমিশ্রিত নীর থেকে ক্ষীরমাত্র গ্রহণ করে—ব্রহ্মজ্ঞও তেমনই একমাত্র সদ্‌বস্তু ব্রহ্মকে অসৎ মায়াপ্রপঞ্চ থেকে আলাদা করে নেন—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তিনি গোলমালের গোল ছেড়ে মালটি নিয়ে নেন। জগতের কলুষতা যাঁর শুচিতাকে ম্লান করতে পারে না এবং যিনি সংসারের স্নেহ-সলিলে আর্দ্র হন না, যিনি প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাসের 'সোঽহম্' ধ্বনির মধ্যে আপনার ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করেন তিনিই যথার্থ হংস। নভোমণ্ডলের ভাস্বর হংসরূপী সূর্যের মত যিনি অবিদ্যারূপ অন্ধকার নাশ করেন তিনিই হংস। এই হংসের পরাকাষ্ঠাই পরমহংস—তিনিই আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে অবস্থিত।

ভাগ্যবান আমরা যে এই দেশেই গত শতাব্দীতে এমন একজন ভাগবতপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন প্রকৃতির পাঠশালায় ; যিনি লৌকিক গুরু বরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু দেখিয়েছিলেন যে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ নির্ভর করে না কালের পরিমাণের উপর, কিন্তু ধ্যানের তীব্রতা ও প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষার উপর ; যাঁর অপাপ-বিদ্ধ শরীর কাঞ্চনের কলুষস্পর্শে ও পাতকীর দেহসংস্পর্শে বিকৃত ও সঙ্কুচিত হয়ে যেতো ; যিনি কেবল স্বয়ংসিদ্ধ নন, কিন্তু অন্যেতে ব্রাহ্মীভাব সঞ্চারিত করতে পারতেন মাত্র স্পর্শের দ্বারা ; যিনি শান্ত-সমাহিত-দৃষ্টির দ্বারা অতিবড় নাস্তিক ও উচ্ছৃঙ্খলের চিত্তকেও ধর্মপ্রবণ করবার শক্তি ধারণ করতেন। এই অলোক-সামান্য পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যে সকল অনৈসর্গিক ঘটনাবলী গড়ে উঠেছে বা এখনও উঠছে তাদের কথা বাদ দিলেও যে ছবিটি

আমাদের মানস চক্ষে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এক অসামান্য জিজ্ঞাসু সমন্বয়বাদী ও সমন্বয়কারী তত্ত্ববিদের প্রশান্তমূর্তি। উপাদান হিসাবে তাঁর চরিত্রে ছিল ভাবের প্রাবল্য, জিজ্ঞাসার আতিশয্য, আধ্যাত্মিক অনুভূতি-পরীক্ষার আত্যন্তিক আগ্রহ, ভক্তির প্রবণতা, সমাধির তীব্রতা, জীবসেবার আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীন মত-প্রকাশের বলিষ্ঠতা ও দৈনন্দিন জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি নির্দোষ পরিহাসপ্রিয়তা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ভক্তের ভগবান্, জ্ঞানীর ব্রহ্ম ও যোগীর আত্মাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন বলে সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্ব, নিত্য ও লীলার কলহ তাঁর মনকে সংশয়বিদ্ধ বা দ্বিধাবিভক্ত করেনি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করে নিয়ে তিনি আদ্যাশক্তি লীলাময়ী মহামায়া কালীর মধ্যেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সন্ধান পেয়েছিলেন। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত আর শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গর তাঁর কানে একই ঝঙ্কারে ধ্বনিত হোতো।

তাঁর জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল ভক্তির ভিত্তির উপর। তাই জ্ঞান ও কর্মযোগের চেয়ে ভক্তিযোগকেই তিনি যুগধর্ম বলে মনে করতেন। [যেমন রোসনচৌকির পোঁ ধরার ঐক্যের উপর রংবেরংএর সুর তোলা হয় বলেই তা উপভোগ্য, তেমনই জ্ঞানমার্গীর অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তার উপর বৈচিত্র্যের লহর ওঠালেই ধর্মজীবন সরস হয়।] এখানে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই—বহিঃ শিব হৃদে কালী মুখে হরিবোল। চাই অহৈতুকী রাগানুগা ভক্তি ["পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়।··প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল"।] তবে অনন্ত মত অনন্ত পথ—কাজেই কোনও ধর্মের অধিকার নেই বলবার যে, সেইই মোক্ষের একমাত্র মুক্তদ্বার।

কিন্তু ধর্মজীবনের একটা দিক্ হচ্ছে সামাজিক কর্তব্য। মানুষকে অবহেলা করে বা ঘৃণা করে ভগবানকে পাওয়া যায় না। খালি সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম বলে চেঁচালে চলবে না। সর্বজীবে বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে তাঁর অবস্থান উপলব্ধি করে জীবসেবায় সার্থক করে তুলতে হবে ব্রহ্মজ্ঞানকে। দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতে হবে শ্রদ্ধার সহিত, সঙ্কোচের সহিত, সন্ত্রস্ততার সহিত। [নির্জনের বেড়া দিয়ে সাধনকে পুষ্ট করে নিয়ে সংসারে নামলে দৈ থেকে তোলা মাখনের মতন মন আর সংসারে মিশে যায় না—কামিনী-কাঞ্চনের মোহ কেটে যায়। তখন অহংভাব থাকে না ও ভগবানের প্রতি তুঁহু তুঁহু ভাব অর্থাৎ সব কাজই ভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে এই ভাব এসে পড়ে।] প্রিয়শিষ্য বিবেকানন্দকে তিনি সমাধির পথ ধরতে দেন নি কেননা, বোধিসত্ত্বের ব্রত নিয়ে অজ্ঞান, দুঃস্থ, অধিকার-বঞ্চিত অগণিত নরনারীর আত্মার উন্নতির ভার নেবার লোক তা হলে থাকবে না। এই ক্ষাত্রশক্তিকে তাঁর ব্রাহ্মণ্যবথধুরাতে যোজিত করে তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীর বিশ্ব-পর্যটনের ব্যবস্থা করেছিলেন বলেই আজ তাহা দিগন্তপ্রসারী। মহাপ্রভু চৈতন্যের মত তিনি শিষ্যগোষ্ঠী-নির্বাচনে অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়ে গিয়েছেন এবং প্রচলিত সনাতন পথ ত্যাগ করে জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে শিষ্যগণকে সন্ন্যাস-আশ্রমের অধিকারী করে ভাবী যুগের সূচনা করে দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে খাট-বিছানায় বসতেন। লালপেড়ে কাপড় জামা জুতা মোজা সব পরতেন, অথচ সংসার করতেন না। ভাব সমস্ত ত্যাগী সন্ন্যাসীর বলে তিনি পরমহংস।

তিনি মানুষ না দেবতা এসম্বন্ধে বিবেকানন্দ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে যা বলেছিলেন তাই

উদ্ধৃত করে আমরা এ কথিকা সমাপ্ত কোরবো। ডাঃ সরকার যখন শিষ্যগণকে বল্লেন, ঈশ্বর বলে পূজা করে ভাল লোক শ্রীরামকৃষ্ণের মাথা না খেতে, তখন বিবেকানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন—"এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন vegetable creation (উদ্ভিদ) ও animal creation (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটা point (স্থান) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী স্থির করা ভারি কঠিন, সেইরূপ man-world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে যেখানে বলা কঠিন এ ব্যক্তি মানুষ কি ঈশ্বর। We offer to him worship bordering on Divine Worship (এঁকে আমরা পূজা করি—সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি)।" প্রিয়তম অন্তরঙ্গ শিষ্যের এই উক্তির উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

ঋগ্বেদের উষাস্তোত্র

অধ্যাপিকা শ্রীযূথিকা ঘোষ, এম্-এ, বি-টি

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের মূল উৎস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ধর্মই মানুষকে প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে, সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধির জন্য নব নব উপকরণ-আহরণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ধর্মের বাহন হইয়াই ভাষা সাহিত্যের দরবারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ধর্মের নামে যাহা কিছু কীর্তিত ও প্রচারিত হইত প্রাচীন যুগের সরল মানবকে তাহা আকৃষ্ট করিত বিশেষভাবে। ভারতের সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই চিরপ্রথার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বেদই ভারতের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান ধর্মসাহিত্য। বৈদিক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারার বিশিষ্ট দিগ্‌গুলি সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান-গরিমার সাক্ষ্য বহন করিতেছে এই বিশাল বৈদিক সাহিত্য। বৈদিক মন্ত্রসমূহে আর্যগণের ধর্মপ্রবণ চিত্তের সরল ভাবটির সহিত আমরা সহজেই পরিচয় লাভ করি। আর্যগণ যে সব রহস্যময় পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন প্রকৃতির মধ্যে, সেখানেই কোন এক দেবতার কল্পনা করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছেন আবেগময়ী ভাষায়। বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির অপরূপ রূপ পরিবর্তন তাঁহাদের মনে দিত দোলা; বিশ্বসৃষ্টির অনবদ্য মাধুর্যে বিহ্বল হইত তাঁহাদের চিত্ত; অপূর্ব আনন্দের আতিশয্যে অভীপ্সিত দেবতাকে আবাহন করিতেন মন্ত্রের পর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। বিশ্বস্রষ্টার বহুবিচিত্র শক্তির কথা স্মরণ করিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত হইত তাঁহাদের মন, বিভিন্ন স্থানে বিরাট বিপুল শক্তির প্রকাশ অনুভব করিয়া অগণিত সূক্ত রচনার দ্বারা দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন আর্যগণ। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহারা বহুর ভিতর হইতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর সন্ধান পাইয়া অধিকতর বিস্মিত হন এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সেই "সত্যং শিবং সুন্দরম্" এর মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—যে ভাবের পরিচয় দিতে যাইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'ভারততীর্থ' কবিতায়—

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহাওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

বিরাট বিশ্বজগতে নিরন্তর অদ্ভুত আলোড়ন চলিয়াছে, সেথানে যে বিশাল শক্তির ক্রীড়া চলিতেছে তাহার অলৌকিকতা প্রাচীন আর্যগণকে অভিভূত করিত। মানবের শক্তি কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য, কত অকিঞ্চিৎকর প্রকৃতির বিপুল শক্তির নিকট। নিজেদের কল্যাণকামনায় সেই অলৌকিক শক্তির প্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত বিস্ময়বিমথিত চিত্তে অন্তরের ভাবটিকে বাণীরূপ দান করিতেন তাঁহারা কল্পিত দেবতার উদ্দেশে শত শত কবিতা রচনা করিয়া। বিশ্বশোভার স্তাবক তাঁহারা, প্রকৃতির বিশ্বস্ত পূজারী তাঁহারা, প্রকৃতির সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া অশেষ তৃপ্তিলাভ করিতেন। শিশুসুলভ সরলতার সহিত দ্বিধাহীন চিত্তে দেবতার নিকট পার্থিব সুখ-বৃদ্ধির আশায় সাধারণ দ্রব্য প্রার্থনা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রত্যেক দেবতার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতেন সরলচিত্তে এবং সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য দেবতাকে অনুরোধ করিতেন। স্তব-স্তুতি ও যজ্ঞের মন্ত্র—প্রধানতঃ এই সমস্ত বিষয় লইয়াই বেদের সংহিতা-ভাগ পদ্যে রচিত হইয়াছে। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীন সংহিতা। ঋগ্বেদেই প্রথম উন্মেষ ভারতীয় সাহিত্যের। যজ্ঞস্থলে দেবতাকে আবাহন করা হইত ঋগ্বেদের মন্ত্রের দ্বারা। বহু দেবদেবীর বন্দনা-গান গাহিয়াছেন আর্যগণ ঋগ্বেদে। পুরুষ দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং স্ত্রীদেবতাদের মধ্যে উষাই অধিক-সংখ্যক স্তোত্রে বন্দিত হইয়াছেন। প্রায় ২০টি সূক্তে উষাদেবীর বন্দনা করা হইয়াছে।

রাত্রি ও দিনের যে স্নিগ্ধ সন্ধিক্ষণ সেই মধুর মুহূর্তে হয় উষার আগমন। ক্ষণে ক্ষণে ধরণীর বক্ষে প্রকৃতিদেবীর অপরূপ পরিবর্তন ঘটে বর্ণে, রূপে, বৈচিত্র্যে। প্রকৃতির সুমধুর বহুবিচিত্র প্রকাশ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের কবির মনে জাগায় অপূর্ব প্রেরণা; আনন্দবিহ্বল চিত্তে বাস্তব জগৎ অতিক্রম করিয়া কবি উপস্থিত হন কল্প-লোকের দ্বারপ্রান্তে; ভাববিহ্বল কবির সম্মুখে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয় কল্পলোকের দ্বার। অবাধ গতিতে কবি তখন বিচরণ করেন উদার উন্মুক্ত মানসলোকে। কি যে অনির্বচনীয় আনন্দরসে সিঞ্চিত হয় কবির মনপ্রাণ তাহা কবি ঠিক প্রকাশ করিতে পারেন না; আংশিক ভাবে তিনি নিজের ভাব প্রকাশ করেন সুললিত ছন্দোবদ্ধ ভাষায়। প্রকৃতিবৈচিত্র্যের যে রমণীয় মুহূর্ত উষা তাহা যুগে যুগে কবিদের উৎসাহ দিয়াছে কবিতা-রচনায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যিনি "সুদূরের পিয়াসী" তিনিও উষার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া গাহিয়াছেন—

অরুণময়ী তরুণী উষা
জাগায়ে দিল গান
পূরবমেঘে কনকমুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ।
কাহার হাসি বহিয়া এনে
করিলি সুধা দান।

এই ব্রাহ্মমুহূর্তের নিত্যনূতন বর্ণসুষমায় সাতিশয় পুলকিত হইয়া আর্যগণ আবাহন করিতেন উষা-দেবীকে—

আ দ্যাং তনোষি রশ্মিভিরান্তরিক্ষমুরু প্রিয়ম্ ॥
উষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥ (৪।৫২।৭)

হে দেবি, সমগ্র আকাশ, সমগ্র অন্তরিক্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে তোমার পূত প্রভায়।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে পূর্বদিকের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া উষার নিস্তব্ধ আগমন-দর্শনে অতীব আনন্দিত হইতেন আর্যগণ। দীপ্তিময়ী দ্যুলোক-দুহিতা তিনি, সকল দিক শুভ্র তেজোরাশিতে উদ্ভাসিত করিয়া গগনবক্ষে আবির্ভূতা তিনি, স্বর্ণরথে ধীরে ধীরে নামিয়া আসেন বিশাল ধরাতলে—

প্রতি ষ্যা সুনরী জনী ব্যুচ্ছন্তী পরি স্বসুঃ ॥
দিবো অদর্শি দুহিতা ॥ (৪।৫২।১)

মানবের প্রেরণাদাত্রী, কল্যাণের জনয়িত্রী, অন্ধকার-অপসারণরতা গগনতনয়া উষাদেবী আকাশ-প্রাঙ্গণে প্রকাশিত হইয়াছেন।

অম্বর-দুহিতা তিনি, পবিত্রতার পূর্ণ প্রকাশ তাঁহার মধ্যে ; মানবের মনে প্রভাতের পবিত্র লগ্নে প্রজ্বালিত করেন সত্যের দীপশিখা। রজনীর নিদ্রায় ক্লান্তিমুক্ত সবল সতেজ মনে এই অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্তন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত আর্যগণ শ্রদ্ধায় উষাদেবীকে প্রণতি-নিবেদন করিতেন। উষাদেবীর অগণিত গুণাবলী স্মরণ করিয়া উচ্চারণ করিতেন একাধিক সূক্ত—

অচ্ছা বো দেবীমুষসং বিভাতীং
প্র বো ভরধ্বং নমসা সুবৃক্তিম্ ॥ (৩।৬১।৫)

জ্যোতিষ্মতী উষাদেবীর উদ্দেশে সুন্দর স্তোত্র রচনা কর, সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন কর সকলে তাঁহার চরণে।

কমনীয়া লাবণ্যময়ী উষার আগমনে রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার হয় ধীরে ধীরে অপসৃত। যাহা কিছু কলুষতাময়, কালিমাপূর্ণ, পাপমলিন সবই হয় তিরোহিত নবীন আলোকস্পর্শে। অসুন্দর অনাচারের নৃত্য হয় স্তব্ধ ; শান্ত স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশে শ্রুত হয় উষার পদবিক্ষেপ। সেই শান্ত শুভ মুহূর্তে পবিত্রতার মধুর স্পর্শে অপূর্ব আনন্দের সন্ধান পায় মানুষ। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া স্নিগ্ধ আলোকরাশি চতুর্দিকে বিকিরণ করিয়া তিনি মানবের মনকে আকৃষ্ট করেন সুন্দরের প্রতি, মানবকে চালিত করেন সত্যের পথে। সত্যাশ্রয়ী উষাদেবী বহুস্থানে ঋতাবরী নামে অভিহিত হইয়াছেন। সত্যই যে মানুষকে অনাবিল আনন্দের সন্ধান দিতে পারে তাহা আর্যগণ স্বীকার করিতেন, তাই প্রভাতের প্রথম পবিত্র স্পর্শে উষাদেবীর নিকট সত্যের পূত আলোক ভিক্ষা করিতেন। আগ্রহভরে তাঁহারা গাহিতেন—

ঋতাবরী দিবো অর্কৈরবোধ্যা
রেবতী রোদসী চিত্রমস্থাৎ। (৩।৬১।৬)

সত্যের অর্চনাকারিণী গগনকে আলোকমণ্ডিত করিয়াছেন। ঐশ্বর্যশালিনী দেবী গগনে বিচিত্র-ভাবে অবস্থান করিতেছেন।

মানুষ গভীর সুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে রাত্রিকালে, কিন্তু সেই সুপ্তি তাহাকে যদিও দেয় ক্লান্তিমোচনের অদ্ভুত আনন্দ, তবুও সেই সুপ্তির রেশ সে নিরন্তর ভোগ করিতে পারে না। নিরন্তর সুপ্তিভোগ করার নামই ত মহানিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যু। নির্দিষ্ট সময় সুপ্তির আনন্দ ভোগ করিয়া পুনরায় নির্ধারিত কাজের জন্য কর্মজগতে নামিতে হইবে। সংসারের ভরণপোষণ ও নিজের জীবধর্ম পরি-পূর্তির জন্য প্রয়োজন কর্মস্পৃহার। গগন-তনয়া প্রেরণাময়ী আনন্দরূপা উষাদেবী তাই প্রতিদিন একই সময়ে পূর্বাকাশে উদিতা হন জীবজগৎকে সুপ্তির ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে জাগাইয়া তুলিতে। মাতৃস্নেহে পূর্ণা তিনি, জননীর দায়িত্ব ন্যস্ত তাহার উপর, তাই সন্তানের কল্যাণের জন্য, তনয়ের সুখতৃষ্ণা

মিটাইবার জন্য অদৃশ্য অঙ্গুলিচালনে প্রেরণা দেন সমগ্র বিশ্বজগৎকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য। তাই আমরা দেখি যাদুমন্ত্রে যেন অপসারিত হয় রাত্রির নিস্তব্ধতা এবং চতুর্দিক ধীরে ধীরে মুখরিত হয় কর্মব্যস্ততায়। মানব, জীবজন্তু সকলেই নূতন প্রেরণায় নবীন উত্তমে কর্মসাধনে তৎপর হয়। বিহগের নীড়েতেও শ্রুত হয় উষার পদধ্বনি ; তাই পক্ষিকুল মধুর কাকলীতে পূর্ণ করে দিঙ্মণ্ডল; নীড় ত্যাগ করিতে উদ্‌গ্রীব হয় আহার-অন্বেষণের জন্য —

যূয়ং হি দেবীঋর্তযুগ্‌ভিরশ্বৈঃ
পরিপ্রয়াথ ভুবনানি সন্তঃ।
প্রবোধয়ন্তীরুষসঃ সসন্তং
দ্বিপাচ্চতুষ্পাচ্চরথায় জীবম্ ॥ (৪।৫১।৫)

—অশ্বপৃষ্ঠে নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র জগৎ-পরিক্রমার সময় নিদ্রিত দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রত্যেক জীবকেই জাগ্রত কর তুমি, তাহাদের গতিশীল কর তুমি।

পূর্বাচলে উষার আগমনের কিছু পরেই হয় প্রদীপ্ত সূর্যের আবির্ভাব, আকাশপ্রাঙ্গণে বিস্তৃত হয় আলোকরাশি, তাই ঋগ্বেদে উষার উদ্দেশে রচিত স্তোত্রসমূহে উষা ও সূর্যের মধ্যে মধুর সম্পর্কের কল্পনা করা হইয়াছে। দীপ্তিময়ী পুণ্যময়ী উষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়াই যেন সপ্তরথে আবির্ভূত হন দিবাকর ; উষার অসমাপ্ত কর্ম শেষ করিবার জন্য যেন ভানুর উদয় পূর্বগগনে। "উষা যাতি স্বসরস্য পত্নী" (৩।৬১।৪)—সূর্যপত্নী উষা গগনমার্গে বিচরণ করিতেছেন। অন্যান্য দেবতাদের কথাও উষা-সূক্তে পাওয়া যায়। রাত্রি উষার ভগিনী, তাই উষাস্তোত্রে 'নক্তোষষা' কথাটি বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। অগ্নির সহিত তাঁহার নিবিড় সম্বন্ধ কেননা উষাকালে পূজারী শয্যাত্যাগ করিয়া ব্যস্ত হয় পূজার আয়োজনে, হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আহুতি-প্রদানে ব্যগ্র হয়, সেই সময় আবাহন করে অভীষ্ট দেবতাদের ; সেজন্য অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাকে 'উষর্বুধ' বলা হয়, অর্থাৎ উষসি বুধ্যন্তে—প্রভাতকালে যাঁহারা জাগরিত হন। দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয়ের কথা উষা-স্তোত্রে পাওয়া যায়। উষার স্তুতির সহিত এই দেবচিকিৎসকদ্বয়ের বন্দনা করা হইয়াছে—

উত সখাস্যশ্বিনোরুত মাতা গবামসি ॥
উতোষো বস্ব ঈশিষে ॥ (৪।৫২।৩)

অশ্বীদের বান্ধবী তুমি, আলোকের জনয়িত্রী তুমি, ঐশ্বর্যপ্রদায়িনী তুমি, তোমাকে জানাই আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

পৃথিবীর বক্ষে সুখে কালাতিপাত করিতে হইলে প্রয়োজন কিছু পার্থিব সম্পত্তির। জননীর কাছে সন্তান সেই সম্পত্তি যাচ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। প্রত্যেক দেবতার কাছে আর্যগণ সরল প্রাণে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সাধারণ সামগ্রী প্রার্থনা করিতেন। ধন, কীর্তি, পুত্র সকলই নিঃসঙ্কোচে উষাদেবীর কাছে চাহিতেন।

রয়িং দিবো দুহিতরো বিভাতীঃ ॥
প্রজাবন্তং যচ্ছতাস্মাসু দেবীঃ ॥ (৪।৫১।১০)
বয়ং স্যামযশসো জনেষু। (৪।৫১।১১)

—দ্যুলোকদুহিতা আমাদের উপর আলোক বিকিরণ কর, আমদের ধন ও বীর্যশালী পুত্র দান কর। লোকজগতে আমরা যেন প্রসিদ্ধি লাভ করি।

গীতি-কবিতার উদ্ভব পরবর্তী যুগে হইলেও ঋগ্বেদের ভিতর এমন কবিতা আমরা পাই যেখানে লিরিকের সুরটি আমাদের চিত্তকে সরস করিয়া তোলে। উষাদেবীর উদ্দেশে রচিত স্তোত্রগুলি ভাষালালিত্যে ও ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তাহারা সমুজ্জ্বল। দীপ্তিময়ী শুভ্রতেজোবসনা উষাদেবীর স্বরূপটি

পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য সেই অতীত যুগে রচয়িতাগণ সার্থক উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের সাহায্যে একদিকে যেমন সূক্তগুলির বাহ্যিক সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে ভাবসম্পদকে গভীর করিয়া তুলিয়াছেন—

বহন্তি সীমরুণাসো রুশন্তো গাবঃ সুভগামুর্বিয়া প্রথানাং।
অপেজতে শূরো অস্তেব শত্রূন্ বাধতে তমো অজিরো ন বোল্হা॥ (৬।৬৪।৩)

অরুণোজ্জ্বল গোসমূহ সুদূরপ্রসারিণী সৌভাগ্যময়ী উষাদেবীর বাহক। সাহসী ধানুষ্কের ন্যায় তিনি শত্রুদের ধ্বংস করেন ও সুদক্ষ যোদ্ধার ন্যায় অন্ধকার অপসারিত করেন।

প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত গবাং সর্গা ন রশ্ময়ঃ॥
ওষা অপ্রা উরু জ্রয়ঃ॥ (৪।৫২।৫)

পূতরশ্মিগুলি যেন বারিধারার ন্যায় নামিয়া আসে ধরণীর বক্ষে; উষাদেবী পর্যাপ্ত আলোকে সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

উষাস্তোত্রের অনেক স্তবকেই লিরিক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সহজ সরল শব্দের দ্বারা ভাবের সূক্ষ্ম চারুত্ব বিকশিত হইয়াছে; বিচিত্ররমণীয় প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা ভাবগভীরতা প্রকাশিত হইয়াছে—

উষো দেব্যমর্ত্যা বিভাহি
চন্দ্ররথা সূনৃতা ঈরয়ন্তী॥
আ ত্বা বহন্তু সুযমাসো অশ্বা
হিরণ্যবর্ণাং পৃথুপাজসো যে॥ (৩।৬১।২)

—শক্তিরূপিণী তেজোময়ী দেবী তুমি, মৃত্যুর অধীন নও তুমি, তোমার স্বর্ণরথ সুদৃঢ় অশ্বগণ সুষ্ঠুভাবে বহন করুক, হে সত্যের পূজারিণী, আলোকরাশিতে সর্বস্থান পরিপূর্ণ কর।

আদিম যুগের সরলতা, উচ্চ মনোভাব আজ অপসৃতপ্রায়। যে সুখ-শান্তির অধিকারী ছিলেন আর্যগণ, আমরা সেই অনাবিল আনন্দের সন্ধান আজ কেন পাই না? হিংসা, দ্বেষ, কলুষতা, কালিমায় জগৎ পূর্ণ, এক জাতির সহিত অপর জাতির যে মৈত্রীবন্ধনের সূত্র তাহা শিথিল হইতে চলিয়াছে; অবিশ্বাস ও সন্দেহের কালোছায়া সকলের মনকে আবৃত করিতেছে। সমবেতভাবে উদাত্তকণ্ঠে শান্তিকামনায় আর্য ঋষিদের ন্যায় সরলপ্রাণে আজ আমাদের গাহিতে হইবে—

যবয়দ্দ্বেষসং ত্বা চিকিত্বিৎ সূনৃতাবরি॥
প্রতি স্তোমৈরভুৎস্মহি॥ (৪।৫২।৪)

—সত্যের প্রতিমূর্তি তুমি, হে উষাদেবী, দ্বেষহিংসার প্রতিরোধকারিণী তুমি, জ্ঞান-প্রদায়িনী তুমি, আমাদের চিত্তে জাগ্রত হও।

কোথায় তুমি?

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কেউ বা দেখি গুরুর কাছে
তোমার তত্ত্ব বুঝতে যায়।
কেউ বা নানান শাস্ত্র ঘেঁটে
তোমার স্বরূপ খুঁজতে চায়।
কেউ বা খুঁজে মঠ-দেউলে,
তীর্থে-তীর্থে কেউ বা বুলে,
সোনা ফেলি অঞ্চলেতে
গিরা তারা বাঁধছে হায়।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
তোমার গ্রহ চন্দ্র তারা,
তোমার ভূধর তোমার সাগর
তোমার কানন নদীর ধারা,

তোমার কথাই কয় যে নিতি,
গাইছে তব প্রণব-নীতি।
একি শুধু কথার কথা
কেবল কবির কল্পনায়?
প্রতিক্ষণই দেখছি আমি
আছ তুমি ভুবন ছেয়ে।
নিশায় দেখি কোটি তারায়
আমার পানে রইছ চেয়ে।
সংজ্ঞা যদি না হয় তবু
নারি তোমায় চিনতে প্রভু,
শাস্ত্র, গুরু, দেবতা কারো
সাধ্য ত নাই, সাধব কা'য়?

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

(এক)

বিশ্বাসী ভক্ত যদু

স্বামী ঈশানানন্দ

জয়রামবাটীতে তখন রাধুর বিবাহ উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ, যোগেন মা, গোলাপ মা ও কয়েক জন ব্রহ্মচারীও রহিয়াছেন। বিবাহান্তে বরকনে বিদায় লইল। পূজনীয় শরৎ মহারাজও অনেকটা নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে সকলকে লইয়া নানারূপ আমোদ করিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় মুহুর্মুহু বজ্রপাতসহ মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। যদু নামক একটি ব্রহ্মচারী পূজনীয় শরৎ মহারাজকে তামাক দিবার জন্য আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন,—যোদো, এই সময় যদি ১০৮টি 'পদ্দো' (ছেলেটি পদ্ম উচ্চারণ করিতে পারিত না। বলিত 'পদ্দো') এনে মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিস, তা হলে তাঁর অশেষ করুণা ও কৃপা লাভ করতে পারবি এবং তোর নিত্য 'পদ্দো' দিয়ে পূজা করা এক দিনেই সার্থক হবে। জানবো তোর কেমন ভক্তি ও উৎসাহ।

বলা বাহুল্য, পূজনীয় শরৎ মহারাজ রহস্য করিয়াই ঐ কথা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী যদু রাধুর বিবাহের কয় দিন জলকাদা উপেক্ষা করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিত এবং উহারই মধ্যে দৈনিক নিয়মিত কয়েকটি পদ্ম আনিয়া মার চরণে দিয়া প্রণাম করিত। যদু কিন্তু পূজনীয় শরৎ মহারাজের এই কথা শুনিবামাত্র এক লাফে পদ্মের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা ভাবিয়া পূজ্যপাদ মহারাজ অতিশয় ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া —ও যোদো, ও যোদো, যোদো ফিরে আয়, বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং অবশেষে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে! যদু কিছুতেই ফিরিয়া আসিল না। আমি সেই সময় মায়ের নিকট বারান্দায় বসিয়া আটা মাখিতেছি। ঘণ্টাখানেক পরে মা কাজকর্ম শেষ করিয়া ঘরের মধ্যে তক্তাপোষের উপর পা দুটি ঝুলাইয়া একটু বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় প্রায় মাইল খানেক দূরের মাঠের পুকুর হইতে ১০৮টি পদ্ম তুলিয়া লইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে যদু হাজির!—আসিয়া পদ্মগুলি মায়ের চরণ-দুটিতে দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। মা সকল কথাই অন্যের মুখে শুনিলেন, মুখে কিছুই বলিলেন না—কেবল হাত দুটি যদুর মাথায় রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পূজনীয় মহারাজও বিশেষ আর কিছু বলিলেন না, কেবল, —যাঃ, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে, অসুখবিসুখ কিছু করে না বসে বাঙ্গাল—বলিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। শুনিয়াছিলাম ইহার কিছুকাল পরেই যদু ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হইয়া অল্প কয়েক দিন উহাতে ভুগিয়া কনখল সেবাশ্রমে সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ করে।

(দুই)

আমার প্রথম মাতৃদর্শন

শ্রীমতী—

আমার স্বামী যখন আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া যান তখন আমার বয়স ষোল সতেরো।

মা তখন রহিয়াছেন বাগবাজারে তাঁহার জন্য নির্মিত বাড়ীতে—(উদ্বোধন কার্যালয়)। একদিন অপরাহ্নে ঐ বাড়ীতে পৌঁছিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম; আমার স্বামী 'মা' বলিয়া ডাকিতে মা সহাস্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে স্বামী একদিন শ্রীশ্রীমায়ের নিকট গিয়াছিলেন; শ্রীশ্রীমা তখন তাঁহাকে বলিয়া দেন,—বউমাকে একদিন এনো। মায়ের আদেশ মতই স্বামী আমাকে লইয়া গিয়া মাতৃপদে সঁপিয়া দিলেন। স্নেহময়ী মা হাস্যমুখে আমায় গ্রহণ করিলেন—আমি তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইলাম। মা সাদরে আশীর্বাদ করিলেন। স্বামী আমায় কৃপা করিবার কথা জানাইলে করুণাময়ী মা দিন স্থির করিয়া দিলেন,—রথের দিন—দ্বিতীয়া তিথি, এনো, সেদিন দীক্ষা দেবো। ক্রমে রথযাত্রা আসিয়া পড়িল। সকাল বেলা স্বামী আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া গেলেন। মা আমাকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া গিয়া দীক্ষা দিলেন। আমি ধন্য হইলাম। তারপর তাঁহার কাছে বসিয়া প্রসাদ পাইবার পর গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছামত যাইতে পারিতাম। কিন্তু বাড়ীতে ছিল অনেক বাধা-বিঘ্ন। তাই যখন 'উদ্বোধনে' যাইতাম অনেক কষ্টেই যাইতে হইত। একদিন শ্রীশ্রীমাকে পূজা করিবার প্রবল ইচ্ছা মনে জাগিল। পূজার কিছু উপচার জোগাড় করিয়া আমার স্বামীর সহিত সকাল বেলা বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মা তখন গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমার সাধ জানিয়া সহাস্যে আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার শ্রীপদকমলে ফুল দিয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা করিলাম। আমার বয়স তখন অল্প—বুদ্ধিশুদ্ধি তত ছিল না। মায়ের অভয় চরণ হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা হইল। মাকে কিছু না জানাইয়াই তাঁহার পা দুটি পরমাগ্রহে বক্ষে তুলিয়া লইলাম। মা হেলিয়া পড়িলেন। মনে ভীষণ লজ্জা হইল, আর মুখ তুলিতেই পারি না। মায়ের মুখ অপার স্নেহের হাসিতে ভরিয়া গেল। গোলাপ মা, যোগেন মা সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। মা বলিলেন—বড় ছেলেমানুষ…। অতঃপর প্রসাদ পাইতে বসিলাম। লম্বা ঘরের কোণের দিকে মা নিজে খাইতে বসিতেন। আমরা সকলে এ পাশে বসিতাম। পরিবেশন করিতেন গোলাপ মা, যোগেন মা। মা নিজে একটু প্রসাদ করিয়া ওঁদের হাতে দিতেন, তাঁহারা সেইটি আমাদের সকলকে ভাগ করিয়া দিতেন। সে সময়ে আমি সব জিনিষ খাইতাম না। তাই একবার কি একটি জিনিষ আমি খাই নাই—তজ্জন্য গোলাপ মার কাছে বেশ বকুনি খাইতে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন,—বৌমা, তুমি ওটা ফেলে দিয়েছ, দেখে এসো মার ছেলেকে—পাতে একটাও দানা নেই…!

এইরকম আমি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাইতাম,

কখনও সকালবেলা, কখনও বা আমার স্বামীর সঙ্গে নতুবা গৌরমাকে সঙ্গে লইয়া। তবে বেশীর ভাগ দিনই সঙ্গী পাইতাম ডাক্তার শশীবাবুর স্ত্রীকে। সকালবেলা মায়ের বাড়ী যাইলে দেখিতাম মা প্রসাদ ভাগ ভাগ করিয়া নিজেই ছেলেদের পাঠাইতেন, আমাদেরও দিতেন। তাঁহার কাছে যখনই গিয়াছি, বেশী কথা বলিতে পারিতাম না। মা আর পাঁচ জনের সহিত কথা কহিতেন—আমি তাহাই শুনিতাম। তবে কখনও কখনও মাকে একটু বাতাস করিতাম কিংবা পায়ে হাত বুলাইয়া দিতাম। একদিন কেবল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, —মা, আমি ত নিত্যপূজা কিছু করি না, আমাকে বলিয়া দিন। মা আমাকে একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা দিয়া বলিয়াছিলেন,—মা, তুমি কচিকাচার মা, পূজো করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তোমায় যে মালা দিয়েছি ঐ জপ কর আর স্মরণ-মনন রাখ, তাহলেই হবে। পূজার ইচ্ছে হয়, আমার ছেলের কাছে জেনে নিও।

মায়ের যখন শেষ অসুখ, স্বামী আমাকে তাঁহাকে দেখিতে লইয়া যান নাই; বলিলেন,—ডাক্তারে নিষেধ করিয়াছে, সুতরাং যাওয়া হইবে না। কাজেই শেষে আর মায়ের দর্শনলাভ করিবার ভাগ্য হইল না।

কঠোপনিষৎ

(পূর্বানুবৃত্তি)

'বনফুল'

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

যে দু'জনে* কর্মলোকে করিয়া থাকেন
স্বকর্মের ফল-রস-পান
এবং পরম লোকে বুদ্ধির গুহায় পশি'
পান যাঁরা ব্রহ্মের সন্ধান
ছায়াতপ সম বলি তাঁহাদের করেন বর্ণন
ব্রহ্মজ্ঞগণ,
কিম্বা যাঁরা পঞ্চ-অগ্নি-সেবী,
কিম্বা যাঁরা নাচিকেত তিনবার করেন চয়ন ॥১॥

জানিয়াছি স্বরূপ তাহার
যাজ্ঞিকের সেতুরূপ সেই নাচিকেত অগ্নি
অক্ষর পরম ব্রহ্ম, তিতীর্ষুর অভয়ের পার ॥ ২ ॥

আত্মাই রথী জেনো, শরীর সে রথ
বুদ্ধি সারথি তার, মন বল্গা-বৎ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়েরা অশ্বসম; তাহাদের গ্রাহ্য যাহা
মনীষীরা তাহাকেই বিষয় কহেন,
ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে তাঁহারা
ভোক্তা নাম দেন ॥ ৪ ॥

বিজ্ঞানবিহীন যারা অশান্ত অধীর
ইন্দ্রিয় তাদের বশে থাকে না কখনও
দুষ্ট অশ্ব যেন সারথির ॥ ৫ ॥

*জীব ও ঈশ্বর: জীবই কর্মফল ভোগ করে, কিন্তু ঈশ্বরকেও (পরমাত্মাকেও) এখানে ফল-ভোক্তা হইয়াছে, সম্ভবতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঘনিষ্ঠতা বুঝাইবার জন্য।

পরন্তু যে বিজ্ঞানীর চিত্ত ধীর স্থির
ইন্দ্রিয় তাহার বশে থাকে সর্বদাই
বাধ্য অশ্ব যেন সারথির ॥ ৬ ॥

জ্ঞানহীন অসংযত অপবিত্র সদা চিত্ত যার
সেই পদ পায় না সে সংসারেতে অধোগতি তার ॥৭॥

জ্ঞানী ও সংযত যিনি, চিত্ত যাঁর পবিত্র সদাই
সেই পদ পান তিনি যাহা হতে পুনর্জন্ম নাই ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞান সারথি যাঁর ধৃত-বল্গা-মন
সকল পথের পার বিষ্ণুর পরমপদ লভেন সে জন ॥৯॥

ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বিষয়েরা
ভোগ্য বিষয় হ'তে উচ্চতর মনের সম্মান
মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হতে আরও শ্রেষ্ঠ
আত্মাই মহান ॥ ১০ ॥

সে মহান হ'তে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত পরম
পুরুষ তাহ'তে শ্রেষ্ঠ, তাই শ্রেষ্ঠ অতি
পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই
ওই শেষ ওই পরাগতি ॥ ১১ ॥

নাহি এঁর আত্মপ্রকাশ সর্বভূতে ইনি সুগোপন
সূক্ষ্মদর্শীর সূক্ষ্ম একাগ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হন ॥১২॥

প্রাজ্ঞেরা মনের মাঝে বাক্যেরে করেন সংহরণ
আত্মজ্ঞানে মন
আত্মজ্ঞান মহাজ্ঞানে বিলীন করিয়া
মহাজ্ঞান শান্তি মাঝে করেন অর্পণ ॥১৩॥

উঠ জাগো আপনারে হও অবগত
লাভ করি বরণীয়তম
সে পথ দুর্গম অতি কবিরা বলেন
তীক্ষ্ণীকৃত ক্ষুরধারা সম ॥ ১৪ ॥

শব্দহীন স্পর্শহীন অরূপ অব্যয়
অরস অগন্ধ নিত্য অনাদি অনন্ত যিনি বুদ্ধির অতীত
মৃত্যুমুখ হ'তে মুক্তি লভয়ে সে জন
সে ধ্রুবকে জানে যে নিশ্চিত ॥ ১৫ ॥

মৃত্যু-উক্ত নাচিকেত এই উপাখ্যান
বলিয়া বা করিয়া শ্রবণ
মেধাবীরা ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হ'ন ॥ ১৬ ॥

অতি গুহ্য এই উপাখ্যান
ব্রাহ্মণ-সমাজে যিনি শুদ্ধচিত্তে শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান
অনন্ত ফলের তিনি অধিকার পান ॥ ১৭ ॥

"উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মানুষ কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে, মানবের দুর্বলতা কি নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সারনাথ

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

সে-বার বারাণসীধামে কিছুদিন অবস্থানের সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ সারনাথ-দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে বেলা দুই ঘটিকার সময় টাঙ্গায় চড়িয়া গোধুলিয়া হইতে সারনাথ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। শহরের সীমানা ছাড়াইয়া একটি তিন্তিড়ী-আম্র-নিম্বাদি বৃক্ষের ছায়া-মণ্ডিত রাস্তা ধরিয়া টাঙ্গা দুই ঘণ্টা চলিবার পর সারনাথের উচ্চ স্তূপ ও নবনির্মিত বৌদ্ধমন্দিরের সমুন্নতশীর্ষদেশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

সারনাথ বারাণসী হইতে প্রায় চারিক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। সারনাথের অপর নাম মৃগদাব। 'সারঙ্গনাথ' শব্দের অপভ্রংশ সারনাথ। সারঙ্গনাথ অর্থে হরিণের রাজা। কথিত আছে, উক্ত অরণ্যময় স্থানে বুদ্ধদেব পূর্বজন্মে মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বয়ং মৃগরাজ হইয়া অন্যান্য হরিণ সহ বনে বিচরণ করিতে থাকেন। একদা কাশীরাজ মৃগয়া-ব্যপদেশে তথায় আগমন করিয়া বনের বহু মৃগ বধ করেন। তখন রাজার সহিত এই চুক্তি হইল যে, প্রত্যহ এক একটি হরিণ স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট প্রাণদানার্থ উপস্থিত হইবে, আর রাজাও মৃগয়ার জন্য আর কোন দিন বনে আসিবেন না। একদিন এক আসন্নপ্রসবা হরিণীর পালা আসিলে মৃগরূপী বুদ্ধ উহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া তৎপরিবর্তে স্বয়ং রাজসকাশে গমন করিলেন। এই অপূর্ব হরিণটি দেখিবামাত্র কাশীরাজ চমকিত হইয়া উঠিলেন। মৃগরাজের মুখে তদীয় আত্মত্যাগের কাহিনী শুনিয়া রাজা নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া উহাকে যাইতে দিলেন এবং তদবধি মৃগয়া পরিত্যাগ করিলেন। ইহাই সারনাথের প্রাচীন উপাখ্যান। আবার সারঙ্গনাথ বুদ্ধদেবেরও অপর নাম। হরিণ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল বলিয়া তিনি এই আখ্যা লাভ করেন।

প্রাচীন কাশী বর্তমান নগরীর মত জাঁক জমক-পূর্ণ না হইলেও উহা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল; ঋষি ও পণ্ডিতমণ্ডলী এখানে অধ্যাপনা করিতেন। উহার কোন অংশে যোগি-তপস্বীর বাস ছিল। তৎকালে কাশ্মীরের ন্যায় এস্থানও সংস্কৃত চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। এই পবিত্র কাশীর এক অঞ্চলের নাম ঋষিপত্তন। পালি ভাষায় উহাকে 'ইসিপতন' বলা হয়। ঋষিপত্তনের সাধারণ অর্থ ঋষিদের বাসস্থান। কাশীর বর্তমান নাম বারাণসী; গঙ্গার উপনদী অসী ও বরুণার মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া কাশী এই আখ্যা লাভ করিয়াছে। ঋষিপত্তনের একাংশে বা সন্নিকটে উক্ত মৃগদাব বা হরিণের উদ্যান অবস্থিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধগয়ায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তথাগত প্রথমে এই মৃগদাব বা সারনাথে আগমন করিয়া ধর্মপ্রচার করেন, তাই এই স্থানের এত প্রসিদ্ধি। বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে প্রাচীন কাশী নগরী সারনাথে অবস্থিত ছিল। উহা বর্তমান শহর হইতে ৩½ মাইল দূরে স্থিত। তথায় অনেক ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গিয়াছে।

সারনাথ এক অনুচ্চ শৈলের উপর প্রায় দুই বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। পুণ্যতোয়া

বরুণা উহার দক্ষিণ প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। আমরা ফুল্লচিত্তে ও সসম্ভ্রমে এই পুণ্যভূমিতে পদক্ষেপ করিতে লাগিলাম। প্রাচীন কালে এস্থানে কত স্তূপ, কত স্তম্ভ, কত মঠ, কত বিহার অবস্থিত থাকিয়া তথাগতের অপার মহিমা প্রচার করিত, সর্বধ্বংসী কালের কুটিল-চক্রে লুণ্ঠনকারীর অস্ত্রাঘাতে আজ সে-সকল ভগ্নস্তূপে পরিণত।

বারাণসীর শ্রেষ্ঠী নন্দীয় বুদ্ধদেব ও তদীয় শিষ্যবর্গের জন্য ঋষিপত্তনে এক বিহার নির্মাণ করেন। তথায় অপর একটি বিহারও বর্তমান ছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সারনাথ বৌদ্ধধর্মানুশীলন ও জ্ঞান-চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। শ্বেত হুনাদি বৈদেশিক জাতির আক্রমণের ফলে সারনাথের বৌদ্ধ বিহার কয়েকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বিধ্বস্ত বিহারের উপর আবার নূতন বিহার নির্মিত হইয়াছে, নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণের ফলেও সারনাথ একবার ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। সর্বশেষে দ্বাদশ শতাব্দীতে মোহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতব-উদ্দিনের নির্মম আক্রমণের ফলে বৌদ্ধকীর্তি নিশ্চিহ্নপ্রায় হয়। সারনাথ বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমগ্ন হয়। বহুকাল এই অতুল কীর্তি মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত ছিল। দৈবক্রমে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এই ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ইহার কিয়দংশ খননের পর তত্ত্বানুসন্ধানে মনোযোগী হন। মাত্র ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের আনুকূল্যে সারনাথের ভূগর্ভস্থিত ধ্বংসাবশেষের খননকার্য আরম্ভ হয়। অদ্যাপি উহার সকল স্থান খোঁড়া হয় নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে খননকার্য বন্ধ হয়।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন সারনাথে চারিটি বৃহৎ স্তূপ এবং দুইটি বিহার দেখিতে পান। কোন হিন্দুদেবতার মন্দির তৎকালে তথায় ছিল না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ সারনাথে আসিয়া তথায় ত্রিশটি সঙ্ঘারাম, প্রায় তিন সহস্র ভিক্ষু এবং শতেক হিন্দুদেবালয় দেখিতে পান। ইহা বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবের পরিচায়ক। শেষ মুসলমান আক্রমণের পরও দুই তিনটি ভগ্নদশাগ্রস্ত অট্টালিকা ঐ ধ্বংস কার্যের নীরব সাক্ষ্যস্বরূপ কিছুদিন বিদ্যমান ছিল। ইহাই সারনাথের প্রাচীন ইতিহাস।

খননকার্যের ফলে যে সকল স্থান উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা আমরা সবিস্ময়ে ও সূক্ষ্মভাবে দর্শন করিতে লাগিলাম। কোথায় কোন্ মঠ ও বিহার, স্তূপস্তম্ভাদি ছিল পরিচয়ফলকে তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কোন্ বিহার বা মঠ-মন্দির কোন যুগের তাহা ঐতিহাসিকগণের গভীর গবেষণার বিষয়। আমরা উহাদের অবস্থান স্থল ও ধ্বংসচিহ্নাদি বিস্ময়নেত্রে অবলোকন করিতে লাগিলাম, লর্ড কার্জনের নির্দেশক্রমে এস্থানের আবিষ্কৃত নিদর্শন সমূহ যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া সারনাথের মিউজিয়ম রচিত হইয়াছে।

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রথমেই এক ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহারের কক্ষ সমূহের ভিত্তি আমাদের নয়ন পথে পতিত হয়। উহা অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়াছিল। ১৮৫১ খৃঃ ইহার আবিষ্কার হয়। হিউয়েন সাঙের লিখিত বিবরণে সারনাথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুইশত ফুট উচ্চ শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ পিত্তলচূড়া-বিশিষ্ট একটি গোলাকার মন্দিরের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের দেহের সমায়তন একটি সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখভাগে একটি শতস্তম্ভযুক্ত বিরাট প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। উহাতে এক সময় তিনসহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যায় উপাসনারত থাকিতেন। উক্তমন্দিরের সামান্য নিদর্শন ও স্তম্ভসমূহের চিহ্ন

এখনও বর্তমান আছে। উহাই সারনাথের প্রাচীনতম মন্দির। মন্দিরের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখভাগে প্রায় আটফুট উচ্চ ভগ্ন অশোকস্তম্ভ অদ্যাপি বর্তমান। সমগ্র স্তম্ভটির উচ্চতা প্রায় পঞ্চান্ন ফুট ছিল। উহা চুণাপাথরে প্রস্তুত অতিমসৃণ এক-হস্ত উচ্চ লৌহনির্মিত মূলভিত্তির উপর স্থাপিত। ঐ স্তম্ভের শিরোভাগে চতুর্দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি গম্ভীরাকৃতি লৌহনির্মিত চারিটি সিংহের দেহের সম্মুখভাগ একত্র সংস্থাপিত ছিল। উহাদ্বারা বৌদ্ধসঙ্ঘের মহিমা এবং অহিতকারী ব্যক্তি-বর্গের প্রতি সতর্কবাণী বিঘোষিত হইত। সিংহ-চতুষ্টয় গোলাকৃতি সমুন্নত প্রস্তর ফলকের উপর দণ্ডায়মান। ফলকের গাত্রদেশে চক্রাকারে ধাবমান সিংহ, অশ্ব, হস্তী ও বৃষের মূর্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। দুই দুইটি প্রাণি-মূর্তির মধ্যস্থলে এক একটি ধর্মচক্র বর্তমান। এই চক্রগুলি একযোগে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু ও সংসারের অনিত্যতা প্রকাশ করিতেছে। সিংহমস্তক-যুক্ত প্রস্তরটি আবার একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরিভাগে অবস্থিত। পদ্মের পাপড়িগুলি ভাঁজ করিয়া নিম্ন-মুখ করিয়া নির্মিত হইয়াছে। অশোকস্তম্ভের এই সিংহসমন্বিত শিরোভাগ অধুনা সারনাথের মিউজিয়মে সুরক্ষিত হইয়া দর্শকগণের মহা-আকর্ষণের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। সিংহমস্তকের উপরিভাগে যে বৃহৎ ধর্মচক্র অবস্থিত ছিল তাহা খণ্ডিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। খননকালে সমগ্র অশোকস্তম্ভটিও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল। উক্ত সুমসৃণ সিংহমূর্তি-চতুষ্টয় সেই যুগের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের ও রসায়ন বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক। অদ্যাপি সেই লৌহের মসৃণতা অমলিন রহিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সিদ্ধিলাভ করিয়া বুদ্ধদেব সর্বপ্রথম সারনাথে তাঁহার বাণী ঘোষণাপূর্বক নবধর্ম প্রচার করেন। এই নূতন ধর্ম প্রবর্তনকে ধর্মচক্র প্রবর্তন বলা হয়। উক্ত সিংহমূর্তি ও ধর্মচক্র তাহারই প্রতীক। প্রাচীন প্রস্তর-লিপিতে ধর্মচক্র বা সদ্ধর্মচক্র বিহারের নাম উল্লিখিত আছে। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে উহাই সারনাথ নামে অভিহিত হয়। সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকায় উক্ত ধর্মচক্র বা অশোকচক্র শোভা পাইতেছে।

খননের ফলে এস্থান হইতে মৌর্য ও সুঙ্গ যুগের বহু জীবমূর্তি ও নরমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সারনাথের উত্তরভাগে ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ স্তূপ ও স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। একটি বৃহৎস্তূপ কাশীরাজ চৈৎ সিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ বিধ্বস্ত করিয়া উহার ইষ্টকাদি দ্বারা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে জগৎগঞ্জ নামক বাজার নির্মাণ করিয়া স্বীয় কীর্তি ঘোষিত করেন। উক্ত স্মৃতিস্তম্ভের ব্যাস ১১০ ফুট ছিল। এই উচ্চ ভূমিতে মহারাজ অশোক-নির্মিত বিখ্যাত ধর্মরাজিকা স্তূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। জগৎসিংহ তন্মধ্যে দুইটি মর্মর প্রস্তর ও চুণাপাথরের পাত্র এবং ১০৮৩ সম্বতের বুদ্ধমূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মর্মর কৌটায় যে দেহাস্থি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বুদ্ধ-দেবের অস্থি বলিয়া মনে করা হয়। পূর্বোক্ত স্তূপের নিকটেই কান্যকুব্জের বৌদ্ধধর্মাবলম্বিনী রাজ্ঞী কুমারদেবী কর্তৃক আটশত ফুট দীর্ঘ একটি বৌদ্ধমঠ নির্মিত হইয়াছিল; উহা 'ধর্মচক্র-জিন-বিহার' নামে অভিহিত। এই বিহারের পশ্চিমদিকে একটি পরিচ্ছন্ন ভূগর্ভস্থ দীর্ঘপথ রহিয়াছে। উহার উপরিভাগ 'গ্রানাইট' নামক স্ফটিক প্রস্তরে আবৃত। পথের অভ্যন্তরস্থিত প্রাচীরে কিয়দ্দূর অন্তর অন্তর এক একটি প্রস্তর-প্রদীপ স্থাপিত। ঐ পথ মন্দির পর্যন্ত গিয়াছে। রাণী বিহার হইতে উক্ত গুপ্তপথে মন্দিরে গমনাগমন করিতেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই সম্বন্ধে আবার প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সন্দেহও প্রকাশ করিয়া থাকেন, কারণ কুমারদেবী-

বিনির্মিত বিহার দাক্ষিণাত্যস্থিত মন্দিরের স্থাপত্য-পদ্ধতিতে নির্মিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। উহার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে দুইটি স্ত্রী-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাও মিউজিয়মে স্থানলাভ করিয়াছে; কিন্তু উহা কোন্ দেবতার মূর্তি তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

প্রধান মন্দির কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া চারিদিকে কয়েকটি বিহার নির্মিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত সাতটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরও কত বিহার যে ভূগর্ভে বিধ্বস্ত অবস্থায় পতিত আছে তাহা কে বলিবে!

সারনাথের ভূগর্ভ হইতে বুদ্ধদেবের প্রায় দশফুট উচ্চ একটি দণ্ডায়মান মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়া মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। উহার মস্তকের উপর দশফুট ব্যাস বিশিষ্ট প্রস্ফুটিক পদ্মাকৃতি একটি সুশোভন ছত্র স্থাপিত ছিল। উহা মিউজিয়মে রহিয়াছে। এই ছত্রযুক্ত বুদ্ধমূর্তি সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে নির্মিত হয়। উৎকীর্ণ-লিপিতে লিখিত আছে: সকল জীবের কল্যাণ ও সুখের জন্য এই বোধিসত্ত্ব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

আমরা অতঃপর ধামেকস্তূপ দর্শন করিলাম। ধামেকস্তূপ শব্দ ধর্মমুখস্তূপ শব্দের সংক্ষিপ্তাকার। উহা গুপ্তযুগের কোনও রাজা কর্তৃক ভাবী-বুদ্ধ মৈত্রেয়ের সম্মানার্থ নির্মিত হইয়াছিল। শেষ মুসলমান আক্রমণের সময়েও উহা বিধ্বস্ত হয় নাই, কিন্তু উহার সুদৃশ্য প্রস্তরসমূহ যে, লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান। কোনও কোনও শূন্যস্থানে সাধারণ প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। লোহার পাতে বড় বড় প্রস্তরগুলি দৃঢ়সংবদ্ধ না থাকিলে হয়ত এই স্তূপ কোন্ দিন কেহ বিধ্বস্ত করিয়া প্রাসাদের কাজে লাগাইত। খননকালে উক্ত স্তূপের নিকট হামান দিস্তা ও উহার দণ্ড পাওয়া গিয়াছে। তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, ঐ-স্থানে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত ছিল। বুদ্ধদেবের কালের এই একটি মাত্র স্তূপ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে; উহা তীর্থযাত্রীর পূজা পাইয়া থাকে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তাকুলচিত্তে ধ্বংসস্তূপ-রাশি দর্শনের পর আমরা নিকটবর্তী একটি সঙ্কীর্ণ স্বল্পতোয়া নদীর সম্মুখবর্তী হইলাম। উহাই পুণ্যসলিলা বরুণা বলিয়া অনুমান করিলাম। যে নদীতে একদা সহস্র সহস্র ভিক্ষু-শ্রমণ অবগাহন করিতেন তাহা আজ কালচক্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে পতিত—বিলুপ্ত-গৌরব হইয়া আত্মগোপনই যেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমরা অনাগারিক ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমঠ দর্শন করিলাম।

অতঃপর আমরা সন্নিহিত নবনির্মিত মূল-গন্ধকুটী বিহার দর্শনে গমন করিলাম। মহাবোধি-সমিতির প্রচেষ্টায় বহু অর্থব্যয়ে এই উচ্চচূড়াযুক্ত সুদৃশ্য মন্দির নির্মিত হইয়াছে। গন্ধকুটী অর্থ সুবাসিত অট্টালিকা। সারনাথে বুদ্ধদেবের বাসার্থ তদীয় শিষ্যগণ কতৃক যে সকল গৃহ নির্মিত হয় তাহাই গন্ধকুটী নামে অভিহিত। বুদ্ধদেব সারনাথে আসিয়া যেই ভবনে তাঁহার প্রথম বর্ষাকাল যাপন করেন তাহা মূলগন্ধকুটী নামে অভিহিত হয়। তদীয় গৃহস্থশিষ্যা সুথমনা উহা বুদ্ধদেবের নামে উৎসর্গ করেন; মিউজিয়মে রক্ষিত উক্ত শিলালিপিতে ঐরূপ লিখিত আছে।

মূলগন্ধকুটী-মন্দিরে ভারতসরকার-প্রদত্ত বুদ্ধ-দেবের পবিত্র দেহাবশেষ (relics) রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত প্রভাযুক্ত বুদ্ধদেবের নয়নাভিরাম মূর্তিদর্শনে আমাদের অন্তর ভক্তিরসাপ্লুত হইল। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত প্রাচীরগাত্রে তেইশটি বৃহৎ বৃহৎ সুরঞ্জিত চিত্রে তথাগতের জীবনের প্রধান প্রধান কাহিনী সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অভিনব

প্রাচীর-চিত্রসমূহ অতি মনোরম; ধর্মপ্রাণ-ব্যক্তির, বিশেষতঃ বৌদ্ধভক্তগণের অন্তরে এই সকল জীবন্ত চিত্র অকৃত্রিম ভক্তিরসের সঞ্চার করিবে। বিখ্যাত জাপানী চিত্রশিল্পী কোসেৎসু নসু এই সকল চিত্র ভক্তি-প্লুত অন্তরে অঙ্কন করিয়াছেন। তাহার পর আমরা 'সারনাথ' নামক মহাদেব মন্দির দর্শন করিলাম; উহা সুপ্রাচীন নহে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহাদেবের এই নাম হইয়াছে। অতঃপর আমরা অদূরস্থিত চৈনিকগণের নবনির্মিত বৌদ্ধমন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরস্থ বুদ্ধদেবের অমল ধবল সৌম্যমূর্তি চৈনিক শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

ইহার পর আমরা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এক জৈন মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরে একাদশ-তীর্থঙ্কর শ্রেয়াংশনাথের কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্মিত প্রশান্ত মূর্তি-সন্দর্শনে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলাম। উক্ত তীর্থঙ্কর অর্ধ ক্রোশ দূরবর্তী সিংহপুরে সিদ্ধিলাভ করেন। মন্দিরে অনেক মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার পরিলক্ষিত হইল।

এইবার আমরা অগ্রসর হইয়া সারনাথের মিউজিয়মে প্রবেশ করিলাম। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত এই মনোরম শ্বেতপ্রাসাদের সম্মুখস্থ তৃণগুল্মসুশোভিত অঙ্গনটি নয়নানন্দদায়ক। মিউজিয়মের দুইটি গৃহে সংগৃহীত দ্রব্য-সম্ভার স্থাপিত আছে। প্রথম গৃহে সিংহস্তম্ভের শিরোভাগ, লোহিত প্রস্তর নির্মিত ছত্রযুক্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, ও ধর্মচক্র মুদ্রাধারী, ধর্মোপদেশ প্রদানরত পদ্মাসনে উপবিষ্ট অর্ধ-নিমিলিতনেত্র ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি মুগ্ধ নেত্রে অনেকক্ষণ দর্শন করিলাম। শেষোক্ত প্রস্তর-মূর্তিটি ভারতীয় ভাস্কর্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। মূর্তির মস্তকের চতুর্দিকে প্রভামণ্ডল। উহার চতুর্দিকে পদ্মের সুন্দর মালা, দুই দেবদূত উপর হইতে পুষ্পবর্ষণে রত। মূর্তির মূল ভিত্তিতে তথাগতের প্রথম পঞ্চশিষ্য এবং সম্ভবতঃ মূর্তি প্রদাতার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মূলভিত্তির মধ্যস্থলে ধর্মচক্র বিদ্যমান। এই গৃহে মহাযান বৌদ্ধদের অবলোকিতেশ্বর বা বোধিসত্ত্বের মূর্তি এবং ভাবী-বুদ্ধ মৈত্রেয়ের মূর্তিও দেখিলাম। মূর্তিগুলির ভাস্কর্য অতুলনীয়। মিউজিয়মের দ্বিতীয় গৃহে ত্রিশূলের সাহায্যে অসুর-বিনাশোদ্যত শিবের বৃহদাকার প্রতিমূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল। সারনাথে খননকালে অসমাপ্ত অবস্থায় উহা পাওয়া যায়। কুতুবুদ্দিন অন্যান্য হিন্দু-বৌদ্ধ দেবমূর্তিসহ উহা ভূগর্ভে নিপাতিত করেন, এজন্য উহার নির্মাণ-কার্য অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়।

উভয় গৃহে আমরা বুদ্ধদেবের বিভিন্ন অবস্থার অনেক মূর্তি, লোকনাথ তারাদেবী ও অন্যান্য হিন্দুদেবতার প্রতিমূর্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর মূর্তি, একপ্রকার মোটা পশমী কাপড়, মৃৎপাত্র, পূজোপকরণ ও তৈজসপত্র, প্রাচীন মুদ্রা আরও কত কি নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়া বলদৃপ্ত প্রতি-হিংসা পরায়ণ লোকের ধ্বংসলীলার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। হৃদয়হীন আক্রমণকারীরা বিহারের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী শুধু লুণ্ঠন করে নাই, অগ্নি-প্রজ্বালনে অট্টালিকা ও সকল দাহ্য দ্রব্য ভস্মীভূত করিয়াছে। কত মূল্যবান্ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ যে ভস্মসাৎ হইয়াছে, কত সুদর্শন ভক্তি-উদ্দীপক মূর্তি যে বিকলাঙ্গ, ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। আবার খননকালেও বহু মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ডিত হইয়াছে। মানবের অপূর্ব কীর্তির এইরূপ শোচনীয় পরিণতির কথা কেহ কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পরে আমরা কাশী ফিরিয়া আসিলাম। মনে ভাবিলাম যতবার কাশী আসিব ততবার এই পুণ্যতীর্থ দর্শনে প্রাণমন শীতল করিব।

দর্শন ও ধর্ম

(দ্বিতীয়ার্ধ)

স্বামী নিখিলানন্দ

অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা সবিশেষ বিতর্কমূলক। মরমী সাধকেরা বলেন, তাঁহাদের অনুভূতি যুক্তিজগতের বাহিরে। সুতরাং যিনি তাঁহাদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁহার মধ্যে এই অনুভব সংক্রমিত হইতে পারে না। এই অনুভূতি সাধকের নিজস্ব; ইহা দার্শনিক সমীক্ষার মত সর্বজনীন নয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মরমী সাধক ভগবৎপ্রেম ও মানবপ্রীতির উপর জোর দেন। তাঁহাদের বলা হয় প্রেমোন্মত্ত। সাধারণ ধর্মপ্রাণ লোকের মত মরমী সাধকগণ জাতি-বর্ণ বা ধর্মমতের পার্থক্যকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনুষ্যজাতির একত্ব অনুভব করেন। তাঁহাদের নিকট জগৎ অবাস্তব নয়; ভগবানের শক্তি তাহাতে ওতপ্রোতভাবে নিবিষ্ট। তাঁহারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা দার্শনিক বিচারের প্রতি উদাসীন। তাঁহারা স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত জীবন যাপন করেন।[১৮] ভারতবর্ষের মরমীদের মধ্যে ভক্ত ও জ্ঞানী দুইই আছেন। যথার্থ মরমী-সাধনকে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ও দার্শনিক অনুধাবনের পরিণতি বলা যায়। কিন্তু জগৎ তথাকথিত বাজে মরমী সাধকে ভর্তি; যুক্তি-বিচারকে অবিশ্বাস করে বলিয়া তাহারা খামখেয়ালী জীবনযাপন করে। ভগবান্ হইতেই সরাসরি তাহারা প্রেরণা-লাভ করিয়াছে, এইরূপ দাবী করিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা নিজেদের মলিন অহংবৃত্তির আকর্ষণে চালিত হয়; আচরণে তাহারা প্রায়ই নীতি-বিরোধী। ধর্ম, দর্শন ও মরমী সাধনের সুদৃঢ় ভিত্তিই হইল নীতি-পরায়ণ জীবন। সত্য, সংযম, দয়া ও পবিত্রতাহীন ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বর-প্রেম বা সত্যানুভূতি সম্ভব নয়।[১৯] যে ব্যক্তি আপনার পক্ষে কি কর্তব্য ও কি অকর্তব্য স্থির করিতে পারে না, সে পশুত্বের বিশেষ উপরে নয়। স্বার্থবুদ্ধিকে যে দমন করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তি মনুষ্যসমাজে বাস করিবার উপযুক্ত নয়। যতদিন মানুষের স্বার্থপর প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তর না ঘটিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার দিব্য দর্শনাদি, তাহার দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি বা ভাব-সমাধি যথার্থ নয়। সত্য, পরিশেষে মানুষ একদিন নৈতিক নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, সে দুর্নীতিপর জীবন-যাপন করিবে। কথাটা হইল, পূর্ণজ্ঞানী প্রথমাবস্থায় আপন আধ্যাত্মিক জীবন গঠন-কালে যে সকল সদ্গুণ ও সদাচারের অভ্যাস করিয়াছিলেন, সেইগুলিই পরে তাঁহাকে মহামূল্য মণির মত অলঙ্কৃত করে। এই গুণরাশি তাঁহার স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। তিনি কখনও ভুলক্রমেও বেতালে পা দিতে পারেন না।

১৮ "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিঃ, অমৌনং চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ; স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এব, অতোঽন্যদার্তম্।" (বৃঃ উঃ, ৩।৫।১)

১৯ "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"
(কঠ উপ, ১।২।২৪)

ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তের নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হইতে বুঝা যাইবে যে, হিন্দু ঐতিহ্য ধর্ম, দর্শন ও মরমী সাধনপন্থা পরস্পরের মধ্যে নিকট সম্পর্ক রাখিয়াছে :

(ক) একটিমাত্র চরম সদ্‌বস্তু আছে—তিনি আত্মভূ, অদ্বৈত, নিত্য শাশ্বত এবং অকার্য, অর্থাৎ তিনি কারণোদ্ভূত কার্য নন। অবশিষ্ট সব কিছুই বাহ্যপ্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত ; ইহারা সকলেই কার্যভূত, আদ্যন্তবান্, সুতরাং আত্যন্তিকভাবে তাহাদের কোন সত্তা নাই।[২০]

(খ) চরমতত্ত্ব সর্বব্যাপী ; ইহা বস্তুমাত্রেরই মূলীভূত সত্তা। ইহা হইতে আলাদা হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছুই থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সব কিছুই সত্যস্বরূপ বলিয়া দেখেন। কোন ব্যক্তি যদি তত্ত্বভিন্ন অন্য কিছু অনুভব করিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে ভ্রান্তির কবলে। অজ্ঞান ব্যক্তি যাহাকে নাম-রূপান্বিত বলিয়া প্রত্যক্ষ করে, অদ্বৈত জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট তাহাই সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত পরব্রহ্ম।

(গ) সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ চরম ও পরম তত্ত্ব একাধারে সর্বানুস্যূত ও সর্বাতিগ। তাঁহার একটি অংশমাত্র মায়াপ্রভাবে যেন দৃশ্যমান জগদ্রূপে প্রতিভাত হয়।[২১] আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সর্বেশ্বরবাদ (pantheism) নয়, মায়াবাদও নয়। ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যতার প্রতিপাদনই ইহার উদ্দেশ্য—ইহা ব্রহ্মাস্তিত্ববাদ।

(ঘ) চরম সত্তা বা ব্রহ্মই জগৎকারণ।[২২] সৃষ্টি ব্যাপার স্বতঃপ্রবৃত্ত ; ইহা কোন বাহ্য প্রেরণার ফল নয়। বিভিন্ন দর্শনাচার্য বিভিন্ন অর্থে 'কারণ'-শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টি শ্রীভগবানের লীলা ; আবার কেহ কেহ বলেন ইহা ব্রহ্মবস্তুর উপর মায়িক অধ্যাসমাত্র—যেমন মরীচিকাতে জলের অধ্যাস। সান্ত মন চরম তত্ত্ব ও আপেক্ষিক সত্যের মধ্যে, এক এবং বহুর মধ্যে যুক্তিগত সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে অসমর্থ—ইহা লীলাবাদ ও মায়াবাদ উভয়েরই অভিমত। সৃষ্টজীব জীবনক্রীড়ায় ক্লান্ত হইয়া যথার্থই মুমুক্ষু হইয়া পড়ে ; এই বাদদ্বয়-অনুসারে ইহাদেরও মুক্তির সম্ভাবনা আছে। অদ্বৈতমতে চরম তত্ত্ব ও আপেক্ষিক সত্যের সম্বন্ধ অবাস্তব ; এই মতে ব্রহ্ম ত নানাত্মক জগদ্রূপে পরিণত হন নাই।[২৩] মাণ্ডূক্য-উপনিষদের ব্যাখ্যায় গৌড়পাদ অজাতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ; নানাত্বের অস্তিত্ব মানসব্যাপার-মাত্র ; যুক্তি দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সৃষ্টি মরীচিকার মত ঘটনা-হিসাবে অনুভূত হইতে পারে ; কিন্তু সৃষ্টি-কার্য বলিয়া কিছুই নাই। মরুভূমি তত্ত্বতঃ মরীচিকা-দৃষ্ট জল সৃষ্টি করে না। গৌড়পাদ কার্যকারণ-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।[২৪] জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই।[২৫] দ্বৈতবাদী আচার্যগণ বলেন, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম ; ইহা তাঁহার ইচ্ছা এবং অনুধ্যান-সম্ভূত।

(ঙ) জীবাত্মা ও পরমাত্মা তত্ত্বতঃ একই। ইহাদের আপাত-ভেদ মায়াকল্পিত। মোহগ্রস্ত

২০ "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ॥"
(মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ গৌড়পাদ-কারিকা ২।৬)
"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥"
(গীতা, ২।১৬)

২১. "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"
(গীতা, ১০।৪২)

২২ "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২)

২৩ "মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।"
(মাণ্ডূক্য-উপনিষদ্ গৌড়পাদ-কারিকা, ১।১৭)

২৪ মাণ্ডূক্য-উপনিষদ্ গৌড়পাদ-কারিকার ৪র্থ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

২৫ মাণ্ডূক্য উপনিষদ্-গৌড়পাদ কারিকা, ১।৯

জীবাত্মা দেহাভিমানবশে সবিশেষ হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদ অজ্ঞানাবস্থায় জীববহুত্ব স্বীকার করে: অদ্বৈতবাদ-মতে ইহাদেব মুক্তি যমনিয়মাদি সাধন সাপেক্ষ। জন্ম-মৃত্যু, ভাল-মন্দ, কর্ম ও জন্মান্তর—এই সমস্ত জীবাত্ম-বিষয়ে প্রযোজ্য, পরমাত্ম-বিষয়ে নহে। জীবাত্মার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যকারণাত্মক কর্মনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রারব্ধই বর্তমান দেহারম্ভের কারণ। এই প্রারব্ধই বর্তমান জীবনের সুখ ও দুঃখকে প্রভাবিত কবিবে; আমৃত্যু ইহা ফলপ্রসব কবিবে। অন্যবিধ কর্মের নাম সঞ্চিত কর্ম; ইহা আগামী জীবনে ফলপ্রসব করিবে। ভগবদ্‌জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সঞ্চিত কর্মের ফল নিরাকৃত হইতে পারে। রাগ ও অহঙ্কার বর্জিত তত্ত্বজ্ঞগণ-কৃত কর্ম ফল উৎপাদন করে না। মানুষ একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন কর্তা; সে অন্ধ নিয়তি অথবা ভগবানেব খেয়ালের বশবর্তী নয়। তাহার নিজের অতীতই তাহার বর্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করে; বর্তমানই আবার ভবিষ্যতের নিয়ামক। মনে হয় কোন প্রেরণা তাহাকে কর্মে প্রণোদিত কবিতেছে, এই প্রেরণা বাহির হইতে আসে না, ইহা তাহার ভিতর হইতেই আসে। কর্মনীতি বলে বর্তমানে তোমার জীবনে যাহা ঘটিতেছে তাহা ধৈর্যের সহিত গ্রহণ কর, মানিয়া লও। এই কর্মনীতিই আবার নিজের ইচ্ছানুসারে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে সাহস দান কবে। অজ্ঞানবশতঃ জীবাত্মা প্রথমেই জড়াভিমানী হইয়া দেহপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এখন জীবাত্মা আপনাকে জড়ের কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট। ক্রম-পরিণাম বলিতে ইহাই বুঝায়। আত্মীয়, সমাজ, দেশ ও মানবজাতিব প্রতি কর্তব্য সম্পাদন বিভিন্ন হিন্দুদর্শন সম্মত মুক্তির একটি সাধন।

(চ) ভগবানের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নতা-প্রাপ্তিই মুক্তি। বৈষ্ণব ধর্ম দ্বৈতবাদী; এইরূপ দ্বৈতমূলক ধর্মসাধনায়ও ভক্ত শেষ পর্যন্ত আপন অন্তরে ইষ্ট-সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যতদিন মুক্তিলাভ করা না যায়, ততদিন পর্যন্ত মানুষ সৃষ্টি-প্রপঞ্চের অধীন। সমাজে যে যে-স্তরে বাস করে তদনুযায়ী তাহাকে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও নৈতিক কর্তব্য করিতেই হইবে। জগৎকে সে মিথ্যা, অবাস্তব মনে করিতে পারে না। এইরূপ লোকের জন্য অদ্বৈত বেদান্ত একটি বিস্তৃত সৃষ্টিতত্ত্বের পরিকল্পনা করিয়াছে। জগচ্চক্রকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়, এই চক্রে প্রবেশ করিয়া ইহা হইতে বাহির হইয়া আসা। নিত্যানিত্যবিচার ও যমনিয়মাদি সাধন দ্বারা এই নিষ্ক্রান্তি তাড়াতাড়ি আসিতে পারে। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং ভ্রম এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়; অবশ্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহারা সকলেই সমভাবে অবাস্তব।

হিন্দুধর্ম জড়বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ দেখিতে পায় না। বিজ্ঞান যুক্তির সাহায্যে জগৎপ্রপঞ্চের শক্তিরূপটি অভিব্যক্ত করে; ধর্ম প্রকাশ করে প্রেমের মাধ্যমে ইহার আন্তর কল্যাণরূপ। জগৎ একটি অবিভাজ্য সত্তা; ইহাতে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে, মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য নাই। যে পার্থক্যটুকু প্রতীত হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়।[২৬] দেব, মনুষ্য, প্রাণী, ও উদ্ভিদ সকলেই একই মৌলিক নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়মগুলি যখন বাহ্য-

২৬ "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।"
(মাণ্ডূক্য উঃ গৌড়পাদ-কারিকা, ১।১৮)

বস্তুজাত—সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহারা জাগতিক বা ব্যাবহারিক নিয়মাবলী; আবার এই গুলিই যখন আভ্যন্তর জগতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহারা আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তত্ত্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জড় ও চৈতন্য উভয়কেই জানা দরকার। মায়াবাদের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রভাবে হিন্দু দার্শনিকগণ যখন পরিদৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা, অবাস্তব এবং অবান্তর জ্ঞান করিতে লাগিলেন, তখনই ভারতবর্ষের অবনতি আরম্ভ হয়।

বাহ্যজগতের নিয়মাবলী যুক্তির সাহায্যে অনুধাবন করিতে হইবে, আধ্যাত্মিক নিয়ম বুঝিতে হইবে সমীক্ষণ বা মনন দ্বারা। অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন হইয়া থাকে যোগের সাহায্যে। আধ্যাত্মিক সংপ্রাপ্তির পথে এই যোগ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ উভয়বিধ যন্ত্রের কাজ করে। সে সকল বস্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিকট অপ্রত্যক্ষ, যোগদৃষ্টি-সম্পন্ন মনের নিকট তাহা প্রত্যক্ষ। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে এমন কোন পার্থক্য নাই যাহা অনপনেয়। যে কোন পার্থক্যই থাকুক না কেন, মানুষ আপন ব্যক্তিগত প্রগতিদ্বারা তাহা দূর করিতে পারে। পিপীলিকার মধ্যে যে সুপ্ত দেবত্ব বিরাজমান, তাহা সে একদিন উপলব্ধি করিবে।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

যে আলো এনেছ মর্তের পরে সীমাহীন করুণায়
এ-জীবন-দীপ যেন ভরি' প্রাণ তাহারি পরশ পায়।
ধূলিকার বুকে বহ্নির সাধ
নিশীথ-মর্মে অমল প্রভাত
সে-পরশ মাঝে চির স্বপনের রঞ্জন বুঝি চায়।

যে আশা এনেছ আশাহীন এই মর্ত-মরুর মাঝে
উঠি' উচ্ছলি' যেন নির্বাধ প্রতি তরঙ্গে বাজে।
চির সবুজের সুবর্ণ-শিখা
বিলায় অমরা-বহ্নির লিখা,
লভি' তব ভাষা তোমার ছন্দে তোমারি স্বপনে সাজে।

যে-দিশা এনেছ নিদিশা এই নিতল রাতের তলে
হে চিরদিশারী, সে যেন অবাব-পন্থার তারি চলে।
বরি' নিস্তল ছায়া ধরণীর
যেন উল্লাসে অমরা-মিহির,
তব মহিমার অসীম-মন্ত্রে প্রতি মুহূর্তে জ্বলে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পশ্চিম বাংলার গ্রাম *

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ সান্যাল, এম্-এ

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তা নিয়ে চারদিকে যে রকম আলোচনা চলছে তাতে সাধারণ লোকের মনেও এ সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বাদানুবাদের ভেতর না গিয়ে, এ পরিকল্পনাটা কি, এর সাফল্যের জন্য জনসাধারণ কি করতে পারে, এবং বিশেষ করে আমাদের সমস্যা-কণ্টকিত পশ্চিম বাংলার জন্য এতে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে এই তিনটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বর্তমান পরিকল্পনার তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য বোঝা দরকার। জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য এ যাবৎ বহু পরিকল্পনাই নিয়োগ করা হয়েছে, সুতরাং আর একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন এমন একটা কী বিশেষ ঘটনা? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে এক একটা পরিকল্পনার সাহায্যে সাধারণত আমরা কোন একটা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি যেমন, 'অধিক খাদ্য উৎপাদন' 'শিক্ষাপ্রসার', 'বন্যানিরোধ' ইত্যাদি, কিন্তু বর্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দেশের **সর্বতোমুখী** বিকাশ। সমস্যাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ না করে, এই পরিকল্পনায় আমাদের সামগ্রিক প্রয়োজন ও সম্বলের বিচার করে উভয়ের সামঞ্জস্যমূলক একটা কার্যকরী কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ রকম ব্যাপক পরিকল্পনার গুরুত্ব সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন প্রথম এবং ১৯৩৮ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেসে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পণ্ডিত নেহেরুর সভাপতিত্বে একটা কমিটি তাঁরই নির্দেশে গঠিত হয়েছিল। কমিটির পক্ষে যথাযথভাবে পরিকল্পনা রচনা সম্ভব হয়নি, তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুন উদ্যমে কাজ সুরু করা হয়। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় 'পরিকল্পনা পরিষদ।' ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে দেশবাসীর আলোচনার জন্য 'পরিষদ' তাঁদের খশড়া প্রস্তাব পেশ করেন এবং দেড় বৎসর সর্বস্তরের লোকের মতামত গ্রহণ করে সংশোধিত আকারে ১৯৫২ সালের ৮ই ডিসেম্বর পরিকল্পনাটা বিধানসভায় চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এ রকম গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার দৃষ্টান্ত অভিনব বলে বিষয়টি বিশ্ববাসীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল এই পাঁচ বছর পরিকল্পনার নির্ধারিত কাল। অর্থাৎ ইতোমধ্যেই পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে আমরা পদার্পণ করেছি। ব্যাপারটা "রাম না হতে রামায়ণের" মত শোনালেও দুর্বোধ্য নয়। বিভিন্ন দিকে গঠনমূলক যে সমস্ত কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেগুলিকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যেই এরকম করতে হয়েছে। আর এর একটা সুবিধা আমাদের দিক থেকে রয়েছে।

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের পল্লীমঙ্গল আসরে লেখক কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ-অবলম্বনে।

পরিকল্পিত লক্ষ্যের দিকে ইতোমধ্যে আমরা কতটা অগ্রসর হয়েছি সেটা জেনে পরিকল্পনাব সম্ভাব্যতা বিচার করা সম্ভব হয়েছে—সমস্তটাই ভবিষ্যতের গহ্বরে না থাকায়।

পরিকল্পনার মোট ব্যয় হবে ২০৬৯ কোটী টাকা অথবা মাথাপিছু ৬০, টাকা। বিভিন্ন বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণই ব্যাপক পরিকল্পনার প্রধান সমস্যা। বর্তমান পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে ব্যয়েব বন্টনের হার এজন্য লক্ষণীয়।

মোট ব্যায়ের শতকরা

কৃষি ও সমাজ সংগঠন	১৭·৪
সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন	২৭·২
যানবাহন ও রাস্তাঘাট	২৪
শিক্ষাস্বাস্থ্য ইত্যাদি সমাজসেবা	১৬·৪
শিল্পের প্রসার	৮·৪
উদ্বাস্তু পুনর্বাসন	৪·১
বিবিধ	২·৫

সেচ কৃষিরই আনুষঙ্গিক, সুতরাং পরিকল্পিত ব্যয়ের শতকরা ৩৯% অর্থাৎ ৭৯৫ কোটী টাকা ধার্য হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উন্নতির জন্য; কৃষির উন্নতিকে এতটা প্রাধান্য দেওয়ার কারণ খাদ্যের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি পূরণ করে কৃষিতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে না পারলে ভবিষ্যৎ উন্নতির সমস্ত পথ অবরুদ্ধ থাকবে এবং আশু প্রয়োজন মিটিয়ে, ভবিষ্যৎ উন্নতির বনিয়াদ গড়াই বর্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সূচনা ও প্রস্তুতি হিসাবেই এই প্রচেষ্টার সার্থকতা মনে রাখা দরকার। শিল্প-প্রসারের জন্য মোট ব্যয়ের ৮·৪% অর্থাৎ মাত্র ১৭৩ কোটী টাকার বরাদ্দ অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে, তাই বলে দেওয়া দরকার যে এটা কেবল সরকারের নিজের ব্যয়ের হিসাব। শিল্প-প্রসারের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে শিল্পপতিদের ওপর। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ৪২টী শিল্পের প্রসারের জন্য তাঁরা ২৩৩ কোটী টাকার মূলধন নিয়োগ করবেন এই পাঁচ বছরে স্থির হয়েছে। শিল্পপতিরা এ আশা পূর্ণ করবেন কিনা সেটা অবশ্য সন্দেহের অবকাশ রাখে কিন্তু পরিকল্পনায় শিল্পের প্রসাব উপেক্ষিত হয়েছে এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। শিল্প কৃষিব চেয়ে লাভজনক সুতরাং জাতীয় আয়ের দ্রুতবৃদ্ধি শিল্পপ্রসার ছাড়া হতে পারে না, তাছাড়া শিল্পপ্রসারের সাহায্যে জমির ওপব নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা না কমালে কৃষিব উন্নতিও সম্ভব নয় "কমিশন" নিজেই সেকথা বলেছেন।

টাকা জোগাড়েব কি ব্যবস্থা হয়েছে সেটার খোঁজ দেওয়া নিশ্চয়ই দবকার। বৈদেশিক সাহায্য যতটা পাওয়া যায় তার চেষ্টা অবশ্যই করা হবে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশের কাছ থেকে ১৫৬ কোটী টাকা ইতোমধ্যে পাওয়াও গেছে, কিন্তু প্রধানতঃ নির্ভব করতে হবে কর, ঋণ ও মুদ্রাসৃষ্টির ওপর। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের তহবিলে কর ও ঋণেব মাধ্যমে ১২৫৮ কোটী টাকা সংগৃহীত করা হবে এই কয় বছরে। তাছাড়া এই পাঁচ বছরে আমাদের পাওনা হিসাবে বিলাত থেকে ২৯০ কোটী টাকার মালপত্র আসার কথা, সুতরাং সেই পরিমাণ মুদ্রাসৃষ্টি করা যেতে পারে মূল্য-বৃদ্ধির আশঙ্কা না করে। মুস্কিল হচ্ছে বাকী ৩৬৫ কোটী নিয়ে—(অবশ্য অন্য অংশের বেলাতেও ঠিক যেমনটী আশা করা হয়েছে কার্যক্ষেত্রে ঠিক তেমনটী হবে মনে কবে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হবে না)। বৈদেশিক ঋণে সমস্তটা সঙ্কুলান না হলে—এবং হওয়ার সম্ভাবনাও কম, দেশের মধ্যে থেকেই ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের ব্যক্তিগত ক্রয়শক্তি-হ্রাসের (অর্থাৎ আশু স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষতির) বিনিময়ে সৃষ্টি হবে কৃষিশিল্প ও সমাজসেবার মূলীন জাতীয়

আত্মবৃদ্ধির পক্ষে যা অপরিহার্য। কৃচ্ছ্রসাধনটা অবশ্য যাতে গরীবের ভাগেই না পড়ে তার জন্য প্রয়োজন মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও অন্যবিধ নিয়ন্ত্রণের। সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ছাড়া পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে মনে রেখে নিয়ন্ত্রণের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির সহায়তা করতে হবে।

আমাদের আলোচনার প্রধান অংশটায় এবার আসা যাক। পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে বলার আগে পশ্চিমবঙ্গের গুরুতর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ প্রয়োজন, উন্নয়ন প্রচেষ্টার তাগিদ বোঝার সহায়তা হবে এতে। এখানে জনসংখ্যার চাপ যত বেশী অন্য কোন প্রদেশেই তত নয়, পশ্চিম বাংলার চাল গম ইত্যাদি তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের ঘাটতি ৫ লক্ষ টনেরও বেশী। গ্রামাঞ্চলে ঋণভার সম্বন্ধে কিছুকাল আগে যে অনুসন্ধান হয়েছিল তা থেকে জানা যায় শতকরা ৫৬টী পরিবারই দেনাগ্রস্ত এবং এ দেনা করতে হয়েছে অমিতব্যয়িতার জন্য নয়, নিতান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। ক্ষেতমজুরদের বেলায় তো মোট দেনার ৭১·৭% ভাগই খাদ্যের জন্য দেনা। দেনা শোধ করতে জমিজমা বিকিয়ে যাওয়ায় বর্গাদারদের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে যারা নিজের জমি চাষ করে তাদের সংখ্যা উত্তরপ্রদেশে শতকরা ৬২ জন, উড়িষ্যায় ৫৯ জন, বিহারে ৫৫ জন কিন্তু পশ্চিম বাংলায় মাত্র ৩২ জন। এ পরিস্থিতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার সঞ্জীবনী, আশার সঞ্চার করবে আশ্চর্য কি?

মোট ৬৯ কোটী টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ১৫০টী প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনায় করা হয়েছে। প্রদেশগুলিতে মাথাপিছু ব্যয়ের হিসাবে পশ্চিম বাংলার স্থান বোম্বাইয়ের পরই। শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান-নির্মাণ প্রভৃতি সমাজসেবার দিকটাকেই আমাদের পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, মোট ব্যয়ের ৩৬% ভাগেরও বেশী এই খাতে নির্দিষ্ট করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান প্রস্তাব—৬ বছর থেকে ১১ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেদের জন্য বাধ্যতামূলক বুনিয়াদি শিক্ষার আংশিক প্রবর্তন ও গ্রামে গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠার সাহায্যে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা ও কৃষ্টিবিস্তার।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধে প্রধান প্রস্তাব গ্রামাঞ্চলে ৬৫০টী "Health Centre" বা 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র' স্থাপন করে চিকিৎসার অভাব দূর করা। ১২৩টী 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র' ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে এবং আরও ৬০টীর নির্মাণকার্য শেষ হয়ে আসছে। এই সঙ্গে গ্রামের আর দুটী প্রধান সমস্যা ম্যালেরিয়া ও পানীয় জল, সমাধানের জন্য যথাক্রমে ১ কোটী ২২ লক্ষ ও ১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার বরাদ্দ হয়েছে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি না হলে প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয় পশ্চিমবাংলার পরিকল্পনায় এ সত্যটীর স্বীকৃতি প্রশংসনীয়।

প্রায় ৭ কোটী টাকা ব্যয়ে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমাদের প্রদেশের ঘাটতি পূরণ পরিকল্পনার আর একটী লক্ষ্য। বলা বাহুল্য চাষীর উত্তম ছাড়া লক্ষ্য লাভ হবে না। উত্তরপ্রদেশ সরকার চাষীদের এ বিষয়ে প্ররোচিত করার জন্য প্রাচীরচিত্র প্রকাশের যে ব্যবস্থা করেছেন তা অনুকরণীয়।

রাস্তাঘাটের অসুবিধা দূর করার জন্য ১৩ কোটী টাকা ব্যয়ে ১৬৯০ মাইল নতুন রাস্তা নির্মাণের সঙ্কল্প করা হয়েছে। এর মধ্যে গত বছর মার্চ মাস পর্যন্ত ১০০০ মাইল রাস্তার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান পরিকল্পনা "ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা'। এ পরিকল্পনা

সম্পূর্ণ হলে ৬ লক্ষ একর জমিতে সেচের আয়োজন ও ৪০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। তিলপাড়া বাঁধের নির্মাণ হওয়ার ফলে প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা গত বছরই করা গিয়েছে।

পল্লীগঠনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা নবপ্রবর্তিত "Community Project" বা 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা'। এই প্রচেষ্টাগুলির উদ্দেশ্য এক একটা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কৃষিশিল্প ও অন্যান্য বিষয়ের যুগপৎ ক্রমোন্নতি। একশোটী পাশাপাশি গ্রাম নিয়ে একটা করে "ব্লক" গড়া হবে, এবং এই একশো গ্রামের কাঁচামাল ব্যবহারের জন্য থাকবে একটী শিল্পকেন্দ্র যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে শুধু কারখানা নয়, সমষ্টি কল্যাণের সমস্ত আয়োজন। ৩ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রকম আটটা ব্লক সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রাদেশিক সরকারকে ব্যয়ের অংশ গ্রহণ করতে হবে না।

স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে ছোট ছোট সংগঠনের কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রদেশব্যাপী গ্রাম পঞ্চায়েৎ স্থাপনের প্রস্তাব গণতন্ত্রের দিক থেকে খুবই মূল্যবান। আংশিক সরকারী সাহায্যে ছোট কাঁচা রাস্তা, (১৫০০০ টাকা অনধিক ব্যয়ে) প্রভৃতি নির্মাণ এদের উদ্দেশ্য। এ রকম ৮৭টী রাস্তা ইতোমধ্যেই নির্মিত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পনার কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং পল্লীবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবর্দ্ধনই এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। জাতি আজ দৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছে এইটেই বড় কথা—পরিকল্পনাটী ত্রুটীবিহীন রচয়িতারাও সে দাবী করেন নি বা অদলবদলের সুযোগ দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। ফলাফল নির্ভর করবে আমাদের মনোবল ও দৃঢ়তারই ওপর।

গর্ব

(Imitation of Christ, ১।৭—অবলম্বনে)

শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত

বৃথা গর্বী অহঙ্কারী কহি তাহারেই—
মানুষ ও দ্রব্যচয়ে যে করে নির্ভর,
আপনারও প্রতি কভু আছে কি ভরসা?
রেখো আশা একমাত্র ঈশ্বরের পর।
শক্তিমান বন্ধুদের গর্ব করা ভুল,
হয়োনা কো মদমত্ত যদি থাকে ধন,
ধ্রুব শুধু ভগবানে মতি ও বিশ্বাস
তাঁরি পায়ে কোরো সদা আত্ম-সমর্পণ।
উন্নত সবল দেহ সুঠাম সুন্দর,
তাই লয়ে অভিমান রেখোনা কো মনে,
স্বল্পমাত্র ব্যাধি যদি করে আক্রমণ,
সকলি বিনষ্ট হতে পারে এইক্ষণে।
প্রতিভা ও জ্ঞান গুণ লভিয়াছ যাহা,
সেই গর্বে ভগবানে রেখো নাকো দূরে,
আপন স্বভাবে তব, যাহা কিছু ভাল,
জেনো সেই বিশ্বপিতা হতে সদা স্ফুরে।

আলো

(একটি ইংরেজী কবিতার ভাব অবলম্বনে)

শ্রীশৈলেশ

মেলিয়া হাজার চোখ রাত্রি দেখে চাহি
দিবা শুধু মেলে এক আঁখি,
নামে যবে সন্ধ্যা-ছায়া সে আঁখি মুদিলে
তমো মাঝে ধরা যায় ঢাকি।
মেলিয়া হাজার আঁখি মন চাহি দেখে
হৃদি চাহে একটি নয়নে,—
মিলায় জীবন আলো মরণের মাঝে
ধরণীর প্রেম-আবাহনে।

হিন্দী-ভজন

শ্রীজয়দেব রায়, এম-এ, বি-কম্

বাংলার ভগবৎ-সঙ্গীতের অধিকাংশ যেমন সাধারণ ভাবে কীর্তনের বিশিষ্ট সুরে গাওয়া হয়, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি ভাষার ঐরূপ গানেরও তেমনি একটি বিশেষ সুরভঙ্গী আছে। ঐ সকল ভাষার সাধন-সঙ্গীত 'ভজন' গান নামে সুপরিচিত।

বাংলা মহাজনী কীর্তনের অনেক পদই অতি উচ্চাঙ্গের সুর ও তালে পূর্বে গাওয়া হইত, নানাপ্রকার তাল, আখর, নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ প্রভৃতি লয়ে নানা শ্রেণীর স্বতন্ত্র রীতিতে সেগুলি গীত হইত। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল শ্রোতারা গানের বহিরঙ্গের কলা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ না হইয়া অন্তরঙ্গের ভাববিহ্বলতায়ই বিগলিত হইতেছেন। কীর্তন তখন উচ্চাঙ্গের অভিজাত সুরের আসন হইতে জনমনের উপযোগী সরল সুরে নামিয়া আসিল। হিন্দী ভজন গানগুলির বিবর্তন সেই ভাবেই হইয়াছে।

ওস্তাদী তানমানলয়ের আসরে রাগসঙ্গীতের পূর্বে গায়করা অপেক্ষাকৃত লঘু সুরে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেন। তাঁহাদের নিকট লঘু মনে হইলেও সাধারণের কাছে অবশ্য তাহা তেমন সহজ মনে হইত না! এ সমস্ত ভজন গানের সুর ও ছন্দ একরকম ধ্রুপদ খেয়ালের ন্যায়ই বেশ উচ্চাঙ্গেরই ছিল। এ গানগুলিই আবার শ্রোতারা নিজেদের কণ্ঠোপযোগী করিয়া লইতেন, তাঁহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সে সুর সমগ্র জনগণের আরাধনার সুরে পরিণত হইত। এভাবেই তানসেন, গোপালনায়ক, বৈজুবাওরা, আনন্দঘন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচকদের ভজন সুররসবঞ্চিত জনগণও লাভ করিয়াছেন। তানসেনের প্রসিদ্ধ শ্রীরাগিণীর চৌতালের শিববন্দনা আজও শিবমন্দিরে, কাশীতেও গাওয়া হয়—

বংশীধর পিনাকধর, গঙ্গাধর গিরিধর।
জটাধর মুকুটধর, বাজত হরিহর।
চন্দনধর ভস্মধর, পীতাম্বর, মৃগচর্মাম্বর,
চক্রধর, ত্রিশূলধর, নরহর শঙ্কর॥
সুধাধর, বিষধর, গরুড়াসন বৃষবাহন;
মানধর পরমেশ্বর ঈশ্বর॥

গোপালনায়কও ছিলেন তানসেনের মতনই সঙ্গীতধুরন্ধর। তানসেনের মতো তিনি অবশ্য ম্লেচ্ছ ছিলেন না, তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অভিজাত ব্রাহ্মণ; 'নায়ক' তাঁহার সাঙ্গীতিক উপাধি। সুতরাং তাঁহার 'শিববন্দনা'য় অনেকটা আন্তরিকতাময় ভক্তি উচ্ছলিত—(দীপক)

শিখর গড় চন্দ কৈলাস নিহতা চন্দ্রপ্রভা কিরণ
জ্যোতি প্রজ্জ্বল।
চন্দ মকরন্দ ফুল ফুলে পরিমল সুগন্ধে দ্বিবিয়া বদন
তনু মদনুপ জাল॥
লাল মোতিয়ন সে ছোটে চন্দ কিরণ সোভাল।
ছন্দ অভিছন্দ গাওয়ে নায়ক গোপাল॥

বৈজু বাওরা ছিলেন গোপাল নায়কের সমসাময়িক। তাঁহার সাধক জীবনের বিষয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে, বনের পশুপাখীরা পর্যন্ত তাঁহার সুরে মোহিত হইত। তাঁহার মাতৃ-বন্দনা ইমনকল্যাণ চৌতালে রচিত—

জয় কালী কল্যাণী, খর্গধারিণী, গিরিজা ঘনশ্যামা
চণ্ডী চামুণ্ডা ছত্র ধারিণী।

জগতজননী জ্বালামুখী, আদি জ্যোতি অনন্তদেব
অন্নপূর্ণা অনাদি তরণ তরণী ॥

আনন্দঘন এই শ্রেণীর আরো একজন উচ্চাঙ্গের সুরসাধক, তাঁহার 'রামস্মরণ' কেদারায় রচিত গানে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সেতু রচনার প্রয়াস দেখা যায়—

ভাজন ভেদ কহাবত নানা, এক মৃত্তিকারূপ রে।
তৈসে খণ্ড কল্পনা রোপিত, আপ অখণ্ড স্বরূপ রে ॥

কিন্তু এসব গানের মধ্যে কলানৈপুণ্য থাকিলেও আন্তরিকতা বিশেষ নাই। কিন্তু আর এক শ্রেণীর সাধকদের গানের মধ্যে সুর চাতুর্যের সঙ্গে ভগবতপ্রীতি অঙ্গাঙ্গী সন্নিবিষ্ট। নানক, দাদু, কবীর, রুইদাস প্রভৃতি ছিলেন ধর্মগুরু সাধুসন্ত, তাঁহাদের গান তাঁহাদের বাণীও। এ গানগুলি অবশ্য তাঁহাদের নিজস্ব সৃষ্টি কিংবা অনুগামিগণ তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছেন তাহা জানা যায় না। কিন্তু এই ভজনগুলিই স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহাদের বাণীকে বহন করিয়া আনিয়াছে।

নানকের ভজন গুরুমুখী বা পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত; তাঁহার অনেক গানের সুরই বেশ চাতুর্যময় কৌশলের—যেমন।

ঠাকুর তব শরণাই আয়ো।
উতর গয়া মেরে মনকা সংশা, জব তেরা
দরশন পায়ো ॥
অনবোলত মেরী বিরথা জানী, অপনা
নাম জপায়ো।
বাহ্ পকড় কড় লীনে জন অপনে, গর্হ অন্ধ
কূপতে মায়ো।
দুখ নাঠে, সুখ সহজ সমায়ে, আনন্দ আনন্দ
গুণ গায়ো ॥
কহ্ নানক গুরু বন্ধন কাটে; বিছড়ত আন্
মিলায়ো ॥

উপরের গানটির রাগিনী আশাবরী এবং ছন্দ ১৪ মাত্রার দীপচন্দী। বাংলায় যে তালকে যৎ বলে, পাঞ্জাবী ভাষাগীতে তাহারই নাম দীপচন্দী। নানকের ভজন শিখদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মের কল্যাণে সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। নানকের দুইটি ভজন 'গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে' এবং 'বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ' গানের সুর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দুইটি বাংলা গানে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই রকম নানকের আর একটি ভজনের মধ্যে আন্তরিকতা কি সুন্দর ফুটিয়াছে—"ঠাকুর তোমার নাম এমনই যে পতিত পবিত্র সবাই তোমাকে আপন ভাবিতে পারে, জাতবর্ণনির্বিশেষে আপামর সবাই তোমার চরণে আশ্রয় পায়—নানক এই ভাবেই সৎসঙ্গ হইতে জ্ঞান পায়।"

ঠাকুর, র‍্যাসো নাম তুম্হারো।
পতিত পবিত্র লিয়ে কর্ অপনে, সকল করত
নমস্কারো।
জাতবরণ কউ পুছে নাহী, পুছে চরণ নিবারো।
সাধুসঙ্গত নানক বুধ পাই, হরি কীর্তন উধারো ॥

রামানন্দ-শিষ্য কবীরও নানকের মতোই দোঁহার মধ্য দিয়া তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনিও মতবাদে হিন্দু-মুসলমানের মহামৈত্রীর চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কারণে তাঁহার 'হরিগুণগানে'ও বহু বিজাতীয় শব্দ স্থান পাইয়াছে। তিলং খাম্বাজঃ তেতালা ছন্দে রচিত—

ভজো রে ভৈয়া রামগোবিন্দ হরী।
জপতপ সাধন কছু নহিঁ লাগত, খরচ ত নহিঁ গঠরী ॥

কবীর তাঁহার গানে নিজের অজ্ঞান তিমির বিদূরিত হইবার সংবাদ দিয়াছেন—

তোহি মোহি লগন লগায়ে, রে ফকীর বা।
সোবত হী মাঁয় অপুনে মন্দির মেঁ;
শব্দ মার জগায়ে, রে ফকীর বা!

ষূড়ত হী মৈঁয় ভবকে সাগব মেঁ,
বঁহিয়া পকড় সুলঝায়ে, রে ফকীব বা।
কহৈঁ কবীর, সুনো ভাই সাধো,
প্রাণ ন প্রাণ লগায়ে, রে ফকীর বা ॥

"ভগবান, তুমি আমাদের মধ্যে অদৃশ্য বাঁধন লাগাইয়াছ। আমি যখন মোহে মগ্ন ছিলাম হে চিরভিক্ষু, তুমিই সুরের আঘাতে আমাকে জাগাইয়াছ। আমি তো সংসার সাগরে ডুবিয়াই গিয়াছিলাম, তুমি হাত ধরিয়া আমাকে তুলিলে। কবীর সাধুজনকে সম্বোধন করিয়া জানাইয়া দিলেন এ ভাবেই ভগবান আমার প্রাণে আসিয়াছেন।"

কবীরের সমসাময়িক সাধক দাদূর ভজনেও দর্শনের জন্য আকুল আকূতি ফুটিয়াছে—

অজহুঁ ন নিকসৈ প্রাণ কঠোব।
দরশন বিনা বহুত দিন বীতে সুন্দর প্রীতম্ মোর ॥
(বাগেশ্রী)

রবিদাস ছিলেন মুচীব ছেলে, কবীর ছিলেন জোলার ছেলে—তাহা সত্বেও তাঁহাদেব অনুসৃত সাধনমার্গের পথ অনুসরণে দেশবাসীর দ্বিধা সংকোচ অনুভূত হয় নাই। রবিদাসের ভজন—দেশকার ঝাঁপতালে

সাচী প্রীতি হম তুম সঙ্গ জোড়ী,,
তুম্ সঙ্গ জোড় অওর সঙ্গ তোড়ী ॥
জো তুম্ বাদল, তো হম্ মোরা,
জো তুম চন্দ্র, হম ভয়ে জী চকোরা ॥
তুম্‌রে ভজন কটে ভয় ফাঁসা,
ভক্তি হেতু গাবে রবিদাসা ॥

"তোমার সঙ্গ তো আমি ছাড়িব না, তুমি যদি মেঘ হও আমি হইব ময়ূব, তুমি যদি চাঁদ হও আমি হইব চকোর। কি ভাবে তুমি রবিদাসের ভক্তিকে এড়াইয়া যাইবে ?"

মুসলমান সাধকরাও এভাবেই অনেকে ভজনগান রচনা করিয়াছিলেন। সন্ত রজ্জবের একটি ভজনের মধ্যে এই ধরণের ভাবময়তা ফুটিয়াছে—

অঘ মিটৌ অঘ-মোচন স্বামী,
অন্তর ভেটৌ অন্তরযামী।
গতলোচন অন্ধ অচল অনাথা,
গতি দে স্বামী, পকড়ো হাথা।
সরণ তুম্‌হারা, তুম্-সিবতারা.
জন রজ্জবকী সুনহ পুকারা ॥

"হে পাপমোচন স্বামী, পাপ দূব কর, অন্তর্যামী ভগবান তুমি অন্তরে এসো। আমি অন্ধ অনাথ তুমি হাত ধরিয়া আমাকে পথ দেখাও। আমি তোমাব শরণ লইলাম, তোমার উপরই এখন রজ্জবের সম্পূর্ণ ভার রহিল।"

তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিত মানস' রচনা করিয়া সমগ্র ভারতের ঘরের কবি হইয়া রহিয়াছেন। হিসাব কষিয়া দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক নিয়মিতভাবে তাঁহার রামায়ণখানি প্রতিদিন পড়িয়া থাকে। রামায়ণের মধ্যেই তাঁহার স্বতন্ত্র ভজনও অনেক আছে। যেমন সিদ্ধিদাতা স্মরণ গানটি (ভূপালী, তেতালা)—

গাইয়ে গণপতি জগবন্দন,
শঙ্কব সুবন ভবানী নন্দন।
সিদ্ধিসদন গজবদন বিনায়ক,
কৃপাসিন্ধু সুন্দর সবনায়ক
মোদকপ্রিয় মুদমঙ্গলদাতা,
বিদ্যাবারিধি বুদ্ধিবিধাতা।
মাঁগত তুলসীদাস করজোরে,
বসহি রামসিয় মানস মোরে ॥

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের নন্দদাস রাসপঞ্চাধ্যায়ী ভ্রমর গীতা, কৃষ্ণচরিত প্রভৃতি রচনা ছাড়াও বহু ভজন গান রচনা করেন—

নন্দভবন কো ভূষণ মাঈ,
যশোদাকো লাল,
বীর হলধর কো।
রাধারমণ, পরম সুখদাঈ॥
শিবকো ধন, সন্তন কো সর্বস্,
মহিমা বেদ পুরানন গাঈ॥

এসব গানের অধিকাংশই আবৃত্তির এবং কথকতার পর্যায়ভুক্ত। হিন্দী সুর সৌন্দর্য মণ্ডিত ভজনগানের মধ্যে মীরাবাঈ এবং সুরদাসের রচনাগুলিই উল্লেখযোগ্য।

সুরদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতাও একজন 'দরবারী' গায়ক ছিলেন। তানসেন এবং সুরদাস উভয়ই আকবরের সভাগায়ক ছিলেন। সুরদাস রচিত 'সুরসাগর' নামে ভাগবতের একটি অনুবাদও পাওয়া যায়।

নানক, কবীর প্রভৃতির ভজন ভক্তিরস-উচ্ছ্বসিত, কিন্তু তাহাদের সুরসৌন্দর্য থাকিলেও নৈপুণ্য মোটেই নাই। সুরকে কোথাও অযথা প্রাধান্য ঐ সকল ভাবপ্রধান গানে দেওয়া হয় নাই। তুলসীদাসের রামায়ণ তো তাঁহার দোহার মতনই সুর করিয়াই পঠিত হয়। সাধারণ জনগণের পক্ষে পুঁথি ধরিয়া পড়িবার অপেক্ষা পুণ্যকাহিনীর রস গ্রহণ এ ভাবেই ঘটিত।

কিন্তু সুরদাস এবং মীরার ভজন রীতিমতো সুর, তাল মান লয়ে গীত হইবার জন্য রচিত। এগুলি নিয়মিতভাবেই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের আসরে ওস্তাদ গান গাহিয়া শোনান। উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গানের যে গম্ভীর সুরধ্বনি শ্রোতাগণ শুনিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারই ঔদার্যময় প্রতিধ্বনি সুরদাসের ভজনের মধ্যেও আছে। Composer বা সুরস্রষ্টারূপে সুরদাস যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাগিণীর স্বর-বিন্যাসে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সমাবেশ করিয়া তিনি নবতম সুরসৃষ্টি করিতেন। এই ভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে সুরদাসী মল্লার, সুরদাসী খাম্বাজ প্রভৃতি। রামকেলি রাগিণী কাওয়ালীতে রচিত তাঁহার এ শ্রেণীর ভজন গান—

জয় নারায়ণ ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীপতি কমলাকান্তম্।
নাম অনন্ত কাঁহা রাগবর্ণ শেষ না পায়ো অন্তম্॥
শিব সনকাদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তম্।
রামরূপ ধরে রাবণ মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তম্॥
বসুদেব গৃহে জনম লিয়ো হৈ নাম ধরে যদুনাথম।
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কংসকো কেশ গৃহন্তম্॥
জগন্নাথ জগমগ চিন্তামণি বৈঠ রহে মেরি চিন্তম্।
দশম সুকন্দ ভাগবত গাওয়ে সুরদাস ভগবন্তম্॥

কিন্তু আন্তরিকতায় সবাইকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে মীরার ভজনগুলি। মীরাবাঈয়ের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তাঁহার গানের সুর সৌন্দর্যে চিরকালই দেশবাসী বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রীভগবানের অংশস্বরূপা বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইয়া আসিয়াছে।

হ্মারে জনম মরণকে সাথী
থানে নহী বিসরূঁ দিনরাতি॥
তুম্ দেখ্যা বিন্ কল ন পড়ত হয়,
জানত মেরী ছাতী।
উঁচী চঢ়্ চঢ়্ পন্থ নিহারূঁ,
রোয়্ রোয়্ আঁখিয়া রাতী।
মীরাঁকে প্রভু পরম মনোহর,
হরি চরণা চিত রাতী॥
পল পল তেরা রূপ নিহারূঁ,
নিরখ নিরখ সুখ পাতী॥

মীরা বলিতেছেন—"হে আমার জন্মমরণের সাথী, তোমাকে যেন দিনরাতে কখনও না ভুলি। আমার অন্তর জানে তোমার অদর্শনে আমি কত কষ্ট পাই। তোমার পথ দেখিবার জন্য আমি উঁচুতে বার বার উঠিতেছি। কাঁদিয়া

চোখ লাল করিতেছি। মীরার প্রভু তুমি পরম মনোহর, তোমার চরণে আমার আত্ম নিবেদন। পলে পলে তোমার রূপ দেখিয়া আমি আনন্দ পাইতেছি।"

মীরার অনেক ভজনের সুর কিন্তু বেশ উচ্চাঙ্গের। মনে হয় সুরজ্ঞগণের কণ্ঠে কণ্ঠে তাহার রূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমাদের মনকে অবশ্য মুগ্ধ ক'রে মীরার ভজনের আন্তরিকতাময় ঘরোয়া ভাবই। গান গাহিবার এবং শুনিবার সময় তাহার সুরের সূক্ষ্ম কাজের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজনই হয় না। এই রকম সিন্ধুড়া; ঝাঁপতালে রচিত—

ফাগুনকে দিনচার, হোলি খেল মনা রে।
বিনা করতাল পখাবজ বাজৈ,
অনাহতকি ঝঙ্কার রে॥
বিনা সুর রাগ ছত্তীসু গাবৈ,
রোম রোম রনকার রে।
শীল সঁতোষকী কেশর ঘোলী,
প্রেম প্রীত পিচকার রে॥

এই শ্রেণীর ভজন গানগুলি আমাদের দেব-উপাসনার প্রধান অঙ্গরূপে গণ্য হয়। মন্দিরে মন্দিরে আরতির সঙ্গে এ রকম গান ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন। গীতার পন্থানুসারে নিজেদের শ্রেষ্ঠধনকে দেবতার পায়ে উৎসর্গ করাই পূজা; সাধক-গায়করা তাঁহাদের দেবদত্ত সুকণ্ঠকে এই ভাবেই সার্থক করিয়া তুলিতেন।

বাংলা দেশের কীর্তন যেমন রাগ আভিজাত্য হইতে বিচ্যুত হইলেও বাংলার গ্রাম্য জনগণের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তেমনি ভাবে ঐ সকল হিন্দী ভজন গানও সুর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ধ্বনিত হইয়া চলিতেছে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে একমাত্র এই ভজন গানগুলি সুরের স্বারাজ্যে বাণীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাহাই বলিয়াছেন—"বাংলা দেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক্, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত; বাণী তার 'ছায়েবানুগতা'। ভজন সঙ্গীতের কথা যদি ছেড়ে দিই, তবে দেখতে পাই পশ্চিমে সঙ্গীত যে বাক্য আশ্রয় করে, তা অতি তুচ্ছ। সঙ্গীত সেখানে স্বতন্ত্র, সে আপনাকেই প্রকাশ করে।"

প্রাসাদ ও কুটীর

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

প্রাসাদ কহিছে গর্বে উঁচু করি শির,
"মোর পাশে কেন আছ দাঁড়ায়ে কুটীর?
দরিদ্রের দল যত, মলিন বসন,
তোমার ও তুচ্ছ কক্ষে করে বিচরণ।
ধনীর দুলাল শত, ঘিরিছে আমায়,
দেখ কত বেশ ভূষা, চমক লাগায়।"

কুটীর কহিল, "সৌধ, আমার সন্তান,
বেশ-ভূষা-হীন বটে, তবু শান্ত প্রাণ।
সম্পদ তোমার মাঝে আনে পরমাদ,
ভা'য়ে ভা'য়ে পিতা পুত্রে ঘটায় বিবাদ।
ঐশ্বর্য-বিভব-শূন্য মোর ছায়া ঘিরে,
রাজাও প্রাসাদ ছাড়ি, শান্তি খুঁজে ফিরে।"

ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীঅতুলানন্দ রায়

সন ১৮৮২ সালের ৫ই আগষ্ট। অপরাহ্ন। মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখতে এসেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। নীচে বৈঠকখানায় বসে বিদ্যাসাগর হাসিমুখে শুনছিলেন তাঁর কথা আর ভাবছিলেন, কে এই নির্বিকার সদানন্দ পুরুষ! রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মা কালীর পূজারী রামকৃষ্ণ তখন বিভিন্ন ধর্ম্মমতে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে মূর্তিমান বৈদিক প্রজ্ঞা। কিন্তু ছাই-চাপা আগুনের মত সেই প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষকে বেশী কেউ তখনও বুঝতে পারেনি। তখনও কত লোকে কত কথা ব'লে তাঁর নামে। কী ক্ষীণ বুদ্ধি বিবেচনা। কী লজ্জা। ঠাকুরকে কেউ কেউ তখন 'মাতাল' বলেও বিদ্রূপ করেছে।

সিমলায় ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী থেকে আনন্দে বিভোর রামকৃষ্ণ গলি-পথ দিয়ে যাচ্ছেন বড় রাস্তায় গাড়ীতে উঠতে। ভাব মুখে বাহ্যজ্ঞান হারা। পা টলছে। পথের ধারে রকে বসেছিল যারা তাদের কেউ কেউ রসিয়ে বলতে লাগলো, "খুব টেনেছে তো। পা টলছে ছাখ..." সবার চোখে যাঁরা বড় তাঁরা কেউ তখনও আসেন না দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ নিজেই যান ভক্ত, পণ্ডিতদের দেখতে, আলাপ করতে। পরনে লাল পেড়ে ধুতি গায়ে একটা বোতাম খোলা কালো কোট, ধুতির আঁচলটা কাঁধের উপর...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈঠকখানার একটা বেঞ্চের উপর বসে রামকৃষ্ণ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে বললেন, আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল, বিল, হৃদ নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখছি। বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন, তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান। রামকৃষ্ণ বললেন, না না! নোনা জল কেন? ..বিদ্যার সাগর! ক্ষীরসমুদ্র! তবে কি জানো, পুঁথি পুরাণ কেতাব পড়ার উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করা। ঈশ্বরকে জানার জ্ঞান। ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ সন্ধান। গীতা-ই ধর। গীতা কী বলে? দ্বাদশবার আওড়াও। জবাব পাবে। শোন। গীতা গীতা বলতে বলতে শুনবে গী-তাগী-তাগী। মানে ত্যাগী। অর্থাৎ ত্যাগী মানুষ। কিনা, হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় কর। যশ মান কামকাঞ্চনাসক্তি মুক্ত হয়ে ঈশ্বরকে জানবার চেষ্টা করতেই বলছে গীতা। আর ঈশ্বরকে জানতে হলে সন্ন্যাসীই বল আর গৃহীই বল, লোভ লিপ্সা ত্যাগ করতেই হবে। অন্য পথ নেই। ওই-ই জ্ঞান। আর সব অজ্ঞান... অবিদ্যা।

ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ...

তবে লোকে এত সাধন ভজন করে কেন? করে অহঙ্কার নাশ করতে। 'আমি' 'আমার' মায়া ঘুচাতে। "আমি" জ্ঞানেই যত গলদ। 'আমি' ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। তুমি কি বল গা? "আচ্ছা তোমার কি ভাব," রামকৃষ্ণ শুধালেন বাঙলার অন্যতম মনীষী বিদ্যাসাগরকে। বিস্ময়ে বিহ্বল বিদ্যাসাগর মৃদুহাস্যে বললেন, "আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলব।"

জ্ঞান বিজ্ঞানের এই শেষ কথা সুদীর্ঘ সাধন ভজনের ফলে অর্জন করেন নি রামকৃষ্ণ। নিয়েই এসেছিলেন সঙ্গে। প্রকাশ্যে চিরকাল গৃহীর

বেশে, গৃহীর পরিবেশের মধ্যে থেকেও যশ মান কামকাঞ্চনাসক্তির লেশ মাত্রও ছিলনা তাঁর মনে। না লোভ, না লিপ্সা, না লালসার কণা। ত্যাগের স্পৃহা, ত্যাগের শক্তি, ত্যাগে আনন্দ ছিল তাঁর কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ, সাবলীল।

গৃহী ভক্তদের বলতেন, ঘর ছাড়বে কেন? ঘরে থেকে সাধন ভজন করাই তো সহজ। ঝামেলা কম। সংসারের মধ্যে বাস করে যিনি সাধনা করতে পারেন তিনিই তো বীর সাধক। ত্যাগের বাহ্যিক আড়ম্বর ছিল না রামকৃষ্ণের। ত্যাগ-প্রতীক বহিরাবরণ অবাধ্য মনের সংযমের জন্যই প্রয়োজন মনে করতেন। "শুধু মুখে বললেই হয় না। কথা রাখতে হয়। যা হোক তা হোক করে ত্যাগের সত্যপালন করতে হয়। তবেই না তুমি ত্যাগী।" "তাক্ তেরে কেটে তাক্ বোল্ মুখে বলা সহজ, হাতে বাজানো কঠিন। ধর্মকথা বলা সহজ, কাজে করা বড় কঠিন।" ধর্ম কি? যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ···যাকে ধর্ম বলি তার প্রকৃতরূপ সত্য।

এই ভাব, এই প্রত্যয় এই প্রজ্ঞার বলেই না ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহী ও সন্ন্যাসীর আদর্শ জীবনের এক নিখুঁত সমন্বয় সাধন করে জীবনে অটুট আনন্দ সম্ভোগের পথ দেখিয়েছেন। তাই না ত্যাগাদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, ত্যাগ সন্ন্যাসের প্রসঙ্গে ভক্ত সঙ্গীদের বলতেন, ঠাকুরকে দেখে চেনা যেতো কি? কতটুকু চিনেছি তাঁকে? ত্যাগীর বাদশা ছিলেন ঠাকুর।

আবাল্য এই সত্যনিষ্ঠায় ছিল তাঁর আনন্দ, অটুট উদ্যম। উপনয়নের সময় ধাইমা ধনী কামারনির একান্ত আগ্রহে কথা দিয়েছিলেন বালক গদাধর, ধাইমার ভিক্ষা গ্রহণ করবেন, সর্বাগ্রে। আত্মীয়স্বজনগণের তীব্র কঠোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও বালক শ্রীরামকৃষ্ণ করেছিলেন সেই সত্য পালন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শূদ্রাণীর হাত থেকে অন্ন ভিক্ষা গ্রহণ করে অপূর্ব ইতিহাস রচনা করেছেন। তবেই না সত্য সত্যই স্বীকার করা, যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ···তবেই না সার্থক বলা, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

জগন্মাতা শ্যামার শ্রীচরণে সর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যশ-অপযশ, সুখ-দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ভূত-ভবিষ্যৎ। সব। ভক্তদের বলতেন, মাকে সব দিয়েছি, সত্য দিইনি। সত্য ত্যাগ করা যায় না। মায়ের পায়ে যে সব ত্যাগ করলাম, এ সত্য পালন করতে হবে তো। তাই মাকে আর সব দিয়েছি, সত্য দিইনি।

ইষ্টের চরণে এভাবে সর্বস্ব, সব রকমের আশা আসক্তি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করাকেই তিনি বলতেন, সত্যিকার ত্যাগ, প্রকৃত সন্ন্যাস।

মুখে মনে এক। মুখের কথা, ত্যাগের আগ্রহ মনকে নাড়া দেওয়া চাই। বলতেন, মনেই তো সব। মন স্বাধীন তো তুমিও স্বাধীন। আসক্তি মনের। লোভ লালসা মোহ মনের। দেহের নয় তো। তাই মনকেই বাঁধতে হয়। অষ্টপাশ থেকে মনকে মুক্ত করতে হয়। মুখে যাই বল, সাধন-ভজন যাই কেন না কর, মনের মিল না থাকলে সবই বৃথা। মিল চাই। কথায় কাজে মিল অটুট অনড় মিল।

যৌবন-প্রারম্ভে, জগন্মাতা জগদম্বার দর্শন-লাভের পূর্বে, কাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করতে, গঙ্গার ধারে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "টাকা মাটি, মাটি টাকা।" টাকায় বাড়ী গাড়ী হয়, লোক-মান্য হয়, ঈশ্বরদর্শন হয় না। তাই তিনি এক হাতে একটা টাকা আরেক হাতে এক ঢেলা মাটি নিয়ে ও আমার চাইনে ব'লে গঙ্গায় ত্যাগ করলেন টাকার সঙ্গে টাকার আসক্তিও।

সেই থেকে টাকা হাতে নিতে শ্রীরামকৃষ্ণের হাত আড়ষ্ট হয়ে বেঁকে যেতো। ছুঁতেই পারতেন

না টাকা পয়সা। জলন্ত আগুনের জ্বালাবোধ হতো গায়ে লাগলে।

গোড়ার দিকে ঠাকুরের এসব অসাধারণত্ব বিশ্বাস করতেন না নরেন্দ্রনাথ। অকুতোভয়ে পরখ করতেন। রামকৃষ্ণের ঘরে বসে একদিন আলাপ করছেন নরেন্দ্র আর আরও কয়েক জন। বাইরে গিয়েছেন রামকৃষ্ণ। এই অবসরে নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ঠাকুরের বিছানার নীচে একটা টাকা রেখে দিলেন। পরখ করবেন টাকার স্পর্শে সত্যিই ঠাকুরের গা জ্বালা করে কি না। রামকৃষ্ণ ফিরে এসে বিছানায় বসতেই লাফিয়ে উঠলেন, "উঃ"···যেন বিছায় কামড়ালো··গায়ে আগুনের ছেঁকা লাগলো। নরেন্দ্র হতবাক্! টাকাটা বের করে আনা হল বিছানার নীচে থেকে। তবে ঠাকুর বসতে পারলেন শান্ত হয়ে।

এভাবে ত্যাগ। কায়মনে ত্যাগ। মুখে ত্যাগের বড়াই আর মনে ভোগের জন্য লড়াই ··সে ভাব নয়। নির্দ্বন্দ্ব ত্যাগানুরাগ। অকুণ্ঠ ত্যাগনিষ্ঠা!

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাবধি রামকৃষ্ণের যা কিছু প্রয়োজন, যোগাতেন মথুরামোহন। ইষ্টজ্ঞানে ভক্তিও করতেন তিনি ঠাকুরকে। তাঁর অবর্ত্তমানে ঠাকুরের কোনও অভাব অসুবিধা না হয় ভেবে, ভক্ত মথুর দশহাজার টাকা আয়ের একটা বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের নামে দানপত্রের দলিল ক'রে দিতে এলেন। শুনে রামকৃষ্ণ চটে আগুন, "তবে রে শালা, তুই আমায় বিষয়ী করতে চাস্!" বলে একটা বাঁশ তুলে তেড়ে মারতে উঠলেন মথুরকে। দলিল ছিঁড়ে ফেলে তবে সেদিন মথুর রক্ষা পান।

ধনী মারোয়াড়ী লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরকে প্রণামী দিতে আনলেন নগদ দশহাজার টাকা। ঠাকুর কি ভাবে সে টাকাকেও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, মনে পড়ে।

পিতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে নিদারুণ অর্থাভাব। দোরে দোরে ঘুরেও কোন কাজ পান না। অভাবের তাড়নায় নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। ঠাকুরকে বললেন, তোমার মাকে বল না আমার অভাব মোচন করতে।

মুখ শুকিয়ে গেছে নরেনের। স্নেহার্দ্র চোখে নরেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থেকে রামকৃষ্ণ বললেন, ওরে, আমি যে মায়ের কাছে এসব চাইতে পারিনে। পাওয়া চাওয়া সবই মায়ের পায়ে ত্যাগ করেছি যে। তুই যা। মাকে বল। মা-ই তো। আমারও মা, তোরও মা। করুণাময়ী। যা। যা চাইবি, পাবি।

মায়ের মন্দিরে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। দেখলেন সর্বৈশ্বর্যশালিনী সর্বার্থসাধিকা অন্নপূর্ণা জগন্মাতা শ্যামার সর্বহরা রূপ। জীবন-মৃত্যুর নর্তননাদ-মুখর মহাব্যোম জুড়ে বিশ্বজননী পরমা প্রকৃতি শ্যামার বরাভয়প্রদা রূপ। অনাবৃত উদ্বেল বক্ষে অনন্ত সন্তান-বাৎসল্যের দোল···ছন্দে ছন্দে কাম-কাঞ্চন-কামনা-রিপুর বিনাশের অখণ্ড অভিযান। আকাশে বাতাসে মায়ের শাশ্বত বাণীর অনুরণন, "মা ভৈঃ, মা ভৈঃ"।

বিষয়বাসনামুক্ত রামকৃষ্ণের স্নেহোষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শে জেগে উঠলো নরেন্দ্রের সুপ্ত সহজাত সংস্কার। জেগে উঠলো সর্বত্যাগী শঙ্কর বিবেকানন্দের সুপ্ত আত্মা। ঘুমিয়েই ছিল তো সিংহ-শাবক। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নেও সে কি চেঁচায় ক্ষুধার্ত শৃগালের মতো? আবার মন্দিরে ফিরে গেলেন নরেন্দ্র। মায়ের প্রতিমার সামনে লুটিয়ে পড়ে বললেন, বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি দাও মা... বার বার তিন বার মন্দিরে গিয়ে ঐ একই প্রার্থনা জানিয়ে এলেন। সাংসারিক প্রার্থনা জানাতে পারলেন না।

পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রামকৃষ্ণ বললেন,—

যা তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব থাকবে না।

এই ত্যাগানুরাগ, এমনিই ত্যাগনিষ্ঠার মহিমময় ছিলেন বলেই না দেবমানব রামকৃষ্ণ গৃহীর ঠাকুর, সন্ন্যাসীর গুরু, সাধকের পরম পুরুষ।

তান্ত্রিক সাধনার ফলে অষ্টসিদ্ধাই পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। ইষ্টদেবী আদ্যাশক্তির বর। অলৌকিক ক্ষমতা। অসাধ্যসাধন শক্তি। হৃদয় বললো, মামা অষ্টসিদ্ধাই পেলে তো ওগুলো ফলাও। কাজে লাগাও।

রামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ও সব পরীক্ষা প্রলোভন। মহামায়ার বন্ধন। বিষ্ঠাজ্ঞানে এড়িয়ে চলতে হয় ভোগ বিলাসের আসক্তিও, ক্ষমতাও।

ঈশ্বর-দর্শনের সাধনায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনের সংযম। অখণ্ড অটল ব্রহ্মচর্য···

একান্ত নিষ্ঠায় কাম ত্যাগ করেছিলেন রামকৃষ্ণ। পার্বতী-নন্দন গণেশের মতো ত্রিলোকের সমস্ত রমণী জননীরই অংশসম্ভূতা জেনে রমণীকে জননী-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন। পুরাণ বলেন, এই জ্ঞানে গণেশ বিবাহ করতে পারেন নি। রমণী মাত্রেই জননী তো।

রামকৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন। জননীজ্ঞানও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। গণপতি গণেশের চেয়েও বিস্ময়কর মাতৃসত্তা-জ্ঞানে রামকৃষ্ণ তাঁর বিবাহিতা পত্নীকেও বিশ্বজননীর অংশজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। জগতে অতুল তাঁদের যুগল জীবন। অপূর্ব-শ্রুত আনন্দঘন বিগ্রহ, জ্যোতির্ময় জীবন্ত এই যুগল মূর্তি!

বৃদ্ধা জননীর সাধ মেটাতেই হোক বা দাম্পত্য-জীবনের এক অশ্রুতপূর্ব আদর্শ দেখাতেই হোক চব্বিশ বছর বয়সে, পূর্ণ যৌবনে রামকৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন ছয় বছরের সারদামণিকে। পতিপত্নীর সম্পর্ক অস্বীকার না করে, ব্রহ্মজ্ঞ রামকৃষ্ণ দিনের পর দিন সাগ্রহে সারদামণির মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন অম্লান মাতৃসত্তাবোধ। বিশ্বমাতৃত্বের অকুণ্ঠ চেতনা। কামনাগন্ধহীন ব্রহ্মচারিণীর অপূর্ব আত্মসংযম। অনাসক্ত নিষ্কাম পতিভক্তি, অনন্ত মধুর বাৎসল্য। তবেই না আমরা পেয়েছি ত্যাগ গরিমার জ্যোতির্ময়ী সবার জননী শ্রীশ্রীমাকে।

সাধক-জীবনের চরম লক্ষ্য ইষ্টদর্শন। সন্ন্যাসীর ব্রহ্মোপলব্ধি। বেদান্ত-সাধনায় অপূর্ব সাফল্য লাভ করে, সুদীর্ঘ ছয় মাস অদ্বৈতভাব-ভূমিতে ব্রহ্মানন্দে বিলীন হয়ে থেকেও জগন্মাতার ডাকে রামকৃষ্ণ নেমে এলেন। মা বললেন, নিজেই আনন্দে ডুবে থাকবি কি? লোক কল্যাণে নেমে আয়। পথভ্রান্ত আর্ত পীড়িত পতিত জীবের কল্যাণে ভাব মুখে থাক্।

স্বার্থত্যাগ করে, মোক্ষত্যাগ করে, অনির্বচনীয় অপার আনন্দলোক ত্যাগ করে নেমে এলেন রামকৃষ্ণ রোগশোক-ক্লেশাকীর্ণ দুঃখের সংসারে, বিশ্বকল্যাণ সাধনে তিলে তিলে আত্মদান করতে।

দীপ্তি তো ত্যাগেই। পরহিতায় নিজে পুড়েই না প্রদীপ জ্বলে আলো দেয়, পথ দেখায়।

আবার ডাকলেন জগদম্বা।··

কাশীপুরের বাগানে নির্জনে ধ্যানে বসেছিলেন নরেন্দ্র·রামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য উত্তরাধিকারী নরেন্দ্র। দোতলার ঘরে শয্যাশায়ী রুগ্ন রামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রকে কাছে ডেকে তার বুকে হাত রেখে রামকৃষ্ণ বললেন, জীবের জন্যই তোর আসা। তাই আজ সর্বস্ব তোকে দিয়ে আমি ফকীর হলাম। সর্বত্যাগ···সর্বস্বত্যাগ·· অকাতরে অকুণ্ঠ চিত্তে জীবনার্জিত যথাসর্বস্ব দান···ফতুর হয়ে বিতরণ!!

অপূর্ব ঐশ প্রেরণা-বোধের উদ্বেল প্রবাহ নেচে উঠলো নরেন্দ্রের শিরায় শিরায়। পথভ্রান্ত আর্তমানবকল্যাণ-ব্রতের উত্তরাধিকার মাথা পেতে নিলেন নরেন্দ্রনাথ। অবতীর্ণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপ্রত্যয়, প্রকৃতি, প্রতিভা প্রবেশ করলো শিষ্য নরেনের দেহ-দেবালয়ে। রোগশয্যায় ফিরে মহাসমাধিস্থ হলেন রামকৃষ্ণ। গুরুর জীবনাদর্শে গড়ে উঠলো অবোধ্য দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃশ্য অন্তরের প্রতিচ্ছায়া সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

সংস্কৃত ভাষায় দ্বিবচনের কারণ

শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য

সংস্কৃত ভাষায় দ্বিবচন কেন আছে—ইহা এক অতি গভীর প্রশ্ন। আধুনিক ভাষায় দ্বিবচনের প্রয়োগ হয় না, যদিও প্রাচীনতম ভাষায় (যথা ল্যাটিন, গ্রীক্, আরবী) উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমরা সংস্কৃত ভাষাকে সর্বপ্রাচীন ভাষা বলিয়া মনে করি, অতএব সংস্কৃত ভাষায় দ্বিবচন কেন আছে—তাহাই এই প্রবন্ধের বিচার্য বিষয়, এবং উহার কারণ নির্ণয় হইলেই অন্যান্য ভাষায় দ্বিবচনের কারণ কি তাহাও জানা যাইবে।

যে শব্দ-সংঘাতের দ্বারা মনোভাবের প্রকাশ হয়, বক্তার মনোভাব শ্রোতা বুঝিতে পারে, এবং শ্রোতা যে আমার বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিল—তাহা বক্তা বুঝিতে পারে—এইরূপ শব্দ-সংঘাতের নাম ভাষা। বস্তুতঃ মনোভাবই ভাষার জনক, ভাষার প্রবর্তন মনোভাবের অনুসারেই হয়। এই সিদ্ধান্তের অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, বেদরচয়িতৃবর্গের মনে এরূপ কোন 'তত্ত্ব' ছিল, যাহা হইতে দ্বিবচন উৎপাদনের অনুকূল ব্যাপার উৎপন্ন হইত; যেরূপ চিন্তা হইত শব্দের প্রয়োগও ঠিক তদনুরূপ হইত। অনুভবানুযায়ী যে শব্দের প্রচলন ও নির্মাণ হইয়া থাকে, তাহা এক প্রসিদ্ধ তথ্য। পাণিনির 'দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে' (১।৪।২২) সূত্র হইতে জানা যায় যে, দ্বিত্বের জন্য দ্বিবচনের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে—অর্থাৎ দ্বিত্ববোধের প্রকাশের জন্য দ্বিবচনের প্রয়োগ করা হয়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, দ্বিত্বরূপ এক স্বতন্ত্র পদার্থ-সম্বন্ধী মনোভাব অতি প্রাচীনকালে ছিল, যাহার ফলে দ্বিবচনের প্রয়োগ বক্তৃবর্গ করিতেন, অর্থাৎ দ্বিবচনের প্রয়োগে মানসিক দ্বিত্ব-বোধের অভিব্যক্তি হইত। তাৎকালিক বেদরচয়িতৃবর্গ বহুত্বের মধ্যে দ্বিত্বের অন্তর্ভাব করিতেন না। যেরূপ আজকাল আমরা একত্ব এবং অনেকত্বের পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করি, এবং দ্বিত্বকে অনেকত্বের এক ব্যাপ্য পদার্থ বলিয়া বুঝি, বেদরচয়িতৃবর্গ ঠিক সেইরূপ অনেকত্ব হইতে দ্বিত্বের পৃথক্করণ করিতেন। যেহেতু আমাদের আর অনেকত্ব হইতে দ্বিত্বের পৃথক্ বোধ করার সামর্থ্য নাই, অতএব দ্বিত্ববোধের দ্যোতক দ্বিবচনের প্রয়োগও আর আমরা করি না। অতএব আধুনিক ভাষায় ক্রমশঃ দ্বিবচনের প্রয়োগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে ইহা স্বীকার্য হয় যে, ঋষিগণ যে বহুত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া দ্বিত্বের গণনা করিলেন, তাহার কারণ ছিল। তাঁহাদের মনে একত্ব-দ্বিত্ব-বহুত্বের পৃথক পৃথক প্রতিভাস। অবশ্যই দ্বিত্ব এবং বহুত্ব একজাতীয় পদার্থ নহে বা বহুত্বের মধ্যে দ্বিত্ব গণিত হয় না, এতদুভয়ের মধ্যে কোনও ভেদক তত্ত্ব কাছে, যদ্দ্বারা দ্বিবচনের পৃথক জ্ঞান হইত। এখন প্রধান হইবে 'দ্বিত্ব' নামধেয় এক পৃথক পদার্থটী কি? এবং কেন বহুত্বের মধ্যে দ্বিত্ব গণিত হয় না?

আমাদের অনুমান এই যে, সাক্ষাৎকৃতধর্মা তত্ত্বসাক্ষাৎকারী ঋষিগণ দেখিলেন যে, কখনও

'এক' হইতে সাক্ষাদ্‌ভাবে 'বহুর' উৎপত্তি হয় না; কারণ যদি ঐ 'এক' কোন * অপরিণামী তত্ত্ব হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোনও পরিণামী 'এক' মিলিত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত 'বহু' (অর্থাৎ পরিণামময় সৃষ্টি) হইতে পারে না। এই অন্য 'এক'টা দ্বিতীয় এক', অতএব উহাতে দ্বিত্ব আছে—এইরূপ স্বীকার্য হয়। অতএব মানিতে হইবে যে 'বহু'র জন্য দুইটি একের আবশ্যকতা আছে, অর্থাৎ এক+এক=বহু।

বহু এবং সৃষ্টি এক পদার্থ, বহুত্বকে ছাড়িয়া দিলে সৃষ্টির কোনই অর্থ হয় না, এবং অপর পক্ষে সৃষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়, ততক্ষণ বহুত্বের বোধও হইতে পারে না, বহুত্বের কারণ-ভূত দুইটি পদার্থেরই বোধ হইবে, অতএব সেস্থলে দ্বিবচনের প্রয়োগ করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। বহু যে অনন্তেরও বাচক, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—'অনন্তো বৈ বহু' (২১।২।১৫)। এই তথ্যটির অনুভব সাধক ব্যক্তি করিতে পারিবেন। যদি এইরূপ স্বীকার করা হয় যে কথিত 'এক' পরিণামী পদার্থ, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিতীয় নিমিত্ত কারণের সহিত তাহার যোগ হইতেছে, ততক্ষণ 'বহু'র উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব এই পথেও বহুর জন্য দুইটি 'একের' সদ্‌ভাব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। অতএব স্বীকার্য এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় কারণভূত পদার্থ, ও বহু কার্যভূত পদার্থ, অতএব কেবল কারণভূত পদার্থেরই যখন বোধ হইবে—তখন—দ্বিবচনের প্রয়োগ অনিবার্য হইবে।

প্রাচীনশাস্ত্রে যে সৃষ্টি-তত্ত্ব আছে, তাহাও এই এক-দ্বি-বহু-দর্শনের জ্ঞাপক। যথা—প্রকৃতি-পুরুষ এবং তদনন্তর বহু বিকার; ব্রহ্ম-মায়া এবং তদনন্তর লীলাবৈচিত্র্য; বিন্দু-বিসর্গ এবং অতঃপর সৃষ্টি (আগম); ইত্যাদি। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে 'কেবল দ্বিত্বে'র বোধ হইতে পারে, যেখানে বহুত্বের গন্ধমাত্র নাই। বহুত্বের মধ্যে দ্বিবচন গণিত হইতে পারে না, কারণ দ্বিবচন পর্যন্ত কারণতাবগাহী জ্ঞান থাকে, এবং বহুবচনে কার্যতাবগাহী জ্ঞান হয়। অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন সাধক এই বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রমাণ হইবেন।

বেদ স্বয়ং বহুত্বের জন্য দুইটী তত্ত্বের কথা বলেন—'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (ঋগ্‌বেদ, ৬।৪৭।১৮)—এই মন্ত্রের দ্বারা। পুরুরূপ = বহুত্বের জন্য ইন্দ্র+মায়া চাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ…'—এই বাক্য হইতেই জানা যায় যে সর্ব=বহুর জন্য 'ব্রহ্ম' ও তাঁহার 'ব্রহ্মাস্মি' রূপ বেদন—এই দুইটি কারণ বর্তমান। যখন যোগী বহুকায়ের নির্মাণ করেন, তখনও তিনি সাক্ষাৎ-ভাবে কায়-সকলের নির্মাণ করিতে পারেন না, তাঁহাকে এক পৃথক্ নির্মাণ-চিত্তের নির্মাণ

* যদিও আমরা বর্তমানে 'এক' এবং 'বহু' দ্বারাই ব্যবহার করি, তথাপি 'দ্বি' রূপে একটী স্বতন্ত্র পদার্থের জ্ঞান প্রাচীন আচার্যের মধ্যে ছিল। প্রবন্ধের শেষের দিকে ইহা বলা হইয়াছে। পাণিনির ৫।৩।৯২ সূত্রভাষ্যে আছে: 'পরিপ্রাণশ্চ অনির্জ্ঞাতে, অনির্জ্ঞাতং চ বহুষু। দ্বেকয়োঃ পুনর্নির্জ্ঞাতম্'। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের দৃষ্টিতে দুই ও বহুর মধ্যে যে ভেদ আছে তাহা পতঞ্জলি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন। ইহা একটি মৌলিক মনোভাব; অবশ্য আজকাল এতাদৃশ বাক্য অসংবদ্ধ প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে 'দুই' যে 'বহু', নহে তাহা অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় আচার্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাচীন আচার্যগণের মতে সমূহের জ্ঞান 'তিন' হইতে সুরু হয়, 'দুই' পর্যন্ত সমূহের জ্ঞান হয় না (কৈয়টটীকা, ৪।২।৪৩)

করিতে হয় (যোগসূত্র, ৪।৩-৪)। উপনিষদে 'একোহং বহু স্যাম্' কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বাক্যের 'এক, কোনও এক অবিভাজ্য অপরিণামী তত্ত্ব নহে, কিন্তু উহাতে 'চৈতন্য' এবং মনবুদ্ধি (অর্থাৎ দ্রষ্টা+দৃশ্য) আদি আছে, অতএব এখানেও বহুর জন্য দুইটি কারণের সত্তার প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। কিঞ্চ এই বাক্যে সৃষ্টি-তত্ত্বাসংবন্ধী একটি সামান্য সিদ্ধান্ত দেখান হইয়াছে, সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয় নাই, অতএব এই বাক্য আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সার্থক হয় না।

পাণিনি স্বয়ং এই সূক্ষ্মতম দর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। অতএব তিনি দুইটি বচননির্ণায়ক সূত্র করিয়াছেন—বহুষু বহুবচনম্ (১।৪।২১) এবং 'দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে' (১।৪।২২)। পাণিনির এই দুইটী সূত্রে বহু অর্থ লক্ষ্য করিবার আছে যাহা আমরা এস্থলে উপন্যস্ত করিতেছি। যথা—

(ক) সূত্রকার দ্বিবচন ও একবচনের এক সূত্রে পাঠ করিয়াছেন এবং বহুবচনের জন্য পৃথক্ সূত্রের রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি দ্বিবচন ও একবচনকে তুল্য-জাতীয় পদার্থ মনে করিতেন, কারণ আচার্য পাণিনির একটী প্রধান শৈলী এই যে তিনি তুল্যজাতীয় পদার্থের একত্র সঙ্কলন করেন (দ্রষ্টব্য, হয়বরট্ সূত্রভাষ্য—'এষা হি আচার্যস্য শৈলী···' বাক্য)। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে দ্বিত্ব পর্যন্ত কারণতাবগাহী জ্ঞানই থাকে, অতএব উহারা তুল্যজাতীয়। প্রয়োগ-সাধনের দৃষ্টিতে দুইটি পৃথক্ সূত্র করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, অতএব অন্য কোনও সূক্ষ্ম প্রয়োজন যে সূত্রকারের ছিল—তাহা দুইটী সূত্রের পৃথক্ কারণ হইতে অনুমিত হয়।

(খ) এই দুই সূত্র একত্র পঠিত হইলে শাব্দিক লাঘব যে হইত তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাহা না করার ফলে সূত্রকার যে কোনও বিশিষ্ট অর্থের স্ফুরণ করিয়াছেন—তাহা অবশ্য স্বীকার্য। আর্বাচীন বৈয়াকরণগণ অর্বাগ্ যোগবিৎ ছিলেন, তাঁহারা এই সূক্ষ্মদর্শন বুঝিতে পারেন নাই, অতএব একই সূত্রে একবচন, দ্বিবচন ও বহু-বচনের পাঠ করিয়াছেন, যাহার ফলে পাণিনির অধ্যাত্মদর্শন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক অর্বাক্-দর্শী পাণিনীয় বৈয়াকরণগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, দুইটী সূত্রের স্থানে একটী সূত্র করিলেই ভাল হইত—কিন্তু তাহা হইলে যে দার্শনিক দৃষ্টির হানি হইত—তাহা এই সমস্ত বৈয়াকরণং-মন্যমানগণ বুঝিতে পারেন নাই।

(গ) সূত্রকার প্রথমে বহুবচনের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তৎপরে দ্বিবচন ও একবচনের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন—এইরূপ ক্রমই অন্যান্য ব্যাকরণতন্ত্রে দেখা যায়, অতএব সহসা সূত্রকার প্রচলিত মানবীয় বোধের অতিক্রমণ কেন করিলেন তাহা প্রষ্টব্য হইতে পারে। উত্তরে বক্তব্য এই যে—জ্ঞানকালে প্রথমে কার্যের জ্ঞান হয়, অতঃপর কারণের জ্ঞান হয়, অতএব শিষ্যসুহৃৎ মাঙ্গলিক আচার্য পাণিনি অগ্রে বহুবচনের সূত্র ও পরে দ্বি-এক-বচনের সূত্র স্থাপিত করিয়াছেন। সমগ্র অষ্টাধ্যায়ীতেই জ্ঞানক্রমের অনুসারে বিষয়-ক্রম রাখা হইয়াছে—তাহা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বৈয়া-করণবর্গ বুঝিতে পারিবেন। এই বিষয়ে 'অষ্টা-ধ্যায়ী-প্রকরণ-ক্রমালোচনম্' নামধেয় আমার সংস্কৃত নিবন্ধ বিশেষভাবে আলোচ্য।

(ঘ) সূত্রোপাত্ত দ্বি এবং এক শব্দ (১।৪।২২) যে দ্বিত্ব এবং একত্বের বাচক তাহা যথার্থ এবং তদ্রূপ 'বহুষু বহুবচনম্' (১।৪।২১) সূত্রস্থ 'বহু' শব্দও বহুত্বের বাচক।

বহু যদি বহুত্বের বাচক হয়, তবে 'বহুষু' পদে বহুবচন কেন হইল—এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, এবং প্রাচীন সর্ব টীকাকারগণই ইহার উত্তর দিয়েছেন। আরোপ-ন্যায় অবলম্বনপূর্বক তাঁহারা যে সমাধান করিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে (ইহার বিশদ বিবরণ মৎকৃত শ্রীমদ্‌ভগবৎপাণিনি-সম্মতসূত্রার্থনির্ণয়ঃ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।) যথার্থ উত্তর এই :—'বহু' শব্দ কার্যভূত পদার্থের বাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়, কার্য সর্বকালেই অমেয় ও বহুসংখ্যক; যদ্যপি কারণ দৃষ্টিতে সমস্ত কার্যতে একত্ব বুদ্ধি হইতে পারে—বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্—এই শ্রৌতন্যায়ানুসারে—তথাপি কার্য-দৃষ্টিতে কার্যে একত্বজ্ঞান কদাপি হইতে পারে না। অতএব 'বহুষু' পদে বহুবচন করা হইয়াছে। 'বহৌ বহুবচনম্' বলিতে অবশ্য শাব্দিক লাঘব অবশ্যই হইত, কিন্তু তাহা হইলে দার্শনিক দৃষ্টির হানি হইত—ভগবান্ সূত্রকার দার্শনিক ছিলেন।[১]

পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, দ্বিত্বের পৃথক্ বোধ হইলে দ্বিবচনের প্রয়োগও অনিবার্য হইবে। কাহার সনে দ্বিত্ববোধ ছিল, এবং কিভাবে অন্যান্য সুপ্রাচীন ভাষাতেও দ্বিবচনের প্রয়োগ হইয়াছিল—তাহা এস্থলে কথিত হইতেছে। দ্বিবচনের সর্ব প্রাচীন প্রয়োগ বেদে আছে, অতএব বেদরচয়িতৃবর্গের মনে দ্বিত্ববোধ হইত। কেবলমাত্র দুইটি জগৎকারণের জ্ঞান-করণের সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল, তাহার ফলে যখন কেবল দুইটি পদার্থ ভাবিত হইত, তখন দ্বিবচনের প্রয়োগানুকূল পৃথক্ ব্যাপার হইত। প্রত্যেক বাহ্য কার্যের কোনও না কোনও আধ্যাত্মিক কারণ থাকে, অতএব দ্বিবচনের প্রয়োগের জন্যও যে কোনও আধ্যাত্মিক কারণ বর্তমান—তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। বেদরচয়িতৃবর্গের মনে এই দ্বিত্ববোধ কেন হইল—যেহেতু তখন তো কেবল জগৎ-কারণভূত দুইটি পদার্থমাত্রই ছিল না। উত্তর—অনাদিনিধন বাক্‌স্বরূপ বেদবাণী সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে প্রবর্তিত। তাঁহার মনে একত্ব-দ্বিত্ব-বহুত্বের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান যথাবৎ আছে। অতএব বেদেও দ্বিবচন আছে। এই উত্তর অনেকের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু দ্বিত্ববোধ ব্যতীত যে দ্বিবচনের প্রয়োগ হইতে পারে না—তাহা মানিতেই হইবে।

প্রত্যেক কার্যে দুই কারণের দর্শন হেতু দ্বিবচনের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইহা সত্য, ঐ হেতু লৌকিক ব্যবহারেও ইহা চরিতার্থ হয়। যদি শঙ্কা হয় যে এরূপ সূক্ষ্ম দর্শন তো জনসাধারণে প্রচলিত হইবার

১ একবচন দ্বিবচন আদি শব্দে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা 'বচন' শব্দের প্রয়োগ। একবচন আদি শব্দে বচনশব্দের সার্থকতা আছে, অন্যথা লাঘব-সর্বস্বব্যসনী ভগবান পাণিনি কেবল 'এক' 'দ্বি' আদি সংজ্ঞারই প্রয়োগ করিতেন, বচন শব্দের কোনও প্রয়োজন ছিল না। 'বচন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা সূত্রকার জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, কদাচিৎ একত্ব-দ্বিত্ব-বহুত্ব-জ্ঞান বচনসাপেক্ষও হয়—উহাদের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান ব্যতীতও। ইহার এক প্রসিদ্ধতম উদাহরণ 'অস্মৎ শব্দের বহুবচনের' প্রয়োগ অর্থাৎ 'বয়ম্' পদ। বস্তুতঃ অস্মৎপদলক্ষ্য পদার্থে অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা ও একাত্মরসতা নিত্য-বিদ্যমান। এবং অহংবোধে বহুত্বের গন্ধমাত্রও নাই—ইহা ন্যায়-সাংখ্য-বেদান্তের প্রসিদ্ধ মত এবং অনুভূত তথ্য। তথাপি 'অহং' পদের বহুবচনের যে প্রয়োগ হয়, উহার কারণ বচন—কথন—শব্দব্যবহার, অর্থাৎ যদ্যপি 'বয়ম্' পদের যথার্থ প্রত্যক্ষ হয় না, তথাপি—অহম্ অহম্ অহম্ এইরূপ সজাতীয় বচন—শব্দ শুনিয়াই বয়ম্ বা 'আবাম্'এর অভিকল্পনা করা হয় এবং ঐ দুইটী শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নহে, অতএব কিভাবে ইহা সর্বত্র আদৃত হইল? উত্তর—সমাধিসিদ্ধ ঋষিগণ কর্তৃক যাহা প্রবর্তিত হইল, তাহার তাৎপর্য অনুসন্ধান না করিয়াও তা লোকে প্রয়োগ করিবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ভাষাতেই এমন শব্দ-প্রয়োগ আছে, যাহা কোনও সময় বা সম্প্রদায়ে সার্থক ছিল, পরে পরবর্তী কালে বা অন্য সম্প্রদায়ে নিরর্থক হইয়া যায়—তথাপি তাঁহার প্রয়োগ চলিতেই থাকে—ভাষাবিজ্ঞান হইতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যেহেতু সর্বোৎকৃষ্ট ঋক্‌স্বরূপ বেদে দ্বিবচন আছে, অতএব সংস্কৃত ভাষাতেও আছে, এবং উহার অনুস্মরণ হেতু অন্যান্য প্রাচীন ভাষাতেও দ্বিবচনের প্রয়োগ হইয়াছে; পরে অমনস্বিতা বাড়িয়া গেলে দ্বিবচনের প্রয়োগ বন্ধ হইয়া যায় (আধুনিক ভাষায়)।

যদিও প্রোক্ত মনোভাবের নাশ হইয়া গিয়াছে, তথাপি অদ্যাপি 'দ্বিত্ব' ও 'বহুত্বের' পার্থক্য প্রসিদ্ধ আছে। এখনও আমরা 'দুই হইতে পৃথক্ করা' ও 'বহু হইতে পৃথক্ করা'র জন্য তর-তম-প্রত্যয় করিয়া থাকি ও সর্বভাষাতেই এই জাতীয় প্রত্যয় আছে। পৃথক্ করণের দৃষ্টিতে 'দুই হইতে পৃথক্ করা' ও 'বহু হইতে পৃথক্ করার' মধ্যে ভেদ নাই, তথাপি যে ভেদ করা হয়, উহার মূল অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কোনও না কোনও সময় দ্বিত্ব ও বহুত্ব পৃথক্‌ভাবে গণিত হইত, আজকালের মত 'এক' ও 'বহুর' মধ্যেই বিভাগ করা হইত না।

স্বপ্নাবেশ

শ্রীমতী সুজাতা সেন

জাগরণে ছিনু যে ধ্যানে বসিয়া, দেখিলেম ঘুমঘোরে
ডাকে আসি ত্বরা, আঙিনাতে কারা, তারই বাণী কহে মোরে।
এনেছিল হাতে ফুলভরা সাজি, আমারই পূজার ছিল বুঝি সাথী
জানিনা কেমনে তাকালো চকিতে, কেমনে গেল গো সরে—
ঘুমের উপর ঘুম জমেছিল আলো-ছায়া-মাখা ঘরে।

তবু প্রাণ জানে কি বারতা তারা এনেছিল সাথে করে
মন্দির পথে আরতি দেখিতে অপরূপ বেশ ধরে
বাতায়ন পথে ক্ষীণ দীপালোকে, সহসা দেখিনু যেন রে পলকে
গৃহের দেবতা সজীব আসীন ফুলের আসন পরে
দূরে মন্দিরে বাজিছে ঘণ্টা ডাকিতেছে সকলেরে।

স্বপন আবেশে কত কথা এল কত কথা গেল ফিরে
ভিতর-বাহির সারাটি চিত্ত আলোয় উঠিল ভরে।
পুরাতন যেন কত খেলাঘর, ভাঙ্গি নিল রূপ নব নব-তর
চির চঞ্চল প্রাণবিহঙ্গ স্তব্ধ রহিল নীড়ে,
বরিষে মধুর সঙ্গীত-সুধা অখিল জীবন ঘিরে।

যারা এসেছিল সোনালী-স্বপনে জাগরণে ডেকে দে রে
বেশী কিছু নয় শুধু দুটি কথা বলে দেব ত্বরা করে।
বলে দেব আজি জাগরণ-ঘুম, দুয়েরে দেখেছি স্তব্ধ নিঝুম
জীবন-সত্যে ধ্যান-আরাধিত পাইনু নিমেষে যারে
তাঁহারি আশিস্-মঙ্গলবারি পড়িছে সতত ঝরে।

সমালোচনা

অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী—লেখক: শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান: মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৫৩ +১৶০; মূল্য—আড়াই টাকা। বইটি অদ্বৈতবাদকে কেন্দ্র করিয়া বেদান্তের বিবিধ তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। জটিল দার্শনিক সমস্যা-সমূহের সরল ব্যাখ্যা লেখকের চিন্তাশীল সূক্ষ্ম মনের পরিচয় দেয়। 'আনন্দ' প্রবন্ধটি সত্যই আনন্দদায়ক। সম্প্রদায়নির্বিশেষে ধর্মপিপাসু ব্যক্তির নিকট বইটি সমাদৃত হইবে—সন্দেহ নাই। শেষের দিকে লেখকের ভারতীয় দার্শনিক-চিন্তার বিভিন্ন ভাবধারার সারাংশটিও উপভোগ্য।

Benoy Kumar Sarkar (A Study)—অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান: দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯৪; মূল্য—দুই টাকা। সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক স্বর্গত মনীষী বিনয় কুমার সরকারের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এবং তাঁহার বিদ্রোহী চিন্তাধারার মৌলিকত্ব সুধীসমাজের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিনয়কুমার বঙ্গের কৃতী সন্তানদিগের অন্যতম; সেইজন্য বাঙ্গালী-মাত্রই বিশেষ করিয়া ছাত্রসম্প্রদায়ের তাঁহার জীবনী এবং বাণীর সহিত পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়ের এই বইটি পাঠ করিলে তাঁহারা এই বিষয়ে প্রচুর সহায়তা লাভ করিবেন মনে হয়।

শ্রীগোবিন্দসুন্দর মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক)

Karl Marx and Vivekananda—লেখক: শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৩৩নং, আপার সার্কুলার রোড হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ: ১০৬+১৬; মূল্য—১।॰ টাকা।

জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমন্বয় সাধনই আলোচ্য পুস্তকখানির উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের নামকরণ হইতেও এই উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লেখক পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় উভয়ের এই প্রকার যোগসূত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে মার্কস্ হেগেলের নিকট ঋণী; হেগেল দার্শনিকপ্রবর স্পিনোজার নিকট ঋণী এবং স্পিনোজার সহিত বেদান্তদর্শনের বহু বিষয়ে মিল দেখা যায়। সুতরাং মার্কসের সহিত বেদান্তের তথা বিবেকানন্দের ঐক্যসাধন করা যায়। বলা বাহুল্য এই প্রকার উক্তি আদৌ বিচারসহ নয়, বরং ইহা উক্ত দর্শন ও দার্শনিকদের সম্বন্ধে লেখকের স্বল্প জ্ঞানের পরিচায়ক। অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে স্বামিজীর অনেক উক্তিই মার্কসীয় সাম্যবাদের অনুকূল বলিয়া মনে হইবে। লেখক অনেকস্থলে এই প্রকার উক্তির সাহায্য লইয়াছেন। মার্কস্ এবং বিবেকানন্দ উভয়েই মানবপ্রেমিক এবং উভয়েই বঞ্চিত এবং শোষিত জনগণের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন,—লেখকের এই সকল মতও সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু শুধু এই প্রকার উক্তির দ্বারাই তাঁহাদের মত ও পথের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাহা ছাড়া পুস্তকে যুক্তি অপেক্ষা উচ্ছ্বাস প্রবল হওয়ায় রচনা অনেকস্থলে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অনেকস্থলে অপ্রাসঙ্গিকভাবে রাষ্ট্র, সমাজ, আইন, আপেক্ষিকবাদ, পরমাণুবাদ প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে লেখক নিজেও সচেতন এবং তিনি উহা স্বীকার করিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু এবং উত্তম প্রশংসনীয়। মার্কস্ ও বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আলোচ্য

পুস্তকখানি তাঁহার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও অনুভূতির অভিব্যক্তি। তবে পাঠকসমাজের জন্য এ প্রকার পুস্তক রচনা করিতে হইলে আরও ধৈর্য, গভীর অনুশীলন এবং প্রস্তুতি প্রয়োজন।

শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন (অধ্যাপক)

উপগীতা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। প্রকাশক—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা—৩২০+১৶; মূল্য—২৲ টাকা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তুর আদর্শে ঋগ্বেদ, বিভিন্ন উপনিষদ্, মহাভারত এবং কিছু কিছু অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোক সংকলিত করিয়া পনরটি অধ্যায়ে প্রাঞ্জল অনুবাদ সহ সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অধ্যায়গুলির বিভাগ লেখক একটি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে করিয়াছেন; উহার যুক্তি ভালই লাগিল। ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী তথ্যপূর্ণ ভূমিকা এবং স্থানে স্থানে জরথুষ্ট্র ও শিখধর্মের চিন্তাধারার সহিত তুলনা-মূলক আলোচনা হৃদয়গ্রাহী।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (১৩৫৯)—সম্পাদক—শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী, এম্-এ, সাহিত্যরত্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, -১০৬, নরসিংহ দত্ত রোড হইতে প্রকাশিত।

পত্রিকাখানির এইটি ষষ্ঠবার্ষিকী সংখ্যা। বিদ্যার্থিগণের সুলিখিত রচনাগুলির ব্যাপক বিষয়-বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষালয়ের উচ্চাদর্শ ছাত্রগণের মনন ও প্রকাশ-ভঙ্গীকে প্রভাবিত করিতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-মুখর শিলং—গত ১১ই চৈত্র শিলং আশ্রমের উপাসনা মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি-প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত সংবাদ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই মাসে উক্ত উৎসবের কিছু বিস্তৃততর বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

এই পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া সমগ্র শিলং উৎসব সমারোহে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় ষাট হাজার নরনারী বিভিন্ন দিনের কর্ম-সূচিতে যোগদান করিয়াছিলেন। আশ্রমে প্রভাতকালীন বেদপাঠ এবং সন্ধ্যায় আরতি ও ভজন উৎসবদিবসগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিত। মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজ কর্তৃক ১১ই চৈত্র মূর্তি-প্রতিষ্ঠার দিন প্রাতঃকালে বিশেষ পূজা হোমাদি এবং রাত্রে কালীপূজা উদযাপিত হয়। উৎসব-কর্মসূচীর আর একটি অঙ্গ ছিল প্রতিদিন সকালবেলা একঘণ্টা করিয়া ধর্মালোচনা। ইহাতে বিভিন্ন দিবস বক্তার আসন গ্রহণ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ, স্বামী শাশ্বতানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, এবং স্বামী গদাধরানন্দ।

দুইদিন মধ্যাহ্নে জাতিধর্মনির্বিশেষে পনর হাজারেরও অধিক নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ ভোজন করানো হয়। এই দুই দিবস দ্বিপ্রহরে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক লীলা-কীর্তন সমাগত সকলেই সানন্দে উপভোগ করিয়াছিলেন। স্বামী প্রণবাত্মানন্দের ছায়াচিত্রযোগে শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতাও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

উৎসব উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন স্থানে সাতটি জনসভা আহূত হইয়াছিল। স্বামী

মাধবানন্দজী ছিলেন বিভিন্ন সভাপতিদের অন্যতম। প্রারম্ভিক এবং শেষদিনের সভায় পৌরোহিত্যে বৃত হন যথাক্রমে আসামরাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅমিয়কুমার দাস এবং বিধানসভার সভ্য শ্রীনীলমণি ফুকন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নয়া দিল্লী কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ চারিটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী, ভগবদ্গীতার মূলতত্ত্ব এবং নাগরিক জীবনের নীতি। কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি আশ্রমের স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ তিনদিন মনোজ্ঞ তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। শ্রীমতী পুষ্পলতা দাস, এম. পি, শ্রীমহাদেব শর্মা, রাজ্যরত্ন এস. ভি. মুখার্জী, কুমারী উষা ভট্টাচার্য এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী সুপর্ণানন্দও বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য—মিশন বোম্বাই রাজ্যের আহমদনগর জেলায় দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। বোম্বাই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের উহার উপর পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে। প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসি-সেবক সহকারিতার জন্য দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে গিয়াছেন। ৪টি কেন্দ্র খুলিয়া দুঃস্থ জনগণকে খাদ্য সরবরাহ করা হইতেছে।

জনশিক্ষা-প্রচার—চৈত্র মাসের মাঝামাঝি বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের জনশিক্ষা-বিভাগ হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং ছাত্রকর্মী রাঁচির চতুষ্পার্শ্ববর্তী কতকগুলি গ্রামে শিবির খুলিয়া চলচ্চিত্র এবং ছায়াচিত্র প্রভৃতি যোগে জনশিক্ষা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

জয়ন্তী-সংবাদ—মালদহ, কাঁথি, মনসাদ্বীপ, আসানসোল, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর —এই সকল শাখাকেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে হেমচন্দ্র নাগ—গত ৩রা বৈশাখ 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহেমচন্দ্র নাগের পরলোক গমনে বাংলার একজন প্রতিভাবান প্রবীণ সাংবাদিকের অভাব হইল। সুদীর্ঘ ৭২ বৎসরের জীবনে বহু সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বাধীন বলিষ্ঠ রচনা দ্বারা অকুণ্ঠিত ভাবে তিনি দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। অকৃতদার হেমবাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ ছিলেন তাঁহার দীক্ষাগুরু। মঠের কয়েক জন প্রাচীন সন্ন্যাসীর সহিতও তাঁহার বহুকালের সৌহার্দ্য ছিল। এই দৃঢ়চরিত্র, ধর্মনিষ্ঠ, উদারহৃদয় মনীষীর মৃত্যুতে আমরা পরমাত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। শ্রীভগবান পুণ্যাত্মার ঊর্ধ্বগতি বিধান করুন।

হোজাই (নওগাঁ, আসাম)তে অনুষ্ঠান—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম জন্মোৎসব গত ৯ই ও ১০ই বৈশাখ এখানে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সৌম্যানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ, স্বামী গোপেশ্বরানন্দ, স্বামী ঈশাত্মানন্দ এবং স্বামী কাশিকানন্দ মহারাজগণের শুভাগমনে জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

প্রথম দিন উষাকীর্তন, পূজা, হোম, শোভাযাত্রা ও স্বামী সৌম্যানন্দের পৌরোহিত্যে একটি মহতী সভায় বাঙলা ও অসমীয়া ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। রাত্রিতে আরাত্রিকের পর "কৃষ্ণলীলা" অভিনীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন প্রায় পাঁচ হাজার দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ সহকারে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মোহের প্রভাব

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং
ব্যাপারৈর্বহুকার্যভারগুরুভিঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ॥

রাত্রিঃ সৈব পুনঃ স এব দিবসো মত্বা মুধা জন্তবো
ধাবন্ত্যুদ্যমিনস্তথৈব নিভৃতপ্রারব্ধতত্তৎক্রিয়াঃ।
ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভূতবিষয়ৈরিত্থংবিধেনামুনা
সংসারেণ কদর্থিতা বয়মহো মোহান্ন লজ্জামহে॥

(ভর্তৃহরি—বৈরাগ্যশতকম্, ৪৩-৪৪)

প্রত্যুষে সূর্য উঠে, দিবাশেষে অস্তাচলে ডুবিয়া যায়, পরমায়ু হইতে একটি একটি করিয়া দিন এই ভাবে প্রত্যহ ক্ষয় হইয়া চলে। বহু কার্যভার কাঁধে লইয়া মানুষকে ঘুরিতে হয়, ব্যাপৃতির তাহার আর শেষ নাই; তাই কালের এই দুর্বার গতি তাহার নজরে আসে না। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং জীবনের বিপুল দুঃখকষ্ট দেখিয়াও সদা-ব্যস্ত মানুষের মনে ত্রাস জাগে না। হায়রে, মানব-চিত্তের বিভ্রম! মোহমদিরা পান করিয়া সারা জগৎ উন্মত্ত।

মনের সঙ্গোপনে উঠে অগণিত সঙ্কল্প—বাহিরে সে গুলিকে বাস্তব রূপ দিতে মানুষ উদ্যম-ভরে কতই না কাজ করিয়া ছুটে। সব কিছুই তাহার মনে হয় কত অভিনব, কত বিচিত্র। কিন্তু হায়, সে বুঝিতে পারে না পৃথিবীতে নূতন বলিয়া বড় বেশী কিছু নাই। সেই রাত্রি, সেই দিন, সেই পুরাতন বিষয়গুলিরই পুনরাবর্তন। যত কিছু ব্যাপার আমরা নূতন ভাবিয়া আকৃষ্ট হই সবই বস্তুতঃ চর্বিত-চর্বণ। বৃথাই আমাদের ছুটাছুটি। সংসারের এই গতানুগতিক জীবন-ধারা আমাদিগকে নাকে দড়ি দিয়া অনর্থক ঘুরাইয়া মারিতেছে। কিন্তু হায়রে মোহ, আমাদের একটুও লজ্জা নাই!

কথাপ্রসঙ্গে

অদ্বৈতজ্ঞান ও মায়া বনাম মায়াবাদ

যিনি আমার পঞ্চভূতাত্মক রক্তমাংসের দেহের প্রকৃত মালিক—দেহী —চেতন আত্মা, তিনিই সকল জীব-শরীরের চালক, সর্বাত্মা—শুধু তাহাই নয়, সমস্ত অচেতন পদার্থসমূহেরও আশ্রয় তিনিই—পৃথিবীতে তিনি, পৃথিবীর উর্ধ্বে অন্তরীক্ষে, দ্যুলোকে তিনি—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছাড়া আর কিছু নাই—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আত্মৈবেদং সর্বম্—এই জ্ঞানের নাম অদ্বৈতজ্ঞান। সকল উপনিষদ এই জ্ঞানের রহস্য প্রচারে মুখর। ইহা শুধু কথার কথা নয়, কল্পনাবিলাস নয়—প্রত্যক্ষানুভবের বিষয়। যুগে যুগে ভারতবর্ষে (এবং কখনও কখনও ভারতবর্ষের বাহিরেও) সাধক-সাধিকাগণ এই গভীর বৈদান্তিক সত্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, হিসাবী দুনিয়া তাঁহাদিগকে উপহাস করিলেও, পাগল বলিলেও গ্রাহ্য করেন নাই—সত্যানুভূতির কৃতার্থতায় ভরপুর থাকিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। প্রশ্ন উঠে, সত্যদৃষ্টিতে সব কিছু যদি চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা, তাহা হইলে আমি বহু দেখি কেন? মানুষে মানুষে, জীবে জীবে, জড়ে চেতনে এত পার্থক্যবোধ কেন? উপনিষদেরই উত্তর: আমি ভুল করি বলিয়া; করা উচিত নয়, তবুও করি। সত্যের দিকে চোখ ঢাকিয়া মিথ্যা আঁকড়াইয়া থাকি বলিয়া; থাকা লোকসান, তবুও সেই লোকসান মানিয়া লই। আমাদের এই ভুলের, অদ্বৈত-সত্য হইতে বিচ্যুতির কারণ কি? এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট জবাব নাই। শুধু এই টুকু বলা চলে—ভুল, দ্বৈতবোধ কি করিয়া আমাদের কাঁধে চাপিল জানিনা—কিন্তু জন্মিয়া অবধি যে মানুষের উহা সাথী ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানুষ কখনো কখনো তাহার চেতনার গভীর স্তরে সংসারের বিচিত্র পরিবর্তনের স্রোতের পশ্চাতে একটি অব্যক্ত একতা অনুভব করে, তখন তাহার মনে হয় উহাই শাশ্বত সত্য—আর যাহা কিছু সবই শুধু আসে যায়, অনবরত বদলায় উহাদের থাকা মাত্র কিছুকালের জন্য—শাশ্বত সত্যের তুলনায় উহারা যেন স্বপ্নের মত ছায়া—মিথ্যা। যে সত্য সনাতন, সর্বাবগাহী আর যে সত্য বিকারশীল, সীমাবদ্ধ তাহাদের পার্থক্য একটি বাস্তব পার্থক্য—যতদিন না মানুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। বেদান্ত যখন জগৎকে মায়া বলেন তখন তিনি এই পার্থক্যটিই বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সব কিছু ব্রহ্ম এই জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানী মানুষ যে বিশ্বসংসারে বহুত্ব বোধ করে উহারই নাম মায়া। মায়া শুধু ন্যায়ের বা ব্যাকরণের বা অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি কথার প্যাঁচ নয়—মায়া স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"আমরা কি এবং সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার সহজ বর্ণনা মাত্র (statement of facts)।"

মায়াকে কেহ অস্বীকার করিতে পারেনা—যেমন চতুষ্পার্শ্বের বায়ুকে, সূর্যের আলোককে, সম্মুখে প্রবহমান নদীর ধারাকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। চরম সত্য অদ্বৈতজ্ঞানকে মানিলে আপেক্ষিক সত্য মায়ার ধারণাও আমাদের কাছে অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

সর্বজনানুভূত এই যে তথ্য মায়া—ইহার সহিত 'বাদ' যুক্ত করিয়া আমরা যে 'মায়াবাদ' কথাটি ব্যবহার করি উহার ইতিহাস কিন্তু

স্বতন্ত্র। যাহা একটি অতি স্পষ্ট নিত্য-প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্য তাহাকে টিকা-টিপ্পনী বিচার-বিতণ্ডার বেড়াজালে পড়িয়া শুধু একটি মতবাদ (theory) রূপে আত্মপরিচয় দিতে হইতেছে ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। যে বায়ুকে আমরা মুহূর্তে মুহূর্তে নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া চলি তাহাকে আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয় করিতে পারি, কিন্তু তাহার সত্যাসত্য লইয়া জল্পনা কল্পনা করা হাস্যকর ব্যাপার। মায়া সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। জগৎ-সংসারের ঘটনাপুঞ্জের চোখে-দেখা প্রকৃতির নাম মায়া। উপনিষদ বার বার বলিতেছেন—উহাকে বাজাইয়া লও, পরীক্ষা করিয়া দেখ—সত্যলাভের জন্য ইহা অবশ্য প্রয়োজন। জগৎকে না চিনিলে জগদতীতকে ধরিবে কি করিয়া? এই পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ এক কথা কিন্তু মায়াকে বাস্তব দুনিয়া হইতে তুলিয়া পুঁথির পাতায় যখন আমরা সংগ্রথিত করিবার চেষ্টা করি তখন ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরূপ। আমরা তখন আর সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিক থাকিনা—আমরা হইয়া পড়ি 'মায়াবাদী'। অসংখ্য বচন এবং যুক্তির থাম তুলিয়া আমরা মায়াবাদরূপ সৌধের ভিত শক্ত করিতে যাই। শক্ত হয়তো করি—কিন্তু সেই সৌধের ইষ্টকস্তূপে মায়া জিনিষটাই চাপা পড়িয়া যায়। জগৎ ও জীবনের পরম সত্যকে জানিবার যাহা অতি প্রয়োজনীয় ধাপ—মায়াকে চেনা—তাহার আর কোন উপায় থাকে না। ভীতিপ্রদ, দুর্বোধ্য, কুয়াসাচ্ছন্ন একটি শাস্ত্রীয় জটিলতা রূপে মায়া আমাদের সমস্ত বুদ্ধি-বিচারকে বিকল করিয়া বসে!

'মায়াবাদ' এ পৃথিবীতে অনেক গালি খাইয়াছে, এখনও খাইতেছে—কেননা যাঁহারা গালি দেন তাঁহারা বলেন, এই সর্বনাশা 'বাদ' মানুষকে ইহকাল-বিমুখ, অলস, স্বার্থপর করিয়াছে—জগতের সুখদুঃখ উপেক্ষা করিয়া পর্বতগুহায় চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকিতে শিক্ষা দিয়াছে। এই অভিযোগ একভাবে হয়তো সত্য। কিন্তু যে উপনিষদের ঋষিরা বলিয়াছিলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বা মায়া, তাঁহারা নিশ্চিতই এই কটূক্তির লক্ষ্য হইতে পারেন না। তাঁহারা কোন চিত্তকল্পিত 'বাদ' উপস্থাপিত করেন নাই। জগৎ ও জীবনের দুই ধাপের দুটি সত্যের (আপেক্ষিক ও পারমার্থিক) তাঁহারা ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। ঐ সত্যদ্বয় কোন 'বাদ' এর অপেক্ষা রাখেনা। উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা, আকাশ-বায়ু-আলোককে অস্বীকার করার মতই বাতুলতা। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' ঘোষণা করিয়া উপনিষদের ঋষিরা মানুষকে কখনও কর্মবিমুখ ও স্বার্থপর হইতে বলেন নাই। প্রতিক্ষণে বিপরিণামী জগৎ-রীতির যথার্থ পরিচয় লাভ করিলে মানুষ কি তাহার ক্ষুদ্র আমিকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিতে পারে, না তাহার কাল্পনিক সীমায়িত ক্ষুদ্র 'মায়িক' ব্যক্তিত্বকে বৃহতের জন্য বিসর্জন দিতে উন্মুখ হয়? বুদ্ধ কি করিয়াছিলেন? শঙ্করাচার্য কি করিয়াছিলেন? জগৎকে তাঁহারা মায়া বলিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের সমগ্র জীবন ছিল অকুণ্ঠিত অক্লান্ত মানবসেবায় ভরপুর। আধুনিক কালের শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া একদিন বলিয়াছিলেন,—"হৃদু, জগৎটা যদি সত্য হত তা হলে তোদের সমস্ত কামার-পুকুরটা সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতাম।" অথচ সেই শ্রীরামকৃষ্ণই এই 'মিথ্যা' জগতে থাকিয়া 'মায়া'র মানুষের দুঃখে কাঁদিয়া তাহাদের কল্যাণের জন্য দেহের শেষ রক্তবিন্দু ক্ষয় করিয়া গেলেন। বুদ্ধ-শঙ্কর-শ্রীরামকৃষ্ণের পদানুগ সন্ন্যাসী

বিবেকানন্দও মায়ার জগতের সেবাই মুক্তিলাভের বিশিষ্ট সাধনরূপে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সংসারের 'মায়িক' স্বরূপ জানার তাৎপর্য গভীরতর—উহা সংসারের 'ব্রহ্মত্ব' সম্পাদনের সহায়ক। জগৎকে 'মায়া' বলিতে আমরা যেন ভয় না পাই। তবে মায়াকে বাস্তব-সমীক্ষা-বর্জিত, বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পর্কশূন্য বাগ-বিতণ্ডার পটভূমিতে একটি 'বাদ' মাত্রে যদি পর্যবসিত করিয়া ফেলি তবে অবশ্যই আমাদিগকে সমালোচকের অনেক নিন্দা শুনিতে হইবে। সেই 'বাদ' দ্বারা কখনও অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করা যাইবে কিনা সন্দেহ। অতএব অদ্বৈতজ্ঞান সর্বথা বরণীয়, 'মায়া'ও স্বীকরণীয় কিন্তু 'মায়াবাদ' শুনিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনীয়।

সমুদ্রের গভীরে

পুরাতন বালিগঞ্জের জনৈক বিত্তশালী ভদ্রলোকের প্রশস্ত আঙ্গিনা ও বাগানযুক্ত বাড়ীর দরজায় সন্ধ্যাবেলায় দলে দলে লোক ঢুকিতেছিল। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, ধনী, গরীব সকল রকম লোকের ভিড়। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল প্রায় পাঁচহাজার নরনারী ঘাসের উপর বসিয়া। দূরে এক কোণে একটি ছোট বেদী সাজানো। পূজার আয়োজন রহিয়াছে। রামায়ণের কথকতা হইবে। এতগুলি মানুষ পরস্পর গা ঘেঁষিয়া, বহু অসুবিধা সহ্য করিয়া বসিয়া আছে—কিন্তু কাহারও মুখে চোখে কথায় কোন অস্বস্তি, উদ্বেগ, চঞ্চলতা নাই। ধীরে ধীরে কথক ঠাকুর শালগ্রাম-শিলা বহন করিয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। স্থিরভাবে বসিয়া নারায়ণ পূজা করিলেন। তাহার পর কথকতা আরম্ভ হইল। সুর করিয়া পয়ারছন্দে রাম সীতা লক্ষ্মণের কাহিনী বর্ণনা—মাঝে মাঝে দু একখানি গীত। নানাজাতির নানা বয়সের নানা প্রকৃতির পাঁচ হাজার মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির ভাবে বসিয়া দুই ঘণ্টা সেই প্রাচীন উপাখ্যান শুনিল। এই চলচ্চিত্র-রঙ্গমঞ্চ-আকীর্ণ, বিবিধ বিলাস-ব্যসন-আমোদপ্রমোদ-ব্যাপৃত সহস্র-কোলাহল-মুখরিত কলিকাতা শহরে ভর সন্ধ্যা-বেলায় এই দৃশ্য দেখিয়া চিত্ত একটি আশ্চর্য আবেগে অভিভূত হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী অশিক্ষিত পল্লীগ্রামবাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৃদ্ধ বা সংসারের সর্বসুখবঞ্চিতা বিধবার দল নহেন। শত শত সুশিক্ষিত, মার্জিতরুচি, ভদ্রঘরের মহিলা ও পুরুষ এবং স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীরাও বসিয়া ছিলেন।

তবে কি সমুদ্রের গভীরে একটি অনির্জ্ঞাত প্রবাহ বাহিরে সকলের অলক্ষিতে বহিয়া চলিয়াছে, আপন কাজ করিয়া অগ্রসর হইতেছে? যতই না কেন আধুনিকতার স্রোতে আমরা গা ভাসাই, বর্তমান বৃহৎ বিশ্বের রোমাঞ্চকর প্রগতি আমাদের চোখে যতই না ধাঁধা লাগাইয়া যায়, ঈশ্বর, ধর্মনিষ্ঠা, পাতিব্রত্য প্রভৃতি শব্দ ও ধারণাগুলিকে আমরা 'প্রাচীন' বলিয়া যতই না কটাক্ষ করি, ভারতের ভগবান কি ভারতবীণাকে রামায়ণের সুরে বাঁধিয়া এখনও ঝঙ্কার দিতেছেন? আর ভারতের পুত্র-কন্যারা সে সুরে কান না দিয়া পারিতেছে না? যে-গুলিকে আমরা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস বলিয়া নাক সিঁটকাইতাম সেইগুলির ভিতরই কি প্রাণপ্রদ জীবনসত্য রহিয়া গিয়াছে, আর সেই সত্য পুনর্বার তাহার দুর্বার শক্তি লইয়া আনমনাকে আকর্ষণ করিতেছে? এই আকর্ষণের পরিধি কি বাড়িয়াই চলিবে? আধুনিকতা, ইহকালসর্বস্বতা প্রভৃতি ভারতের মাটিতে আখেরে শিকড় গাড়িতে পারিবে না, ইহাই কি বিধিলিপি?

"ঠাকুরের কৃপায়"

একগাল হাসিভরা মুখে তিনি তাঁহার

ধর্মবন্ধুর সহিত আত্ম-বিভোর হইয়া কথা বলিতেছিলেন। সরকারের উচ্চপদ হইতে সম্প্রতি মোটা টাকার পেনসনে অবসর লইয়াছেন। চাকুরী থাকিতে থাকিতেই তিনটি ছেলেকে এ-সাহেব, বি-সাহেব, সি-সাহেবকে ধরিয়া দুষ্প্রবেশ্য সরকারী বিভাগে ঢুকাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন—তাহারা প্রত্যেকেই এখন অফিসার, যথাক্রমে ছয় শ', পাঁচ শ' ও সাড়ে চার শ' মাহিনা পায়। ছোট ছেলেটি এম্-এস্ সি পাশ করিয়া বসিয়া ছিল—'ঠাকুরের কৃপায়' অমুকের সুপারিশে তাহারও একটি ভাল অ্যাপ্রেন্টিসী জুটিয়া গিয়াছে, দুই বৎসর পরে সাত শ' টাকা করিয়া আনিবে। বড় দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে; এক জামাতা জজ্—অপরজন বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী। ছোট মেয়েটি বি-এ দিল—পাশ করিবে কোন সন্দেহ নাই—সেতার শিখিতেছে। তাহারও জন্য পাত্র দেখা হইতেছে। বিবাহের টাকা মজুদ আছে; পুত্রহীন শ্বশুর মহাশয়ের উইলের টাকা। কয়েক বৎসর পূর্বেই বালিগঞ্জে যে একটি বাড়ী কেনা হইয়াছিল উহা "ঠাকুরের কৃপায়" খুব তালমতই হইয়া গিয়াছিল। নহিলে আজ দারুণ গৃহসঙ্কটের দিনে ঐরূপ একটি বাড়ী করিতে দেড় লাখ টাকাই লাগিয়া যাইত। গদ্‌গদ কণ্ঠে বন্ধুকে বলিতেছিলেন, সব 'ঠাকুরের দয়া' ভাই।

নিকটে অপর একটি প্রৌঢ় ক্ষীণদেহ ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত সৌভাগ্যবান ভক্তদ্বয়ের কথা শুনিতেছিলেন। মলিন জামা কাপড়, সংসারের অজস্র ঘাতপ্রতিঘাতের চিহ্ন ললাটের কুঞ্চিত রেখায় উঁকি মারিতেছে। ভাবিতেছিলেন, তিনিও তো ঈশ্বরের ভক্ত—সারা জীবন ভগবানে মতি রাখিয়া কাটাইয়া আসিয়াছেন—সৎভাবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু কই, সংসারের দিক দিয়া 'ঠাকুরের কৃপা' তো তাঁহার উপর হইল না। রোগ-শোক-ব্যাধি-দারিদ্র্য-দুশ্চিন্তা—ইহাদেরই পাইয়াছেন জীবনের নিত্যসহচর—ভগবানের আশীর্বাদ!

ভাগ্যবানকে তিনি হিংসা করিতে ছিলেন না, কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইতেছিল। এই ভদ্রলোকের সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে—জীবনপথে পদে পদে প্রচণ্ড বাধা ঠেলিয়া ইঁহাকে অগ্রসর হইতে হয় নাই, শোকতাপ-দুঃখদুর্দশার কঠোর অভিঘাত ইঁহাকে কখনো আচ্ছন্ন করে নাই—ইঁহার পক্ষে 'ভগবানের কৃপা' সত্যই বাস্তব—কিন্তু রঙ্গমঞ্চে যদি পট-পরিবর্তন হইত, তাঁহার নিজের মত যদি দিনের পর দিন অভাব অনটন অস্বাস্থ্য পারিবারিক অশান্তি এই ভদ্রলোকের জীবনকে ঘিরিয়া রাখিত তাহা হইলে তিনি 'কৃপা'র কথা কি গালভরা হাসিমুখে বলিতে পারিতেন? ভগবান কি কেবল সুখেরই বিধাতা? দুঃখের সময় অমলিন মুখে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করার হিম্মত কি আমাদের অর্জন করিতে হইবে না? আর একটি কথা। মানিলাম ভদ্রলোক সঞ্চিত শুভকর্ম-ফলেই হউক অথবা যে কারণেই হউক ভগবানের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন। বিত্ত, মান, পারিবারিক শান্তি—কোন কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু ইঁহার কি উচিত নয় সেই কৃপার ফল ভগবানের অপর শত শত সন্তানদিগের সহিত ভাগ করিয়া উপভোগ করা? শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-চৈতন্য-শ্রীরাম-কৃষ্ণের কি তাহাই শিক্ষা নয়? বিষয়ী লোকের সেই দুর্দম্য ধনতৃষ্ণা—সেই ঘোর স্বার্থপরতা—সেই আত্মম্ভরিতা—ইহাদের সহিত 'ঠাকুরের কৃপা'লাভের সামঞ্জস্য কোথায়? ভগবানের মহিমা

কি প্রকটিত হয় বড়লোককে আরও বড়লোক করিয়া? ধনমানমত্ত অহঙ্কারীর অহঙ্কারকে আরও পরিপুষ্ট করিয়া? 'কৃপা' যিনি অনুভব করিয়াছেন তাঁহার অন্তর কি পরিপূর্ণ হওয়া উচিত নয় দীনতা, অনাসক্তি, সন্তোষ, সহানুভূতি, সেবায়?

রবীন্দ্র-জয়ন্তী প্রসঙ্গে

গত ২৫শে বৈশাখ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৯২তম জন্মদিন উপলক্ষে কলিকাতায় এবং বাংলাদেশের শত শত স্থানে কয়েকদিন ধরিয়া সভা-সমিতি এবং নৃত্য-গীত, আবৃত্তি প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বাংলার বাহিরেও নানা স্থানে এই স্মরণীয় উৎসব প্রভূত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ছিলেন কবি ও সাহিত্য-শিল্পী, কিন্তু তাঁহার বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন শক্তিমান ব্যক্তিত্বের অপর বহুদিকও আমরা দেখিতে পাই—যে গুলি সমানই বিস্ময়কর। তাঁহার ভিতরকার বিচক্ষণ শিক্ষাবিদ্, দরদী লোকসেবক, অদ্ভুতকর্মা সংগঠক, মনস্বী দার্শনিক এবং ভাব-গভীর মরমী সাধক ও ঈশ্বরপ্রেমিক ঐ ঐ ক্ষেত্রে যে সকল মৌলিক চিন্তা, ভাবধারা ও কীর্তিনিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতীয় জাতির অভ্যুত্থানের পথে মূল্যবান পাথেয়। আমাদিগকে আজ রবীন্দ্র-প্রতিভার এই শেষোক্ত দিকগুলির সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হইতে হইবে। ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও দর্শনের আদর্শ কবির জীবন ও চিন্তাধারাকে কী গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল—ভারত-সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য তাঁহার রচনাবলীতে কী জ্বলন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সামাজিক ও জাতীয় অগ্রগতির জন্ম যাঁহারা পরিশ্রম করিবেন তাঁহাদের কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি কি কি সারবান উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—এই সব বিশেষ করিয়া দেশবাসীর অনুধাবন করা কর্তব্য। বসন্তের হাওয়ায় বকুল ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ, আর অলস সন্ধ্যায় আনমনে আকাশের পানে তাকাইয়া মিহিসুরের গান—শুধু ইহা দ্বারাই যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিবার প্রয়াস পাই তাহা হইলে বিশ্বকবির প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে মানুষ হইতে বলিয়াছিলেন—ভারতীয় সংস্কৃতিকে চিন্তায়, আচরণে, কর্মে ফুটাইয়া তুলিতে বলিয়াছিলেন। প্রখর মননে—পবিত্র গভীর ভাবসাধনায়—অকুণ্ঠিত কর্মে, আমাদের চরিত্রকে নিরলস, সবল করিয়া তুলিবার ভূরি ভূরি প্রেরণা কবির বাণীতে আকীর্ণ রহিয়াছে। সেইদিকে আমরা যেন বেশী করিয়া দৃষ্টি দিই।

"বেদান্ত বলেন, মুক্তির যে মহা আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ। ঐ ভাবকে খুব নিকটে লইয়া আসিতে হইবে, যতদিন না তুমি জানিতে পার যে ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ। শুধু ইহা বুদ্ধিপূর্বক জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা—আমরা এই জগৎকে যতদূর স্পষ্টভাবে দেখিতেছি তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে উহা উপলব্ধি করা। * * * তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, হৃদয়ের সকল চঞ্চলতা স্থির হইয়া যাইবে, সমুদয় বক্রতা সরল হইয়া যাইবে—তখনই এই বহুত্বভ্রান্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি, এই মায়া এখনকার মত ভয়ানক, অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র বলিয়া মনে হইবে—তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমরা যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করি তাহারাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

স্বামী শান্তানন্দ

১৩১৮ সাল চলিতেছে। শ্রীশ্রীমা রহিয়াছেন বাগবাজারে তাঁহার উদ্বোধনের বাটীতে। মায়ের শরীর সুস্থ হইয়া উঠিতেছে না, তাই জয়রামবাটি যাওয়া স্থির হইল। ৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার মা কলিকাতা হইতে রওনা হইলেন। হাওড়া ষ্টেশনে নাগপুর প্যাসেঞ্জার নয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম হইতে ছাড়িবে। প্ল্যাটফর্মে পূজনীয় স্বামী তুরীয়ানন্দ, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন; অনেক ভক্তেরও সমাবেশ হইয়াছিল। গোলাপ মা ষ্টেশনে মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি ভক্তদের বলে দিন যে মায়ের শরীর ভাল নয়, তাঁরা যেন দেশে গিয়ে মাকে বিরক্ত না করেন।" মাষ্টার মহাশয়ও জোর গলায় এই কথা সমাগত সকলকেই জানাইয়া দিলেন। মা কিন্তু উহা শুনিতে পাইয়া গোলাপ মাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "একি বোল্‌ছো গোলাপ, একি বোলছো!"

* * *

পরের বৎসর (সন ১৩১৯) কার্তিক মাসে স্থিরীকৃত হইল শ্রীশ্রীমা ৺বারাণসীধাম যাইবেন। মা কলিকাতা হইতে রেলগাড়ীর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরাতে ২০শে কার্তিক মঙ্গলবার মোগলসরাই আসিয়া পৌছিলেন। সেদিন একাদশী। সঙ্গে রহিয়াছেন মায়ের আত্মীয়গণ এবং মঠের কয়েকজন সাধু। ষ্টেশনের কর্মচারীরা মায়ের কামরাটি কাশীগামী গাড়ীর সহিত জুড়িয়া দিল। গাড়ী গঙ্গার ব্রীজের নিকট আসিলে মা কাশীর দৃশ্য দর্শনে খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রীজের মাঝামাঝি আসিয়া করজোড়ে প্রণাম করিতেছিলেন। মায়ের মুখের ভাবটি অদ্ভুত রূপ ধারণ করিল। মায়ের দুর্বল শরীরে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনের ওভারব্রীজ পার হইতে বেশ কষ্ট হইবে বলিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ* মায়ের জন্য একটি পালকীর ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। অন্যান্য সকলের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল। অদ্বৈত আশ্রমের গেট হইতে আশ্রম বাড়ী পর্যন্ত অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছিল। মায়ের পালকী যখন আশ্রমে পৌছিল তখন বেলা প্রায় ১টা। শ্রীশ্রীমহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ, বিজ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি সকলেই সানন্দে মায়ের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মা পালকী হইতে নামিলে মহারাজ ভাবে বিহ্বল হইয়া একজন সেবককে বলিয়া উঠিলেন, "ধর্‌ ধর্‌, মা যেন পড়ে না যান।" সে এক অপূর্ব দৃশ্য! হলঘর অতিক্রম করিয়া মা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ভাঁড়ার ঘরে গিয়া বসিলেন। অতঃপর কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে তাঁহার জন্য নির্ধারিত বাটীতে গমন করিলেন।

আশ্রমে ২৫শে কার্তিক, শনিবার দিন শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা হইল; শ্রীশ্রীমাকে ঐ দিবস আশ্রমে পূজায় শুভাগমন করিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি বলিলেন, "আজ যাইব না, কাল যাইব।" পরের দিন বেলা প্রায় ৯।১০ টার

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

সময় মা আশ্রমবাটীতে আসিয়া কিছুক্ষণ প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া ছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ প্রতিদিনই প্রাতে ভ্রমণে বাহির হইতেন; ঐ সময় তিনি শ্রীশ্রীমা যে বাড়ীটিতে থাকিতেন সেইখানে গিয়া নীচ হইতে ভূদেব* বলিয়া ডাকিতেন। মা ঐ ডাক শুনিবামাত্র "রাখাল এসেছে" বলিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মহারাজ মায়ের নিকট গেলে পাছে তিনি ভাবে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন এইজন্য নিম্নেই মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া চলিয়া আসিতেন।

৺কাশীতে মায়ের থাকাকালীন আমি প্রত্যহ অদ্বৈত আশ্রম হইতে ফুল তুলিয়া মায়ের কাছে পূজার জন্য দিয়া আসিতাম এবং ঠাকুরের মিষ্টি প্রভৃতি জলখাবার আনিতাম। একদিন জিলাপী লইয়া যাইবার সময় বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, এমন সময় খাবারের ওপর চিলে ছোঁ মারিল, সাথে সাথে ২।১ খানা জিলাপিও লইয়া গেল। আমি বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম; আসিয়া মাকে সমস্ত বিবৃত করিলে মা সেই জিলাপিগুলি ঠাকুরের ভোগে ত দিলেনই না। এমন কি আমাদের কাহাকেও খাইতে দিলেন না, বলিলেন, "চিলের পায়ে কত কি থাকে, এ তোমাদের খেয়ে দরকার নেই।" শ্রীশ্রীমা তাঁহার সন্তানদের কি চোখেই না দেখিতেন!

২৩শে অগ্রহায়ণ, (১৯১৯) অমাবস্যা, রবিবার দিন শ্রীশ্রীমা সকালে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইলেন। স্নানের পর মা রামচন্দ্রের মন্দির দর্শনপূর্বক ৺বিশ্বনাথের পুরানো ভাঙ্গা মন্দির দেখিতে গমন করিলেন; অতঃপর ৺বিশ্বনাথের মন্দির, ৺অন্নপূর্ণার মন্দির ও ঢুণ্ডীগণেশ দর্শনান্তে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসেন।

২৫শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সকালে মা অসি-সঙ্গমে স্নানান্তে ঘাটের উপরেই অবস্থিত জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে যাইলেন। ইহার পর তাঁহাকে সঙ্কট-মোচনের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। এই মন্দিরটির সন্নিকটে একটি বৃহৎ বটগাছ আছে। মা উহা দেখিয়াই বলিলেন, "দেখ, এই বটগাছটি ঠিক আমাদের পঞ্চবটির মতন।" ইহা বলিয়াই তিনি গাছটি স্পর্শ করিলেন। তৎপরে মা প্রথমে শ্রীমহাবীরকে দর্শন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে আসিলেন। পরিশেষে সঙ্কটমোচনের মন্দিরের পিছন দিকে অবস্থিত তুলসীদাসের সাধন-স্থান পর্যবেক্ষণান্তে গাড়ী করিয়া দুর্গাবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং দুর্গাবাড়ী ও স্বামী ভাস্করানন্দের মন্দির পরিদর্শন পূর্বক নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

২৮শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার বৈকালে মা ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধুকে সাথে লইয়া পাল্কী করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কালভৈরব দর্শনে যান। মন্দির দেখাইবার জন্য তাঁহার এক সন্ন্যাসী সন্তান সঙ্গে ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকজন আত্মীয়া ও গোলাপ মা প্রভৃতি গাড়ীতে করিয়া গিয়াছিলেন। গাড়ীতে গেলে অনেকখানি রাস্তা হাঁটিতে হইবে বলিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ মায়ের জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কালভৈরব দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমা মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণের রোয়াকে উপবেশনপূর্বক কিছুক্ষণ জপ করিলেন। তথা হইতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর স্থান এবং তৎপরে আসিলেন বেণীমাধবের মন্দিরে। মায়ের বেণীমাধব ও বেণীমাধবেশ্বর শিব দেখা সমাপ্ত হইলে তাঁহার ভাইপো ও ভাইঝিরা ধ্বজায় উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মা অনুমতি দিলেন। তিনি নিজে তাঁহার সন্ন্যাসি-সন্তানের সহিত সেইখানে

* মায়ের জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন, "দেখ, এখন আমি বুড়ো হয়েছি, তাই উঠ্‌তে পারলাম না। ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন ৺কাশীতে এসেছিলাম, তখন এই ধ্বজায় উঠেছিলাম। সেই সময় যখন পুষ্কর ও হরিদ্বারে যাই তখন সাবিত্রীর পাহাড় ও চণ্ডীর পাহাড়েও উঠেছিলাম।" অপর সকলের বেণীমাধবের ধ্বজা দেখা শেষ হইলে মা ৺সঙ্কটার মন্দিরে আসিলেন। অনন্তর দেবী দর্শনান্তে একটি টাকা দক্ষিণা দিলেন। মন্দিরের পাণ্ডারা ইহাতে অত্যন্ত খুশী হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিল, "মাঈ কঁহাসে আয়ী!" তাহাতে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আগত সাধুটি উত্তর দিলেন, "য়ঁহাসে আয়ী, অউর কঁহাসে আয়েংগী?" মায়ের কানে উহা যাইতেই তিনি সাধুটিকে ধীরে ধীরে কহিলেন, "না, না, বলো, জয়রামবাটী থেকে এসেছেন।" তদনন্তর মা ৺বীরেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন এবং শিবদর্শন ও প্রণামপূর্বক মণিকর্ণিকার ঘাট দেখিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

১৫ই পৌষ, বুধবার দিন মায়ের জন্মতিথি পড়িল। অদ্বৈত আশ্রমে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও হোমাদি তিনি আসিয়া দর্শন করিলেন। অনেক ভক্ত তাঁহাকে এইখানে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। মা পরে কিছু জলযোগান্তে নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যান।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়কার একজন কথক ঠাকুর সেই সময় ৺কাশীতে আগমন করেন। তিনি শ্রীশ্রীমাকে কথকতা শুনাইতে আসিলেন। ২৭শে পৌষ, শনিবারে পাঠ হইল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কয়েকটি উপাখ্যান। শ্রীশ্রীমহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ধ্রুব চরিতাংশে যখন বালক ধ্রুবের একাকী নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 'কোথায় আমার সেই পদ্মপলাশলোচন হরি' বলিয়া আকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিবার কথা হইতেছিল, তখন পূজনীয় হরি মহারাজজীর দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল। সেই সমাবেশে বেশ একটা জমজমাট্ ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল। কথক ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে মাকে বলিলেন, "এখানে একটি রামকুণ্ড আছে, শ্রীরামচন্দ্র যখন ৺কাশীতে আসেন, তখন সেইখানে স্নানাদি করে-ছিলেন; আপনি কি সেই স্থান দর্শন করতে যাবেন?" শ্রীশ্রীমা ঐ কথামত যাইতে সম্মতা হওয়ায় একটি পাল্কীর ব্যবস্থা করা হইল। তিনি অপরাহ্নে ঐ পাল্কীতে চড়িয়া রামকুণ্ডে গমন ও তথায় উহা স্পর্শ করেন।

পৌষ সংক্রান্তির দিন মা সকাল বেলায় ঘোড়াঘাটে গঙ্গাস্নান করিলেন; সেদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে অত্যন্ত ভীড় হইবে বলিয়া ৺শূলটঙ্কেশ্বর মহাদেবকে "এই-ই বিশ্বনাথ" বলিয়া দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসেন। অপরাহ্ণ সাড়ে চারটার সময় গাড়ী করিয়া বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও ঢুণ্ডি গণেশ দর্শন করিতে গমন করিয়া ছিলেন। ৺কাশীধামে মা যে কয় মাস ছিলেন, একদিন অন্তর ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে, ঠিক সামনে, গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন।

ভক্ত তুলসীদাসের সাধন-স্থান সঙ্কটমোচনের মন্দিরে রাসযাত্রা করিবার জন্য বৃন্দাবন হইতে রাসলীলার একটি দল আসে। শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত ডাক্তার নৃপেনবাবু ঐ রাসলীলা মাকে দেখাইতে দলটিকে অদ্বৈত আশ্রমে আনাইলেন। মা তিন দিনই আশ্রমে আসিয়া হলের উত্তর দিকে যে ছোট ঘরটি আছে সেইখানে বসিয়া ঐ পালা দেখিয়াছিলেন। অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আসল ও নকল এক দেখলাম।"

পালা-শেষে তিনি রাসধারীদের কয়েকটি টাকা পারিতোষিক দেন।

একদিন বৈকালবেলা শ্রীশ্রীমা গাড়ীতে করিয়া বটুক ভৈরব, কামাখ্যা, বৈদ্যনাথ ও শঙ্কর মঠ দেখিতে গমন করেন। শঙ্কর মঠ হইতে বাহির হইবার সময় গেটের কাছে দাঁড়াইয়া জঙ্গলের দিকে মুখ করিয়া তাঁহার সহিত আগত সাধুটিকে বলিলেন, "তোমাদের এইদিকে একটা মঠ হলে বেশ হোতো।"

মা একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী-সন্তানদের খাওয়াইবার জন্য মনস্থ করিলেন। তাঁহার গৃহেই আহারাদির সমস্ত বন্দোবস্ত হইল। শ্রীশ্রীমহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী প্রভৃতি সকলে সাহ্লাদে মায়ের বাড়ী গেলেন। বেলা দ্বিপ্রহর আন্দাজ খাইতে বসা হইয়াছিল—সকলেই খুব আনন্দ করিয়া ভোজন করিলেন। মা ঠাকুরের সন্তানদের এবং উভয় আশ্রমের সমস্ত সাধু ব্রহ্মচারীদের একটি করিয়া কাপড় দিবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ মত আমি কাপড় কিনিয়া আনিলাম। হরি মহারাজ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন, এজন্য মা আমায় বলিলেন, "হরির কাপড়টা গেরুয়া করে দেবে।" শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে বস্ত্র পাইয়া পূজনীয় মহারাজগণ সকলেই পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে উহা মাথায় বাঁধিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বস্ত্র বিতরণের সময় সেবাশ্রমের একখানি কাপড় কম পড়িল; আমি বলিলাম, "এতেই হয়ে যাবে, আর কাপড় কিনতে হবে না।" আমার উত্তর শুনিবামাত্র মা বলিলেন, "না, না; তোমাদের না দিলেও চলে, এরা কত রোগীর সেবা করছে পরের জন্য কত খাটছে, ওদের কাপড় আগে দিতেই হবে। তুমি আর একটি কাপড় কিনে আনো।" আমি তাহাই করিলাম।

মায়ের ৺কাশীতে বাসকালীন আশ্রমে একদিন দশনামী সাধুদের খাওয়ানো হইয়াছিল; মা তথায় আসিয়া সাধুদের দর্শন করিয়াছিলেন।

সেইবার ৺জগদ্ধাত্রী পূজার সময় অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিমা গড়িয়া পূজা হইয়াছিল। মা ঐদিন বেলা ১০।১১টার সময় আশ্রমে শুভাগমন পূর্বক পূজা ও হোমাদি দর্শন করিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে মায়ের জন্য তাঁহার বাড়ীতে প্রসাদ লইয়া যাইলাম। মা বলিলেন, "জয়রামবাটীতেও জগদ্ধাত্রী পূজো হচ্ছে, সেখানে পূজো শেষ হলে পর তবে খাবো, রেখে দাও।"

ঠিক হইল ২রা মাঘ, বুধবার, মা ৺কাশীধাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন। বেলা দুইটা বাজিয়া চৌদ্দ মিনিটের সময় নিজ বাটী হইতে মা শুভযাত্রা করিয়া বাহির হইলেন। বড় রাস্তায় পৌঁছিলে দেবাদিদেব ৺বিশ্বনাথের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণামপূর্বক গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং বেনারস ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনে শ্রীশ্রীমহারাজ, হরিমহারাজ ও বিজ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছিলেন। বহু সাধু মায়ের সহিত মোগল-সরাই ষ্টেশন অবধিও গমন করিয়াছিলেন।

মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম, ৺বারাণসীপুরে থাকার সময় মা খুব ভোরে মৃদুস্বরে এই গানটি গাহিতেন,

"শিবের আনন্দ কানন কাশী।
যার মধ্যে বিরাজ করেন অন্নপূর্ণার কাশী॥"

কালী করালিনী

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যুদ্দামসমপ্রভামন্নী, আরূঢ়া সিংহোপরি,
চক্রধরালি খেটকরধৃতা ললাটে চন্দ্রকলা ;
অনলস্বরূপা ত্রিনয়নী মাতা, ভীষণা, লম্বোদরী
বিবিধা শক্তি সেবিতা দুর্গা, বর্ণসমুজ্জ্বলা।

পঞ্চমুণ্ডসমাসীনা দেবী, শিরোপরি মহাকালী
নৃমুণ্ডমালা শোভিতা করালী, রত্নমুকুট মাথে,
পীন-উন্নত-ঘটস্তনী মা,—ধ্যানের আলোক জ্বালি'
দেখি, পুস্তক অভয়মুদ্রা অক্ষমালিকা হাতে।

ধ্যান করি তোমা ওগো মহাদেবী আগমশাস্ত্র-গীতা
অনলাত্মিকা রক্তবসনা, দাঁড়াও সমুখে আজি,
অমৃতরশ্মিরত্নমুকুটে হে কালী, মহেশপ্রীতা
চরণপদ্মযুগলে রত্ননূপুর উঠুক বাজি।

গলে মণিহার সহস্রভুজে শূলাদি অস্ত্র শোভে
ইষ্টদাত্রী চরণে তোমার বন্দনা করি নিতি,
জয় হোক তব ভূতাপহারিণী বিচ্ছেদ আনো ক্ষোভে,
হে কালরাত্রি, তোমারে প্রণাম,—নাশো তমিস্রাভীতি।

জননী, আমার সমুখে দাঁড়াও রণরঙ্গিণী বেশে
আকাশে ঠেকুক স্বর্ণমুকুট, জ্বলুক মধ্যমণি,
সূর্য্যের আলো ম্লান হয়ে যাক কুঞ্চিত এলো কেশে
মহাশ্মশানের জ্বলন্ত চিতা দেখ তুমি ত্রিনয়নী।

দক্ষিণ করে খড়্গ তোমার ঝলসি' উঠুক জ্বলে,
সুতীক্ষ্ণ ধারে শোণিত পিপাসা হউক দুর্নিবার,
বাম করে দাও অভয় আশিস ভীত সন্তান দলে,
করালিনী কালী, দাঁড়াগো আবার কবি মা অঙ্গীকার—

হৃদয়-পিণ্ড উপাড়িয়া দিব, হৃদয়-বাসিনী শ্যামা
যদি সে অর্ঘ্যে তৃষ্ণা তোমার মিটে যায় চিরতরে,
প্রেতের নৃত্য সহিতে পারি না ; রোষকটাক্ষে থামা
মাতৃমন্ত্রে ছন্দোপতন,—সহিব কেমন করে ?

তুমি মহামায়া, আদ্যাশক্তি কালোয় জগৎ আলো,
অম্বিকা যার ললাট হইতে স্বয়ং সমদ্ভূতা,
দিগম্বরী মা, মুক্ত আকাশে প্রলয়ের শিখা জ্বালো,
লোলজিহ্বার তৃষ্ণা হউক আহ্লাদে আপ্লুতা।

অমাবস্যার ঘনান্ধকার, রজনী দ্বিপ্রহর,
জনমানবের সাড়া নাই, শুধু মহাশ্মশানের বুকে,
শবসাধকের কণ্ঠে মন্ত্র উঠিছে দ্বিঅক্ষর,
মায়ের চরণে প্রাণবলি দিতে চাহি সহাস্য মুখে।

এ হেন সময় ওগো মা জননী দাঁড়াও আঁখির আগে
স্নেহ নয়,—চাহি শাসনকঠোর কটাক্ষ ভয়াবহ,
তৃতীয় নেত্রে যে অগ্নি জ্বলে তাই যেন মনে লাগে,
অগ্নিশুদ্ধ প্রাণবলিদান চরণে তোমার লহ।

ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরবাদ

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন, এম্‌-এ

ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বরূপসম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন, এই তিন অবৈদিক দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং এই তিন দর্শন সম্পূর্ণ নিরীশ্বরবাদী বলা যাইতে পারে। বৈদিক দর্শনসমূহের মধ্যে মহর্ষি কপিল-প্রণীত সাংখ্য দর্শনও নিরীশ্বর বলিয়াই খ্যাত। আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সাংখ্য, জগতের স্রষ্টি-কর্ত্তা কোনও সগুণ ঈশ্বর কল্পনা না করিলেও নিত্য-মুক্ত নিগুর্ণ পুরুষবিশেষরূপ ঈশ্বর স্বীকার করে। মীমাংসামতেও জীবের কর্ম্মজনিত ধর্ম্মা-ধর্ম্মই সংসারের স্বষ্টির প্রতি কারণ, সুতরাং জগতের স্বষ্টিকর্ত্তারূপে কোনও ঈশ্বরের কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। এ জন্য প্রাচীন মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হয় নাই। নবীন মীমাংসকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। বেদে ঈশ্বরের উল্লেখ থাকায় তাঁহারাও আগমপ্রমাণবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে তিনি জগতের স্রষ্টা নহেন। তিনি পরম কারুণিক। তাঁহার উপাসনা করিলে জীব পরম নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারে। বৈদিক দর্শনের মধ্যে সাংখ্য এবং পূর্ব্বমীমাংসা ঈশ্বরবাদী কি না তাহা লইয়া মতবিরোধ থাকিলেও ন্যায়-বৈশেষিক, পাতঞ্জল যোগদর্শন এবং বেদান্তদর্শন যে স্পষ্টতর ঈশ্বরবাদী সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এই প্রবন্ধে ন্যায়দর্শনোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম প্রমেয়সূত্রে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ এবং (১২) অপবর্গ—এই দ্বাদশ প্রমেয়(ক)। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ না থাকায় মনে হইতে পারে যে ন্যায়সূত্রকারের মতে ঈশ্বর বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। কিন্তু ন্যায়সূত্রকার প্রথম প্রমেয় আত্ম-শব্দের দ্বারা জীবাত্মা অর্থাৎ জীব এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর এই উভয়কেই উদ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে "ঈশ্বর" কথাটীর উল্লেখ না থাকিলেও চতুর্থ অধ্যায়ের একটী সূত্রে উহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাহার পরবর্ত্তী সূত্রদ্বয়েও ঈশ্বরতত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে(খ)। ঐ স্থলে সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন "গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ; তস্যাত্মকল্পাৎ কল্পান্তরানুপপত্তিঃ।" অর্থাৎ আত্মা জীবাত্মা ও পরমাত্মাভেদে দুই প্রকার। ঈশ্বর আত্মারই প্রকারভেদ হওয়ায় আত্ম-শব্দ দ্বারাই লক্ষিত হইয়াছেন। এই জন্যই প্রমেয়বিভাগ-প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম পৃথক্ ভাবে আত্মপদার্থের উল্লেখ করেন নাই।

ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান এই ছয়টি আত্মার গুণ। এই ছয়টি গুণ হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি গুণের যিনি আশ্রয় তিনিই আত্মা।

(ক) আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্য-ভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্। ন্যায়সূত্র, ১।১।৯

(খ) ন্যায়সূত্র, ৪।১।১৯—২১

এই ছয়টি গুণ আত্মার অসাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ ইহা আত্মা ভিন্ন দেহেন্দ্রিয়াদি পদার্থে নাই। এই গুণগুলির মধ্যে আবার ইচ্ছা, প্রযত্ন এবং জ্ঞান এই তিনটী জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই উভয়েরই লক্ষণ; এবং দ্বেষ সুখ ও দুঃখ এই গুণত্রয় কেবল জীবাত্মার লক্ষণ। অর্থাৎ পরমাত্মাতে দ্বেষ, সুখ এবং দুঃখ নাই। তাঁহাতে কেবল নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন এবং নিত্য-জ্ঞান বর্ত্তমান। ঈশ্বর এই গুণত্রয়ের আশ্রয়, ইহাই প্রচলিত ন্যায়মত। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট বলেন যে, নিত্যজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরে নিত্যসুখও বর্ত্তমান ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কারণ বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে আনন্দবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া নিত্যসুখ না থাকিলে তাঁহার জগৎসৃষ্টির যোগ্যতা থাকিত না(গ)। মহা-নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের উপসংহারে পরমেশ্বরকে "আনন্দনিধে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আরও অনেক গ্রন্থকার ঈশ্বর আনন্দবিশিষ্ট,—নিত্যসুখও ঈশ্বরের অন্যতম গুণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহা হইলে ন্যায়মতে ঈশ্বর সগুণ পদার্থ। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পুরুষ কিম্বা অদ্বৈতদর্শনের নির্গুণ ব্রহ্মের ন্যায় তিনি নির্গুণ পদার্থ নহেন। আত্মার ষড়্‌বিধ গুণের উল্লেখ করায় বুঝা যায় যে, ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতমের মতে আত্মা-মাত্রই সগুণ। সুতরাং পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরও গুণবিশিষ্ট। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নির্গুণ ঈশ্বর কোনও প্রমাণের বিষয় না হওয়ায় তাঁহার অস্তিত্বসাধন করা যায় না। ঈশ্বরের সগুণত্ব-বোধক বহু শ্রুতিবাক্যও এ বিষয়ে প্রমাণ। তবে যে শাস্ত্রে নির্গুণত্ববোধক বাক্যের উল্লেখ দেখা যায় সে স্থলে "নির্গুণ" শব্দ "গুণাতীত" এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। ন্যায়মতে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টই জগৎসৃষ্টির প্রতি সহকারী কারণ। এই অদৃষ্টই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণের সমষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়। পরমেশ্বরে এই গুণত্রয় না থাকায় শাস্ত্র তাঁহাকে গুণাতীত অর্থাৎ নির্গুণ বলে। অপরপক্ষে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্য দ্বারা তিনি যে নিত্যজ্ঞানরূপ গুণের আশ্রয় তাহা প্রমাণিত হয়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সগুণ হইলেও উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূত্রকারের নির্দ্দিষ্ট ছয়টি আত্মগুণের মধ্যে ঈশ্বর ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রযত্ন এবং কাহারও কাহারও মতে সুখ—এই কয়েকটি গুণের আশ্রয়। রাগ এবং দ্বেষ ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে। এই গুণসমূহ আবার জীবে নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকে না। মুক্তাবস্থায় জীবাত্মায় কোনও গুণই থাকে না। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাজ্ঞানাদি গুণ নিত্য। নিত্যজ্ঞানের আশ্রয় হওয়ায় ঈশ্বর অধর্ম্ম, মিথ্যাজ্ঞান এবং প্রমাদ হইতে মুক্ত এবং ধর্ম্ম জ্ঞান ও সমাধিরূপ সম্পত্তি-বিশিষ্ট (ঘ)। জীবাত্মার রাগ ও দ্বেষ এই দুইটী গুণ থাকায় তাহার জ্ঞান কখনও কখনও ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। সুতরাং জীবের জ্ঞান সত্যানৃতমিশ্রিত। কিন্তু ঈশ্বরের রাগদ্বেষ না থাকায় তাঁহার মিথ্যাজ্ঞানের

(গ) সুখত্বস্য নিত্যমেব। নিত্যানন্দেনাগমাৎ প্রতীতেঃ। অসুখিতস্য চৈবম্বিধকার্য্যারম্ভযোগ্যতাভাবাৎ॥ ন্যায়-মঞ্জরী।

(ঘ) অধর্ম্মমিথ্যাজ্ঞানপ্রমাদহান্যা ধর্ম্মজ্ঞানসমাধিসম্পদা চ বিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ॥ বাৎস্যায়নভাষ্য, ৪।১।২১

সম্ভাবনা নাই। তাঁহার ইচ্ছা এবং প্রযত্নও রাগমোহাদির দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এইজন্য তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্ম এবং সমাধিযুক্ত। নিরন্তর ধর্ম্ম এবং সমাধিযুক্ত থাকায় তিনি অণিমাদি আট প্রকার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। এই কারণে এই কারণে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়।(৬)

জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরও লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ কি? নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে অনুমান এবং আগম এই উভয় প্রমাণের দ্বারাই ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। প্রথম আগম অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের কথা আলোচনা করা যাইতেছে। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক বহু শ্রুতি দেখা যায়। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে অক্ষপাদ দর্শন অর্থাৎ ন্যায়দর্শনের আলোচনায় দার্শনিকপ্রবর শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োবতস্থে (তৈঃ সং ১।৮।৬) ইত্যাদিবাগমস্তত্র প্রমাণম্।" "এক ঈশ্বর বিদ্যমান ছিলেন, দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।" কিন্তু শ্রুতিপ্রমাণের সাহায্যে ঈশ্বরাস্তিত্ব সাধন করিতে গেলে একটি সমস্যার উদ্ভব হয়। ন্যায়মতে শ্রুতি অর্থাৎ বেদ ঈশ্বর-কৃত এবং নিত্য জ্ঞানময় ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়াই তাহার প্রামাণ্য। সেই শ্রুতি আবার ঈশ্বরাস্তিত্বে প্রমাণ হইলে পরম্পরাশ্রয়রূপ দোষ উপস্থিত হয় অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য ঈশ্বরাধীন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদশাস্ত্রের প্রমাণাধীন হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্যার মীমাংসায় ন্যায়াচার্য্যগণ বলেন যে, আগম অর্থাৎ বেদ যে অর্থে ঈশ্বরসাপেক্ষ, ঈশ্বর সে অর্থে আগমসাপেক্ষ নহেন; আবার ঈশ্বর যে অর্থে আগমসাপেক্ষ, আগম সে অর্থে ঈশ্বরসাপেক্ষ নহে। যেমন বেদের উৎপত্তি ঈশ্বরাধীন, কিন্তু তাই বলিয়া ঈশ্বরের উৎপত্তি বেদের অধীন নহে। কারণ ঈশ্বর নিত্যপদার্থ, তাঁহার উৎপত্তি নাই। আবার ঈশ্বরে জ্ঞান আগমসাপেক্ষ। বৈদিক শ্রুতি হইতে আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু বেদবিষয়কজ্ঞান ঈশ্বরসাপেক্ষ নহে। বৈদিকজ্ঞান গুরুমুখে এবং গুরুপরম্পরায় লব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে আগম এক অর্থে ঈশ্বরসাপেক্ষ এবং ঈশ্বর অন্য অর্থে আগম সাপেক্ষ হওয়ায় পরস্পরাশ্রয় দোষ ঘটে না।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধনের জন্য নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ অনুমান প্রমাণেরও আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেখা যায় পর্ব্বত সাগর প্রভৃতি পদার্থ সাবয়ব, অর্থাৎ তাহাদের অংশ আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে তাহারা 'জন্য' পদার্থ। যাহা 'জন্য' পদার্থ তাহার অবশ্যই কোনও কর্ত্তা থাকিবে। যেমন ঘটাদি কার্য্য দৃষ্টে কুম্ভকারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আর এই কর্ত্তা অবশ্যই চেতন কর্ত্তা হওয়া আবশ্যক। অচেতন পদার্থে ইচ্ছা, প্রযত্ন, জ্ঞান প্রভৃতি গুণ নাই। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন ছাড়া কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। ঘটের উপাদান বা সমবায়িকারণ মৃত্তিকা। কিন্তু চেতন কুম্ভকারের প্রযত্ন ব্যতিরেকে মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। এইরূপে পর্ব্বত, সাগরাদি সমুদায় জাগতিক পদার্থের উপাদান কারণ নিত্য পরমাণুসমষ্টি। কিন্তু এই পরমাণু জড়পদার্থ। এই পরমাণু সমষ্টি কোনও জ্ঞান, ইচ্ছা এবং প্রযত্নবান পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয়। অতএব জগতের নিমিত্ত কারণ রূপে পরমাত্মা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

(৬) তস্য চ ধর্ম্মসমাধিফলমণিমাদ্যষ্টবিধমৈশ্বর্য্যম্।
—বাৎস্যায়নভাষ্য, ৪।১।২১

প্রশ্ন হইতে পারে জগতের নিমিত্ত কারণ যে পরমাত্মা পরমেশ্বর হইবেন সে বিষয়ে প্রমাণ কি? জীবাত্মাও ইচ্ছা-জ্ঞানাদি-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। সুতরাং জীবাত্মার পক্ষে জগৎকর্ত্তা হওয়ায় বাধা কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে জীবাত্মার ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম অনিত্য। দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত যোগ হইলে জীবাত্মায় জ্ঞানরূপ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। জগৎসৃষ্টিব পুর্ব্বে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি সৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং জীবাত্মা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না। তাহা হইলে নিত্যজ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা এবং নিত্য প্রযত্ন সম্পন্ন পুরুষবিশেষই যে জগতের নিমিত্ত কারণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপ যুক্তিবলে ন্যায়দর্শনে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বর জীবের কর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া সাক্ষাৎ ভাবেই জগৎ সৃষ্টি করেন, কিম্বা জীবেব কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-অনুসারে সৃষ্টি করেন, এই প্রশ্ন-সম্পর্কে ন্যায়সূত্রকার গৌতম সূত্রগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এক বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। দুইটি সূত্রে তিনি পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ বিরোধী পক্ষের মত প্রকাশ করিয়া তৃতীয় সূত্রে উহা খণ্ডন পূর্ব্বক স্বসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রটি এইরূপ—"ঈশ্বরঃ কারণং, পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ" (৪।১।১৯)। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়াই জগতের নিমিত্ত কারণ হন। যেহেতু অনেক সময়েই জীবের কর্ম্ম বিফল হইতে দেখা যায়। অতএব জীবের কর্ম্ম জগৎসৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। ঈশ্বর স্বেচ্ছানুসারে জগতের সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে— "ন, পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ" (৪।১।২০)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষের অর্থাৎ জীবের কর্ম্মই জগৎসৃষ্টির কারণ, ঈশ্বর কারণ নহেন। যেহেতু দেখা যায় জীবের কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্মই ফলের নিয়ামক হইয়া থাকে। কর্ম্মব্যতীত ফলনিষ্পত্তি হয় না।

উপরোক্ত মতদ্বয় খণ্ডন করিয়া তৃতীয় সূত্রে মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জগতের সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন। সূত্রটি এইরূপ—তৎকারিতত্বাদহেতুঃ (৪।১।২১)। উহার তাৎপর্য্য এই যে শুধু জীবকর্ম্ম সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না, যেহেতু তাহা ঈশ্বরকারিত। তাহা হইলে কেবল ঈশ্বর বা কেবল জীবের কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট জগতের নিমিত্ত কাবণ নহে। জীবের অদৃষ্ট অচেতন, সুতরাং তাহা ঈশ্বর-নিরপেক্ষভাবে কারণ হইতে পারে না। আর যদি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া ঈশ্বর স্বেচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তাঁহাতে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য প্রভৃতি দোষের আপত্তি হয়। দেখা যায় জগতে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন সুখ দুঃখ ভোগ করে; তাহাদের ভোগায়তন দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যেও প্রচুর পার্থক্য লক্ষিত হয়। ঈশ্বর যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় জগৎসৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হয় যে তিনি কোনও কোনও জীবের প্রতি বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরে এ প্রকার বৈষম্য কল্পনা করা যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে বিচিত্র ভোগায়তন এবং ভোগের উপকরণরূপ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মকে সহকারিকারণরূপে গ্রহণ করায় তাহার স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু এইরূপ সন্দেহও অনর্থক। কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের জনক যে শুভাশুভ কর্ম্ম তাহাও ঈশ্বরকারিত। অর্থাৎ

ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া জীব শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ।

সূত্রকারের এই অভিমত পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ সকলেই সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অন্য কোনও হেতুর অপেক্ষা না করিয়া ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিলে তাঁহাতে নানা দোষের আপত্তি হয়; সৃষ্টি অনাদি; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নানা বৈচিত্র্যময়; প্রতি শরীরে ভোগেরও বৈচিত্র্য দেখা যায়; সুতরাং অনুমান করা যায় যে জগৎসৃষ্টির মূলে অদৃষ্ট নামক কোনও অলৌকিক সহকারী কারণ অবশ্যই আছে(চ)।

এখন সমস্যা এই যে, ঈশ্বরের রাগ দ্বেষ বা দুঃখ প্রভৃতি গুণ না থাকায় তাঁহার কোনও অভাবেরও উপলব্ধি হয় না। তাঁহার যদি কোনও অভাব না থাকে তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় কেন? "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"—বিনাপ্রয়োজনে মন্দমতি লোকও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। তাহা হইলে ঈশ্বর কোন্ প্রয়োজনে জগৎসৃষ্টি করিলেন? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ বলেন পরমকারুণিক ঈশ্বরের করুণাই তাঁহাকে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া জীবের মুক্তির জন্য তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। জীবের অনাদিকালে সঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগের দ্বারাই ক্ষয় হইতে পারে। শ্রুতি বলিতেছেন—"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প-কোটীশতৈরপি"; ভোগব্যতীত শতকোটী কল্পেও কর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং কর্ম্মক্ষয়ের জন্য ভোগায়তন শরীর এবং ভোগ্য জগৎ প্রয়োজন। এই জন্য ভোগের দ্বারা জীবের কর্ম্মফল ক্ষয় করাইবার উদ্দেশ্যে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন।

কোনও কোনও আচার্য্যের মতে ঈশ্বর স্বীয় স্বভাববশতঃই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বর নিত্য ইচ্ছা এবং নিত্যপ্রযত্নের আশ্রয়। তাঁহার ইচ্ছা এবং প্রযত্নের ফলে তাঁহার যে ধর্ম্মের উদ্ভব হয় উহাই তাঁহাকে স্বভাবতঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করে। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এই মত সমর্থনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"তৎস্বাভাব্যাৎ প্রবর্ত্ততে ইত্যদুষ্টম্", অর্থাৎ ঈশ্বর স্বভাববশতঃই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন ইহা বলিলে কোনও দোষ হয় না। আচার্য্য জয়ন্তভট্ট-কৃত ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। জয়ন্তভট্ট বলিতেছেন—সূর্য্যের উদয়াস্ত যেমন তাঁহার স্বভাবজন্য, বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহারও তদ্রূপ ঈশ্বরের স্বভাব-জন্য। আবার সূর্য্যের উদয়াস্ত যেমন জীবের ভোগের জন্য তাহার কর্ম্মকে অপেক্ষা করে, বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহারও তদ্রূপ ঈশ্বরের স্বভাবজন্য হইলেও জীবের কর্ম্মসমষ্টিকে অপেক্ষা করে।

উপরে ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক যে অনুমানপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে মীমাংসক-সম্প্রদায় তাহার প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে অশরীরী পদার্থের কর্তৃত্ব কোথাও দেখা যায় না(ছ)। ঈশ্বর যদি অশরীরী হন তাহা হইলে তাঁহার করচরণাদি না থাকায় তাঁহার জগৎসৃষ্টির শক্তি থাকিতে পারে না। আর ঈশ্বরকে শরীরবিশিষ্টও বলা যায় না, কারণ শরীরবিশিষ্ট হইলে তিনি সকলের দর্শন-যোগ্য হইতেন। তাহা ছাড়া ন্যায়দর্শনও

(চ) সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বাদ্ বৈচিত্র্যাদ্বিশ্ববৃত্তিতঃ।
প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ভুক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ॥
ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ১।৪

(ছ) শরীরেণ বিনা যস্য কর্ত্তা কুত্রাপি দৃশ্যতে।
মানমেয়োদয়, দ্রব্যখণ্ড—৩৮ অনুচ্ছেদ

ঈশ্বরের শরীরবত্তা স্বীকার করে না।(জ) যে অনুমানবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হয় তাহাতে প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত উদাহরণ বাক্যের সমতা না থাকায় অনুমানটীও দুষ্ট হইয়াছে। ঘটের সৃষ্টির প্রতি যেমন কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ, জগৎসৃষ্টির প্রতি সেইরূপ ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ—এইরূপ অনুমানে কুম্ভকার শরীরধারী হওয়ায় ঈশ্বরেরও শরীরত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরের শরীর না থাকায় তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব প্রমাণিত হয় না। ইহার উত্তরে ন্যায়াচার্য্যগণ বলেন যে শরীর থাকা জগৎকর্তৃত্বের বা কোনও প্রকার কর্তৃত্বের হেতু বলা যায় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তিতে বা মৃত শরীরেও কর্তৃত্ব দেখা যাইত। তাহা ছাড়া দেহধারণই যদি কর্তৃত্বের হেতু হয় তাহা হইলে যে কুম্ভকার ইহজন্মে দণ্ডচক্রাদির সাহায্যে ঘট নির্ম্মাণ করে জন্মান্তরে পশুযোনি প্রাপ্ত হইলেও তাহার পক্ষে ঐরূপে ঘটনির্ম্মাণ করা সম্ভব। কারণ তখনও তাহার দেহ থাকে।(ঝ) সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে দেহবত্তাই কর্তৃত্বের হেতু নহে; কার্য্যোৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, ইচ্ছা এবং প্রযত্নই হেতু, এবং এইরূপ জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রযত্ন যাঁহার আছে তিনিই কর্তা। ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান, ইচ্ছা এবং প্রযত্নের আশ্রয় হওয়ায় তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।

ন্যায়দর্শনের এই ঈশ্বরতত্ত্বের সহিত পাশ্চাত্ত্য আস্তিক (Theistic) দর্শনের ঈশ্বরতত্ত্বের কোনও কোনও বিষয়ে মিল দেখা যায়। অধ্যাপক Flint এর ভাষায় "Theism is the doctrine that the universe owes its existence and its continuance in existence to the reason and will of a self-existent Being, who is infinitely powerful, wise and good." এই বিশ্বের অস্তিত্ব এবং স্থিতি কোনও সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ এবং পরম মঙ্গলময় স্বয়ম্ভু পুরুষের জ্ঞান ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—এইরূপ বিশ্বাসকেই ঈশ্বরবাদ বলা যায়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণও জগৎরূপ কার্য্য হইতে ইহার চেতন এবং সর্ব্বশক্তিমান কর্ত্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহারাও ঈশ্বরকে পরমকারুণিক এবং জীবের মঙ্গলবিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে যে কর্ম্মবাদ স্বীকৃত হইয়াছে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাহা কুত্রাপি স্থান লাভ করে নাই। সুতরাং নৈয়ায়িক যে স্থলে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও জীবের শুভাশুভ কর্ম্মকে তাহার সহকারী কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য ঈশ্বরবাদী দার্শনিকগণ সে স্থলে ঈশ্বরকে নিরপেক্ষ জগৎ-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর পরম কারুণিক হইলে তাঁহার সৃষ্টিতে সুখ-দুঃখের এত বৈচিত্র্য কেন? পাপ এবং অমঙ্গলের এত প্রাদুর্ভাব কেন?—এই প্রশ্ন পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও একটি প্রধান সমস্যারূপে উত্থাপিত হয়। পাশ্চাত্ত্য ঈশ্বরবাদে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। কর্ম্মবাদ স্বীকার করায় ভারতীয় দর্শনে এই প্রশ্নের মীমাংসা সহজসাধ্য হইয়াছে। নিজ সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলে জীব শুভাশুভ ফললাভ করে। ইহাতে জগতস্রষ্টা ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষের আপত্তি হইতে পারে না। নৈয়ায়িক সম্প্রদায় এই প্রকারে সৃষ্টিরহস্যের সমাধান করিয়া থাকেন।

(জ) মানমেয়োদয়—দ্রব্যখণ্ড, ৩৭ অনুচ্ছেদ।

(ঝ) য এব কুলালকায়বান্ ঘটস্য কর্তা স এব করভ শরীরবানপি দণ্ডাদীন্ প্রযুঞ্জীত। আত্মতত্ত্ববিবেক।

বিবেকানন্দ ও যুগধর্ম্ম

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

১

ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তিতে বড়ো বড়ো চোখ দুটী উজ্জ্বল। প্রতিভার ছাপ যুবক নরেন্দ্রনাথের সমস্ত মুখমণ্ডলে। তখনকার যুব-সমাজের মধ্যমণি নরেন্দ্রনাথ। শরীর সুগঠিত এবং বলিষ্ঠ। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মনে একটুও শান্তি নেই। সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানুষের তৃপ্তি নেই। অনেক জানার মধ্যেই বা মানুষের পরিতৃপ্তি কোথায়? বিত্তের মধ্যেও কি মানুষের তৃপ্তি আছে? ঋষিরা বলেছেন: ভূমৈব সুখম্। অনন্তের মধ্যেই আমাদের জীবনের আনন্দ। উপনিষদ ঘোষণা করেছে:

সেই এক এবং অদ্বিতীয়, সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা পরমপুরুষকে অন্তরের মধ্যে দেখ্‌বার দিব্যদৃষ্টি যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরাই কেবল শাশ্বত সুখের অধিকারী হয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথের চিত্তে ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুল-তার অন্ত নেই। তাঁর হৃদয় শাশ্বত সুখের পিয়াসী! কে তাঁকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে? কোথায় সেই কাণ্ডারী যে তাঁকে মৃত্যুর ছায়া থেকে নিয়ে যাবে অমৃতের তীরে? 'সব আনন্দ ধূলায় ফেলে দিয়ে যে আনন্দে বচন নাহি ফুরে' —সেই আনন্দ-সমুদ্রে পৌছে দেবার মনের মানুষটী কই?

২

যাঁকে তিনি এমন একান্তভাবে খুঁজ্‌ছিলেন তাঁর দেখা অবশেষে মিল্‌লো গঙ্গাতীরে দক্ষিণে-শ্বরের মন্দিরের ছায়ায়। কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন মজ্জায় মজ্জায় ক্ষত্রিয়। সহজে কারও কাছে আত্মসমর্পণ করবার মানুষ তিনি ছিলেন না। রোম্যা রলাঁ ঠিকই লিখেছেন: Battle and life for him was synonymous. শক্তির প্রাচুর্য্য থেকে অন্তরে আসে প্রভুত্ব-প্রিয়তা। নরেন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ছিল অপরিমেয়। তাঁর মধ্যে ছিল দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ানের জিগীষা। পৌরুষের গরিমায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল দৃপ্ত। কালিফোর্ণিয়া থেকে লেখা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিলের একখানি পত্রে স্বামিজী নিজের এই দুর্ব্বলতার কথা স্বীকার ক'রেছেন। ঐ পত্রের এক জায়গায় আছে:

"ইতিপূর্ব্বে আমার কর্ম্মের ভিতর নামযশের ভাবও উঠিত, আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তি-বিচার আসিত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফল-ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিত। আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসিত।" (পত্রাবলী দ্বিতীয় ভাগ)

রোম্যা রলাঁ স্বামীজীর জীবনচরিতে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন: 'For he suffered from that excess of power which insists on domination and within him there was a Napoleon'

সাহিত্যিক রলাঁর দ্রষ্টার চোখে স্বামিজীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ঠিকই ধরা পড়েছিল। নারী-সুলভ পেলবতা দিয়ে বিধাতা তাঁকে তৈরী করেন নি। তিনি ছিলেন বজ্রের উপাদানে গড়া পুরুষসিংহ। পত্রাবলীর আর একখানি পত্রে আছে: "বীর আমি যুদ্ধক্ষেত্রে মরব,

এখানে মেয়েমানুষের মত বসে থাকা কি আমার সাজে?" (পত্রাবলী ২য় ভাগ)

কবি সত্যেন দত্তের ভাষায় স্বামিজী 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ,' রলাঁর ভাষায় Warrior prophet.

এই ধরণের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জিগীষু অতি-মানবের পক্ষে সহজে কাকেও মেনে নেওয়া স্বভাবতঃই সম্ভব ছিল না। তাঁর সতেজ মস্তিষ্কের প্রদীপ্ত বুদ্ধি সংশয়ের পর সংশয়ের পারাবারকে অতিক্রম ক'রে তবে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে দৃপ্ত ফণা নত করেছিল। ভগিনী নিবেদিতা The Master as I saw Him গ্রন্থে লিখেছেন, আমার চিত্তের সংশয়াকুল অবস্থার দিকে লক্ষ্য ক'রে একদা তিনি বলেছিলেন:

Let none regret that they were difficult to convince! I fought my Master for six years, with the result that I know every inch of the way! Every inch of the way!"

সন্দেহের অন্ধকারকে অতিক্রম ক'রে, ছয় বৎসরব্যাপী সংগ্রামের শেষে সত্যের শিখরদেশে তিনি পৌছে গেলেন। কুয়াশা কেটে গিয়ে পথ তার সামনে জেগে উঠ্লো। তাঁর মনে ভয়, সংশয়, ইতস্ততঃ ভাব—কিছুই আর রইলো না। ঠাকুরের কাছে তিনি নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করলেন।

৩

ঠাকুরের কৃপায় যুবক নরেন্দ্রনাথ নির্ব্বিকল্প সমাধির অনির্ব্বচনীয় সুধাসমুদ্রের মাঝে কেমন ক'রে তলিয়ে গিয়েছিলেন—তার কাহিনী সুপরিচিত। সমাধি ভেঙে গেলে নরেন্দ্র গুরুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি যোগের আনন্দের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে থাকতে পারেন। ঠাকুর শিষ্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন নি। রোরুদ্যমান আর্ত্ত জগতের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত ক'রে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলেছিলেন: তুই স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের মুক্তি নিয়ে থাকবি? তোর মুক্তি বন্ধ রইলো আমার সিন্দুকে। তোর কাজ যখন ফুরিয়ে যাবে আবার তুই নির্ব্বিকল্প সমাধির আনন্দ আস্বাদন করবি। ঠাকুরের এই বাণীর পূর্ণ তাৎপর্য্য স্বামিজী হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন যখন তিনি পরিব্রাজকের বেশে ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করছিলেন। স্বদেশের সহস্র সহস্র গ্রামে লক্ষ লক্ষ কুটীরে যারা বসবাস করে তারা মানুষ, না জীবন্ত নরকঙ্কাল? তাঁর চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা যেন সরে গেল। দেখলেন, সাম্নে দুলছে দিগন্তবিস্তারী ফেনিল দুঃখ-সমুদ্র। কোটী কোটী মানুষ বৎসরে একটী দিনের জন্যও পেট ভ'রে খাওয়ার আনন্দ জানে না। তাদের জীবনের উপরে দুঃসহ দারিদ্র্যের জগদ্দল পাথর চাপানো। তাদের শুভবুদ্ধি শত-শতাব্দীর কুসংস্কারের গাঢ় তমসায় আচ্ছন্ন! তাদের মেরুদণ্ড অত্যাচারে অত্যাচারে, অবজ্ঞায় অবজ্ঞায় ভগ্নপ্রায়। এরা জীবিত না মৃত, অথবা জীবন্মৃত? ভারতের সমস্ত লাইব্রেরীর মূল্যবান গ্রন্থরাজি স্বামিজীকে যে জ্ঞান দিতে না পারতো জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের দারুণ অভিজ্ঞতা তাঁকে দান করলো সেই জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ। দেখলেন হতাশাময় বর্ত্তমানের অশ্রুসজল সকরুণ মুখচ্ছবি! দেখলেন মুক্তিপিপাসু মহামানবের মধ্যে স্বয়ং নারায়ণই সংগ্রাম করছেন বাঁধন ছেঁড়ার জন্য! দেখলেন ভারতবর্ষ মহাশ্মশান, আর দেখলেন সেই মহা-শ্মশানে অমঙ্গলের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ!

কান পেতে শুনলেন সর্বনাশের অতলে নিমজ্জমান দরিদ্রের সকরুণ ক্রন্দন!

এই দুঃখ-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে স্বামিজী মজ্জায় মজ্জায় উপলব্ধি করলেন ঠাকুরের 'খালি-পেটে ধর্ম্ম হয় না' কথাটীর সম্যক তাৎপর্য্য। পেটে ক্ষিদে থাকলে মানুষ ভগবানের কথা ভাববে কেমন ক'রে? কেমন ক'রে সে অনুভব করবে ঈশ্বরকে পাওয়ার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ? শরীর যদি যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য না পায় চিন্তাশক্তিও দুর্ব্বল হ'তে বাধ্য। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক নিয়ে কে কবে ঈশ্বরকে পেয়েছে? আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে এত যে বৈরাগ্য-চর্চ্চা—এর বেশীর ভাগই তো জড়তাপ্রসূত। স্বামিজী অনায়াসে বুঝতে পারলেন, সব আগে দেশের মানুষগুলিকে অন্ন দিয়ে বাঁচানো দরকার। ভালো ক'রে তারা খেতে যতদিন না পাচ্ছে ততদিন তাদের অন্তরে অধ্যাত্মভাবকে উদ্বুদ্ধ করবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক। মানুষ যতক্ষণ বুভুক্ষু, শীতার্ত্ত এবং উলঙ্গ ততক্ষণ বড়ো বড়ো আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামানো তার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। তাকে খেতে পরতে দাও, থাকবার জন্য বাসস্থান দাও—অমনি তার মধ্যে সুরু হবে রূপান্তর। তার চিন্তাগুলো আকাশে ডানা মেলে উড়বে, তার মনে পাপ-পুণ্যের কথা জাগবে, অনন্তের দিকে সে দুটী বাহু প্রসারিত করে দেবে। ভারতবর্ষ যদি পেট ভ'রে খেতে পায় তবেই সে পুনরায় নিজেকে ফিরে পাবে, শরীরে মনে আবার সে শক্তি-সঞ্চয় করবে। এই চৈতন্যের আলোয় স্বামিজীর সারা মন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। তাঁর রক্তাক্ত হৃদয় চিরে যে-বাণী বেরিয়ে এলো তার প্রতিধ্বনি ভারতের আকাশে বাতাসে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে:

"অন্ন—অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিনা।" (পত্রাবলী—প্রথম)

অন্নহীন যারা তাদের কাছে অন্ন পৌছে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। কি ক'রে অন্ন সংগ্রহ করতে হবে নিজের চেষ্টার দ্বারা সে শিক্ষাও তাদের কাছে পরিবেষণ করা দরকার। অন্নের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। স্বামিজী তাই লোক-শিক্ষার কথাও বললেন।

"ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন।"

পত্রাবলীর আর জায়গায় আছে:

"আমি কেবল একটী জিনিষ চাই:—যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী দিতে না পারে আমি সে ধর্ম্ম বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত সুন্দর মতবাদ হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম্ম নাম দিই না।"

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো থেকে লেখা একখানি পত্রে দেখতে পাই:

"আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালোবাসি। আমি এ দেশে যাদের গরিব বলা হয় তাদের দেখছি আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা ভালো হলেও কত লোকদের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে। কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটী নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায়

কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক।"

দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নিজেকে নিবেদন করবার সংকল্প গ্রহণ স্বামিজীর জীবনের একটী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার কাহিনী রলাঁ (Romain Rolland) নাটকীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন স্বামিজীর জীবনীতে:

At this date, 1892, it was the misery under his eyes, the misery of India, that filled his mind to the exclusion of every other thought. It pursued him, like a tiger following his pray, from the North to the South in his flight across India. It consumed him during sleepless nights. At Cape Comorin it caught and held him in its jaws. On that occasion he abandoned body and soul to it. He dedicated his life to the unhappy masses.

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ। স্বামিজীর হাতে পরিব্রাজকের দণ্ড। ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণপ্রান্তে চলেছেন তিনি। ভারতবর্ষের দুঃখ তাঁর চোখের সামনে রয়েছে দিবারাত্র। সেই দুঃখে পূর্ণ হয়ে আছে তাঁর সন্ন্যাসীর মন। মনের মধ্যে আর কোন চিন্তা নেই—একটী চিন্তা ছাড়া। ভারতবাসীর দুঃখের চিন্তা। দাক্ষিণাত্যের দিকে চলেছেন। একনিমেষের জন্যও ভুলতে পারছেন না দীন-দরিদ্রের ম্লান মুখচ্ছবি, ভুলতে পারছেন না তাদের নিষ্পেষিত জীবনের অপরিমেয় বেদনার কথা। বাঘ যেন শিকারকে অনুসরণ করে চলেছে। নিদ্রাহীন রজনীর প্রহরগুলিও একই চিন্তায় কেটে যায়। কুমারিকা অন্তরীপে এসে তাঁর জীবনকে তিনি উজাড় ক'রে সঁপে দিলেন ভাগ্যহত জনসাধারণের সেবায়।

৪

নির্ব্বিকল্প সমাধির আনন্দসমুদ্রে যিনি চেয়েছিলেন তলিয়ে যেতে—স্বদেশের কোটী কোটী দুর্ভাগা নরনারীর অপরিমেয় দুঃখ তাঁকে দিলো কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দেবার প্রেরণা। মুক্তির কামনাকে ধূলায় ফেলে দিয়ে কাজের মধ্যে তিনি ডুব দিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবার কাজ। দেশের জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ ছবি একদা রবীন্দ্রনাথকেও কি কল্পজগতে বিহারের আনন্দ থেকে কর্ম্মজগতের মধ্যে ঠেলে দেয় নি? ছিন্নপত্রের মধ্যে দেখ্‌তে পাই:

"ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুল্‌ছে, সর্দ্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদ্‌ছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না। এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত্ত সহ্য হয়?"

আমরা জানি কবির জীবনে এমন একদিন এসেছিল যখন পদ্মাতীরের নিভৃতে কল্পনা নিয়ে মেতে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। সেদিন দরিদ্রের ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে তিনি লিখেছিলেন:

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর!"

লিখেছিলেন:

"বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।"

যারা সকলের পিছে, সকলের নীচে তাদের সেবার প্রেরণায় শিলাইদহের অজ্ঞাতবাস থেকে বোলপুরের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে কবির জীবনের একটী বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাই। এই পরিবর্ত্তনের উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়ে লিখেছেন :

"নির্জ্জনে অরণ্যে পর্ব্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোলো। এবারের বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব্ব।" 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটীতে কবির জীবনধারার আমূল পরিবর্ত্তনেরই আভাষ পাই।

বিবেকানন্দের জীবনীর মধ্যে একজায়গায় রলাঁ লিখেছেন :

Every human epoch has been set with its own particular work. Our task is, or ought to be, to raise the masses, so long shamefully betrayed, exploited, and degraded by the very men who should have been their guides.

জনসাধারণের উদ্ধারের কাজকে রলাঁ বলেছেন যুগধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্মের আহ্বানে বাঙলাদেশের সন্ন্যাসী নির্ব্বিকল্প সমাধির লোভকে সংবরণ ক'রে তুলে নিয়েছেন কর্ম্মের ধ্বজা। এই যুগধর্ম্মের আহ্বানেই বাঙলাদেশের কবিও কল্পলোকে শুধু বাঁশী বাজানোর আনন্দকে ত্যাগ ক'রে কর্ম্মযোগে নিয়েছেন দীক্ষা।

বাঙলার সাধনা, বাঙলার বাণী ভারতের গণসিংহকে নিদ্রা থেকে জাগিয়েছে—এতে কোন সন্দেহ নেই। গান্ধীজীর গণ-আন্দোলনের পিছনে বিবেকানন্দের অগ্নিবাণীর এবং রবীন্দ্রনাথের রুদ্রবীণার প্রেরণা কতখানি—কে তার পরিমাপ করবার ধৃষ্টতা রাখে? নিদ্রিত ভারতবাসীর কর্ণে বিবেকানন্দের 'দরিদ্রনারায়ণ' মন্ত্র উচ্চারণ কি জাতির চিন্তারাজ্যে একটা বিরাট বিপ্লবের ঝড় বহন ক'রে আনেনি? রলাঁ ঠিকই লিখেছেন :

If the generation that followed, saw, three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India today has definitely taken part in the collective action of organised masses, it is due to the initial shock, to the mighty

"Lazarus, Come forth!"

of the Message of Madras.

বাংলার বিদ্রোহ, তিলক এবং গান্ধীর বিরাট আন্দোলন, আচার্য্য বিনোবার ভূদান-যজ্ঞের এবং সর্ব্বোদয়ের বাণী—এ সমস্তের মূল উৎস যে বিবেকানন্দের মাদ্রাজের সেই যুগান্তকারী বাণী এবিষয়ে কি কোন সংশয় আছে?

"আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, তাহা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, মঠসমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়-বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে।"

* * * * * *

"সমস্ত ভারত সন্তানের এখন কর্তব্য তাহারা যেন সমগ্র জগৎকে মানবজীবন-সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে উপযুক্ত করে। তাহারা সমগ্র জগৎকে ধর্ম শিখাইতে ধর্মতঃ এবং ন্যায়তঃ বাধ্য। আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে; প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের অভ্যুদয় হইবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

কঠোপনিষৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'বনফুল'

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ইন্দ্রিয়ে বিদীর্ণ করি বহির্ম্মুখী করিলেন স্বয়ম্ভু স্বয়ং,
বহির্ম্মুখী দৃষ্টি সকলের ;
অন্তরাত্মার পানে কেহ নাহি চায়।
ক্বচিৎ কখনও কোন ধীর
হইয়া আবৃত-চক্ষু অমৃত-আশায়
সে আত্মারে প্রত্যক্ষ দেখিবারে পায়॥ ১ ॥

বহির্ম্মুখী কামনারে অনুসরে যারা শিশুমতি
সর্ব্ব-ব্যাপী মৃত্যু-পাশে অবশেষে লভে তারা গতি।
কিন্তু ধীর-মনা
ধ্রুবেরে অমৃত জানি অধ্রুবের করে না কামনা॥ ২ ॥

রূপ রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শ ও মৈথুন
জানিতেছি যাঁর প্রভাবেই
তাঁহারে জানিলে আর বাকী থাকে কিবা ?
ইনি সেই ॥ ৩ ॥

স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে উভয় সময়ে
যাঁর বলে দেখে সব লোক
সেই সে মহান বিভু আত্মারে জানিয়া
ধীরগণ হন বীতশোক ॥ ৪ ॥

ভূত-ভবিষ্যের শিব জীব-সন্নিহিত
মধুপায়ী যে আত্মাকে জানিবার পরে
ঘৃণা আর থাকে না অন্তরে
ইনি সেই ॥ ৫ ॥

প্রথম-তাপস-জাত জলেরও পূর্ব্বেতে যিনি
করেছেন জনম গ্রহণ
গুহায় প্রবেশ করি সর্ব্বভূতে-বর্ত্তমান
যে আদির মিলে দরশন
ইনি সেই ॥ ৬ ॥

দেবময়ী যে অদিতি* প্রাণরূপে হ'ন প্রকাশিত
উপজিয়া সর্ব্বভূতাধারে
গুহায় প্রবেশ করি দেখা যায় তিষ্ঠমান যাঁরে
ইনি সেই ॥ ৭ ॥

গর্ভিণীর গর্ভসম নিহিত অরণি মাঝে
যেই জাতবেদা অগ্নি অতি সুনিভৃত
যজ্ঞশীল পুরুষেরা নিত্য যার সেবা করে
অপ্রমত্ত চিত
ইনি সেই ॥ ৮ ॥

সূর্য্যের উদয় যেথা হতে
অস্ত যার মাঝে
অতিক্রান্ত নাহি হ'ন কভু
সকল দেবতা যেথা আছে
ইনি সেই ॥ ৯ ॥

এখানে আছেন যিনি তিনিই সেখানে
সেখানে আছেন যিনি তিনি এখানেই
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এঁরে দেখে যেই জন
মৃত্যু হ'তে মৃত্যু লভে সেই ॥ ১০ ॥

* অদিতি—ন দিতি—অসীমা অর্থাৎ যাহা সীমাহীন ব্যাপ্তি, boundlessness

মন দিয়া পাওয়া যায় এঁরে
এঁর মাঝে ভিন্নতা প্রকাশ না পায়
নানাভাবে যে দেখে ইহাঁরে
মৃত্যু হ'তে মৃত্যুতে সে যায় ॥ ১১ ॥

পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র আত্মমধ্যে যাঁর অবস্থান
যিনি ভূত ভবিষ্য ঈশান
যাঁহারে জানিলে পরে জুগুপ্সার হয় অবসান
ইনি সেই ॥ ১২ ॥

নির্ধূম জ্যোতি সম পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ
যিনি ভূত ভবিষ্য ঈশান
আজ যিনি কাল তিনি সর্ব্বদা সমান
ইনি সেই ॥ ১৩ ॥

সুদুর্গম উচ্চস্থানে নিপতিত বৃষ্টি যথা
পর্ব্বতেতে বহে বহুধারা
সেইরূপ ধর্ম্মে যারা পৃথক বলিয়া ভাবে
না বুঝিয়া হয় আত্মহারা ॥ ১৪ ॥

শুদ্ধ জল যেইরূপ শুদ্ধই থাকে
শুদ্ধজলে হইলে পতিত
সেইরূপ, হে গৌতম, বিজ্ঞানী মুনির আত্মা
বহে অবিকৃত ॥ ১৫ ॥

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র*

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

হৃষীকেশ
৭ই মাঘ রবিবার
(Jan 19, 1890)

পরম ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বাবু মহাশয়েষু

আপনার পত্র পাইলাম। আজ প্রায় ২০ দিন হইল আমি অত্যন্ত জ্বরভোগ করিয়া এক্ষণে গুরুদেবের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছি কিন্তু এখনও অতি দুর্ব্বল। শরৎ প্রভৃতি ইহারা যথা-সাধ্য সেবা দিবারাত্র করিয়াছেন। এখানে অসুখ হইলে বড়ই বিপদ, কারণ এ জঙ্গলে ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত কিছুই হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ আমাদের বাঙ্গালীর শরীর সহজেই কোমল, তাহাতে আবার অসুখ হইলে বুঝিতেই পারেন। শরৎ, হরি, তুলসী, ইহাদের শরীর এখন শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় বেশ আছে। ছত্রের রুটি প্রায় কাঁচা থাকে বলিয়া সাণ্ডেলের মধ্যে মধ্যে আমাশয় দেখা যায় আবার একটু সাবধানে থাকিলেই সারিয়া যায়। আপনার শরীর অসুস্থ শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আপনি হতাশ হইবেন না। কি করিবেন বলুন, শরীরের ধর্ম্ম কখন ভাল থাকে. কখন অসুস্থ হয়। এমন কিছু আশা করা যায় না যে শরীর চিরকাল সুস্থ থাকুক। তবে যতদিন সুখে থাকে ততই ভাল। অসুখের সময় গুরুদেবের কৃপা বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময়ে একবার তাঁহাকে স্মরণ করিলে সমস্ত যন্ত্রণা ভুল হইয়া যায় ও হৃদয়ে শান্তির উদয় হয়। তাঁহার যে কত দয়া যাঁহারা সংসারে আছেন ও তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর করেন তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। তিনি কাহাকেও কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া কতই

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত।

শিক্ষা দেন, কাহাকেও আবার গায়ে কষ্টের আঁচ লাগিতে দেন না। তাঁহার যেমন ইচ্ছা তিনি সেইরূপ করুন, আমাদের এই প্রার্থনা যে সকল অবস্থাতে যেন তাঁহাতেই মন থাকে এবং তাঁহারই চিন্তাতে যেন দিবারাত্র অতিবাহিত হইয়া যায়। আপনি যদি শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে আসিয়া বাস করেন তাহা হইলে বোধ হয় আপনার শরীর change-তে অনেকটা ভাল থাকিতে পারে এবং সেখানে আমরাও কেহ কেহ আপনার নিকট থাকিতে পারি। গিরীশবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হওয়াতে এখন কিরূপ মনের ভাব তাহা আমরা সকলেই জানিতে অত্যন্ত উৎসুক। আহা! মহেন্দ্রবাবুর ইদানীং কিছু ধর্মের ভাব প্রবল হইতেছিল কিন্তু হঠাৎ জোয়ান পুরুষকে তিনি আর এ সংসারের যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিলেন না। একরূপ ভাল, সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

ইতি—কালী

(২)*

চুনীবাবু মহাশয়—

আপনার মনের অবস্থা পত্রপাঠে বিশেষ জানিতে পারিলাম। আপনি ব্যস্ত হইবেন না, অপেক্ষা করুন ও প্রার্থনা করুন। ঠিক সময় না হইলে কোন কাজ হয় না। দিবারাত্র একমনে কেবল গুরুদেবকে ডাকুন। তিনিই আপনার সকল কষ্ট দূর করিবেন। তিনি বড় দয়াময়, তিনি কাহারও কষ্ট দেখিতে পারেন না। তাঁহার কাছে যে (মন মুখ এক করিয়া) যাহা চায় সে তাহাই পায়। কত লোকের কষ্ট দূর হইয়া গেল আর আপনার হইবে না? আপনার জন্য আমরা সকলেই প্রার্থনা করিতেছি। তিনি সকলই জানিতেছেন, যাহাকে যতটুকু দরকার তাহাকে ততটুকু দিতেছেন, কাহারও অকুলান রাখেন না। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেই বা কি হইবে? বরং সংসারের কষ্টের মধ্যে থাকিলে তাঁহার প্রতি নির্ভরতা বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতেই থাকে, সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারা যায়। তিনি বলিতেন "ঘায়ের কাঁচা ছাল তুলিলে রক্ত পড়ে আর যখন ছাল শুকাইয়া আপনি খসিয়া পড়ে তখন আর কোন কষ্ট থাকে না"। সংসার ত্যাগ সম্বন্ধে সেইরূপ জানিবেন। যতদিন সংসারের বাসনা থাকে তত-দিন সংসার ত্যাগ করা উচিত নহে। আর অধিক কি লিখিব? তাঁহার যে সকল উপদেশ শুনিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলেই অনেক শান্তি পাইবেন। আপনারা আমাদের সকলের নমস্কার জানিবেন। ইতি—কালী

* এই দ্বিতীয় পত্রটি প্রথমটির সহিত একই খামে প্রেরিত হইয়াছিল। চুনীবাবু—বলরাম বাবুর প্রতিবেশী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহীভক্ত শ্রীচুনীলাল বসু।

(৩)

শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

হৃষীকেশ
2nd March
(2/3/90)

শ্রীযুক্ত বলরাম বাবু মহাশয়—

আপনার পত্র কাল পাইয়াছি। আমার এখনও জ্বর আসিতেছে, জ্বরটা এখন পুরাতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে ঔষধ ও পথ্য না পাওয়াতে প্রায় ৩মাস ভোগ হইল। এখন change ভিন্ন আর উপায় নাই। অনেক দিন হইল শরৎ নরেন্দ্রকে টাকা পাঠাইবার জন্য এক পত্র লেখে। তাহার জবাবস্বরূপ কাল নরেনের এক telegram পাই। তাহাতে এই কটি কথা আছে—Letter just received, telegraph if money required now এবং

॥০ আট আনা telegraphর জন্য অপিসে জমা করিয়া দেয়। সেইজন্য আজ তুলসী ও সাণ্ডেল হরিদ্বারে টেলিগ্রাফ করিবার জন্য যাইতেছে। বোধ হয় telegraphic money order এ নরেন্দ্র শীঘ্রই টাকা পাঠাইবে। তবে কত পাঠাইতে পারিবে জানি না। টাকা পাইলেই আমি নীচে যাইব। আপনারা এখন এ ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন না, কারণ Dehra হইতে এখানে পত্রাদি আসিতে প্রায় ১৫দিন দেরী হয়। (তাহার সাক্ষ্য দেখুন নরেন Gazeepur হইতে 17th Feby. telegraph করে, সেই telegram কাল 1st March আমরা পাই) এবং এতদিন আমি বোধ হয় এখানে থাকিব না, টাকা পাইলেই চলিয়া যাইব। পরে যেখানে যাইব যদি টাকার আবশ্যক হয় তাহা হইলে আপনাদের পত্র লিখিব, সেই ঠিকানায় পাঠাইবেন। এই পত্রখানি মাষ্টার মহাশয়কে ও মঠে দেখাইবেন। সুরেশ বাবুর অসুখ শুনিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমরা প্রার্থনা করিতেছি যেন তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠেন। বাবুরাম এতদিন ভুগিতেছে শুনিয়া বড় কষ্ট হইল। হৃষীকেশে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি ক্ষুদ্র উৎসব হয়। মাষ্টার মহাশয় দুটি টাকা money order করিয়া ঐ দিনের ভোগের জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহাতেই আমরা যথাকথঞ্চিৎ ভোগ দিই। ভোগের বিবরণ মাষ্টার মহাশয়ের পত্রে বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি বোধ হয় আপনাদের ঐ পত্র দেখাইয়াছেন। এখানে আর সকলে ভাল আছে। আমাদের নমস্কার জানিবেন—ইতি কালী

তবু

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

তোমারে যে কভু ভালবাসি নাই
সে কথা আমিও জানি,
তৃষ্ণা-কাতর নয় যে চকোর
তাহাও সত্য মানি।
রুদ্ধ-দুয়ারে করিয়া আঘাত
আমারে যখন ডেকেছ হে নাথ
কণ্ঠে তোমার দিয়াছি তখন
বিদায়-মাল্যখানি।

তবু মোর লাগি' নয়নে তোমার
প্রেমের প্রদীপ জ্বলে,
তোমারে যে হেরি আলো-পারাবার
দুঃখ-তিমিরতলে।
করিয়া উজাড় তব ভাণ্ডার
তুমি দাও মোরে কত উপহার,
করুণা-কণায় কর সুরভিত
অন্তর-শতদলে।

বিশ্ব-শান্তি কোন্ পথে ?

স্বামী তেজসানন্দ

বিংশ শতাব্দীর তটভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া মানব-কৃষ্টির বৈচিত্র্যবহুল ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই কত সাম্রাজ্য ও সভ্যতা, কত জনপদ ও কৃষ্টিকেন্দ্র কাল-সাগরে বুদ্‌বুদের মত ক্ষণে ক্ষণে উত্থিত ও বিলীন হইতেছে; কত বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন জাতির পর জাতিকে পৃথিবীর বক্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতেছে। সুদূর অতীতের বিস্ময়কর মিশরীয় সভ্যতা, আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের রোমাঞ্চকর কীর্ত্তি-কাহিনী, গ্রীস ও রোমের চিত্ত-চমৎকারী সাম্রাজ্য বিস্তার—আজ প্রত্নতাত্ত্বিকের গভীর গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৃষ্টি ও ধ্বংস—এই সংসারের চিরন্তন ইতিহাস। তাই একদিন যাহাদের পার্থিব শক্তি সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রহেলিকাদ্বারা সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে,—কালের কুটিল গতিতে পরক্ষণেই হয়ত তাহা অসীম শূন্যে বিলীন হইয়াছে। কিন্তু ভারত আজও জীবিত,—স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া অভিযান সুরু করিয়াছে তাহার চির-সঞ্চিত সংস্কৃতি-সম্পদ বহন করিয়া। তাহার প্রতি চিন্তা ও কর্ম্মে, সাহিত্যে ও শিল্পে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে, রাজনীতি ও দর্শনে—সর্ব্বত্র সাড়া দিয়া উঠিয়াছে যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত অমিত সুপ্ত শক্তি যাহা নব চেতনার উন্মেষে ভারতের ভৌগোলিক পরিধির ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে স্বতঃই কুণ্ঠিত। সৃষ্টির উন্মাদনায় প্রবুদ্ধ ভারত দিকে দিকে ছুটিয়াছে বন্ধুর পিচ্ছিল পথকে তুচ্ছ করিয়া। অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে তাহার শাশ্বত শান্তির বাণী। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন, "···আমার এই জন্মভূমি বর্ত্তমান কালেও মহীয়সী রাজ্ঞীর ন্যায় অপূর্ব্ব মহিমায় মন্থর পদক্ষেপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে আপনার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য,—পশুভাবাপন্ন মানবকে নররূপী নারায়ণে পরিণত করিবার জন্য। ভূলোকে কিংবা সুরলোকে এমন কোন শক্তি নাই যাহা ভারতের এই মহৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে।"

প্রশ্ন উঠিয়াছে,—এই জাতির বিপ্লববহুল সুদীর্ঘ জীবনের মূল উৎস কোথায়, যাহার প্রভাবে ভারতবাসী আজ পুনঃ জাতিসংঘে গৌরবাসন অধিকার করিয়া হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীকে সাম্য মৈত্রী ও শান্তির অভয় বাণী শুনাইতেছে? প্রতীচ্যের পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, জড়বিজ্ঞান-মণ্ডিত সভ্যতার প্রদীপ্ত প্রতীক শ্বেতকায় জাতিনিচয় একহস্তে বিশ্ব-ধ্বংসী আণবিক বোমা ও অপর হস্তে ধর্ম্মগ্রন্থ ধারণ করিয়া শান্তি-সভা আলোকিত করিয়া বসিয়াছেন! হিংসার তীব্র জ্বালায় তাঁহাদের হৃদয় বিধায়িত; ধূমায়মান বিদ্বেষবহ্নির ঘনান্ধকারে তাঁহারা দৃষ্টিহীন। একদিকে "যুদ্ধং দেহি" আরাবে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত; অপরদিকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মুখোস পরিয়া দ্বিমুখী জেনাস (Janus) এর মত সকলে শান্তির বাণীর ফোয়ারা তুলিয়াছে! ভাগ্যের এমন কদর্য্য তথা নিদারুণ পরিহাস

ইতিহাস কখনও সাক্ষ্য দিয়াছে কিনা সন্দেহ। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Toynbee তাঁহার 'Study of History' গ্রন্থে সত্যই লিখিয়াছেন, "যে ব্যাঘ্র একবার মনুষ্যরক্তের আস্বাদ পাইয়াছে তাহার মানব-রক্ত-পিপাসা দিন দিন সহস্রগুণে বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। রক্তের নেশা নিশ্চিত মৃত্যুকে তাহার নিকট তুচ্ছ করিয়া তোলে। মনুষ্যসমাজেও এই নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। মানব-হস্তের যে কোষমুক্ত শানিত কৃপাণ একবার নররক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাকে কোষবদ্ধ করা সুকঠিন। হিংসায় উন্মত্ত মানব অপরের বক্ষরক্তপানের জন্য পৈশাচিক উল্লাসে ছুটিয়া চলে,—নিজের নিশ্চিত মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া।" তাই রক্তলোলুপ হিংস্র ব্যাঘ্রের মতই মানবের দুর্ব্বার পশুবৃত্তি ধরিত্রী-বক্ষে এক ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার পরিণাম যে নিশ্চিত ধ্বংস, তাহা জানিয়াও মানব স্বীয় ধ্বংস-সাধক পাশবিক প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ নহে।

মানবজাতি যে কি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে—তাহা শান্তভাবে চিন্তা করিবার অবসরও আজ বিরল। সত্য বটে, বিজ্ঞানের বলে ভৌগোলিক ব্যবধান দূর হইয়াছে—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি নিমেষে ভাবের ও কৃষ্টিসম্পদের অবাধ আদান প্রদান চলিতেছে; জলে, স্থলে, আকাশে সকলের স্বৈর-গতির বাধাও দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু শান্তি কোথায়? বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকবৃন্দের যে অপূর্ব্ব অবদান জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে তাহা এক-দিকে যেমন অতুল পার্থিব সম্পদে মানবজাতিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে, অপরদিকে তাহাই পুনঃ কতিপয় কূটনীতিপরায়ণ রাজনৈতিকের হস্তে ধ্বংসের অব্যর্থ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাদের ভ্রুকুটিভঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক-কুলও আজ পর্য্যুদস্ত,—স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার এবং জগতের কল্যাণসাধন করিবার সামর্থ্য ও সুযোগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত। তাই আজ জগতের হিতকামী মনীষিবৃন্দের কণ্ঠ রুদ্ধ ও প্রতিভা স্তব্ধ। দেশ-দেশান্তরে প্রচণ্ড কোলাহল ও বিপ্লবের তরঙ্গ অবাধগতিতে ছুটিয়াছে। কোরিয়া ও কাশ্মীর, ইন্দোচীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ট্যুনিসিয়া ও কেনিয়া—সর্ব্বত্র এক অশান্তির তীব্র হলাহল সমগ্র মানবমনকে বিষদিগ্ধ ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে—শান্তি কোথায়? শান্তির বৈঠক কতকাল ধরিয়া বসিতেছে ও ভাঙ্গিতেছে; কত মূল্যবান সময় শান্তির পরিকল্পনায় অতিবাহিত হইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে কত রাজ্য জনপদ ধ্বংসের কুক্ষিগত হইতেছে; কত প্রবল জাতি দুর্ব্বলকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গৌরবোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবী শতাব্দীর অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের করাল দৃশ্য দর্শন করিয়াই যুগনায়ক আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়তার সহিত একদিন বলিয়াছিলেন, "সাবধান! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগৎ একটা আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; উহা যে কোন মুহূর্ত্তে অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগৎকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। এখনও যদি তোমরা সাবধান না হও, তাহা হইলে আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"

আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে পররাজ্য-লোলুপ রাজনীতি-বিশারদগণের শান্তির বৈঠকে শান্তির গবেষণা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শান্তিভঙ্গকারিগণকে শান্তিকামী ও শান্তির অগ্রদূত জ্ঞানে আমরা এতদিন যে ভুল করিয়া আসিয়াছি সে ভুল সংশোধনের সময় পুনঃ উপস্থিত। ভারতের প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান

কাল পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ যে শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা উপেক্ষা করিয়াই মানবকুল আজ শান্তিহারা,—দিশাহারা। বিশ্বকল্যাণকামী প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞগণ শিক্ষা দিয়াছেন ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না; অত্যাচার দ্বারা অত্যাচার প্রশমিত হয় না। অন্তরের মণিকোঠায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহার সঙ্গে যাহাদের পরিচয় লাভ না ঘটিয়াছে তাহাদের কণ্ঠে শান্তির বাণী বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইতিহাস এখনও সাক্ষ্য দেয়—বুদ্ধ ও যীশু, শঙ্কর ও চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ শান্তি-স্থাপনের জন্য করাল করবাল হস্তে মনুষ্যসমাজে ধ্বংসলীলার অভিনয় করেন নাই। জাগতিক ভোগের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতার বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন। তাঁহাদের প্রতি কথায়, প্রতি প্রেমমধুর স্নিগ্ধ চাহনিতে বিশ্ব অমৃতায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে একদিন উপনিষদের অমোঘ বাণী শুনাইয়াছেন, "যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বীয় একরূপকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে। যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবানদিগের চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তুসকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপরের নহে।"—বিশ্ব-প্রেমিক ভগবান যীশু স্বীয় ক্রোধোন্মত্ত শিষ্য পিটারের কোশমুক্ত অসি সজোরে ছিনাইয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, "যাহারা অসির সাহায্য গ্রহণ করে, তাহারা সেই অসির আঘাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" ঠিক এমনি ভাবেই ভগবান বুদ্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বিশ্বশান্তির প্রকৃত পন্থা। বৌদ্ধধর্ম্মের অমর গ্রন্থ ধম্মপদে আজও ধ্বনিত হয় তাঁহার সেই মর্ম্মবাণী—

"নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥
সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে ॥
যো সহস্সং সহস্সেন সংগামে মানুসে জিনে
একং চ জেয্যমত্তানং স বে সংগামজুত্তমো ॥
জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয় পরাজয়ং ॥"

—এ জগতে ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা সম্ভব নহে। অঘৃণা বা অবৈরভাব দ্বারাই ঘৃণাকে জয় করা সম্ভব—ইহাই একমাত্র চিরন্তন সত্য। অপরের সঙ্গে নিজকে অভিন্ন চিন্তা করিয়া অপরকে কখনও আঘাত বা হত্যা করিবে না। সংগ্রামজয়ী বীর সহস্রবার সহস্রব্যক্তিকে পরাজিত করিয়া গৌরবার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু তাহার জয়ই প্রকৃত জয়, যে নিজকে জয় করিতে সমর্থ হয়। পরাজিতের প্রাণে যে পরাজয়ের গ্লানি জমাট বাধিয়া থাকে, তাহা বিজেতার প্রতি স্বতঃই ঘৃণার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যিনি প্রকৃত নিস্পৃহ ও শান্ত, তিনি জয় পরাজয়কে তুচ্ছ করিয়া সংসারে সদানন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন।

যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও সেই শাশ্বত সনাতন প্রশ্ন ও তাহার সুমীমাংসা পুনঃ ধ্বনিত হইয়াছে—"জীবন সংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না, ঘৃণার জয় হইবে? ভোগের জয় হইবে, না ত্যাগের জয় হইবে? জড় জয়ী হইবে, না চৈতন্য জয়ী হইবে? এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন,

আমাদেরও সেই বিশ্বাস। কিংবদন্তী যে অন্ধকার দূর করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মহিমময় পূর্ব্বপুরুষগণ এই সমস্যাপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহারা জগতের নিকট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, যদি কাহারও সাধ্য থাকে, উহার সত্যতা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত এই—ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতিকারই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা ত্যাগ করিলেই সেই জাতি দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইহার প্রমাণস্বরূপ দেখ—ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে—শূন্য হইতে বুদ্বুদের উদ্ভব; কিছুদিনের জন্য পাপখেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান জাতি অনেক দুরদৃষ্ট, বিপদ ও দুঃখের ভার সত্ত্বেও এখনও জীবিত রহিয়াছে; কারণ এই জাতি ত্যাগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।"

মানবজাতির ঘোর সঙ্কটমুহূর্ত্তে ভারতই আজ পুনঃ জাতিসঙ্ঘে শান্তির বাণী শুনাইতেছে;—পৃথিবীর প্রজ্জলিত হুতাশন নির্ব্বাপিত করিতে ভারত-প্রতিভা আজ অগ্রণী ও বদ্ধপরিকর। যে জড় সভ্যতা এক মুহূর্ত্তে মানব-কৃষ্টিকে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে না, যাহা মানুষের অন্তরের দিব্য প্রেমসম্পদ উদ্ঘাটিত করিয়া জগতের কল্যাণে তাহা অর্ঘ্য দিতে শিক্ষা দেয় না, অদূর ভবিষ্যতে তাহার ধ্বংস যে অনিবার্য্য তাহা বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস রক্তাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে। শান্তির আকাঙ্ক্ষায় মানবপ্রাণ আজ ব্যাকুল। সমগ্র মানবের অন্তরের আকুতি আজ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—শান্তি কামনায়। ভারত-আত্মার চিরন্তন অমর সঙ্গীত দেশমাতৃকার বক্ষ ভেদ করিয়া ধ্বনিত হইতেছে—মানব কল্যাণে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আজ সার্থক হইয়া উঠুক। তিনি বলিয়াছিলেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ,—জগদ্ধিতায় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া এবার ভারতবর্ষকে দান-প্রসারিত হস্তে তাহা বিলাইতে হইবে।" এস আর্য্য, এস অনার্য্য; এস হিন্দু, এস মুসলমান; এস বৌদ্ধ, এস খৃষ্টান, এস জৈন, এস পারশিক, এস বিশ্বসভার জাতিপুঞ্জ,—যে যেখানে আছ ছুটিয়া এস, ভারতের এই পুণ্যতীর্থসলিলে অবগাহন করিয়া সকলে ধন্য হও। শান্তির অমৃত সিঞ্চনে জগতের হিংসা দ্বেষ, ধ্বংসের বীভৎসলীলার অবসান করিয়া পুনঃ স্বর্গের সুষমায় জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তোল; শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

"যাহারা সন্ন্যাসী হইয়াছে, সংসারের বন্ধন হইতে আপনি মুক্ত হইয়াছে, তাহারা বনে যাইয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হইবে, ইহা বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু যাহারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পিতা, মাতা প্রভৃতির সমুদয় কার্য্য করিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে, তাহার প্রতি ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপা প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

"মনে, কোণে, বনে"

শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশে পাই, তিনি বলিতেছেন :—"ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে।" মনে অর্থাৎ একান্ত মনে; কোণে—যেখানে অন্য লোকের গতায়াত নাই এমন স্থানে—নিরালায়; বনে—জন-কোলাহলের বাহিরে, অর্থাৎ, সংসারের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হৈচৈ হইতে দূরে।

তাঁহার প্রথম উপদেশ,—একান্ত মনে ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান করিতে বসিলেই ত মনের ভিতর সাংসারিক নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইয়া চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। তখন যত রাজ্যের সংসারের ভাবনায় মন চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে থাকে। এই অবস্থা আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই চিত্তবিক্ষেপের প্রতিকার কি?

স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ' গ্রন্থে মনঃ-সংযম-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মন যেন একটি উন্মত্ত বানর। ধ্যান করিতে বসিয়া চক্ষু বুজিলেই যখন মন ছুটাছুটী করিতে থাকে, তাহার গতিকে শিথিল করিয়া তখন চুপ করিয়া থাকিলেই দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মন যে পথ লক্ষ্য করিয়া ঘুরিতেছে সে পথে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, অন্য একটা বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সে পথ হইতে পুনরায় অন্য পথে ধাবিত হয়। এইরূপে মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া বিশ্রামের জন্য চুপ করিয়া যায়। ঠিক তখন মনকে সম্মুখে যে প্রতীক রহিয়াছে—তা সেই প্রতীক যাহাই হউক—কালী, দুর্গা, হরি, শিব, কোন মহাপুরুষ, কোন শক্তিমান লোকোত্তর মানব, যাঁহার যে প্রতীক প্রীতিপ্রদ সেই প্রতীকের নিকট আত্মনিবেদন করিলে সে কাতর প্রার্থনা তাঁহার চরণে পৌছায়। এইরূপ কিছুদিন করিলে বিক্ষিপ্ত চিত্ত ক্রমে শান্ত হইয়া আসে। তখন ধ্যান করিতে বসিয়া মনকে আর পাহারা দিবার প্রয়োজন হয় না।

ধ্যান করিবার পৃথক একটী স্থান প্রত্যেকের আয়ত্তের মধ্যে করিয়া লইতে স্বামিজী উপদেশ দিয়াছেন। যিনি পৃথক একখানি গৃহ ইহার জন্য নির্দিষ্ট করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে এ ব্যবস্থা খুবই সুবিধার। যাঁহার এরূপ সুবিধা নাই তিনি অন্তত তাঁহার বাসগৃহের একপাশে তাঁহার আদর্শ প্রতীকের স্থান নির্দেশ করিয়া ধ্যানের স্থান করিয়া লইবেন। ইহাও তিনি বলিয়াছেন যে ঐ স্থানে ধ্যান ভিন্ন সাংসারিক কোন কথা বা আলোচনা করা উচিত নয়। সেখানে শুধু ধ্যান, প্রার্থনা ও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ আলোচনা প্রভৃতি চলিবে। ঐরূপ নির্দিষ্ট স্থানে কিছুদিন ধরিয়া সৎচিন্তার অভ্যাস করিলে ঐস্থান এমন হইয়া যাইবে যে, মনে কোনরূপ চঞ্চলতার হেতু ঘটিলে সেখানে বসিলে মন শান্ত হইয়া আসিবে। দুই একদিনের চেষ্টায় ইহা না হইলে হতাশ হইবার কিছুই নাই। ধৈর্যের সহিত কিছুদিন এই অভ্যাস করিতে পারিলে ঐস্থানের হাওয়া পর্যন্ত পবিত্র হইয়া যায়। ইহা স্বামিজী বেশ পরিষ্কার ভাবেই ভরসা দিয়া বলিয়াছেন। মনের চঞ্চলতা দূর করিবার স্বামিজীর কথিত এই প্রণালী ধরিয়া কিছুদিন চেষ্টা করিলেই তাঁহার কথার সত্যতা আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতে পারি।

আমরা চাই সদ্য ফল। আজ বৃক্ষ রোপন করিয়া কালই ফলবান বৃক্ষ দেখিতে চাই। ধ্যান

করিতে বসিয়া "বিশ্বরূপ" সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ করিতে চাই। কিন্তু তাহা হইবার নহে। মলিন মন। ধূলিসমাচ্ছন্ন দর্পণে সহসা প্রতিবিম্ব পড়েনা। দর্পণের ধূলি মুছিতে হইবে, তবেই ত উহাতে ছায়া পড়িবে। মলিন মন পরিষ্কার করিয়া লইলেই ত সেই মনমুকুরে মহামায়া অথবা মদনমোহনের ছবির আবির্ভাব হইবে। এই জন্য স্বামিজী বলিয়াছেন,—বহুদিনের বহুজন্মের চঞ্চল স্বভাবের গতি বন্ধ তুইএক দিনে হয় না। এইজন্য ধৈর্যের প্রয়োজন।

প্রাণে যদি ব্যাকুলতা সত্যই থাকে তাহা হইলে অরুণোদয় হইবেই এই আশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহারা আন্তরিক আগ্রহ ও যত্ন লইয়া সাধন-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে, ক্রমশঃ মানবজীবনের যাহা পরম কাম্য, তাহা সফল করিয়া তুলিতে পারিবেন।

শৈশবকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, দিদিমা পিসিমার দৈনন্দিন পূজা। পূজার সঙ্গে দেখিতেছি কত ব্রত নিয়ম, উপবাস, সংযম। পাড়ার দাদা খুড়াকে দেখিয়াছি পুষ্প আহরণ করিতে;—কত মালা তিলক, পূজা হোম যজ্ঞ। দিনের পর দিন একই ভাবে পূজা অর্চনা। ঘরে ঘরে দেখিতেছি,—কত তথাকথিত শুচিভাব, কত পুরশ্চরণ, কত নামসংকীর্তন। কত পুষ্পচয়ন হইল, কত চন্দন ঘসিয়া ঘসিয়া ক্ষয় হইল। কিন্তু জীবন অগ্রসর হইল কই? যেস্থান হইতে উহা আরম্ভ হইয়াছিল, জীবনের শেষের দিকেওত মনের সেই অবস্থা। নোঙ্গর ফেলিয়া শুধু দাঁড় টানা হইয়াছে

ঠাকুর দেবতার সম্মুখে চক্ষু বুজিয়া বসি,—সংসারের যত জটিল কার্যের ছবি তখনই মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে:—ঘরে আজ চাউল নাই,—ছেলের স্কুলের বেতন দিবার তারিখ আগামী কাল, উহার যোগাড় করিতে হইবে—শ্যামের জমীটুকু লইতে না পারিলে বাড়ীটির শোভা হয় না,—বেহাইবাড়ী তত্ত্ব না পাঠাইতে পারিলে লজ্জার সীমা থাকিবে না,—উপেনের খতের মেয়াদ এই শনিবার শেষ হইবে, সোমবার আরজি না দিলেই লোকসানের বিষয় হইবে,—মুখুজ্যেবাড়ীর সীমানার মোকদ্দমার সাক্ষী আজই ত দিতে হইবে,—বাজারে ছাই কিছুই পাওয়া যায় না, যাহা মিলে তাহাও অগ্নিমূল্য,—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাই হইল ঠাকুর দেবতার সম্মুখে বসিয়া আমাদের নিত্যকার ধ্যান পূজা! অভ্যাস বশে মুখস্থ বলিবার মত ফুল দেবতার চরণে অর্পণ করিলাম, স্তব-স্তোত্র আবৃত্তি করিলাম মাত্র। ভাব কই?

জীবন একটুও অগ্রসর হইল না। সেই হিংসা দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা,—পরস্ব-অপহরণ, অসত্যভাষণ, অসংযম, মনের মধ্যে অহর্নিশি ঘুরিতেছে।

কেন এমন হয়? এত পূজা অর্চনা যাগ যজ্ঞ—ইহার কোন ফলই পাইতেছিনা, কোথায় কোন ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিতেছিনা। গলদ কোথায় রহিয়াছে?

আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখাইয়া দিয়াছেন। নিষ্ঠার সহিত উহা পালন করিতে পারিলেই আমাদের কল্যাণ হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন:—"শুধু নাম করলে হবে কেন? নামের প্রতি অনুরাগ চাই। মুখে সিদ্ধি সিদ্ধি বললে কি নেশা হয়? সিদ্ধি আনতে হয়, বাটতে হয়, সেবন করতে হয়, তবে ত হবে। শুধু সন্দেশ সন্দেশ করলে কি সন্দেশের স্বাদ পায়? সন্দেশ আনতে হয়, খেতে হয়, তবে ত? নামে যদি অনুরাগ না থাকে তবে সব বৃথা। গানে আছে,—'প্রভু বিনে অনুরাগ করে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা?' তাঁর প্রতি অনুরক্ত হও। নামে অনুরাগ হলে পূজা, ধ্যান, জপ, তপস্যা সকলি সার্থক হবে।"

এই অনুরাগ লাভ করিবার উপায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন:—"সাধক যদি ঠিক ঠিক ধর্মজীবন লাভ করিতে চাও, তবে সৎসঙ্গ কর, সৎপ্রসঙ্গ, সৎ আলোচনা কর,—লোক দেখান ভাবে নয়—আন্তরিক। ভগবান বাহিরের কার্য অপেক্ষা মন অধিক দেখেন।"

সত্যই কি আমরা ধর্মজীবন চাই? তাহা হইলে উপরে লিখিত উপদেশ-অবলম্বন ভিন্ন আমাদের অন্য পথ নাই।

গোষ্পদে রবি-বিম্ব

শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, এম্. এ, কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, সাহিত্যশাস্ত্রী

মহাকবি কালিদাস একদা সমুদ্রের অনন্ত বৈচিত্র্য ও অসীম বিপুলতা দর্শনে বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্তে বিষ্ণুর সহিত তাহার তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"বিষ্ণোরিবাস্যাহনবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা"—অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর ন্যায় সমুদ্রের রূপেরও যাথার্থ্য বা পরিমাণ, কিছুই নির্দ্ধারণ করা যায় না। রবীন্দ্র-প্রতিভাও মহাসমুদ্রেরই মতো অনবধারণীয় এবং বৈচিত্র্যে, বিপুলতায়, গাম্ভীর্য্যে ও সারবত্তায় এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর বস্তু। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনাতে শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, গীতি-কাব্য, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, ছোট- ও বড়-গল্প, ছন্দ, ভাষাতত্ত্ব, প্রবন্ধ, রাজনীতি, ধর্ম্ম, দর্শন, সমালোচনা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, আত্মজীবনী, জীবনচরিত, ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরী, শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ইত্যাদি সকল বিষয়ই স্থান পাইয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলি অতি উচ্চ ও বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছে। সকল বিষয়ের রচনাতেই তাঁহার সুদীর্ঘ-সাহিত্যসাধনা-লব্ধ পরিপক্ব অভিজ্ঞতার ও তীক্ষ্ণ গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন, সমৃদ্ধ ও অদ্ভুত মনীষার পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় পরিচয় এই যে, তিনি কবি এবং সর্ব্বাংশে কবি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা 'পরিচয়'-নামক কবিতাতেও সেই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই কবি-মনের অপূর্ব্ব দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার সকল প্রকার রচনাকেই এক বিচিত্র আলোকপাতে উজ্জ্বল, মধুর ও মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনই বর্ষার পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মতো কবিতার লীলায়িত ছন্দে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার দুর্দ্দান্ত গতিবেগ প্রতিহত বা মন্দীভূত হয় নাই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের প্রভাব প্রচুর বিদ্যমান। তাই বলিয়া অক্ষম অনুকরণের দৈন্য কোথাও তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীকে ম্লান করে নাই, বরং সহজাত চিন্তাধারার মতোই স্বাঙ্গীকৃত ও স্বতঃউৎসারিত ভাবসমূহ তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। ভাব-সম্পদের দিক দিয়া তুলনা করিতে গেলে তাঁহার অগ্রজ ও অনুজ সামসময়িক কবিদিগকে স্বভাবতই শিশু বলিয়া মনে হয়। ভাষা ও প্রকাশের দিক্ দিয়াও দেখিতে গেলে তাঁহার স্থান সকলের ঊর্দ্ধে। প্রয়োজন অনুসারে তাঁহাকে ভাষা আবিষ্কার করিয়া ও কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইয়াছে। ছন্দ, শব্দ-তত্ত্ব, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনাকালে তাঁহার পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি তাহার সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিমনের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো যে একটি বিজ্ঞানী মন রহিয়াছে, 'বিশ্ব-পরিচয়" গ্রন্থখানি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে এবং এই জাতীয় টেকনিক্যাল বিষয়ের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়েও একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে গদ্যে সাধুভাষা ব্যবহারের সমর্থক ছিলেন, পরে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দৃষ্টান্তে চলতি ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা রবীন্দ্র-নাথের সংস্কারমুক্ত, চির-নবীন ও চির-জাগ্রত মনের পরিচায়ক।

চির-নবীন রবীন্দ্রনাথ কোন কিছুকেই বেশী

দিন আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক এক সময়ে এক এক জাতীয় ভাব তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং এক এক জাতীয় ফসল ফলাইয়া বিদায় লইয়াছে। তাহার পর আবার আর এক জাতীয় ভাবের জোয়ার আসিয়াছে। তাঁহার কবিমনের চলমান ধারা কোথাও দীর্ঘকাল আটকাইয়া থাকে নাই। বিভিন্ন পরিবেশ, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন ক্ষণ তাঁহার সদা-জাগ্রত, তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ, স্পর্শ-কাতর মনে ও ইন্দ্রিয়গ্রামে যে সাড়া জাগাইত তিনি তাহাকে ছন্দে, গানে অমর করিয়া রাখিতেন। এইজন্য, কোনদিনই কোন বিশিষ্ট মতবাদ, প্রথা বা সংস্কার তাঁহাকে পাইয়া বসিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ এক সময় স্বদেশীতে নামিয়াছেন এবং অজস্র স্বদেশী গান, প্রবন্ধ, কবিতা, বক্তৃতা প্রভৃতিতে সমস্ত বঙ্গবাসীকে নূতন প্রেরণা দিয়াছিলেন। আবার তাহার পরেই রাজনীতি ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিরালা কাব্য-কুঞ্জে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা, ছন্দ, প্রকাশ-ভঙ্গী প্রভৃতি বিষয় ও রসভাবাদির সর্ব্বতোভাবে অনুগামী। তিনি ভাষায় কারুশিল্পী। শব্দ-নির্ব্বাচনবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সহজে সন্তুষ্ট হইবার লোক ছিলেন না। এজন্য তাঁহার লেখায় বিস্তর কাটাকাটি হইত। কিন্তু সৌন্দর্য্যের পূজারীর হাতে কিছুই অসুন্দর থাকিবার উপায় ছিল না। সেই কাটকুট-গুলি চিত্রিত করিয়া তিনি বিচিত্র করিয়া তুলিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষরও ছিল তাঁহার নিজের আকৃতির মতোই সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কাব্যের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং মনে মনে তাঁহাকে কবিগুরু পদে বরণ করিয়া তাঁহার শাগরেদি করিয়াছিলেন। তবে শীঘ্রই তিনি সে প্রভাবমুক্ত হইয়াছিলেন। ছন্দের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ছন্দ-যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আর কোন কবিরই মৌলিকতায়, বৈচিত্র্যে, বহুলতায় ও স্বতঃস্ফূর্ত্ততায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা হয় না। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অপূর্ব্ব ও তাঁহার ভগবৎপ্রেমিক মনের অনুসারী। তাঁহার প্রকাশভঙ্গী অনন্যসাধারণ ও অপরূপ। রবীন্দ্রনাথ তাহার 'পুরস্কার' নামক কবিতায় যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন—

> না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে,
> মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
> কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে,
> মাগিছে তেমনি সুর,
> কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
> কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
> বিদায়ের আগে দু'চারিটা কথা
> রেখে যাব সুমধুর।"

—তাঁহার সে আকুতি তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় সার্থক হইয়াছে এবং বাণী তাঁহার ভাবকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন পূর্ণ আশাবাদী। তাঁহার রচনাতে কোথাও তিনি নৈরাশ্য, দুঃখ, ধ্বংস বা মৃত্যুকে বড় করিয়া দেখান নাই বা শেষ কথা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আশা, আনন্দ, জীবন ও যৌবনের গানই তিনি সারা জীবন ধরিয়া গাহিয়া গিয়াছেন। "তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে"—ইহাই হইল তাঁহার সাহিত্যের ও জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা ও চরম কথা। মানুষের স্খলন বা পতনকে তিনি চিরদিনই সাময়িক বস্তু বলিয়া মনে করিতেন এবং হাজার দোষ-ক্রটী-অপরাধ সত্ত্বেও মানুষের মনুষ্যত্বে তিনি চিরদিনই পূর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাই বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও সমরাভিযানের মধ্যেও তিনি তাঁহার অশীতিবৎসর বয়সের প্রারম্ভে "সভ্যতার সংকট" নামক প্রবন্ধে এই মানুষের অপরাজেয় মহিমার বাণীই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বেস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলে স্র্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল সুর হইল সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ। ক্রমবিকাশবাদের নিয়মানুসারে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি বিশ্বমৈত্রী ও মানবপ্রীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিগুলি দেশ ও কালের সীমানা ছাড়াইয়া এখন বিশ্বসম্পদে পরিণত হইয়াছে।

স্বর্গের রঙীন নেশাও রবীন্দ্রনাথকে কোনওদিন অতিমাত্র বিহ্বল করিয়া তোলে নাই বা মৃত্যুর বিভীষিকাকেও তিনি কোনওদিন সার সত্য মনে করিয়া ব্যথিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ মাটির মানুষ এবং এই মাটির পৃথিবীর জন্য তাঁহার মমতা ও বেদনাবোধ অত্যন্ত নিবিড়। অমরাবতীর অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে প্রলুব্ধ করে নাই; বরং এই মাটির পৃথিবী ও তাহার মাটির মানুষের ছোট-খাটো সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, উত্থান-পতনই তাঁহার কবি-প্রেরণা জোগাইয়াছে। একদিন লাজুক প্রকৃতির ঘোমটা খুলিয়া তিনি যেমন কত রহস্যের কথা আভাসে-ইঙ্গিতে জানিতে পারিয়াছেন তেমনি, অপরদিকে, তিনি তাঁহার গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা মানুষের সহস্র জটিল সমস্যা ও রহস্যেরও দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অতীন্দ্রিয় ভাব-সম্পদেরও খনি। তাঁহার আধ্যাত্মিক মানসের চরম পরিণতি গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, নৈবেদ্য প্রভৃতি ছাড়াও তাঁহার অজস্র কবিতাতে আধ্যাত্মিকতা 'সূত্রে মণিগণা ইব' অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

স্বদেশের ও স্বজাতির যেখানে তিনি কোনও হীনতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, ইতরামি, দুর্ব্বলতা বা বচনসর্ব্বস্বতা দেখিয়াছেন, সেইখানেই তিনি বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন এবং ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে আরব বেদুইনও হইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আবার তাহাদের কল্যাণ কামনায়ই

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা;
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে
হবে আশা";

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট"

—ইত্যাদিও প্রার্থনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের তিরস্কার নিছক আঘাত দেওয়ার জন্য নহে—উহা স্নেহমিশ্রিত ও সংগঠনমূলক। যেখানে স্নেহ নাই, তিরস্কারের প্রশ্নও সেখানে উঠে না।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন যদিও একান্ত নিয়মানুবর্ত্তী, শান্ত ও সংযত ছিল, তথাপি তাঁহার মন কোন কালেই সংরক্ষণশীল ছিল না; বস্তুতঃ, তাহা প্রশান্ত, উদার, প্রগতিপ্রবণ ও চির-প্রসারণশীল ছিল। তাঁহার সংস্কারমুক্ত মন সমাজের সকল প্রকার নিষ্ঠুর, অনুদার, ও হৃদয়হীন মত ও প্রথার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। তিনি অস্পৃশ্যদের প্রতি স্বদেশবাসীদের আচরণে লজ্জা ও বেদনাবোধ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যে ভগবৎসমীপে ভারতের সর্ব্ববাধাবন্ধ-সংস্কার-মুক্তির জন্য তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ব্ব মহিমায় উজ্জ্বল।

স্বদেশের ও স্বজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট।

তিনি তাঁহার ঋষিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন যে ভারতের দুঃখ-দুর্দ্দিন-দুর্দ্দশা সাময়িক, চিরস্থায়ী নহে। সমস্ত অবসাদ, গ্লানি কাটাইয়া একদিন তাহার গৌরবময় শুভদিন আসিবেই আসিবে। তাই তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়াছেন—

"নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
কোন অনাগত বরষে
তব মঙ্গল-শঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণ-হুঙ্কার,
ভেদি' বণিকের ধন-ঝঙ্কার,
মহাকাশতলে ওঠে ওঙ্কার
কোন বাধা নাহি মানি'।"

রবীন্দ্রনাথ প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন-সাধক ছিলেন। তিনি ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপটিকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং ভারতীয় সভ্যতা যে বিভিন্ন সভ্যতাকে আত্মসাৎকরণের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া প্রাচী ও প্রতীচী উভয়ের ভাবধারার মিলনেই যে পরস্পরের মঙ্গল তাহা তাঁহার "ভারত-তীর্থ" নামক কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। জননীরূপে, ভগিনীরূপে, কন্যারূপে, প্রিয়ারূপে ও মানসীরূপে—সকল রূপেই তিনি অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত নৈপুণ্যের সহিত নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষে নারী কেবল নর্ম-সহচরীই নহে, কর্ম- ও চিন্তা-সহচরীও বটে। বাস্তবিক পক্ষে, অম্লান শাশ্বত সৌন্দর্য্যপিয়াসী, আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে নারী কখনই নিছক ইন্দ্রিয়ার্থরূপে রহিতে পারে নাই, দেখিতে দেখিতে প্রেমের উত্তুঙ্গ মহামহিমময় অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হইয়া নারীত্বের চরম ও পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

চিন্তারাজ্যের নানাবিধ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ অধিনায়কত্ব করিয়াছেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথম অতি উচ্চাঙ্গের গল্প রচনা করেন। তাঁহার "গল্পগুচ্ছ" প্রভৃতি জগতের যে কোন প্রথম শ্রেণীর গল্পের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি," "ছেলেবেলা" ইত্যাদি আত্মজীবনী উৎকৃষ্ট রস-সাহিত্যের মূল্য ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। তাঁহার দিন-পঞ্জী "ছিন্নপত্র" অপূর্ব্ব সাহিত্যবস্তু। এগুলির শুধু সাহিত্যিক মূল্যই নাই, পরন্তু এগুলি পরম-রহস্যময় বিরাট রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্য-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি-স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁহার সাহিত্যসাধনা ভালভাবে বুঝিতে হইলে এগুলি গভীরভাবে পাঠের আবশ্যকতা আছে, কেননা, তাহারা বহু সঙ্কেত বহন করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন সাহিত্য," "আধুনিক সাহিত্য," "লোকসাহিত্য," "সাহিত্য," "সাহিত্যের পথে," "সাহিত্যের স্বরূপ" প্রভৃতি সমালোচনা-গ্রন্থগুলিও তাঁহার লেখনীর গুণে ও কবিমানসের সংস্পর্শে অপরূপ সুন্দর রসবস্তুতে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার অদ্ভুত বিশ্লেষণী শক্তির ও রসদৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি," "জাপানযাত্রী," জাপানে-পারস্যে," "ইউরোপ প্রবাসীর পত্র" প্রভৃতি ভ্রমণ-কাহিনীও তত্তৎ দেশের ও অধিবাসীদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের তথ্যে পরিপূর্ণ এবং কবিমন কিভাবে তাঁহাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিয়াছে এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার নিজের মতামত কি তাহা বিশদরূপে জানাইয়া দেয়। "ছন্দ," "বাংলাভাষাপরিচয়," "বিশ্ব-পরিচয়" প্রভৃতি গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানী মনের পরিচায়ক। তাঁহার লিরিক কবিতাগুলি কি প্রাচুর্য্যে, কি বৈচিত্র্যে, কি মনোহারিতায় বোধ হয় সমস্ত পৃথিবীর

মধ্যে শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যাও বিপুল। তিনি শুধু উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর গান-রচয়িতাই নহেন, স্বয়ং সুর-স্রষ্টা, সুকণ্ঠ গায়ক এবং নূতন সম্প্রদায়-প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথের "কালান্তর," "স্বদেশ," ও "সমাজ," "ধর্ম," "মানুষের ধর্ম," "শান্তিনিকেতন," "ব্রাহ্ম-সঙ্গীত" প্রভৃতি তাঁহার গভীর দেশাত্মবোধ, রাজনীতি, দার্শনিকতা, আধ্যাত্মিকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও চিরন্তন সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের "চারিত্র-পূজা" জীবন চরিত জাতীয় রচনার আদর্শরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য এবং তাঁহার শ্রদ্ধাবান্ চিত্তের পরিচায়ক। মাতৃভাষার মধ্যস্থতা ব্যাতরেকে এবং জাতীয় নীতি, সংস্কৃতি ও আদর্শের অনুসরণ ও পরকীয় শ্রেষ্ঠ ভাব ও গুণগ্রামের স্বাঙ্গীকরণ ব্যতিরেকে যে শিক্ষা সুসম্পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও কল্যাণকর হয় না, এই মৌলিক কথাটি তিনি বহুভাবে "শিক্ষা"-নামক অমূল্য গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দেশের প্রাণ-কেন্দ্র হইতে উৎসারিত ও পল্লীর সম্পদ-স্বরূপ ছেলে-ভুলানো ছড়া, গ্রাম্য সাহিত্য, বাউলের গান, পল্লী-শিল্প ইত্যাদির সংগ্রহ, সমালোচনা ও মূল্যনির্দ্ধারণ-প্রয়াসেও তাঁহার সৌন্দর্য্য ও রসপিপাসু সমজদারী মনের পরিচয় মেলে। বাস্তবিকপক্ষে, সমস্ত চেতনা ও অনুভূতি দিয়া নিবিড়ভাবে রস-স্বাদ না করিলে এবং যথার্থ সহৃদয় রসিক, বিদগ্ধ ও মার্ম্মিক না হইলে কেহ অন্যকে এভাবে বুঝিতেও পারে না বা বুঝাইতেও পারে না। রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্রাবলীও নানাবিধ তথ্য ও আলোচনায় পরিপূর্ণ উৎকৃষ্ট রসোত্তীর্ণ পত্র-সাহিত্যের সুন্দর নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি গতানুগতিক সাধারণ নাটকের পর্য্যায়ে পড়ে না। মহাকবি কালিদাস তাঁহার "মালবিকাগ্নিমিত্র"—নামক নাটকে নাটকের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে।
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধকম্।"

অর্থাৎ, নাটকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট নানারসাশ্রয় লোকচরিত্রের অবতারণা থাকায় লোক-রুচি বহুধা ভিন্ন হইলেও নাটক সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন করে। মহাকবি কালিদাসের নাটকের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মূল্য কমিয়া যাইবে, কেন না, এগুলির অভিনয়ের দ্বারা লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, অন্ততঃ বর্ত্তমানে সেরূপ শিক্ষিত, মননশীল দর্শকবৃন্দের অত্যন্ত অসদ্ভাব। সংস্কৃত-সাহিত্যেও "প্রবোধচন্দ্রোদয়," জাতীয় রূপক-নাটকের সংখ্যা অতি অল্প। মেটারলিঙ্ক্-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারের প্রভাব ও প্রেরণাই রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকের মূলে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে বেশীর ভাগ অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রগুলিই স্থান পাইয়াছে। উপন্যাসগুলির চরিত্র-চিত্রন, ঘটনা-বিন্যাস মন-স্তত্ত্ববিশ্লেষণ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত লোকোত্তর প্রতিভারই পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রেও তাঁহার স্বকীয়তা সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের বহু-বিস্তৃত সাহিত্য-সাধনার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পূর্ণাবয়ব, অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন ও মহিমা-মণ্ডিত করিয়া বিশ্বসাহিত্যের আসরে তাহার গৌরবময় ও সম্মানজনক স্থান চিরতরে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরাও বলি—

"জগৎ-কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙ্গালী আজ জ্ঞানের রাজা, বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব।"

রবীন্দ্রনাথের মতো সকল দিক দিয়া এরূপ

ভাগ্যবান ব্যক্তি জগতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস একদা মহারাজ দিলীপ সম্বন্ধে যে উচ্চশ্রেণীর প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন—“একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং, নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ”, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রভুত্ব করিয়াছেন মাটির জগতের নহে—মনোজগতের; তাঁহার ঋজু, দীর্ঘায়ত বিরাট বপুও ছিল অপরূপ কান্তিসম্পন্ন, আর বৃদ্ধবয়সেও তিনি ছিলেন মুক্ত তরুণ। রবীন্দ্রনাথের অপরূপ রূপও তাঁহার বলিষ্ঠ সর্ব্বাতিশায়ী ব্যক্তিত্ব এবং সুদৃঢ় চরিত্রের ন্যায়ই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষী, ও জনসাধারণের নিকট হইতে যে বিপুল সম্মান, সংবর্দ্ধনা ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আর কাহারও ভাগ্যে জুটে নাই।

রবীন্দ্রনাথ দেশের যুবশক্তিতে পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। তিনি ছিলেন চির-আশাবাদী ও তারুণ্যের জয়-গাতা; তাহার সাক্ষ্য তাঁহার “বলাকা”, কাব্য। তিনি মনে প্রাণে জড় প্রবীণদের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন এবং যুবকদের কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-যজ্ঞে তাঁহার দান অকৃপণহস্তে বিতরিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান কবি গ্যেটে মৃত্যুর সময় বলিয়াছিলেন—“Light, more light.” সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ‘ছিন্নপত্রের’ একস্থানে বলিয়াছেন যে, তিনি হইলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন—“More light and more space”। এ প্রার্থনা করিবার যোগ্যতা তাঁহার সত্যই সর্ব্বথা ছিল। তাঁহার ন্যায় মহাপ্রতিভাবান বিরাট পুরুষকে পৃথিবীর এইটুকু আলো ও এইটুকু স্থানে সত্যই কুলায় না। তাঁহারই কবিতার কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

> “হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা
> তপন তোমায় স্বপন দেখি যে,
> করিতে পারিনে সেবা!”

বস্তুতঃ, অসীম মহাকাশ ছাড়া রবিকে কোথাও ধরে না, ইহা সত্য কথা।

উপনিষদের সর্ব্বানুভূতি—“একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা” রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে একীভূত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-সাহিত্য রবীন্দ্র-জীবন হইতে স্বতন্ত্র পোষাকী জিনিস নয়, উহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে বুঝিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। বহুর মধ্যে একের, সীমার মধ্যে অসীমের সাধনাই রবীন্দ্র-জীবনের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাধনা। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘গীতাঞ্জলি’তে কৃতজ্ঞ চিত্তে ও শ্রদ্ধাবনত মস্তকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

> “বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খে’লে,
> অপরূপকে দে’খে গেলেম দু’টি নয়ন মে’লে।
> পরশ যারে যায় না করা,
> সকল দেহে দিলেন ধরা,
> এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক’রে দিন তাই
> যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥”

স্নানযাত্রা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

শ্রীশ্রীনীলাচলনাথ দারুব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়াই ওড়িয়া জাতির অনেকগুলি জাতীয় পর্ব বা উৎসব। অক্ষয়-তৃতীয়াতে চন্দনযাত্রা—তিন সপ্তাহ ব্যাপী। শ্রীজগন্নাথের প্রতিনিধিস্বরূপ মদন-মোহনকে বেশভূষা ও পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত করিয়া নরেন্দ্রসরোবরে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পূর্বে চন্দনযাত্রা খুব সমারোহে সম্পন্ন হইত। অপরাহ্নে সাধুমণ্ডলী স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে, সংকীর্তনের দল উচ্চরোলে হরিনামে মত্ত হইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া নরেন্দ্রসরোবরের দিকে চলিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবকেরা পদোচিত বেশে সজ্জিত হইয়া কেহ আসাসোটা ও পতাকা প্রভৃতি ধারণ করিয়া, কেহ কেহ-চামর বা বড় বড় হাতপাখার বিমানে বাহিত শ্রীশ্রীমদনমোহনকে বীজন করিতে করিতে, কেহ কেহ নানা বাদ্য-যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে শোভাযাত্রার অনুগমন করিতেন। সুসজ্জিত নৌকায় মদনমোহনকে আরোহন করাইয়া জগন্নাথের জয়ধ্বনি দিতে দিতে সন্ধ্যার মৃদুমন্দ হিল্লোলে নৌকা-বিহার করানো হইত এবং সন্তরণপটু সেবক, পাণ্ডা ও যাত্রীরা নরেন্দ্র-সরোবরে ভজন-কীর্তন গাহিতে গাহিতে সাঁতার কাটিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। সেই সময় মঙ্গলধ্বনির মধ্যে নানা প্রকার বাজী পোড়ানোও হইত। নৌকায় নরেন্দ্রসরোবরে বিহার করিয়া শ্রীবিগ্রহ উপনীত হইতেন সরোবরের মধ্যস্থিত চন্দন মন্দিরে। মদনমোহনের সঙ্গী বিগ্রহদেরও তথায় একে একে উঠাইয়া লওয়া হইত। তুরী ভেরী প্রভৃতি বাজিয়া উঠিত। শৃঙ্গারী পাণ্ডা ফুলহারে ও অলঙ্কারে মদনমোহনকে সাজাইয়া মন্দিরে বসাইত এবং পূজক ভোগবাগ দিত। প্রায় রাত্রি ৯টা।১০টার পর শোভাযাত্রা সহ মদনমোহন বিগ্রহ-মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। বর্তমানকালে সেই শোভাযাত্রা নামে মাত্র আছে, আনন্দোৎসব বা অনুরাগ নাই।

চন্দনযাত্রার পর ওড়িষ্যার প্রধান পর্ব স্নান-যাত্রা। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানাভিষেক হয়। এখানে জগন্নাথ অর্থে চারিজন—জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম ও সুদর্শন। শ্রীমন্দিরের মণিকোঠার রত্নবেদী হইতে বিরাট প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব কোণে স্নানবেদীর মণ্ডপে দারুব্রহ্মকে আনা হয়। পূর্বরাত্রির মধ্যভাগ হইতে স্নানযাত্রার আনুষঙ্গিক নানা ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্নানমঞ্চ বা স্নানবেদীতে যথাবিধি পূজার্চনা করিবার পর কলসীগুলির জলকে মন্ত্রপূত করিয়া অভিষেক-মন্ত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীসুভদ্রা ও শ্রীশ্রীবলরাম বিগ্রহাদির মস্তকের উপর বর্ষণ করা হয়। সেই সময় শঙ্খ তুরী ভেরী পটহাদি বাদ্য বাজিতে থাকে। সেই স্নানজল যাত্রীরা শ্রদ্ধাপূর্বক পান করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে এত লোকের ভিড় হয় যে স্নানমণ্ডপে সকলের দাঁড়াইয়া দেখা অসম্ভব। পুরীর রাজা অসুস্থ বা অপর কোনও প্রতিবন্ধক থাকিলে তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের যথারীতি সেবাকার্য সুসম্পন্ন করাইয়া থাকেন। এই

প্রতিনিধির নাম মুদীরথ বা মুদ্রাহস্ত। স্নানযাত্রার তুইদিন পূর্ব হইতে অর্থাৎ শুক্লা ত্রয়োদশীতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী 'দৈতা'রাই শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহাদির পূজার্চনা ও অন্য সকল কার্য করিয়া থাকে। এই দৈতাগণ বিশ্ববসু শবরের বংশধর—তাঁহারা আপনাদিগকে জগন্নাথের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। নব কলেবরে যখন মন্দির-প্রাঙ্গণের পশ্চাতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে পুরাতন বিগ্রহের সমাধি হয় তখন দৈতা-সেবকেরা অশৌচ গ্রহণ করে। পতি মহাপাত্রেরা আপনাদিগকে বিদ্যাপতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে যে মালবের অধিপতি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার রাজধানী অবন্তীতে বাস করিতেন। তিনি পরম বিষ্ণু-ভক্ত ছিলেন। স্বয়ং বিষ্ণু একদিন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া রাজার নিকট আসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি রাজাকে "শ্রীক্ষেত্রে"র মাহাত্ম্যের কথা বলিলেন। শ্রীভগবান সেখানে নীলমাধব মূর্তিতে বিরাজিত—দেবতারা তথায় আসিয়া শ্রীভগবান বিগ্রহের সেবা পূজা করিয়া থাকেন। আর সর্বতীর্থের অপেক্ষা শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অধিক।

দ্বারাবত্যাং জলে মুক্তিঃ বারাণস্যাং জলে স্থলে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে মুক্তিঃ স্যাৎ পুরুষোত্তমে॥

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সন্ন্যাসীর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া বিদ্যাপতি নামক এক বিশ্বাসী ভক্ত-ব্রাহ্মণকে পথ ঘাট ও সব তথ্য সংগ্রহ করিতে পাঠাইলেন। শ্রীক্ষেত্রে শবর জাতি ছাড়া অন্য কোন বসতি ছিল না। সমস্ত স্থানটি গভীর অরণ্যপ্রদেশ বলিলেই হয়। শবর জাতির রাজা বিশ্ববসু। বিশ্ববসুর কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিদ্যাপতি নীলমাধবকে দর্শন করিতে সক্ষম হন। এই বিশ্ববসুর বংশধর বলিয়া দৈতারা পরিচয় দেয় এবং পতি-মহাপাত্রেরা বিদ্যাপতির বংশধর বলিয়া দাবী করে। যাহা হউক স্নানযাত্রার তুই দিন পূর্ব হইতেই ইহারাই শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবাপূজার ভার গ্রহণ করে। মণিকোঠার রত্নবেদী হইতে স্নানবেদীতে যখন বিগ্রহেরা আনীত হন—তখন স্নানের পরে সর্বসাধারণ তাহাদের ইচ্ছামত প্রাণ ভরিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভৃতিকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিতে পারেন—কোন বাধা নাই। এই স্নানযাত্রার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্নানবেদীর উপরে গণেশ বেশ ধারণ করেন। পুরীবাসী অনেকেই গণেশবেশ দেখিয়া থাকেন। এই স্নানযাত্রার পর অনবসর—অর্থাৎ জগন্নাথের জ্বর হয়। তিনি মণিকোঠায় গিয়া আর রত্নবেদীতে বসেন না এবং লোকদিগকেও দর্শন দেন না। দৈতারা পতি-মহাপাত্রদের দ্বারা পাঁচনভোগ দিয়া থাকেন। সেই পাঁচন অতি সুস্বাদু। অনেকেই প্রসাদ পাইয়া থাকেন। অমাবস্যা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলে। সাধুভক্তেরা শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুকে দর্শন করিতে পারিবেন না বলিয়া কেহ আলালনাথ বা কোন দূরতীর্থে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু মন্দিরে দশাবতারের পটে ভোগ নিবেদন করিয়া মহাপ্রসাদ দানে ভক্ত-দিগকে পরিতৃপ্ত করা হইয়া থাকে। এই পনর দিন অনবসরে জগন্নাথের দারু মূর্তির রং করা হয়। জলে রং অনেকটা ধুইয়া মুছিয়া যায়। এই সময়ে এই সব কাজ যাঁহারা করেন—তাঁহাদিগকে দাত্য বলে এবং যাঁহারা দারুমূর্তি নির্মাণ বা সংস্কার এবং মহাপ্রভুদিগকে বহন করে তাহাদিগের নাম 'দয়িতা সয়াত্তরী'। অনবসরকাল উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে নেত্রোৎসব বা নবযৌবন এবং দ্বিতীয়া তিথিতে তাঁহাদের রথারোহন আর রথযাত্রা। এই সময়ে বিগ্রহদিগকে আলিঙ্গন ও স্পর্শ করিতে কোন বাধা নাই। শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা পূজার

জন্য **"ছত্তিশা নিজগ"** স্বয়ং অনঙ্গ ভীমদেব এই নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। এই সেবকের দল উত্তরাধিকারী-সূত্রে বংশপরম্পরায় সেবাপূজা করিয়া আসিতেছেন। সেবার নীতি বা রীতি এমন করিয়া বাঁধা যে সামান্য কোন সেবক অনুপস্থিত থাকিলে মন্দিরের সেবা-পূজা অচল। বর্তমানে এই সেবকের দল—ছয় হাজার প্রাণী—১৪০০ পরিবারে বিভক্ত। মাদলাপঞ্জীতে আছে যে 'ছত্তিশা নিজগ' ব্যতীত ১২০ জন ছোট ছোট সেবকের দলও আছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ যে কোন্ দেবতা তাহা লইয়া এক এক সম্প্রদায়ের এক এক মত। কেহ বলেন বিষ্ণু মূর্তি, কেহ বলেন কৃষ্ণ মূর্তি কিন্তু যাঁহারা শাক্ত তাঁহারা বলেন—বিষ্ণুর প্রসাদ কোথায় মহাপ্রসাদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—বিষ্ণুর নৈবেদ্য বা ভোগে কোথায় আদা মাষকলাইএর পিঠা দেওয়া হয় ইত্যাদি। আবার বৈদান্তিকেরা বলেন ইহা ওঁকার মূর্তি। পূজারী পাণ্ডাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে ইঁহারা সর্বপ্রথমে ব্রহ্মমন্ত্রে অর্চনা করিয়া পরে দক্ষিণা-কালিকা-মন্ত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথকে, শিবমন্ত্রে বলভদ্রকে এবং সুভদ্রাকে ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে পূজা করেন। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে রাজার আদেশে সর্বশেষে গোপালমন্ত্রে পূজা হইয়া থাকে।

শিক্ষিত পুরাতত্ত্ববিদ এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন—ইহা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের—ত্রিমূর্তি। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন ভারত কিম্বা ভারতেতর দেশে কোথাও কোন বৌদ্ধমন্দিরে এইরূপ মূর্তি দেখা যায় না। ইহা যদি বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের প্রতীক-মূর্তি হয় তবে অন্যত্র তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। বৌদ্ধমন্দিরে কোথাও প্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলা হয় না। বরং মহানির্বাণতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় "মহাপ্রসাদমানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ"। ৺পুরীধামে মহাপ্রসাদে হাত ধুইয়া কুলকুচা করিতে নাই। মহানির্বাণ তন্ত্রে ষষ্ঠোল্লাসে আছে "হস্ত প্রক্ষালনং নাস্তি তব নৈবেদ্যসেবনে॥" শ্রীশ্রীজগন্নাথের পার্শ্বদেবতা সবই শক্তিমূর্তি। শক্তিপীঠে মা সতীর এক একটি অঙ্গ পড়িয়াছিল—প্রস্তরীভূত সেই অঙ্গ পীঠে পূজা হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গের অভ্যন্তরে সেই শক্তির অঙ্গ আছে—তাহারই স্নান হয়। ইহাকে পাণ্ডারা ব্রহ্মপদার্থ বলে। কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধ অনাচারে মূর্তি নষ্ট হওয়ায় শ্রীশঙ্করাচার্য দারু মূর্তি নির্মাণ করাইয়া গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন। মঠাম্নায় আছে—

"পুরুষোত্তমন্তু ক্ষেত্রং স্যাৎ জগন্নাথোহস্য দেবতা।
বিমলাখ্যা হি দেবী স্যাদাচার্যঃ পদ্মপাদকঃ॥
তীর্থং মহোদধি প্রোক্তং ব্রহ্মচারী প্রকাশকঃ।
মহাবাক্যং চ তত্রোক্তং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম চোচ্যতে॥"

গোবর্ধন মঠের রক্ষিত গুরু-পরম্পরার নামমালার আছে—

"পদ্মপাদঃ শূলপাণিস্ততো নারায়ণাভিধঃ।
বিদ্যারণ্যো বামদেবঃ পদ্মনাভাভিধস্ততঃ॥
জগন্নাথঃ সপ্তমঃ স্যাদষ্টমো মধুরেশ্বরঃ।
গোবিন্দঃ শ্রীধরস্বামী মাধবানন্দ এব চ॥"

এখানে শ্রীধর স্বামীর নাম দশম আচার্যরূপে রহিয়াছে। গোবর্ধন মঠের ভূতপূর্ব মোহান্তের সময়ে গ্রন্থাগারটি সুরক্ষিত ছিল এবং সে সময়ে শ্রীধর স্বামীর হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার পুঁথিও অনেকে দেখিয়াছেন। বর্তমান সময়ে অনেক অমূল্য হস্তলিখিত পুঁথি হারাইয়া গিয়াছে। শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন মঠের প্রভাব এখনও শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে লুপ্ত হয় নাই। একমাত্র উক্তমঠের পীঠাধীশ শঙ্করাচার্য শ্রীমন্দিরে আসন লইয়া বসিতে পারেন। ভারতের অন্য কোন সম্প্রদায়ের পীঠাধীশের এই মর্যাদা নাই।

মন্দিরের রক্ষিত মাদলা পাঁজিতে দেখা যায়

যযাতি কেশরী শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রক্তবাহুর আক্রমণে ও সাগরের প্লাবনে মন্দির ও শ্রীমূর্তি ছিল না। যযাতি কেশরী অনুসন্ধানে জানিলেন যে সোনপুরে শ্রীবিগ্রহ আছেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন যবনাক্রমণের ভয়ে জগন্নাথ ভূগর্ভে প্রোথিত। তিনি তাহা উত্তোলন করিয়া ৩৮ হাত উচ্চ মন্দির নির্মাণ করাইয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনিই বিশ্ববসু ও বিদ্যাপতির বংশধরগণকে সন্ধান করিয়া শ্রীমন্দিরের সেবা-পূজায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। অনঙ্গ ভীমদেব বর্তমান সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া 'ছত্রিশা নিজগ' নিযুক্তপূর্বক সেবা পূজার সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁহারই পদ্ধতি আজ পর্যন্ত কোনক্রমে চলিতেছে। ইঁহাকে ওড়িষ্যায় দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

কালাপাহাড় যখন কটকে আসিয়া পৌছেন তখন পাণ্ডারা আক্রমণের ভয়ে জগন্নাথকে চিল্কাহ্রদের ধারে পারিকুদে অপসারিত করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় তাহার সন্ধান পাইয়া শ্রীমূর্তি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। বিশার মহান্তি নামক জনৈক ওড়িষ্যাবাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রাণ উপেক্ষা করিয়া অর্ধদগ্ধ জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ হইতে ব্রহ্মপদার্থ (relics) উদ্ধার করিয়া কুজঙ্গে আনেন। টোডরমল্ল যখন রামচন্দ্রদেবকে ওড়িষ্যায় স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য করেন তখন উক্ত রাজা কুজঙ্গ হইতে পুরীধামের শ্রীমন্দিরে দারুমূর্তিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের আমলে মন্দির অনেকবার লুটপাট হইয়াছিল। মারাঠা রাজাদের আমলে সাতাইশ হাজারী মহলটী শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা ও শ্রীমন্দিরের রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং শ্রীমূর্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে শ্রীশঙ্করাচার্য যে দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে বর্তমানে নদীয়ার নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছে—

স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর হইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল মহাদুঃখ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িঞা॥

এখনও এই স্নানযাত্রা দেখিবার জন্য যাত্রীর দল টিকিট কিনিয়া শ্রীমন্দিরের চারিপাশের মঠের ছাদ-বারান্দায় বসিয়া স্নান দর্শন করেন। বড়দাণ্ড অর্থাৎ বড় রাজপথে দাঁড়াইয়াও শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্নান অনেকে দর্শন করিয়া থাকেন।

এই স্নানযাত্রার দিনেই বাংলাদেশে কলিকাতায় কালীঘাটে ভোর সাতটা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত দ্বার বন্ধ করিয়া 'দেবীর কৌটা'র (relics) স্নান হয়। এই পর্ব দর্শন করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সাত জন ব্রাহ্মণকে চক্ষু বাঁধিয়া মন্দিরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। বেলা ১টার সময় যখন তাঁহাদের বাহির করিয়া আনা হইল তখন তাঁহারা প্রায় অর্ধমূর্চ্ছাপন্ন। সেবকেরা তাঁহাদের পাখা লইয়া বীজন করিয়া মুখে চোখে জলের ছিটা দেয়। সেই স্নানজল অত্যন্ত মধুর সৌরভপূর্ণ—আমি সেই স্নানজল পান করিয়া ঠিক অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, পাণ্ডারা সেই স্নানজলে গঙ্গাজল মিশাইয়া যাত্রীদিগকে প্রদান করেন—পয়সার জন্য। তবুও সুগন্ধ ও মধুর স্বাদ থাকে। আর কোন দেবীপীঠে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কিনা তাহা অনুসন্ধানযোগ্য।

এই স্নান-পূর্ণিমার দিনেই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থান দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শ্রীশ্রীভবতারিণী কালীমাতার প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলাদেশেও ইহা বিশেষ পর্ব।

মহাত্মা গান্ধীর জীবন-দর্শন

শ্রীমনকুমার সেন

সত্যের সাধক মহাত্মা গান্ধীর জীবননীতি ও কর্মব্রতের পশ্চাতে যে 'দর্শন' লক্ষিত হয় তাকে বলা যেতে পারে 'ভগবদ্-দর্শন' বা এই বিরাট ও অনন্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলে পরম সত্যস্বরূপ যিনি রয়েছেন তাঁকে উপলব্ধি করা। বস্তুতঃ, মর্মমূলে প্রচণ্ড ঈশ্বর-বিশ্বাসের শক্তি তাঁকে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে বলেই গান্ধীজী একাধারে ভক্তিযোগী ও কর্মযোগী হ'তে পেরেছেন;—স্বার্থলেশহীন সর্বত্যাগী হয়েও সংসারের ছোট-বড় শত শত সমস্যার সমাধানে সক্রিয় থাকতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সংসার ছিল মুখ্যতঃ এই চল্লিশ কোটি দরিদ্র ও মূর্খ ভারতবাসীর সংসার।

গান্ধীজী তাঁর 'আত্মকথা'র অন্যতর নামকরণ করেছেন 'সত্যের প্রয়োগ' (Experiments with truth): জাগতিক সীমাবন্ধনীর মধ্যে থেকে অনন্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যেমন তার প্রয়োগ-শালায় আপেক্ষিক সত্যের কোন না কোন দিক, কোন নূতন দিকের বীক্ষণ, অনুবীক্ষণ বা আবিষ্কারে মগ্ন থাকেন, গান্ধীজীও তেমনি তাঁর কর্মে উৎসর্গীকৃত জীবনের মধ্য দিয়ে, প্রাত্যহিক বহু ঘটনা ও কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, সংসারের সীমাবন্ধনীর মধ্যে লব্ধ ও আবিষ্কৃত খণ্ড খণ্ড আপেক্ষিক সত্যে জোড়া লাগিয়ে পূর্ণতম পরম সত্য বা মানবকল্যাণের মূলাধারকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

'আত্মকথা'র ভূমিকায় গান্ধীজী লিখেছেন, "সত্যই আমার কাছে মূল নীতি,—আরো অসংখ্য নীতি এর অন্তর্ভূত হয়ে আছে। এই সত্য শুধু বাক্যের সত্যতা নয়, চিন্তারও সত্যতা; আর আমরা যাকে আপেক্ষিক সত্য মনে করে থাকি শুধু তাই নয়, পূর্ণতম সত্য, সনাতন শাশ্বতনীতি,—অর্থাৎ ঈশ্বরও।" পূর্বে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'God is truth'—'ঈশ্বরই সত্য'—; পরে বললেন, 'Truth is God'—সত্যই ঈশ্বর। সত্যের উপর উচ্চতম গুরুত্ব আরোপ করলেন তিনি। আর, যে 'সত্' থেকে 'সত্য' শব্দের উৎপত্তি, তার মানেও হচ্ছে 'যা আছে', (that—which exists):—কি আছে, বা পরম সত্য কি? ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন,—জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে, কর্মযোগী গান্ধী প্রধানতঃ আত্মার বা আত্মশক্তির উদ্বোধনের মধ্যেই পূর্ণতম সত্য উপলব্ধি করেছেন; উপলব্ধি করেছেন পূর্ণতম সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে। কোন্ পথে তাঁর এই উপলব্ধি হয়েছিল? অনুপম ভাষায় তিনিই এর জবাব দিয়েছেন, "ঈশ্বররূপে সত্যকে যদি খুঁজে পেতে চাও, প্রেম বা অহিংসাই তার এক ও অদ্বিতীয় পথ",—কাজে কাজেই, "প্রেমই ঈশ্বর, একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই।" কাজেই আমরা দেখছি, গান্ধীজীর দৃষ্টিতে 'সত্য' ঈশ্বরেরই স্বরূপ, সত্য-সাধনা ঈশ্বরেরই সাধনা, আর এই সাধনার একমাত্র অবলম্বনীয় পথ প্রেম। আত্মশক্তি বা 'soul force'—যা গান্ধীজীকে মহাত্মারূপে বরেণ্য করেছে, তা এই প্রেম থেকেই উপজাত। "যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা এবং যাঁকে আমি সত্যস্বরূপ বলে

মনে করি, তাঁকে উপলব্ধি করবার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে আছি—আর জীবনের প্রথম অবস্থাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যদি আমাকে সত্যোপলব্ধি করতে হয় তাহলে জীবনের বিনিময়েও আমাকে প্রেমধর্ম (the law of love) মেনে চলতে হবে।" এ-ই হচ্ছে তাঁর কথা: জীবন যায় যাক্, তবু প্রেম তথা অহিংসা জয়যুক্ত হোক! প্রেমধর্মের প্রতি এই অনন্যনিষ্ঠ আনুগত্যই গান্ধী-জীবন ও সাধনার ভিত্তি। প্রয়োজনের তাগিদেই এই প্রেম নয়, মানুষের আত্মার স্বভাবধর্ম বলেই এর আবাহন। দেব ও দানব এই দুয়ের সংমিশ্রণে গড়া মানুষ: দেবত্বের বিভূতিতে যে জীবন যত আকৃষ্ট হবে, দেবভাবের দিকে যে মানুষের জীবন যত ঝুঁকবে, তার গতি ও সার্থকতাও ততই বেড়ে যাবে। প্রেম বা অহিংসা মানুষের দেবভাবের পরিচয়: এইটাই তার প্রকৃত ধর্ম, আর শুধু এই ধর্মের বলেই মানুষ তার জীবনের মূল লক্ষ্যে বা পূর্ণতায় পৌঁছুতে পারে। তাই গান্ধীজীবন ও নীতিতে 'Truth' হচ্ছে লক্ষ্য,—পূর্ণতা বা পরম সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতীক,— আর 'Non violence' বা অহিংসা হচ্ছে সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথ।

মহাত্মা গান্ধী নিছক পুঁথিগত দর্শনের মত এই তত্ত্বকথা শুনিয়ে যান নি। তিনি বললেন কার্যকরী অহিংসার কথা। পূর্ণতার আদর্শ শুধু জ্ঞানের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, কার্যক্ষেত্রে এর আচরণ ও প্রয়োগ চাই! মহাত্মা বললেন, "অন্যায়ের প্রতিরোধ অবশ্য করবে, তবে অন্যায় দিয়ে নয়, ন্যায় দিয়ে। অসত্যকে সত্যের শক্তিতে পরাভূত কর; অহিংসার মন্ত্র আঁকড়ে চল,—অনিবার্যরূপে এই মন্ত্রশক্তিই তোমাকে পূর্ণতম অহিংসার বা প্রেমের প্রতিমূর্তি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরসমীপে পৌঁছে দেবে। সত্যই তোমাকে মহাসত্যে পৌঁছে দিতে পারে, প্রেমেই শুধু মহাপ্রেমের আধার উপলব্ধ হতে পারে। অসত্য দিয়ে সত্যে পৌঁছানো যায় না, অ-প্রেম বা হিংসাকে অবলম্বন করে প্রেম বা অহিংসার আদর্শে পৌঁছানো কখনই সম্ভব নয়। বুনো গাছের বীজে বুনো গাছই হয়, গোলাপ হয় কি? সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে যদি গরুর গাড়ীকে কর বাহন, তাহলে গাড়ী আর তুমি দুই-ই ডুববে। সুতরাং লক্ষ্য যতখানি সুন্দর, বিশুদ্ধ ও সৎ হবে, পন্থাও ঠিক ততখানি, এমন কি তারও বেশী সুন্দর, বিশুদ্ধ ও সৎ হওয়া চাই।" মহৎ আদর্শ যে কোন দিনই সহজ-লভ্য নয় গান্ধীজীর সংগ্রাম-বহুল জীবনই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বস্তুতঃ দেহের বন্ধনের মধ্য থেকে দেহাতীত পূর্ণ সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি খুবই কঠিন। তবু, মানুষ চিরদিনই আদর্শকে বড় করে তুলে ধরেছে, এক ধাপ নিজে এগিয়েছে তো জীবনের লক্ষ্যকে আরো তিন ধাপ দূরবর্তী বলে মনে করেছে: লক্ষ্যকে প্রসারিত করা এবং অনুক্ষণ সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার সাধনা করা, এটাই হচ্ছে প্রকৃত সভ্যতা ও মানুষের জীবনধর্ম। লক্ষ্যকে ক্রমেই সঙ্কুচিত করে আনবার, মনুষ্যজীবনের মহত্তম আদর্শকে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর করে নিছক দৈহিক ক্ষুন্নিবৃত্তির পর্যায়ে নামিয়ে আনবার যে প্রবৃত্তি শিল্প-বিপ্লবোত্তর পশ্চিমী সভ্যতায় প্রকাশ পেয়েছে, তার ভয়াবহ পরিণাম গান্ধীজী দূরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন: আর এই সর্বনাশা স্রোতকে অবরুদ্ধ করবার জন্যেই প্রেমভিত্তিক কর্মপন্থার রচনা ও রূপায়নেই আজীবন ব্রতী রেখেছিলেন নিজেকে ও আদর্শবাদী কর্মিদলকে,—বহুমুখী কর্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই কর্মানুষ্ঠানের উপস্থিত লক্ষ্য দুর্গত জনগণের দুঃখমোচন করা,—সমাজের সুপ্ত জীবনকে চঞ্চল করে তোলা। সমাজের এই রূপান্তর যে প্রকারান্তরে পূর্ণতম সত্যের পথকেই প্রশস্ত করবে, এই অবিচল বিশ্বাসই তাঁকে পরিচালিত করেছে: 'I know I cannot find Him apart from humanity'—মানুষকে বাদ দিয়ে আমি তাঁকে (ঈশ্বরকে) পেতে পারি না।" জীবে প্রেম, জীবের সেবা—ঈশ্বরেরই সেবা,—এই ছিল তাঁর সুগভীর প্রত্যয়। আর ভারতীয় জীবন-দর্শনেরও এইটেই মূল কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একটি মানুষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী, তর্ক-বেদান্ততীর্থ

বিরল হলেও এমন লোক আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাই যিনি দেহে এবং আংশিক ভাবে মনে মানুষের সবলতা দুর্বলতা বহন করেও এমন এক অপার্থিব আলোতে প্রাণের প্রদীপ জেলে জগতে বিচরণ করেন যে সেই আলো অপর মানুষকেও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। এইরূপ ব্যক্তির বাহিরে কোনও পরিচয়, পদ বা প্রতিষ্ঠা না থাকলেও তাঁর ভিতরের আগুনের ছোঁয়াচ তাঁর সংস্পর্শে যারাই আসে তারাই অনুভব করে। এই ধরণের এক জন মানুষ ছিলেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একজন খাঁটি মানুষ। গত বছর, ১লা পৌষ আমরা তাঁকে অপ্রত্যাশিতভাবে হারিয়েছি।

তাঁর বাল্যবন্ধুরা আজও তাঁর বাল্যকালের অদ্ভুত সাহস, দৃঢ়সংকল্প ও বন্ধুপ্রীতির কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে পড়েন। স্বদেশী যুগের সমিতির শিক্ষায় গড়ে উঠেছিল তার অদম্য মনোবল ও সুদৃঢ় দেহবল। প্রথম যৌবনেই দুর্বৃত্ত পুলিস অথবা অন্য কোনও দুষ্টলোককে শাসন করতে বন্ধুদের অনুরোধে তিনি হতেন অগ্রণী। আবার শবদাহ, রোগীর পরিচর্যা প্রভৃতি কার্যে তাঁর ছিল অক্লান্ত উদ্যম। যে সকল বীভৎস বা কঠিন রোগীর কাছে তাদের নিকট-আত্মীয়বর্গ থাকতে কুণ্ঠিত হতেন, নগেন্দ্রনাথকে অম্লানবদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে দীর্ঘকাল তাদের সেবায় ব্যাপৃত থাকতে দেখা যেত। কিন্তু এসব ছিল তাঁর চরিত্রের বাহিরের দিক। অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত বাল্য থেকেই ছিল তাঁর তীব্র আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, যা ক্রমশঃ নানা ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে জীবনের অপর সকল দিক্‌কে পরিপ্লাবিত করে মিলিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের ভাবধারার ত্রিবেণীসঙ্গমে। 'ছোটবেলা থেকেই মনে হতো ঋষি মহাপুরুষরা যা করে গেছেন, যা বলে গেছেন—সব জানতে হবে, তাঁদের জীবন অনুসরণ করতে হবে।" সত্য ও ধর্ম জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রথম যৌবনেই তিনি মূল অথবা অনুবাদের সাহায্যে বহু ধর্ম ও জ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রথম যৌবনেই যখন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারার সহিত পরিচিত হলেন, তখন থেকেই তাঁর নানামুখী চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা একটা সুনির্দিষ্ট ধারা প্রাপ্ত হয়ে সেই ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। স্বামিজীর দেশ-প্রেম, মানবপ্রীতি, তাঁর ভারত সংস্কৃতি-প্রীতি ও আধ্যাত্মিকতা-প্রীতি নগেন্দ্রনাথকে পাগল করে তুলল। এক নির্দিষ্ট স্থানে সমভাবের বন্ধুদের নিয়ে দিনরাত্রি স্বামিজীর কথা ও আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন। খেলাধুলা, ব্যায়াম, আর্ত ও রোগীর সেবা, জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গঠন, আবার নীরবে বন্ধুদের নিয়ে পাঠ-আলোচনা-ধ্যান-ধারণা, এই সকল ব্যাপারেই তাঁর অসাধারণ সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্ব ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যেত। স্বার্থশূন্য উদার ভালবাসা ছিল তাঁর সহজাত স্বভাব। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্ব-স্থান পাবনা জেলা-স্কুল থেকে প্রবেশিকা

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নানা কারণে তাঁকে ভাগলপুর, কুচবিহার প্রভৃতি নানাস্থানের কলেজে অধ্যয়ন করতে হয়। পরিশেষে রংপুর কলেজ থেকে বি. এ., পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঐ কলেজেরই গ্রন্থাগারিক ও হোস্টেল-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। ছাত্রজীবনে ফুটবল খেলোয়াড় রূপেও তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বন্ধুরা বলেন, তাঁকে মেরে অজ্ঞান না করলে 'গোল' দেওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই খেলোয়াড়-খ্যাতি যখন চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, সেই সময় একদিনের সংকল্পে তিনি সারাজীবনের জন্য 'ফুটবল' খেলা ত্যাগ করলেন। আশ্চর্য মনোবল! "কলেজের ছেলেদের মধ্যে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাব দিতে পারলে দেশের অনেক কাজ হবে, এই জন্যই কলেজে কাজ নিয়েছিলাম, নইলে চাকুরী করবার কোন স্পৃহা বা প্রয়োজন আমার ছিল না।" কলেজের ও হোস্টেলের ছাত্রদের কাছে দিনরাত উচ্চপ্রসংগ এবং আত্মত্যাগ ও ভালবাসা দিয়ে তাদের গড়ে তোলা, এই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। বীরত্বপূর্ণ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে দেশপ্রেম—এই ছিল তাঁর প্রধান শিক্ষার বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন থেকেই এই দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ, বীর্য ও পৌরুষ-পূর্ণ ভাবসমূহের অনুশীলনের ফলে তাঁর ভিতর পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল একটি কঠোর পুরুষোচিত মনোভাব এবং নারীজাতির প্রতি এক প্রকার অবহেলাপূর্ণ ব্যবধানের দৃষ্টি। তাই এক বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি যেতে স্বীকৃত হন নাই শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে দর্শন করতে। "ভাবতাম মেয়েমানুষ আর বেশী কি উন্নত হতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী বলেই লোকে এত বড় করছে।" তবুও পরে একদিন সেই বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে যেন বাধ্য হয়েই তাঁরই সংগে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। এক ব্রহ্মচারী তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে সেদিন আর মায়ের দেখা পাবেন না। কিন্তু বাধা পেয়েই নগেন্দ্রনাথের আগ্রহ ও সংকল্প উদ্দীপ্ত ও দৃঢ়তর হয়ে উঠল। তিনি সংকল্প করে বসলেন,—'এসেছি যখন মাকে না দেখে যাবই না'। ব্রহ্মচারীর নিষেধ সত্ত্বেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করতে লাগলেন শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের আশায়। এমন সময় উপর থেকে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। প্রতীক্ষমান দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও তোমরা?"

"মার কাছে যেতে চাই, মাকে দর্শন করতে।"

"বেশ, উপরে চলে যাও তোমরা মার কাছে।"

শরৎ মহারাজের আদেশ হয়েছে, আর বাধা দেয় কে? দুজনে মায়ের সন্নিধানে উপস্থিত! একে একে সমবেত পাঁচ ছয়জন প্রণাম করার পর সকলের শেষে গিয়ে প্রণাম করলেন নগেন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই এক প্রণামেই লুটিয়ে পড়ল তাঁর জীবন শ্রীশ্রীমায়ের চরণে। শুধু মায়ের চরণে নয়, শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিমূর্তি সমগ্র নারীজাতির চরণে! প্রণাম করার সংগে সংগেই তাঁর বাহিরের সংজ্ঞা লোপ পেল। চোখে অবিরল অশ্রু, পরে মুখে অস্ফুট মা মা ধ্বনি! সংগী বন্ধু আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল! অপার করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা সন্তানকে ক্রোড়ে শায়িত করে ব্যজনে ব্যস্ত! কিছুকাল পরে সংজ্ঞা ফিরে এল। শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে সন্তানকে খাইয়ে দিলেন মিষ্টান্নপ্রসাদ। পরের জীবনে নগেন্দ্র হেসে বলতেন—"মা সন্দেশ খাইয়েছিলেন বটে, কিন্তু অনেকখানি কাঁদিয়ে;

তাই সারাজীবন অনেক সন্দেশ খাচ্ছি বটে, কিন্তু কেঁদে কেঁদে।"..... সেই একস্পর্শে সমগ্র নারীজাতির প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হল – ভক্তি ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নারীর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই "একস্পর্শে সকল সংশয় দূর হয়ে গেল—জীবনের গন্তব্যপথ ও লক্ষ্য-সম্পর্কে। টাকা পয়সা মান যশের দিকে আর কখনই মন যায়নি।" শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা লওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে মা বলেছিলেন, "এখন থাক্, সে পরে হবে।"* এই সময়ে প্রিন্সিপাল ওয়াট্কিন্সের আগ্রহে তিনি দর্শন ও ইতিহাস এই দুই বিষয়ে এম্-এ পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ওয়াটকিন্স-এর আকাংক্ষা ছিল, এম. এ, পাশ করিয়েই তাঁকে কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবেন, কারণ তিনি নগেন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ এসে সব ওলট্ পালট্ করে দিল। এম্-এ, পরীক্ষা তো দেওয়া হোলোই না, যাদের জন্য তিনি কলেজের কাজে ছিলেন সেই সব ভাল ভাল ছেলেরা অধ্যাপকদের সাথে আন্দোলনে যোগদান করে ছত্র-ছন্ন হয়ে পড়ল। "যাদের জন্য কলেজে ছিলাম তারাই যখন ছত্রছন্ন হয়ে গেল, তখন আর থাকব কিসের জন্য?" তাই একদিন স্নান করতে যাবার সময় কলেজের আপিসে গিয়ে কাজের পরিত্যাগ-পত্র দিয়ে এলেন। "ভেবেছিলাম কলেজটাকে অবলম্বন

* শ্রীশ্রীমায়ের স্থূলশরীরের অদর্শনের পর পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—"মা তোমার জন্য মন্ত্র রেখে গেছেন আমার কাছে।"

করেই একটা প্রকৃত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠ্বে। সেটা যখন এইভাবে ভেঙ্গে গেল, তখন বুঝলাম যে মার ইচ্ছা নয় এ জীবনে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি।" বন্ধুদের আগ্রহে তাদের সাথে কিছুকাল গ্রামে গ্রামে চরকা ও তাঁতের কাজে ঘুরলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। নগেন্দ্রনাথ বেদান্ত সমিতির গ্রন্থাগারিকরূপে স্বামী অভেদানন্দের সাহচর্যে দুই বৎসর অবস্থান করলেন। এর পরে নগেন্দ্রনাথ কলকাতায় শ্যামবাজারে প্রায় পাঁচ বৎসর রইলেন। এ সময়েও পাঠ-আলোচনা-ধ্যান-ধারণায়, পূজা-উৎসব-সেবায় তাঁর দিন কেটেছিল বন্ধুবর্গের সাথে। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, দেশ, এই সব ছিল তাঁর নিত্য প্রসংগের বিষয়। আবার কলা, সুর, সংগীত নিয়েও আলোচনা করতেন। নিজে যদিও পারতেন না গাইতে, তথাপি সংগীত ও সুর তাঁকে গভীর আনন্দ দিত। সুযোগ মত প্রায় প্রত্যহই গান শুনতেন বন্ধুদের মুখে। কত উৎসাহ দিতেন তাদের। যদিও তিনি নিজেকে রাখ্তে চাইতেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও গোপন, তবুও তাঁর সংগে কারও কয়েক দিনের আলাপ কোন প্রকারে হলেই সে আকৃষ্ট হয়ে পড়তো তাঁর অসাধারণ চিন্তাশক্তি, ব্যক্তিত্ব ও ভালবাসার আকর্ষণে।

কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে (১৯২৮) ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের জন্য উপস্থিত হলেন নগেন্দ্রনাথ। দরিদ্র যাত্রীরা পোঁটলা-পুঁটলি হাতে করেই এসেছে স্নানে। অবগাহনের উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধা তার পোঁটলাটি দিল জলে অবস্থিত নগেন্দ্রনাথের হাতে। দেখাদেখি একের পর আর যাত্রীরা দিয়ে চল্লো তাদের পোঁটলা, মুক্তহস্তে নিশ্চিন্তে

ডুবটি দিতে। হৃদয়বান্ নগেন্দ্রনাথ কি করে নিরাশ করবেন দরিদ্রগণের নির্ভরতাপূর্ণ এই সামান্য আকূতিকে? দশ ঘন্টা কোমর জলে দাঁড়িয়ে এই দ্রব্যরক্ষার কাজ করে চললেন নগেন্দ্রনাথ নির্বিকার চিত্তে অসহায় দরিদ্র যাত্রীদের সেবায়! কলকাতায় ফিরে তাঁর অনুগত কয়েকজন সংগী ও বন্ধুর সংগে তিনি ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন। অতি নির্জন তীর্থস্থান, শিবের স্থান, বিশেষতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্বাচিত বাসস্থান ভুবনেশ্বর, বড়ই পছন্দ হল তাঁর। রাত্রিদিন অধিকাংশ কাল ধ্যান-ধারণা, পাঠ-আলোচনা ও উচ্চপ্রসংগে অতিবাহিত করে ৩।৪ ঘন্টা মাত্র তাঁর অবশিষ্ট থাকত নিদ্রার জন্য। প্রত্যেক মহাপুরুষের জন্মতিথি উপলক্ষে সেদিন থেকে আরম্ভ করে মাসাবধি চলতো তাঁর জীবনী ও বাণীর আলোচনা। সংস্পর্শে যারা আসতো তাদের চিন্তাধারা ও ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য তাঁর ছিল অক্লান্ত উদ্যম, অফুরন্ত ভালবাসা। কোন নিরাশ বা ব্যথিত হৃদয়ে একটু আশা ও আনন্দ সঞ্চার করতে পারলে তিনি স্বর্গ-সুখ অনুভব করতেন। কারও দোষের বিচার না করে শুধু তাকে ভালবেসে যাওয়া, তার গুণটাকে খুব বড় করে দেখে সেই দিক দিয়ে তার সাথে মেশা, ভালবেসে তাকে উন্নীত করা—এই ছিল তাঁর পদ্ধতি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী তাঁরই আগ্রহে নিমন্ত্রিত হয়ে যখন তাঁর বাসস্থান 'সারদাধামে' এসেছিলেন তখন নগেন্দ্রনাথ সকলকে বললেন—"সাক্ষাৎ ঠাকুরই আস্ছেন জানবে, তোমাদের যার যা আকাঙ্ক্ষা হয় সব আয়োজন করবে।" ছোট বড় সকল সন্ন্যাসীর গৈরিকের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সম্মান। কেউ এলে নিজের হাতেই পা ধোয়ার জল এনে দিতেন। এমনি করে দিন কাটছিল সারদাধামে—শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবায়। শ্রীশ্রীগোপালও আছেন প্রতিষ্ঠিত; তাঁরই নামে দেবোত্তর হল 'সারদাধাম'। সেবায়েত করলেন অপর সবাইকে, নিজে কিছুই নয়। কোন অর্থ, কোন সম্পত্তি কেউ তাঁকে দিতে পারেনি তাঁর নিজের জন্য কোন দিন। সবই ঠাকুরের, সবই গোপালের। "না খেটে খেতে নেই"—তাই তীব্র জর নিয়েও ঠাকুর-সেবার পরিশ্রম, না হয় দু'ঘণ্টা পাঠ-আলোচনা করাই চাই। উচ্চচিন্তার অগ্নি-শিখা, গভীরভাবের তীব্রতা ক্রমে বেড়েই চললো। শরীরের নিয়ম মেনে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ল। কিন্তু শরীরের ধর্ম না মানলে প্রকৃতি তার পরিশোধ নিতে ছাড়ে না। ক্রমশঃ ভেঙ্গে এলো সেই লোহার শরীর। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবাল্যের স্বপ্ন হিমালয়ের আহ্বানে ঘুরে এলেন কেদার বদরী। তারপর প্রায় দুই বৎসর বৈদ্যনাথ ধামে। অত্যন্ত আনন্দ পেলেন স্বামী জগদানন্দের সংগে। বৈদ্যনাথ-ধাম থেকে জগন্নাথধাম পুরীতে এলেন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। সমুদ্রের তীরে ছিলেন আনন্দেই—মাঝে মাঝে জগন্নাথ দর্শন, পাঠ-আলোচনা ও অসীমের ধ্যান। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ বড়ই ব্যথিত করেছিল তাঁর হৃদয়কে। এই সময়ে তিনি পূর্ববঙ্গে ছিলেন। মানুষের দুঃখে তাঁর করুণ হৃদয় অসহায় ভাবে যে যন্ত্রণা অনুভব করতো চোখে মুখে ফুটে উঠতো সেই ব্যথা। সামনে যারা এসে পড়তো আর্ত, তাদের জন্য যতখানি সম্ভব সাগ্রহে সর্বদাই সেবা করতেন। এক বৎসর পরে আবার ফিরে এলেন নিজের প্রিয় সাধনার স্থান ভুবনেশ্বরে। এই সময়ে তাঁর অধ্যয়ন ও আলোচনা ক্রমে আরো অধ্যাত্মমুখী হয়ে উঠ্লো। বলতেন—"ধ্যানে ডুবে যেতে হলে বিদ্যা ও স্মৃতি—এগুলিও অন্তরায় হয়ে ওঠে, তাই এখন প্রার্থনা করে স্মৃতি ভোলবার চেষ্টা

করছি।" অদ্ভুত ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি; যাকে একবার দেখেছেন, যা কিছু একবার পড়েছেন তা যেন আর ভুলতেনই না। সকলের ছিলেন তিনি 'দাদা'। পূর্ণত্যাগ ছিল তাঁর সাধনার ভিত্তি। কাম-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ, দেহারাম ত্যাগ। নিজেকে মুছে ফেলা, অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। ভালবাসার ভিত্তিতে পূর্ণ আত্মত্যাগ। বলতেন,—"শরীরের দিকে তাকালে কি আর জীবন (অধ্যাত্মজীবন) হয়? শরীর তো যাবেই। The flesh must be crucified so that the spirit may resurrect." "My part is only to love and serve"—এই ছিল তাঁর কথা। শরীর ক্রমশঃ ভেঙে আসতে লাগলো। আহার কমে গেল অস্বাভাবিকরূপে। কিন্তু তবু এত পরিশ্রম, এত পাঠ-আলোচনা, এত ধ্যান-ধারণা, কেউ বুঝতেই পারতো না কতটা তাঁর অসুস্থতা। ডাক্তারেরাও এসে তাঁর অধ্যাত্মপ্রসংগের প্রভাবে ভুলে যেতেন রোগীর শরীরের কথা। ঠাকুর ও মায়ের সেবা ছেড়ে নড়তে চাইতেন না সহজে। তবুও ১৩৫৯ সনে পূজার পূর্বে এক বন্ধুর বিশেষ আগ্রহে রওনা হলেন দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে। কি এক ভাবাবেগের আলোড়ন হয়ে গেল কন্যাকুমারীর দর্শনে। ফিরে এসে অন্যান্য বারের মতই পূজার উৎসাহ! বন্ধুরা অনেকেই আসে পূজার সময়ে। সুদীর্ঘ পূজা ও মন্ত্রপাঠ-অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করলেন পূজার দিনগুলি। পূজার পরে সবাই ধরল, কলকাতায় যেতে হবে চিকিৎসার জন্য। শরীরের ভাঙন দেখে সবাই শংকিত। "কন্যাকুমারীর পায়ে দিয়ে এসেছি এই দেহ ও জীবন," বললেন তিনি। "আর কোন কামনা নেই আমার, আমি যাবার (মৃত্যুর) জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।" কিন্তু একথা শুনেও বন্ধুরা ও সংগীরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তাঁর চিরযাত্রার দিন এত সন্নিকট। শরীরটা কতকটা ভাঙ্গা হলেও এমন কিছু কঠিন ব্যাধিতো হয়নি। বয়স তো মাত্র উনষাট। এখনো সিংহের মত শক্তি। তবু সবার অনুরোধে শেষে বল্লেন—"একটা সংকল্প নিয়ে আসনে বসছি। যদি যাই তো শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসবের পরে যেতে পারি।" মধ্যরাত্রি হতে সারারাত ধ্যান আরম্ভ হল এই সময়ে। কলকাতার এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—"শরীর যখন ভেঙে অন্য কাজের অযোগ্য হয়, ধ্যানই তখন একমাত্র অবলম্বন।" প্রত্যহ রাতে পাঠের সময় গভীর আধ্যাত্মিক জীবন ও তত্ত্বের আলোচনার পর বলতেন, "জীবনের প্রতি তৃষ্ণাই জ্ঞানের প্রধান অন্তরায়।" এমনি করেই কাটছিল। সহসা শরীরে প্রকাশ হল রক্তহীনতার উপসর্গ। চিকিৎসকের আদেশে এবং বন্ধুদের আগ্রহের চাপে আসতে বাধ্য হলেন কলকাতায়। সকলের আশা চিকিৎসা হলেই সুস্থ হবেন; বাহিরের কর্ম-শক্তি, সকলের সংগে সানন্দে প্রসংগ প্রভৃতি দেখে বোঝবার উপায় ছিল না। কিন্তু ডাক্তার দেখে বললেন, ভিতরের সকল যন্ত্রই প্রায় শেষ হয়ে গেছে—'too late' তবু চেষ্টা করলেন তাঁরা প্রাণপণ। আট দশ দিন হল চিকিৎসার অভিনয়। কলকাতার সব বন্ধুদের কাছে সেই একই কথা। "দেহ গেলেও আমার দুঃখ নেই, কন্যাকুমারীর পায়ে জীবন দিয়ে এসেছি।" আর করুণ-ভাবে বলেছিলেন, "বড় কষ্ট! সারা জীবন সকলের সেবা করে এসেছি, এখন আবার সেবা নিতে হচ্ছে।" একটুও আর্তনাদ করেন নি নিজের জন্য রোগের যন্ত্রণা সত্ত্বেও। ১লা পৌষ (১৩৫৯) অমাবস্যা। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থা সত্ত্বেও 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ, হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' নিজেই উচ্চারণ করতে লাগ্লেন। অনিমেষ নয়নে দেখ্তে লাগ্লেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের মূর্তি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সাথে সাথে অদ্ভুত স্পন্দন দেখা দিল ভ্রূদ্বয়ে ও ভ্রূমধ্যে। অবিশ্রাম নামধ্বনি চলেছে সকলের মুখে 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ।' খেলায় ক্লান্ত সন্তান চল্লেন দিব্যধামে—মায়ের কোলে। স্মরণ হল গীতার বাণী—

"প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
　　ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
　　স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

জান কি ?

শ্রীমতী কল্যাণী সেন

তোমারি ঐ নিঃসীম নীল-নয়নে
আঁখি দুটি মোর পথ হারাল যে কেমনে ?
বিশ্ব-হৃদয় ! তোমার হৃদয়-গভীরে
পরাণ আমার ডুবিতে যে চায় অধীরে ?
সুদূর তোমার সুমধুর হাসি-আলোকে
আকাশে যত না আঁধার টুটিল পলকে ?

শান্ত শীতল অতল অমিয়-সিন্ধু
ক্লান্ত তৃষিত চাহি তারি এক বিন্দু।
চেতন ! তোমার নিবিড় আলিঙ্গনেতে
জড়তা-মুক্ত আমি চাই মোরে চিনিতে।
যতেক কর্ম রহিবে তোমারে ঘেরিয়া
তারি মাঝে মোর নবীন প্রকাশ বরিয়া।

গানে গানে আর প্রাণের আকুল ছন্দে
ভরিবে নিখিল প্রেম-ফুল-মধু-গন্ধে ?

সমালোচনা

পুরাণ-মংগল (সাধারণ খণ্ড—প্রথম ভাগ)—শ্রীসাহাজী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীভবন, রাসমণিডেঙা, নবদ্বীপ; পৃষ্ঠা—১৪০; মূল্য ৩৲ টাকা।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির বহুতর পরিচয় পুরাণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে—কিন্তু ঐ পরিচয়ের ঐতিহাসিক মূল্য অনেকে দিতে চান না। ইহার পক্ষে একটি প্রধান বাধা পুরাণে কথিত কালের দুর্বোধ্যতা।

সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসরের অনুশীলন ও গবেষণার ফলস্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থটিতে পুরাণে বর্ণিত কালের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারতের ঐতিহ্যের অনুরাগিগণকে লেখকের উপস্থাপিত তথ্য ও যুক্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

মহিষ-মর্দিনী—শ্রীসাহাজী প্রণীত। পৃষ্ঠা—২৮; মূল্য—॥০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে দেবী মহিষ-মর্দিনী সম্বন্ধে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। লেখকের সিদ্ধান্ত :—মহিষ চারিজন; ১ম মহিষ মন্দর পর্বতে, ২য় মহিষ ক্ষীরোদ (দক্ষিণ) সাগরের উত্তর তীরে, ৩য় মহিষ অরুণাচলে এবং ৪র্থ মহিষ বিন্ধ্যপর্বতে দেবী কর্তৃক বিনষ্ট হয়। দেবীও চারিজন : উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী, দুর্গা এবং কাত্যায়নী। লেখক নানা পুরাণ হইতে প্রমাণ আহৃত করিয়াছেন।

উপনিষদের উক্তি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ কর্তৃক সংকলিত; প্রকাশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, পৃষ্ঠা—৩৮+।৶০; মূল্য—দশ আনা।

ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে বাছিয়া কতকগুলি শ্লোক ও উক্তির অন্বয় এবং অনুবাদ সহ সংকলন। পরিশেষে বিভিন্ন উপনিষদের আটটি আখ্যানও দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে উপনিষদের ভাবধারা প্রচারে গ্রন্থকারের এই উদ্যমকে সমাদর করি।

শ্রীমদ্ভাগবত (সংক্ষিপ্ত আখ্যান ভাগ)—লেখক : শ্রীগুণদাচরণ সেন; প্রকাশক : প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২ ; পৃষ্ঠা—৩৫৯+৩২ ; মূল্য—৫৲ টাকা। এই পুস্তকটিতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের সকল স্কন্দ হইতে আখ্যান অংশগুলি বাছিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে পর পর সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে অনুবাদ সহ প্রদত্ত মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি গ্রন্থের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। ধর্মপিপাসু সাধারণ পাঠকপাঠিকাগণ বইটি পড়িয়া উপকৃত এবং আনন্দিত হইবেন। বাংলা ভাগবত-সাহিত্যে এই পুস্তকের উপযুক্ত সমাদর কামনা করি। ইহা যখন অনুবাদ গ্রন্থ নয় তখন ভাষা আর একটু সরল ও স্বাধীন হইলে বোধ হয় ভাল হইত।

সামবেদীয় সন্ধ্যা বিধি—শ্রীশ্রীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ঘটক সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান : ৯১নং সি কোয়ার্টার, পোঃ হিনু, রাঁচি। পৃষ্ঠা : ৩৪ ; মূল্য ।০ আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে সন্ধ্যা-আহ্নিকের নিয়ম, ক্রম এবং অন্বয়মুখী অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ মন্ত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে। ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল এবং মৌলিকতাপূর্ণ। বহু মুদ্রন-প্রমাদ চক্ষুকে পীড়িত করে, অবশ্য বইএর শেষে শুদ্ধিপত্র দেওয়া আছে।

শ্রীম-কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)—স্বামী জগন্নাথানন্দ সংকলিত। প্রকাশক : শ্রীঅনিল কুমার গুপ্ত, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা—৬। ২৭৫ পৃষ্ঠা ; মূল্য আড়াই টাকা।

'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-কার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা 'শ্রীম'র সহিত নানা ধর্মপ্রসঙ্গের বিবরণ ভক্তগণের (১৯২৪-১৯২৯) সালের দিনপঞ্জী হইতে সংকলিত হইয়া বর্তমান গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। প্রসঙ্গগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু উক্তির প্রাণবন্ত বিবৃতি মিলে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন 'শ্রীম'র কাছে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থেরই মনোজ্ঞ ব্যাখ্যান শুনিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগিগণের নিকট পুস্তকখানি ভাল লাগিবে, সন্দেহ নাই। অনেক ছাপার ভুল চোখে পড়িল। কোন কোন দিনের আলোচনার মধ্যে 'শ্রীম'-ব্যতিরিক্ত অপর কয়েকজন ব্যক্তির কথাবার্তা ও বর্ণনা গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতই অবান্তর মনে হইল।

জনগণের উপনিষৎ—অনুবাদক : শ্রীযোগেশ চন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ, বি-টি, বি-ই-এস্‌ (অবসরপ্রাপ্ত), গোবাবাজার, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) পৃষ্ঠা ৯২ ; মূল্য এক টাকা মাত্র।

ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক—এই চারিটি উপনিষদের পদ্যানুবাদ। 'উপনিষদের যৎকিঞ্চিৎ' নামে প্রাবন্ধিক একটি পরিচিতি অধ্যায় এবং প্রত্যেক উপনিষদের পূর্বে উহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মাঝে মাঝে পাদটীকায় কঠিন শব্দ ও বিষয়ের সরল বিবৃতি দেওয়া আছে। অনুবাদে মূল সংস্কৃতের ভাব ও তাৎপর্য সুপরিস্ফুট, তবে কবিতার শব্দবিন্যাস ও লালিত্য সর্বত্র সুষ্ঠু নয়।

নির্ঝর সঙ্গীত—প্রোজ্জ্বল নীহার ভারতী-প্রণীত। প্রকাশক : শ্রীগৌর চন্দ্র চক্রবর্তী, ৩।১ এম্‌ ছিদাম মুদী লেন, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা—৯৬ ; মূল্য—বার আনা।

বিভিন্ন বিষয়বস্তু-অবলম্বনে লেখা ছোট বড় ৩৭টি কবিতা বইটিতে স্থান পাইয়াছে। কোন কোন কবিতায় উচ্চ ভাবাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় পুস্তকের 'পরিচায়িকা'য় লিখিয়াছেন,—"লেখকের ভাষা স্বচ্ছ, সরল, ছন্দোরচনা প্রায় নিখুঁত, প্রাণের গভীর অনুভূতি কবিতাগুলির রচনায় লেখককে প্রেরণা দিয়েছে। * * আমি সানন্দে এই নবীন কবিকে সাহিত্যসমাজে বরণ করছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দুর্ভিক্ষসেবা—বোম্বাই রাজ্যের আহমদনগর জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে মিশন সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন এই সংবাদ আমরা গতমাসে দিয়াছিলাম। আহমদনগর সদর, শ্রীগোণ্ডা, রশিন্ (কার্জাট্ তালুক) এবং জামগাঁও (পর্ণার তালুক)—এই চারিস্থানের খাদ্যবিতরণকেন্দ্রে প্রত্যহ এক হাজার নরনারীর দুই বেলা ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ১১টি গ্রামের ১১৩টি দুঃস্থ মধ্যবিত্ত পরিবার ১লা মে হইতে অরন্ধিত খাদ্য-শস্য সাহায্য পাইতেছেন। প্রত্যেক কেন্দ্রেই সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। দুঃস্থ লোকের পরিধেয় বস্ত্রাদিরও একান্ত অভাব লক্ষিত হইতেছে। সুষ্ঠুভাবে এই সেবাকার্য চালাইবার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট মিশনের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৌরব ও প্রসার—এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় বেলুড় বিদ্যামন্দির, কলিকাতার গড়পারে অবস্থিত বিদ্যার্থি-আশ্রম ও পাথুরিয়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম—মিশনের এই তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণের ফল প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও অতি সুন্দর হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানত্রয়ের ছাত্রগণের পাশের হার যথাক্রমে শতকরা ৮৫%, ১০০% এবং ১০০%। আই-এস্ সি তে তৃতীয় ও দশম এবং আই-এ তে চতুর্থ স্থান যথাক্রমে অধিকার করিয়াছে বিদ্যামন্দিরের একটি এবং বিদ্যার্থি আশ্রমের দুই-জন ছাত্র। আশ্রমজীবনের সদাচার, সুনীতি ও স্বাবলম্বন-মূলক শিক্ষার জন্য সময় ও মনোযোগ দিয়াও বিদ্যার্থিগণ যে লেখাপড়াতেও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিতেছে ইহা আশ্রমগুলির শিক্ষণরীতির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে।

কিছুদিন পূর্বে ডক্টর শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সভাপতি ডাঃ চট্টোপাধ্যায় এক মনোজ্ঞ ভাষণে দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ছাত্রগণকে স্বামিজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান জানান। প্রত্যেক যুবককেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী পাঠ করিতে বলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় ছাত্র-জীবনের পাঠ-পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে আত্মোৎকর্ষের প্রধান সহায়করূপে বিবেকানন্দ সাহিত্য তাঁহারা বাল্যকালে পাঠ করিতেন।

বিদ্যামন্দিরের মুদ্রিত সচিত্র বার্ষিক পত্রিকা (ডবল ক্রাউন আটপেজী ১৫৪ পৃষ্ঠা) গ্রীষ্মের ছুটির প্রাক্কালে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান ছাত্রগণ ব্যতীত কয়েকজন প্রাক্তন বিদ্যার্থীরও রচনা আছে। প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পগুলিতে তরুণ লেখকগণের মনন, কল্পনা এবং রচনাশৈলী সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কলেজের সেক্রেটারী স্বামী বিমুক্তানন্দের 'সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' এবং অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দের 'সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দের যোগদৃষ্টি' ইংরেজী প্রবন্ধদ্বয় মূল্যবান চিন্তা-সমৃদ্ধ।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রভূত অর্থানুকুল্যে পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমের অব্যবহিত উত্তর পার্শ্ববর্তী পাঁচতলা বাড়ীটি মিশন ঐ আশ্রমের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়াছেন।

আশ্রমের ছাত্র ও কর্মিগণ কর্তৃক পরিচালিত বিবেকানন্দ নৈশবিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক উৎসব গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সাড়ম্বরে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কুটিরশিল্প ও চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন ও জনসভায় পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু।

কলিকাতা রমেশ দত্ত ষ্ট্রীটের সন্নিকটস্থ রামবাগান বস্তীতে এই বিবেকানন্দ নৈশবিদ্যালয়। প্রায় ১ বৎসর আগে ১৯৫২ সালের ২১শে মে কয়েকজন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে পাথুরিয়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রের উদ্যোগে ইহার কাজ সুরু হয়। বিদ্যালয়টি প্রথমতঃ বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয়। কিন্তু পরে বিদ্যালয়ের একটি শিশুবিভাগ খোলা হয়,—উদ্দেশ্য, বস্তীর স্থায়ী কল্যাণের জন্য বস্তীর শিশুদের প্রথম হইতে গড়িয়া তোলা। বর্তমানে বিদ্যালয়ের বয়স্ক বিভাগের ছাত্রসংখ্যা ৫০, শিশুবিভাগে ৩৬। বিদ্যালয়ের এই শিক্ষা-বিভাগ ছাড়াও, একটি Cottage industry development বা কুটিরশিল্প-উন্নয়ন বিভাগ খোলা হইয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার ও কারু এবং চিত্রশিল্প-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের মনোজ্ঞ ভাষণে অনুন্নত ও অশিক্ষিত জনগণের প্রতি শিক্ষিতদের নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে সকলকে সচেতন হইতে বলেন।

গত ১লা চৈত্র ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার শ্রী কে, রমন, মহোদয়ের পৌরোহিত্যে দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সুসজ্জিত সভামণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামিজী, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য এবং মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এবং শ্রীজহরলাল নেহরু প্রভৃতির প্রতিকৃতি সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। শ্রী তুষারকান্তি ঘোষ বিদ্যাপীঠের আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাপ্রদান-রীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভাপতির অভিভাষণে শ্রী রমন বলেন—বিদ্যাপীঠের ন্যায় আবাসিক বিদ্যালয়ের আজ দেশে প্রয়োজন, যেখানে ছাত্রগণ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও নৈতিক আদর্শের মধ্যে চরিত্রগঠন করিবার সুযোগ লাভ করে।

উৎসব সংবাদ—গত ৫ঠা এবং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বেলুড়মঠে যথাক্রমে আচার্য শঙ্কর এবং ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পাঠ এবং আলোচনা পরিচালনা করেন স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী সৎস্বরূপানন্দ। রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে শহরের দুইস্থানে (হিন্দুক্লাব ও গভর্ণমেণ্ট কলেজ) বুদ্ধ-জয়ন্তী পরিপালিত হইয়াছিল। বক্তা ছিলেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দ, অধ্যাপক বিনয় কুমার সেন, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর অমরনাথ ঝা, অধ্যাপক শ্রীনওলকিশোর গৌড়, অধ্যাপক শ্রীঅবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভিক্ষু জগদীশ কশ্যপ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যান্য অনেকগুলি শাখাকেন্দ্রেও ঐ উৎসব-দ্বয় উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৮শে চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত ৪দিবস ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আহূত কয়েকটি জনসভায় বেলুড়মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। প্রতিদিন রাত্রে বর্ধমানের চণ্ডীর কীর্তন এবং সকালে ব্রহ্মচারী ভোলানাথ বাবাজী-পরিচালিত নামকীর্তন ও পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়।

কাঁথি কেন্দ্রের দুই দিন ব্যাপী (৫ই ও ৬ই বৈশাখ) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জয়ন্তীর প্রথম দিবস স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী বীতশোকানন্দ স্বামীজির জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন বিশেষ পূজা, হোম পাঠ ও প্রায় দুই সহস্র নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্তের শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উভয় দিন সন্ধ্যায়ই কলিকাতার সুরশিল্পী শ্রীসুধীর চন্দ্র ঘোষ দস্তিদারের গীত এবং শ্রীমনোরঞ্জন সরকারের হাস্যকৌতুক শ্রোতৃবর্গকে প্রচুর আনন্দ দান করে।

মনসাদ্বীপ (সাগর দ্বীপ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ২০শে চৈত্র আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে যুগাবতারের আবির্ভাব উৎসব স্বামী নিরাময়ানন্দের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজা-হোম-শাস্ত্রপাঠ-ভজন এবং জনসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসূচি ব্যতীত আড়াই সহস্রাধিক নরনারীকে প্রসাদ বিতরণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৈশ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণ 'বাঙ্গালী' নামক নাটক নৈপুণ্যের সহিত অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করেন।

শিলচর শাখাকেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে ৭ই চৈত্র, মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। করিমগঞ্জ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীকুশীমোহন দাস, শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য, শ্রীকরুণা রঞ্জন ভট্টাচার্য মনোজ্ঞ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। ৮ই চৈত্র পূজার্চনা ভোগরাগাদি ও পদাবলী কীর্তন হয়। প্রায় ৯ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে জয়রামবাটীতে "শ্রীশ্রীমাতৃ মন্দির" প্রতিষ্ঠার একত্রিংশ বার্ষিকী সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ বৎসরও বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র হইতে অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং নানাস্থানের বহু ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন।

পাকিস্তান কেন্দ্রসমূহে অনুষ্ঠান—গত ২০শে চৈত্র বাগেরহাট (খুলনা) আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। অপরাহ্নে আহূত জনসভায় কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

ময়মনসিংহ আশ্রমে উৎসব উৎযাপিত হইয়াছে গত ১২ই এবং ১৩ই চৈত্র। প্রথম দিন অপরাহ্নে বেলুড় মঠের স্বামী রামেশ্বরানন্দের পৌরোহিত্যে জনসভায় অধ্যাপক শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত, শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দে, স্বামী সত্যকামানন্দ এবং স্বামী শর্মানন্দ ভাষণ দেন। পরদিন সারা-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানসমূহের ক্রম ছিল শাস্ত্রাবৃত্তি, রামনাম কীর্তন, বিশেষ পূজা হোমাদি, তুলসীদাসী-রামায়ণপাঠ, এবং প্রায় সাত হাজার নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ।

গত ১৫ই হইতে ২০শে চৈত্র পর্যন্ত দিনাজপুর আশ্রমে ছয়দিন ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব শামসুদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভায় রেভাঃ পি, আর, গ্রীণ "খ্রীষ্ট ধর্ম," অধ্যাপক হাসমতুল্লা সাহেব "ইস্‌লাম ধর্ম", খানবাহাদুর আমিনুল হক্ "ধর্মে সর্বজনীনতা", অধ্যাপক সুশীলচন্দ্র শাশনবীশ 'বৌদ্ধধর্ম', ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সত্যকামানন্দ "বেদান্ত", এবং দিনাজপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অচিন্ত্যানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্ম সমন্বয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৬ই চৈত্র হইতে ১৯শে চৈত্র পর্যন্ত ভাগবত পাঠ, ঢাকার নিত্যানন্দ দাসের কীর্তন ও রামায়ণগান এবং "মহাতাপস" নাটকের অভিনয় হয়।

মেদিনীপুরের পল্লী-অঞ্চলে প্রচার—স্বামী আদিনাথানন্দ গত ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হইতে চৈত্র মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত মেদিনীপুরের তমলুক, চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত কতিপয় পল্লীতে গ্রামবাসী এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট প্রাঞ্জল ভাষণের মাধ্যমে শিক্ষা এবং শ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোকে ধর্মের সর্বজনীন আদর্শ বিষয়ে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

স্বামী মঙ্গলানন্দের দেহত্যাগ—গত ২৮শে বৈশাখ, স্বামী মঙ্গলানন্দ ৫৭ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণমঠে শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড়মঠে যোগদান এবং তিন বৎসর পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মঠ ও মিশনের নানা কেন্দ্রে তিনি আর্তসেবা, শিক্ষাদান এবং ধর্মপ্রচারকার্যে ব্রতী ছিলেন। কিছুদিন উদ্বোধন-কার্যালয়েও কর্মীরূপে কাটাইয়াছিলেন। এই নিরভিমান তপোনিষ্ঠ সেবাব্রতী সন্ন্যাসীর বিদেহ আত্মা আত্যন্তিক শান্তি লাভ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

বুদ্ধগয়া মন্দিরের নূতন ব্যবস্থা—গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বুদ্ধ-পূর্ণিমা দিবসে বুদ্ধগয়া মন্দিরের পরিচালনভার হিন্দু ও বৌদ্ধদেব একটি যুক্ত কমিটির হস্তে ন্যস্ত হয়। বিহারের রাজ্যপাল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রায় এক লক্ষ নরনারী এই উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ প্রতিনিধিবর্গও অনুষ্ঠানে যোগ এবং মনোজ্ঞ ভাষণ দান করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় নৃত্যকলা প্রচার—সম্প্রতি বোর্ণমাউথ (হাম্পায়ার) লিটেরারী লাঞ্চন ক্লাবের এক সম্মেলনে ভারতীয় নট রাম গোপাল বলেন যে প্রাচী ও প্রতীচ্যের মধ্যে বোঝাপড়ার ভাব জাগ্রত করার কাজে নৃত্যকলা যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে শিল্পের মধ্য দিয়াই প্রাচী ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভব হইতে পারে।

ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া রাম গোপাল বলেন যে ৪,০০০ বৎসর ধরিয়া নৃত্য জনগণের জীবনের এক অপরিহার্য অংশ হইয়া আছে। ইহা হইতেছে তাহাদের জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় প্রকাশের মাধ্যম। তিনি এই প্রসঙ্গে ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে ব্যবহৃত ৫,০০০ মুদ্রার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই মুদ্রার সাহায্যে জীবনের যে কোন দিকের যে কোন অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা সম্ভব।

তিনি সর্বশেষে ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল নৃত্যের সহিত পশ্চিমী নৃত্য-পদ্ধতির তুলনা করেন। (বৃটীশ ইনফরমেশন সার্ভিস্)

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-বার্ষিকী—বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে ২৯শে চৈত্র জেলাশাসক শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' লেখক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত, বেলুড় মঠের স্বামী বোধাত্মানন্দ ও চারণ কবি শ্রীবিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনবেদ আলোচনা করেন। ৩০শে চৈত্র স্বামী বোধাত্মানন্দের সভাপতিত্বে সু-সাহিত্যিক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় স্বামিজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

খড়্গপুর শহরের অধিবাসিবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থানীয় দুর্গামন্দিরে ২৭শে চৈত্র হইতে চারিদিন ব্যাপিয়া বিপুল আনন্দসহকারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টাদশাধিক শততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন, ঊষাকীর্তন, পূজা, পাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, আরতি, ভজন, প্রভৃতি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। দুই দিন জনসভায় বেলুড় মঠের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' এর সহ-সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানায় ৮ই বৈশাখ, শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী সুসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পল্লীর পথে পথে ঊষাকীর্তন ও পুষ্প-পত্রশোভিত মণ্ডপে পূজা-হোম এবং গীতা ও চণ্ডীপাঠ পল্লীবাসীর প্রাণে প্রভূত আধ্যাত্মিক প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাণ্ডার সভাপতিত্বে তিন সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের তিন জন সন্ন্যাসী (স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী বীতশোকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দেন।

২৪ পরগণা জেলার নূতনপুকুর (পোঃ—

পাথর ঘাটা) গ্রামে ২০শে চৈত্র অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবে বেলুড় মঠের স্বামী সাধনানন্দ ও স্বামী শান্তিনাথানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার নোতুক গ্রামে 'বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে' ১৫ই চৈত্র স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে ঘাটাল মহকুমা-পালক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে স্বামী আদিনাথানন্দ স্বামিজীর শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। উক্ত জেলার আরিট ও গেপুত গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী পালিত হয় ১২ই হইতে ১৪ই বৈশাখ। বক্তা ছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপেশ্বর রায়।

জিয়াগঞ্জে (মুর্শিদাবাদ) স্থানীয় ভক্তগণ ২২শে ও ২৩শে চৈত্র উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রা, পূজা পাঠ কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় শ্রীপৎসিং কলেজের অধ্যক্ষের পৌরোহিত্যে জনসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীকালিপদ দে ভৌমিক, স্বামী বীতশোকানন্দ (বেলুড় মঠের) এবং পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণ তর্কতীর্থ।

চুঁচুড়ায় 'প্রবুদ্ধভারত সংঘ' ও 'স্বরাজ সংঘ' এর উদ্যোগে ১৩ই বৈশাখ মল্লিক কাশেম হাটের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পৌর্বাহ্নিক কর্মসূচি ছিল পূজা-পাঠ-কীর্তনাদি। অপরাহ্নে একটি মহতী সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণানন্দ (বেলুড় মঠ) এবং প্রধান অতিথি হন মিঃ, এস্ কে হালদার আই-সি-এস্, (হুগলী জেলাশাসক)। শ্রীযুক্ত অমরনাথ নন্দী (সহকারী সম্পাদক, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড) এবং অধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র মজুমদার (বিজয়মোহন মহাবিদ্যালয়, ইটাচুণা, হুগলী) বক্তৃতা করেন।

গত ২৭শে বৈশাখ কলিকাতা বহুবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-সমিতিভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নের ধর্মালোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন বেলুড় মঠের স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ ভাবব্যঞ্জক বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও বাণী সুললিত ভাষায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন নির্লেপ ত্যাগাদর্শের মূর্তিমান বিগ্রহ। ঠাকুরের জীবনে কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের যে বহ্নিমান্ আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে তাহার সাধ্যানুসারে অনুধ্যান ও অনুশীলনই আধুনিক প্রত্যেক নর-নারীর শ্রেয়স্কর কর্তব্য। সভাপতি মহারাজ বলেন, অবতার একাধারে ভগবান ও মানুষ, নর ও নারায়ণ, জীব ও শিব। অবতারলীলায় অসীম ভগবান সসীম জীবদেহের মধ্যে ধরা দেন জীবকল্যাণের জন্য। মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত, দুর্নীতি ও অধর্মের দূরীকরণ এবং নীতি ও ধর্মের সংস্থাপনার জন্যই পূর্ণকাম ভগবানের নরদেহগ্রহণ।

পরলোকে প্রাচীন ভক্তদ্বয়—শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীকুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায় ৬৩ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে গত ১১ই বৈশাখ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী ছিল ফরিদপুর জেলায়। দীর্ঘকাল শিক্ষাব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া গত ১৫ বৎসর যাবত তিনি ৺বারাণসীধামে সাধুসঙ্গ ও ধর্মচর্চা লইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সরল, অমায়িক ও সপ্রেম ব্যবহার এবং ভগবন্নিষ্ঠা বহুজনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিত। প্রথম জীবনে কিছুকাল তিনি বেলুড়মঠে ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯১১ সালে কোঠারে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করেন। তাঁহার কর্মস্থল ছিল রাঁচি। স্থানীয় বহু জনহিতকর কাজের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিহার সরকারের সহকারী একাউণ্টস্ অফিসারের কাজ হইতে ১৯৪৫ সালে অবসর গ্রহণ করিবার পর অধিকাংশ সময় শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে কাটাইতেন। গত ৬ই বৈশাখ রাঁচিতে তাঁহার দেহাবসান ঘটিয়াছে। যতীন বাবু খুলনার লোক ছিলেন। রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতেন। তাঁহার উদার দৃঢ় চরিত্র বিশেষ লক্ষ্যণীয় ছিল।

শ্রীভগবানের অভয় পাদপদ্মে এই প্রাচীন ভক্তদ্বয়ের আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

বন্ধন ও মুক্তি

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্ণাতি কিঞ্চিদ্ হৃষ্যতি কুপ্যতি॥
তদা মুক্তির্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥
তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তমসক্তং সর্বদৃষ্টিষু॥
যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিৎ মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা॥

(অষ্টাবক্র সংহিতা, ৮।১-৪)

তখনই বন্ধন, যখন চিত্ত কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, আবার উহা না মিটিলে শোকাকুল হয়—মনের মতো নয় বলিয়া কোন কিছু পরিহার করে অথবা রমণীয় বলিয়া কোন কিছু আঁকড়াইয়া ধরে—কোন কিছু পাইয়া উল্লাসে মাতিয়া উঠে, কিংবা কোন কিছু দেখিয়া ক্রোধে নিজকে হারাইয়া ফেলে। (ইচ্ছা-শোক, ত্যাগ-গ্রহণ, হর্ষ-কোপ—এ সকলই অজ্ঞানের অভিব্যক্তি।)

তখনই মুক্তি, যখন চিত্ত কোন কিছুই চায় না, কোন কিছুরই জন্য (করায়ত্ত হইল না বলিয়া) পরিতাপ করেনা—কোন কিছু বিরূপ বলিয়া বর্জন অথবা মনোরম বলিয়া গ্রহণ করিতে যায় না—কোন কিছুতেই হৃষ্ট বা কুপিত হয় না। (তত্ত্বজ্ঞানে যে চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়াছে উহা সর্বদাই, সকল অবস্থাতেই সাম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে।)

তখনই বন্ধন, যখন চিত্ত কোন কিছু ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আসক্ত হয়—আর মুক্তি তখনই, যখন চিত্ত সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-বিষয়ে নিজকে নির্লিপ্ত রাখিতে পারে। (বিষয়ের জ্ঞান হইবে না বা বিষয় সম্মুখে থাকিবেনা এমন নয়—কিন্তু বিষয়ের প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি যেন না থাকে।)

যখন 'আমি-আমি' নাই তখনই মোক্ষ; যতক্ষণ 'আমি-আমি' ততক্ষণই বন্ধন। এই নিগূঢ় রহস্য জানিয়া সহজভাবে আসক্তি বা বিরাগ এই দুয়েরই পারে চলিয়া যাও। (কোন কিছুকে ভাল লাগা বা না লাগা—দুইই ঘটে ক্ষুদ্র 'অহং' এর কুহকে।)

কথাপ্রসঙ্গে

দেবত্ব বনাম মনুষ্যত্ব

ধর্মের আঙিনায় আসিয়া আমরা অহরহ শুনি 'দেবত্বে'র কথা, কিন্তু দেবত্ব জিনিসটা কি তাহা আমরা অনেক সময়ে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করি না, আমাদের জীবনের দিব্য-সত্তা কোথায় দাঁড়াইয়া আছে তাহা তলাইয়া দেখিবার সুযোগ হয় না; আমরা চাই লাফ দিয়া গাছে চড়িতে—পরিশ্রম না করিয়া, মূল্য না দিয়া বহুপ্রযত্ন-লভ্য অমূল্যকে হাতে পাইতে। কিন্তু তাহা তো হইবার নয়। তাই দেবত্ব তো আমরা লাভ করিই না, যেটুকু বরং অপেক্ষাকৃত সহজে পাইতে পারিতাম—খাঁটি মনুষ্যত্ব—পাইয়া নিজের দিক দিয়া এবং সমাজের দিক দিয়া প্রচুর লাভবান হইতাম, তাহাও খোয়াইয়া বসিয়া যাই 'অসুর'—ভোগোন্মত্ত, জড়-দৃষ্টি, স্বার্থপর নরপশু-বিশেষ। তবুও হয়তো আমরা মনে মনে ভাবি আমরা ধার্মিক, আমরা দেবতার পূজা করিয়াছি, দান-ধ্যান-তীর্থবাস-ব্রত-উপবাস-পুরশ্চরণ করিয়াছি, সংকীর্তনে নাচিয়াছি—আমরা ভগবানের প্রিয়জন, দেবলোকে আমাদের স্থান সুনির্দিষ্ট আছে! ভগবান অলক্ষ্যে হাসেন আমাদের শোচনীয় আত্মপ্রবঞ্চনা দেখিয়া।

দেবত্ব মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি বিপুল পরিবর্তন—একটি স্বচ্ছ সর্বপ্রসারী জ্ঞানময় সত্যে উহার সুস্থির প্রতিষ্ঠা। এই পরিবর্তনে আর কিছু হউক না হউক, যে অন্ধ ভোগবাসনা ও ক্ষুদ্র স্বার্থসংঘাত মানুষকে সতত ছুটাইয়া মারে, একটুও বিশ্রাম দেয় না—উহাদের যে সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবত্বের বিকাশে অদ্ভুত প্রশান্তি, অপূর্ব হৃদয়-প্রসার মানুষের প্রতিটি আচরণে ফুটিয়া উঠে। যে সত্যের সহিত তাহার নিবিড় সংস্পর্শ ঘটে উহার যেন কোন সীমা নাই—সমগ্র মানুষ, জীবজন্তু এমন কি অচেতন পদার্থনিচয়কেও যেন উহা আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কোন কিছুই তখন আর দূর নয়। সারা বিশ্বসংসার যেন সরিয়া সরিয়া অতি নিকটে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—গলিয়া গলিয়া নিজের রক্তপ্রবাহের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই অতি-গহন একত্বে ক্ষয়-বৃদ্ধি জন্ম-মৃত্যু যেন অর্থহীন। এই সত্য যেন অজর, অমর, অভয়, বিশোক।

মানব-সত্তার এই বিশাল রূপান্তর, এই ভূমা সত্যে নিজেকে আবিষ্কার—ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানো নিশ্চিতই সহজ নয় এবং সহজ নয় বলিয়াই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ লক্ষ্যকে নামাইয়া আনিবারও আমাদের কোন অধিকার নাই। বেশী স্বার্থত্যাগ না করিয়া, ক্লেশ না সহিয়া যাহা হউক একটা কিছু করতলগত করিয়া উহারই গায়ে দেবত্বের মার্কা মারিয়া দিয়া আমরা লোক ঠকাইতে পারি কিন্তু ভগবানের চোখে ধুলা দিতে পারি না। আচার্য শঙ্কর 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

> অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বাখিলভূশ্রিয়ম্।
> রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্হতি ॥
>
> (৬৪ নং শ্লোক)

শত্রুসংহার না করিয়া, ভূসম্পত্তিনিচয়ের অধিকারী না হইয়া শুধু 'আমি রাজা' এই শব্দমাত্র

আওড়াইয়া কেহ কখনও রাজা হইতে পারে না।

অতএব 'দেবত্ব' বিষয়টির প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া এবং উহাতে ভয় না পাইয়া শনৈঃ শনৈঃ উহার অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়স্কর পন্থা। 'দেবত্ব'-লাভের প্রথম সোপান 'মনুষ্যত্বের' বিকাশ সাধন। ইহারই নাম 'ধর্ম'। দুঃখের বিষয় আমরা বেদ-উপনিষদ্-স্মৃতি-পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত ধর্মের মূল তাৎপর্য এখন ভুলিতে বসিয়াছি এবং শুধু জপ-তপ-পূজাদিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছি। আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম বলিতে মানুষের জীবনের সংধারক সেই সামগ্রিক শক্তি বুঝায় যাহা মানুষের অন্তর্নিহিত কল্যাণকর ক্ষমতানিচয়কে বিকশিত এবং পরিপুষ্ট করে—মানুষকে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির কল্যাণে যথাযথ গড়িয়া তুলে। ধর্মের দৃষ্টি শুধু আকাশে নয়—বরং প্রধানত এই মাটির পৃথিবীতেই। ধর্ম জীবনকে উড়াইয়া দেয় না—উহাকে মানিয়া, সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া পরে উহারই অবলম্বনে উহার অতীত সত্যের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে। তখনই দেবত্ব, তাহার পূর্বে নয়।

মনু বলিতেছেন—

> ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥
>
> (মনুসংহিতা, ৬।৯২)

সন্তোষ, ক্ষমা, চিত্তস্থৈর্য, অন্যায়পূর্বক পরধন গ্রহণ না করা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, বুদ্ধির নির্মলতা, আত্মবিবেক, সত্য, অক্রোধ—এই দশটি হইতেছে ধর্মের লক্ষণ।

কই, এখানে জপতপ, ব্রত-উপবাস, স্নান, তীর্থভ্রমণের কথা তো বলিলেন না? অতএব বুঝিতে হইবে মনুষ্যত্ব-সৌধের বনিয়াদ ওগুলিতে নয়—মনুষ্যত্বের উপরোক্ত চারিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলিতেই। উহাদের অর্জন করিতে হয় মাটির দুনিয়ায় বসিয়াই—দেবলোকে তাকাইয়া নয়। আর দশলক্ষণলক্ষিত উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি যদি কেহ আয়ত্ত করিতে পারে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরিবারে ও সমাজে কতটা কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে তাহা সহজেই অনুমেয়। সে কি চতুষ্পার্শ্বের আর্ত-পীড়িত-অসহায় নরনারীর দুঃখকষ্ট দেখিয়া গৃহকোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? অপর দশজনের স্বার্থকে পদদলিত করিয়া নিজের বিত্তবিভব-পারিবারিক-স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধিতে মত্ত হইতে পারে? অন্যায়-অসদুপায়ে সঞ্চিত পুঁজিতে মোটর হাঁকাইতে, পাঁচতলা ইমারত খাড়া করিতে পারে? তাহার আচার-বৃত্ত-ব্যাপৃতি দ্বারা সমাজে আসে শান্তি, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য। তাহার সংস্পর্শে মানুষ পায় শক্তি, সাহস, আত্মপ্রত্যয়।

যথার্থ মনুষ্যত্ব-যুক্ত এই রূপ মানুষ চাই দলে দলে। ইহাই ধর্মের লক্ষ্য—মানুষ তৈরী। চারি প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম প্রথম পুরুষার্থ। ইহা সকল মানুষের জন্যই প্রয়োজন। কেননা সকল মানুষকেই গোড়ায় প্রকৃত মানুষ হইতে হইবে। পক্ষান্তরে মোক্ষ কিন্তু সকল মানুষের জন্য নয়। ধার্মিক—অর্থাৎ যথার্থ মানুষ না হইলে কেহ মোক্ষের অধিকারী হয় না। মনুষ্যত্বের ধাপ ডিঙাইয়া গিয়া কেহ দেবত্বলাভ করিতে পারে না—করিবার চেষ্টা করিলে উল্টা ফল হয়।

দেবত্ব লাভ করিতে গেলে মনুষ্যত্বের উপর ভাল করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তবেই আমরা সতেজ-সংযত ইন্দ্রিয়গ্রাম, চিত্তের শুচিতা, চিন্তা ও আচরণের সত্যতা লইয়া জগৎ ও জীবনের উচ্চতর সত্যে ধীরে ধীরে পৌঁছিতে পারিব। তখনই আমরা 'মানুষে'র সমস্ত কাজ সারিয়া মানুষের অন্তরতম পরিচয়—'দেবতা'কে স্পর্শ করিতে পারিব। তখনই আমরা ঠিক ঠিক

আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হইব। সেই আধ্যাত্মিকতাতে কোন মেকী থাকিবে না।

পুরীর চিঠি

সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্যলাভ করিতে গিয়া পুরী হইতে জনৈক পত্র লিখিয়াছেন—

"বিদেশে এসেও আমার ভয়ানক কষ্ট হয়, অর্দ্ধেক দিন খাওয়া হয় না। রাতে ঘুমুতে পারি না। এত দরিদ্র এদেশবাসী—আহার পায় না দিনান্তে, দুর্দান্ত পরিশ্রম, বসতি দেখলে মনে হয় মানুষ প্রায় পশুর স্তরে জীবন যাপন করে। * * * নানাদিক ঘুরে ঘুরে মনে হয় সরকার বলে দেশে কোনও বস্তু নেই, আর সমস্ত পৃথিবী পাষণ্ডে ভর্তি। হৃদয় বলে কারুর কোনও বালাই নেই।"

এই পত্রে বর্ণিত বিষয় নির্মম সত্য। ইহা শুধু উড়িষ্যারই চিত্র নয়,—সারা দেশে—সহরে, গ্রামে সর্বত্র এই দৃশ্য চোখ খুলিয়া চলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহা যে সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে তাহাও নয়—ষাট বৎসর আগে স্বামী বিবেকানন্দ এই দৃশ্যের দিকে দেশের ধনী, শিক্ষিত, অভিজাত সম্প্রদায়ের চোখ ফিরাইতে চাহিয়াছিলেন। দেশের রাষ্ট্রে, সমাজে, চিন্তা-ধারায়, কর্মরীতিতে কত পরিবর্তন ঘটিয়া গেল কিন্তু দেশজোড়া এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য মুছিল না। তবে এই টুকু শুধু আশার কথা যে, যে অভিজাত শ্রেণীর বহু শতাব্দীর নিষ্পেষণের ফলে সহস্র সহস্র লোকে আহার পায় না, জঘন্য বসতিতে পশুর জীবন যাপন করে তাঁহাদেরই কেহ কেহ আজ জনগণের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইতেছেন। আমেরিকায় ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্যের চিন্তায় বিনিদ্র স্বামী বিবেকানন্দের মতো রাত্রে বিছানায় পড়িয়া তাঁহাদের চোখে ঘুম আসিতেছে না। আজ তাঁহারা বিবেকের দংশন অনুভব করিতেছেন। প্রার্থনা, এই দংশন দ্বারা ব্যাপকভাবে ধনী, শিক্ষিত ও উচ্চবর্ণগণ আক্রান্ত হউন। বিবেকানন্দের রুষ্টবাণী শত-সহস্র অভিজাত ব্যক্তির মর্মে মর্মে আঘাত করুক—

"যতদিন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে ও অশিক্ষায় রহিয়াছে ততদিন তাহাদেরই আত্মত্যাগের দ্বারা শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদিগের প্রতি যাহারা একটুও তাকাইতে চাহে না উহাদের প্রত্যেককে আমি বলিব বিশ্বাসঘাতক। যাহারা গরীবের নিষ্পেষণ-দ্বারা লব্ধ অর্থে বাবুগিরি করিয়া বেড়ায় তাহারা ক্ষুধার্ত বনমানুষের দশায় উপনীত বিশ কোটি লোকের জন্য যতদিন না কিছু করিতেছে ততদিন তাহাদিগকে আমি বলিব শয়তান।"

কিন্তু ইহাই পর্যাপ্ত নয়। স্বামিজী বলিতেন—সমবেদনা অনুভব মাত্র গোড়ার কথা। সেই সমবেদনাকে অনুভূতির পর্যায় হইতে টানিয়া আনিতে হইবে ক্লান্তিহীন প্রচণ্ড নিঃস্বার্থ কর্মে। শুইয়া শুইয়া কাঁদিলেই তুমি দরিদ্রের বন্ধু হইলে না। দরিদ্রের জন্য কিছু কর—যতটুকু হউক—যত সামান্যই হউক তোমার শরীরের, সঞ্চয়ের, স্বার্থের প্রত্যক্ষ নিয়োগ দেখাও। তবে তো বুঝিব তুমি দেশ-দরদী। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

"যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনো দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো। তাহাকে জানাইয়া দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ-সংসারে অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞানতা তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও।"

স্বামিজী তাঁহার জনৈক সন্ন্যাসি-শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, তুই আর কিছু না পারিস পথের ধারে এক কলসী জল নিয়ে বসে পিপাসার্ত পথিকদের খাওয়া। এই শিষ্য আমরণ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মিশনের একটি সেবাশ্রমে অক্লান্তভাবে পীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

সেদিন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বৃদ্ধা মহিলা বলিতেছিলেন,—"সারা জীবন তো সংসারের সেবা করলাম, এবার বড় ছেলে সংসারের ভার নিলে একটি উদ্বাস্তু কলোনীতে গিয়ে থাকবো আর ছোট ছোট গরীব ছেলেমেয়েদের পড়াবো। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তবুও একটু দেশের কাজ হবে।" এই মহিলার মনোবৃত্তি সকল 'শিক্ষিত' 'ভদ্র' এবং 'বিত্তশালী'দের চিত্তকে আচ্ছন্ন করুক। শুধু অশ্রুমোচন নয়—অজস্র সেবার ক্ষেত্রের যে কোনটিতে যে কোন অংশে যতটুকু সম্ভবপর বাস্তব আত্মনিয়োগ।

বিপ্লবের আহ্বান

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁহার একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় দেশের যুবকগণের কথায় বলিয়াছেন—

"তাহাদের মধ্যে উৎসাহ প্রচুর, তাহাদের মুখে চোখে বিপ্লব নাচিতেছে। তাহাদের বিপ্লব দেখিতে পাওয়া যায়—বাগবিতণ্ডার উপর। কিন্তু আজ যখন আমাদের সামনে এই বৃহৎ বিপ্লব উপস্থিত (ভূদান যজ্ঞ) তখন আমরা উহা যদি না চিনিতে পারি তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের কথা। * * আমি যুবকদের বলিতে চাই যে এক বৎসরের জন্য তাঁহারা স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া এই কাযে ব্রতী হউন।"

ভূদান-যজ্ঞ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের মতো একটি অহিংস সামাজিক বিপ্লব সন্দেহ নাই। কিন্তু যুবক ও ছাত্র সমাজ এই কাজের জন্য কতটা উপযোগী তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বিত্তশালী জমিদারগণের স্বেচ্ছায় ভূমিদান করিবার মতো হৃদয়ের পরিবর্তন আনিতে হইলে দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বয়স্ক সেবাব্রতীর প্রয়োজন। যে সকল যুবকের মধ্যে কাজের উৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে বরং বয়স্ক শিক্ষাপ্রসারে নিয়োজিত হইতে বলা উচিত। উড়িষ্যার রাজ্যপাল জনাব সৈয়দ ফজল আলী সম্প্রতি একটি ভাষণে (কটক, ৪ঠা জুন) যুবকগণকে এই আহ্বানই জানাইয়াছেন—

"আমাদের সরকার আজ বহুতর সমস্যায় জড়িত। অশিক্ষিত বয়স্ক লোকদের শিক্ষাদানের ভার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের এবং শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের লওয়া উচিত। আমি আশা করি আমাদের তরুণগণ স্বদেশের এই মহৎ কল্যাণকর কাজটির জন্য কিছু কিছু সময় ব্যয় করিবেন।"

জনাব ফজল আলীর এই আহ্বান বেগ সঞ্চয় করুক, ইহাই প্রার্থনা। ইহাও এক বিপুল বিপ্লবের আহ্বান, যদিও ইহাতে সাময়িক উত্তেজনা নাই। যুবকগণকে দেশের স্থায়ী কল্যাণকর গঠনমূলক সেবাকার্যে ব্রতী হইতে অভ্যস্ত করাই সবাপেক্ষা উত্তম।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সাম্প্রতিক ভ্রমণ

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ইউরোপে এবং আমেরিকায় ব্যাপক ভ্রমণ করিতেছেন। পারস্পরিক শুভেচ্ছা-বিনিময় এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আদান প্রদানই এই সফরের উদ্দেশ্য। নানাস্থানের বহু বিদগ্ধ সমাজ ভারতের এই সৌম্যদর্শন, জ্ঞান-তপস্বী, দার্শনিক রাষ্ট্র-সেবকের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য এবং অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত ওজস্বী ভাষণ শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। ঐ সকল বক্তৃতার কিছু কিছু এখানকার সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইতেছে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ ভারত-ভারতীর সুযোগ্য প্রতিনিধি। তাঁহার কথা শুধু 'বাগ্‌-বৈখরী শব্দঝরী' নয়—উহার পশ্চাতে শক্তি আছে, কেননা তাঁহার নিজের সত্যনিষ্ঠ জীবনে 'ভাবের ঘরে চুরী' নাই। সকল মানুষের ভিতরে যে জন্মমৃত্যুহীন চেতন আত্মসত্তা বাস করিতেছে —যাহা ভারতের ঔপনিষদ্ বিজ্ঞানে বহু-

বিস্তারিতভাবে ঘোষিত হইয়াছে বিশ্ববাসীকে আজ তাহার অন্তরের সেই বিরাট সত্যের দিকে তাকাইতে হইবে। তবেই মানুষ মানুষকে চিনিবে, ভালবাসিবে। মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, ধর্ম আজ যদি মানুষের এই যথার্থ সত্যের উপর না দাঁড়ায় তাহা হইলে সভ্যতার সংঘর্ষগুলি কিছুতেই মিটিবে না—বিশ্ব-শান্তি অতি দূরে রহিয়া যাইবে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ ভারতের এই শাশ্বতী-বাণী নির্ভীকভাবে বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়ভোগৈক-লক্ষ্য শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যাভিমানী পাশ্চাত্যের লোক এ কথায় কতটা কান দিবে বা কান দিয়াও কতটা মানিবে তাহা অবশ্য বলা কঠিন, কিন্তু ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ নিঃসঙ্কোচে সার্বভৌম সত্য, মৈত্রী ও শান্তির বার্তা সকলকে শুনাইয়া চলিতেছেন। আমরা বলি—শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

শ্রীমন্দিরে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মন্দিরের শিল্পকলা ঘুরে ঘুরে চারি দিকে
করি নিরীক্ষণ
পশিলাম শ্রীমন্দিরে শ্রান্ত দেহে লয়ে মোর
অবিশ্বাসী মন।
পুণ্যলোভী নর-নারী চারিদিকে সারি সারি
করিয়াছে ভিড়,
তাহাদের পানে হানি' কৃপাদৃষ্টি, দাঁড়ালাম
উঁচু করি শির।
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে খোল করতাল,
সবে কৃতাঞ্জলি,
আরতির দীপশিখা বিগ্রহের মুখখানি
তুলিল উজলি'।
জগমোহনের তলে মধুর কীর্তন চলে,
বাজিছে খঞ্জনী,
পূজারীরা বসি দ্বারে স্তব-মন্ত্র পাঠ করে
উঠে জয়ধ্বনি।
এই পরিবেশ মাঝে আমার অজ্ঞাতসারে
নত হয় শির,
ভারতীয় চিত্ত মোর হুঙ্কারি জাগিয়া উঠে
ঠেলি সব ভিড়।

নবনারী কোটি কোটি যুগে যুগে হেথা জুটি
হইল প্রণত,
নিবেদিল হৃদয়ের ব্যাকুলতা আর্তিভরা
আকিঞ্চন যত।
কোটি কোটি মানুষের শুচি শুভ্র হৃদয়ের
যত ভক্তিধারা
ও বিগ্রহে কেন্দ্রীভূত, এই পরিবেশ মাঝে
হইয়াছে হারা।
কোন দেবদেবী এরে রচিয়া তুলেনি কভু
মহাতীর্থভূমি,
মানুষই রচেছে এরে মহাতীর্থ যুগে যুগে
এর ধূলি চুমি।
দারুর বিগ্রহ মাঝে শ্রীমন্দিরে ভগবানে
নাই দেখিলাম,
কোটি কোটি মানুষের ভক্তিপূত হৃদয়ের
নাই কিছু দাম?
কোটি কোটি নরনারী যে বিগ্রহে করিয়াছে
ভক্তি নিবেদন,
কোথা আর ভগবানে মিলিবে এ বিশ্বে, যদি
সেথা নাহি র'ন?

জন্ম জন্মান্তর পানে　সহসা খুলিয়া গেল
　মানস নয়ন,
মনে হ'ল দূরে কাছে　যাহারা দাঁড়ায়ে আছে
　সবাই আপন।
আত্মীয় জনের দলে　দাঁড়ায়ে মন্দির তলে
　হ'ল মোর মনে,
কতকাল পরে পুন　ফিরিয়া আসিনু যেন
　আপন ভবনে।
ভারত-সন্তান আমি　এই গর্ব চিত্তে মোর
　জাগিল তখন,

মনে হ'ল মন্দিরের　বাহিরে শুধুই যেন
　পশুর জীবন।
মন হ'তে গেল ভাসি　আবর্জনা রাশি রাশি
　বিদেশী শিক্ষার,
স্বধর্মে নিধনও মানি　ভয়াবহ পরধর্মে
　দিলাম ধিক্কার।
আমার উদ্ধত শির　সহস্র শিরের সাথে
　নমিল ভূতলে,
বহু দিনকার জমা　মালিন্য চাহিল ক্ষমা
　তপ্ত অশ্রুজলে।

ঔপনিষদিক সমাজে নীতি ও ব্রহ্মজ্ঞানের স্থান

স্বামী বাসুদেবানন্দ

উপনিষদ্ সাধারণের জন্য ধর্মোপদেশ করছেন—"সত্যং বদ"—সত্য কথা বলবে। "ধর্মং চর"—ধর্মাচরণ করবে। "স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ"—অধ্যয়ন হতে বিরত হবে না। "আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ"—অধ্যয়ন সমাপন হলে, আচার্যকে তাঁর অভীষ্ট ধনদান কোরে, বিবাহ করবে, সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখবে। "সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্"—বাক্যদান কোরে তা থেকে বিচলিত হবে না। "ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্" স্বকর্তব্য হতে বিচলিত হবে না। "কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্"—শুভকর্ম হতে বিচলিত হবে না। "ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্"—ঐশ্বর্য সম্পাদনে প্রমাদগ্রস্ত হবে না। "স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্"—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হতে বিচলিত হবে না। "দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্"—দেব পিতৃকার্য হতে বিরত হবে না। "মাতৃদেবো ভব"—মাতা যেন তোমার দেবতা হন। "পিতৃদেবো ভব"—পিতা যেন তোমার দেবতাস্বরূপ হন। "আচার্যদেবো ভব"—আচার্য যেন তোমার দেবতাস্বরূপ হন। "যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি"—অনিন্দিত কর্মই সেবা করবে। "নো ইতরাণি"—অন্য কর্ম নয়। "যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি॥"—আমাদের যা সদাচার তাই তোমার অনুষ্ঠেয়। "নো ইতরাণি"—অপর সকল নয়। "যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্"—যে সকল ব্রাহ্মণেরা আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, তাদের তুমি আসনাদির দ্বারা শ্রমদূর করবে। "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।"—শ্রদ্ধাসহকারে দান কর্তব্য, অশ্রদ্ধায় দান অকর্তব্য। নিজের ঐশ্বর্যানুরূপ দান করা উচিত। বিনয় সহকারে দান করা উচিত। পাছে কোন দোষ হয়, এইরূপ চিন্তাপূর্বক সভয়ে দান করা উচিত। প্রেমের সহিত দান করা

উচিত। "অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তি-বিচিকিৎসা বা স্যাৎ"—আর যদি কর্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে তা হলে—"যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ।"—সেখানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্তব্যপরায়ণ, শুভকর্মে ও সদাচারে নিযুক্ত, অনিষ্ঠুর, ধর্মকাম ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁরা যে ভাবে জীবন যাপন করেন, তখন সেখানে সেই ভাবেই জীবন যাপন করবে।…"এতদনুশাসনম্"—এই হলো সাধারণের প্রতি বেদের অনুশাসন।—(তৈঃ উঃ ১।১১)।

কিন্তু এই চারিত্র-নীতিগুলির অনুসরণেই কর্তব্য শেষ নয়—নৈতিক জীবন উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের প্রস্তুতি মাত্র। ক্রমে অনুশীলনের দ্বারা আত্মার ক্ষুদ্র গণ্ডী সকল চূর্ণ কোরে (ত্রিশংকু ঋষির ন্যায়) ওগুলিকে সমষ্টি আত্মায় বিলয় করতে হবে।—

"অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ।"—(তৈঃ উঃ ১।১০)—

আমিই এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরয়িতা। কীর্তি আমার গিরিপৃষ্ঠের ন্যায়। আমার মূল (ঊর্ধ্ব) পবিত্র পরমব্রহ্ম। সূর্যের ন্যায় আমি সু-অমৃত স্বরূপ। আমি দীপ্তিমৎ (বর্চস) জ্ঞানবিত্ত। আমি অমৃতসিক্ত সুমেধা ব্রহ্মবিৎ।

উপনিষদের মতে অন্নের সাত্ত্বিক (সূক্ষ্ম) পরিণাম মন (ছাঃ উঃ ৬।৫।১); অতএব আহার-শুদ্ধি হলে চিত্তশুদ্ধি হয় (ছাঃ উঃ ৭।২৬।২)। বৃথা দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং আপৎকালে সকলের দান গ্রহণ করা যায় (ছাঃ উঃ ১।১০।৪)। অতিথি-সৎকার ও অতিথিকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান (কঠ ১।১।৭—৯); একমাত্র সত্যবাদিতাই ব্রহ্মণ্যধর্মের পরিমাপ (ছাঃ উঃ ৪।৪।৫); সত্য-মিথ্যা জানবার জন্য তপ্ত পরশু গ্রহণ (ছাঃ উঃ ৭।১৬।২), স্ত্রীলোকের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার (বৃঃ উঃ ৩।৬, ৩।৮, ৪।৫); শূদ্রের বেদাধিকার (ছাঃ উঃ ৪।৪,৪।১-৩) ইত্যাদিও উপনিষদে দেখা যায়।

আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অন্তরঙ্গ সাধন, উপনিষদ বলেন—জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে পরস্পর অধ্যয়ন, অধ্যাপনা চলত। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় ক্ষত্রিয়েরা সংক্রমণ, দেববিদ্যা বা উপাসনাতেই পারদর্শী ছিলেন। চরম ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরাই উপদেষ্টা। উপনিষদে বহুস্থলে ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত-মল-স্খালনের কথা আছে, যথা, "অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন"—(কঠ উঃ ১।২।১২), "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া"—(কঠ উঃ ১।৩।১২), "যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" -(কঠ উঃ ১।৩।১৩)—বাক্যকে মনে, মনকে জ্ঞানাত্মায় (বুদ্ধিতে), বুদ্ধিকে মহতে অর্পণ করবে। "শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ"—(মুণ্ডক উঃ ২।২।৪), "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যগ্-জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিত্যম্। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো, যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥" (মুণ্ডক উঃ ৩।১।৫), "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্"—(শ্বেঃ উঃ ১।৩), "ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ, প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্"—(শ্বেঃ উঃ ২।১২) ইত্যাদি।

চতুর্বিধ আশ্রমের মধ্য দিয়ে সেই পরম তত্ত্ব লাভ করতে হবে। কিন্তু উপযুক্ত মেধাবী ও বৈরাগ্যবান হলে প্রথম আশ্রম হোতেই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু এটা বিশেষ বিধি। যথা—"ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।

যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্বা বনাদ্বা॥ অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাহস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ।" — (জাবালোপনিষৎ ৪)।

সন্ন্যাসীরা কখনও রাজনীতিতে যোগ দিতেন না, তথাপি তাঁরা সম্রাটের মত সম্মানিত হতেন। কেন?—"তাঁরা স্বর্গের আলো পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন, অনন্ত জীবন-উৎসের রহস্য-বার্তা তাঁরা আবিষ্কার করে সকলকে সন্ধান দিয়েছেন—" (Evelyn Underhill, Mysticism p. 172).

সন্ন্যাসীবা হলেন তৃষ্ণার্তদের নিকট সহস্রার পদ্মের অমৃতধারার পরিবেশনকারী, তাঁরা হলেন আধ্যাত্মিক সুতুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণকারী তপস্বী ভগীরথ, দুর্গম হিমালয় শীর্ষে পুঞ্জীভূত ধর্মতুষারের তপ-উত্তাপে বিগলিত জাহ্নবীরূপে মর্ত্যলোকে পরিবহনকারী জীব-বন্ধু।

ডয়সন্ (Paul Deussen) তাঁর "উপনিষদ্ দর্শনে" নৈতিকতাটা গৌণ বলেন ; কারণ ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ, তখন উহা নিশ্চয়ই কতকগুলো নৈতিক কর্তব্যের পরিণাম স্বরূপ হতে পারে না। জীব অজ্ঞানহেতু স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না ; এই অজ্ঞান-নাশের প্রধান কারণ জ্ঞান, অর্থাৎ মিথ্যা-দৃষ্টি অপসারিত হলেই সত্যের প্রভাত সুনিশ্চিত। সত্য-সূর্য সেখানে সৃষ্টি হয় না, সত্য সেখানে অনাদি হয়েই আছেন। নৈতিক কর্তব্য আত্মায় সচ্চিদানন্দ অনুভূতির কারণ বা ব্যাপার নয়, জ্ঞানের সহকারী মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান যদি কর্তাকরণোপাদানব্যাপারবৎ অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্বন্ধে উৎপন্ন হোত, তা হলে ঘটবৎ নশ্বর হয়ে পড়ত। ডয়সন্ বলেছেন, "moral conduct cannot contribute directly but only indirectly to the attainment of the knowledge that brings emancipation. For, this knowledge is not a becoming, something which had no previous existence and might be brought about by appropriate means, but it is the perception of that which previously existed from all eternity," (পৃঃ ৩৬২)। অর্থাৎ, মুক্তি-বিধায়ক (আত্ম) জ্ঞানলাভের প্রতি নৈতিক চরিত্রের সাক্ষাৎ অবদান নেই—পরোক্ষভাবে উহা সহায়ক মাত্র। কেননা এই জ্ঞান এমন কোন বস্তু নয় যা পূর্বে ছিল না এবং এখন উপায়-বিশেষ-অবলম্বনে 'উৎপাদ্য'। এই জ্ঞান হচ্ছে অনন্তকাল ধরে বর্তমান তত্ত্বের প্রত্যক্ষীকরণ।

কিন্তু উপনিষদে জ্ঞানের তুলনায় সব কিছুই গৌণ হলেও, নিম্নাধিকারীরা উপনিষদের পূর্ব-কথিত নৈতিক তত্ত্বগুলি বাদ দিয়ে তত্ত্বজ্ঞানে কখনও উপস্থিত হতে পারে না,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"—(মুণ্ডক উঃ—৩।২।৪)

'দুর্বল, প্রমাদশীল বা নিয়ম-শৃঙ্খলা-আচার-রহিত তপস্বী এই আত্মাকে লাভ করতে পারেনা। শাস্ত্রোক্ত প্রণালীসমূহ-অবলম্বনে যে সাধন করে সেই জ্ঞানীব্যক্তির আত্মাই, ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।'

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"—
(কঠ উঃ ১।২।২৪)

'পাপাচরণ ও ইন্দ্রিয়-লোলুপতা হতে যে বিরত হয়নি, যার চিত্ত একাগ্র নয় এবং ফল-লাভের চিন্তায় অশান্ত, সে কখনও সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে লাভ করতে পারে না।'

"যস্য দেবে পরা-ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"
—(শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)

'পরমেশ্বর এবং আচার্যের প্রতি যার ভক্তি আছে সেই মহাত্মার কাছেই উপনিষদুক্ত এই সব তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।'

আর শ্রীভগবান গীতায় (১৩।৭-১১) নৈতিক বিধি, উপাসনা বা মনঃসংযোগ বিধি এবং সদসৎ বিচারগুলিকেই "জ্ঞান" বলেছেন, আর সব অজ্ঞান। অর্থাৎ সাধনের স্তুতির জন্য সাধনকেই সাধ্যের নামে আখ্যাত করেছেন। শ্রীরামানুজাচার্যও "জ্ঞান" অর্থে "ধ্যান" বা উপাসনাকেই গ্রহণ করেছেন, (ব্রঃ সূঃ উপক্রমণিকা)।

তবে জ্ঞান ভিন্ন অন্য যা কিছু সাধন, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি সবই গৌণ, কারণ শ্রুতি বলছেন—"নান্যৈর্দেবৈস্তপসা বা"—(মুণ্ডক উঃ ৩।১।৮); "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"—(মুণ্ডক উঃ ৩।১।৮) —অন্য কোন দেবতা বা তপস্যা দ্বারা তিনি লভ্য নন। জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে ধ্যানশীলেরাই নিরবয়ব ব্রহ্মকে জানেন। এই শুদ্ধসত্ত্ব মনই হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য রাহস্যিকদের ভারজিন মেরী, সেখানে "Divine communion" জীব ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি ঘটে, "যস্মিন বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা"—(মুণ্ডক উঃ ৩।১।৯)—যে চিত্ত নির্মল হলে আত্মা বিশেষ ভাবে সেখানে প্রকাশিত হন। রাহস্যিকরা এই যোগোৎপন্ন জ্ঞানকে "Spiritual birth of Christ" বলেন। একহার্ট তাঁর "আত্মার দুর্গ" (The Castle of Soul) নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "and his substance, his nature and his essence being mine, therefore I am the son of God." মুণ্ডকোপনিষদের "বিশুদ্ধসত্ত্ব", "ধ্যায়মানঃ" হচ্ছে খ্রীষ্ট সাধকদের "রাহস্যিক জীবনের পঞ্চম স্তর", যাকে তাঁরা "union" (মিলন) বলে থাকেন। খ্রীষ্টীয় নানা সাধকেরা এটিকে নানা নামে আখ্যাত করেছেন, "Mystical Marriage" (রাহস্যিক উদ্বাহ), "Deification" (দেবভাবপ্রাপ্তি) "Divine Fecundity" (দিব্যাবির্ভাব)—এ অবস্থায় জীব কর্তৃক কেবল প্রাতিভালোকে অব্যয় জীবনের দর্শন ও স্পর্শন নয়, পরন্তু একীভূত হওয়া।

যা হোক উপনিষৎ প্রবর্তকদের জন্য কর্ম-ব্যবস্থা করেছেন, সেটাও অবিধিপূর্বক নয়, বিধি ও জ্ঞানপূর্বক—(মুণ্ডক উঃ ১।২।১-১১ দ্রঃ)। কিন্তু পরিশেষে উপনিষৎ বলছেন, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নেই, "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্"—(কঠ উঃ ১।২।১৭), এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, এই হচ্ছে পরম গতি। "অশব্দমস্পর্শম্··· নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"—(কঠ উঃ ১।৩।১৫), 'অশব্দ, অস্পর্শ···সেই তত্ত্বকে জেনে মৃত্যুমুখ হতে মুক্ত হওয়া যায়।' "তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্"—(কঠ উঃ ২।২।১২), 'যে ধীর ব্যক্তিগণ নিজের আত্মাতে সেই পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন তাঁরাই শাশ্বত সুখ লাভ করেন, অপরে নয়।' "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্···তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"—(মুণ্ডক উঃ ১।২।১২), 'সকামকর্ম-লভ্য লোকসমূহের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করে এর অতীত ধ্রুব শাশ্বত বস্তুর জ্ঞান-লাভের জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত হতে হবে।' "যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥" —(শ্বেঃ উঃ ৬।২০)—যে দিন চর্মের ন্যায় আকাশকে বেষ্টন করা যাবে সেই দিন ব্রহ্মদেবকে না জেনেও দুঃখের অন্ত হবে।

যতক্ষণ অহংকার আছে ততক্ষণ নৈতিকতার রাজত্ব, নিম্ন প্রকৃতিটাকে শাসন কোরে রাখা। কিন্তু যখন এই অহমাত্মা নিজের ভেতর চিদাত্মার সন্ধান পায়, তখনই নৈতিক রাজত্বের অবসান এবং আধ্যাত্মিক রাজত্বের আরম্ভ হলো।

আধ্যাত্মিকলক্ষ্যহীন নৈতিকতা একটা নিরুদ্দেশ সংগ্রাম, ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া, কিন্তু কিসের জন্য তা আমরা জানি না। অর্থাৎ নৈতিক আইন-কানুন যদি অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের জন্য বাস্তব জীবনে প্রযুক্ত না হয়, তা হলে সেগুলো সারা জীবনের একটা উদ্দেশ্যহীন কৃচ্ছ্রতা স্বীকার ছাড়া তার আর কিছু উপযোগ্যতা থাকে না। ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞান হলেই তবে নৈতিকতার সার্থকতা, ব্রহ্মজ্ঞানেই ভালমন্দ, শুভাশুভ কর্মের, পাপপুণ্যের অবসান—"তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি, সর্বং আত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্বং পাপ্মনং তপতি, বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি।"—(বৃঃ উঃ ৪।৪।২৩)। 'এই জন্যই এইরূপ জ্ঞানী শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হয়ে দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করেন—নিখিল বস্তুকে আত্মা বলে সন্দর্শন করেন; পাপ এঁকে স্পর্শ করতে পারে না, ইনি সমস্ত পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ এঁকে সন্তপ্ত করে না, ইনি সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করেন। ইনি বিপাপ, বিরজ ও বিগতসন্দেহ ব্রহ্মজ্ঞ হন।' "কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীই 'কেন আমি সাধুকর্ম করি নি, কেন আমি পাপ করেছি' বলে অনুতাপ করে না"—(তৈঃ উঃ ২।৯)।

খ্রীষ্টীয় মরমিয়া-তন্ত্রেও (Mysticism) ভাগবত জ্ঞানে এই পাপপুণ্যের নির্লিপ্তির উদাহরণ রয়েছে। সেণ্ট ক্যাথারিনের যখন প্রথম দিব্য দর্শন হলো, তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, "আর সংসার নয়! আর পাপ নয়! হে প্রেমময়! একি সম্ভব! তুমি এত ভালবেসে আমায় ডেকেছ, এবং এক মুহূর্তে এমন জিনিষ জানালে যা জগৎ প্রকাশ করতে পারে না।" অব্যয়-মূলক এই বোধির সহিত তাঁর আর একটা আন্তর দর্শন হলো, ক্রুশবাহী খ্রীষ্ট, জগতের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত; তাতে তাঁর চিত্তে এলো আরও দীনতা, আরও অনুরক্তি। "হে প্রভু! হে প্রিয়তম! আমার জন্য এত কষ্ট তোমার, আর না! আর কখনও পাপ করব না প্রভু!" এই তত্ত্বটির উপর খ্রীষ্টীয় নীতিশাস্ত্র ব্যবস্থিত, যত মহাপাপই হোক তা কখনও মুক্তির বাধা হবে না, যদি অনুতাপ আসে, যদি শরণাগতি আসে। "সাধুরেব স মন্তব্যঃ"—(গীতা ৯।৩০), "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—(গীতা ৯।৩১), "তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্"—(গীতা ৯।৩২)। জ্ঞানী ভক্তের অহংকার না থাকায় তার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিণত হয়, তার জীবনে ঈশ্বরীয় জীবন প্রকটিত হয়, পূর্ণে সংযুক্ত হওয়ায় সে পূর্ণ হয়ে যায়, তার সর্ব কর্মের প্রেরণা সেই অব্যয়-উৎস থেকেই বেরুচ্ছে।

"আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি—কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তি ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণে

(এক)

মহাশক্তিরূপিণী মা

শ্রীমতী মীরা দেবী

বহু জন্মের পুণ্যফলে মাকে দর্শন স্পর্শন করবার ও তাঁর স্নেহ-বিগলিত কৃপা পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, কিন্তু তিনি যে ভাগবতী মহাশক্তি—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীব-উদ্ধার কাজে সাহায্য করে তাঁর লীলা পুষ্ট করতে নারীদেহ ধারণ করেছিলেন, তা আমরা তখন কিছুই বুঝি নি। আমরা তাঁর স্নেহে ভরপুর হয়ে তাঁকে শুধু মমতাময়ী মা বলে জেনেই আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম। অন্য কিছু ভাববার প্রয়োজন বা যোগ্যতাও তখন ছিল না।

মায়ের ভাণ্ডারে কত মণিরত্ন আছে আমরা সে খবর তখন রাখিনি, তাঁর কাছে গেলে জগৎ-সংসার ভুল হয়ে যেতো। সে মাত্র অনুভবের বস্তু, ভাষা তা ব্যক্ত করতে পারে না। একমাত্র ঠাকুরই দুচার কথায় তাঁর মহিমা ব্যক্ত করেছেন। তিনিই মাকে জেনেছিলেন, চিনেছিলেন, সেজন্য আমরা আজ ঠাকুরকেই মায়ের প্রথম ও প্রধান প্রচারক বলতে দ্বিধাবোধ করবো না।

মা তাঁর সাধন, ভজন, ভাব, সমাধি ইত্যাদি মহাশক্তিবলে গোপন করে রাখতে পেরেছিলেন, সর্বসাধারণ সে সব কিছুই জানতে পারে নি। সেইজন্য ঠাকুরের দেহত্যাগের পরও ভক্তদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা ঠাকুরকে অবতার বলে পূজা করলেও মাকে একজন সাধারণ লজ্জাশীলা ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক বলেই মনে করতেন। এইরকম কোন এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুরের ঈশ্বরকোটি প্রিয় সন্তানদের অন্যতম স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) বলেছিলেন:—"মাকে কে বুঝবে? ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই। ঠাকুরের তবুও বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, ভাব, সমাধি লেগেই থাকতো, কিন্তু মার ঐ ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত,—এ কি মহা শক্তি! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না—সব মার কাছে চালান করে দিচ্ছি, মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্ন্যাসী হয়েও স্ত্রীকে ত্যাগ করেন নি; নিজ গর্ভধারিণী মাতাকে যেমন কাছে রেখে সেবা যত্ন করেছেন তেমনি স্ত্রীকেও অতি যত্নের সহিত, অত্যন্ত মান্যসহকারে নিজের কাছে রেখে তপস্যা দ্বারা তিনি যাতে নিজ মহিমায় বিকশিতা, মহিমান্বিতা হয়ে লোককল্যাণ সাধন করতে পারেন তার উপযোগী শিক্ষা ও সুযোগ করে দিয়েছেন। এবং শ্রীশ্রীমাও তেমন আধার বলেই তা সম্যকরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। শিক্ষকের একার কৃতিত্ব থাকলেই শিক্ষাকার্য সুসম্পন্ন হয়না, গ্রহীতারও সমান কৃতিত্ব থাকা চাই।

পত্নীর সঙ্গে আট মাস এক শয্যায় শয়ন করে ঠাকুর নিজের মনকে বহু রকমে পরীক্ষা করেও যখন দেখলেন স্ত্রীর প্রতি শ্রীশ্রীজগদম্বা ভিন্ন অন্য কোন ভাব তাঁর মনে এলো না, তখন তিনি পরীক্ষায় নিজেকে উত্তীর্ণ মনে করে পত্নীকে

তৃতীয় মহাবিদ্যা "ষোড়শী" জ্ঞানে আলপনাযুক্ত দেবীপীঠে বসিয়ে গভীর নিশীথে ফলহারিণী কালী-পূজার দিন ষোড়শোপচারে পূজা করলেন এবং তাঁর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের কঠোরতম সাধনার সকল ফল এমন কি জপের মালাটি পর্যন্ত মায়ের শ্রীপাদ-পদ্মে সমর্পণ করলেন এবং বার বার প্রণাম করে প্রার্থনা করতে লাগলেন—যেন জীব-কল্যাণে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়।

আমরা একবার চিন্তা করে দেখতে পারি, এই নারী-রূপধারিণী কত বড় শক্তির আধার ছিলেন! ১৮।১৯ বছরের একটি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, শহুরে ভাব, শিক্ষা যার কিছুমাত্র জানা নেই, তিনি কেমন করে সেই 'পতি পরম গুরু'র যুগে, এক দিকে স্বামী ও অন্য দিকে এত বড় একজন গণ্যমান্য মহাপুরুষের পূজো নিঃসঙ্কোচে, অবলীলাক্রমে গ্রহণ করলেন? বর্ণিত আছে, পূজক ও পূজ্যা উভয়েই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবার পরও আমরা মাকে দেখি তিনি পূর্বে যেমন স্বামী ও শাশুড়ীর সেবিকা ছিলেন, পরেও তেমনি সেবিকাই রইলেন। প্রাণপণে সেবাই করতে লাগলেন। কিছুমাত্র অহঙ্কার তাঁর মধ্যে মাথা তুলতে পারল না,— তাঁর মাথা বিগড়েও গেল না। তিনি যেমন ধীর, স্থির, সেবাপরায়ণা, অক্লান্ত কর্মী, নিরভিমানা, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি ছিলেন, তেমনই থেকে গেলেন। তাঁর এই চারিত্র মাধুর্য হতে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন "আদর্শ হিসেবে যা করতে হয় তার বাড়া করেছি।" (অর্থাৎ অনেক বেশী করেছি)। এর থেকে বোঝা যায় তাঁর জন্ম-পরিগ্রহ করাটাই লোক-শিক্ষার জন্য হয়েছিল।

ঠাকুর তাঁর ছেলেদের কাছে বলেছিলেন, "ও যদি এত ভাল না হোত,—তা হলে দেহ-বুদ্ধি আসতো কি না কে বলতে পারে?"

ঠাকুর আরও বলেছেন, "ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। জীবের অমঙ্গল আশঙ্কায় এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" আবার কখনও, মহাশক্তি যে ক্ষুদ্র দেহের আবরণে লুকিয়ে আছেন তা বুঝাবার জন্যে বলেছেন, "ও ছাই চাপা বেড়াল।" আরও একটা দৃষ্টান্ত দিইঃ—ভাগ্নে হৃদয় আমাদের মাকে সাধারণ মানুষ, তাঁর মামী মনে করে সময় সময় মার প্রতি দুর্বিনীত ব্যবহার করতেন দেখে ঠাকুর তাঁর অকল্যাণ আশঙ্কা করে তাঁকে একদিন সাবধান করে দিয়েছিলেন। "শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি"-রচয়িতা অক্ষয় বাবুর ভাষাতেই সে কথা বলি:—

"একদিন মিষ্ট ভাষে বিনয় করিয়া।
হৃদয়ে কহেন প্রভু মায়ে দেখাইয়া॥
ইনি যদি রুষ্ট হন রক্ষা নাহি আর।
সাবধানে কর কর্ম মিনতি আমার॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ইষ্ট এবং গুরুরূপে লাভ করে মা তাঁর আমিত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁর মধ্যে বিসর্জন দিয়েছিলেন। ঠাকুর ছাড়া তাঁর কোন পৃথক অস্তিত্ব আছে—তা কখনও কোনও আচরণেই প্রকাশ পায়নি; তবু শেষ-জীবনে মায়ের মুখ থেকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে ২।১ টা কথা শুনতে পাওয়া গেছে যা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন:— "আমার জন্মও তো ঐ রকমের" অর্থাৎ ঠাকুরের জন্মের মত অলৌকিক। রোগযন্ত্রণায় কষ্ট হচ্ছে— কোন অন্তরঙ্গ শিষ্যাকে বলছেন,— "এসব শরীরে কি মা রোগ হয়, দেব শরীর, লোকের পাপ গ্রহণ করে এ-সব হয়েছে।" রামেশ্বর দর্শনের পর, কেমন দেখলেন এই প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে মা বলে ফেলেছিলেন, "যেমনটি রেখে এসেছিলাম তেমনটিই রয়েছে দেখলুম।"

ঠাকুর যদি একাধারে রাম ও কৃষ্ণের শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, তবে সীতা ও রাধিকার শক্তি একাধারে মিলিত হয়ে যে আমাদের মাতৃরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন—তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানের যুগ, বিদ্বান-বুদ্ধিমানের যুগ, এ যুগে কারো স্বামী পুত্র শত প্রশংসা করলেও, কিম্বা তিনি নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ভাবের শব্দ প্রয়োগ করলেও, মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ কারো কথা বিশ্বাস করতে চায় না—শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করা তো অনেক দূরের কথা। সুতরাং আমাদের মাতাঠাকুরাণী কি ভাবে তাঁর ৬৭ বছরের জীবন যাপন করে গেলেন, বাঙ্গলার নারী-সমাজের আজ তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

সাধারণতঃ নারীজীবন কন্যা, ভার্যা ও মাতা—এই তিন রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। মায়ের জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, এই তিন জীবনেই তিনি লোকশিক্ষার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। নারী-জীবনের কঠিন কঠিন পরীক্ষায় তিনি কি ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। নারী-জাতি বিশেষ করে বাঙ্গালী নারী যে অলঙ্কারে ভূষিতা হলে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, সেই দয়া, তিতিক্ষা, ক্ষমা, সংযম, নিঃস্বার্থপরতা, নিজ শরীরের সুখ-দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, সহানুভূতি প্রভৃতি নিজ আচরণের দ্বারা মা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষা তিনি দেন নি, নিজে পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করলে প্রকৃত সুখী হবো তা ঠিক করতে পারছি না। চতুর্দিকে আপাত-মনোরম প্রলোভন আমাদের বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এই সময় অতি সুযোগ্য কর্ণধার বিনা আমাদের জীবনতরী লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারবে না। যতই দিন যাচ্ছে—ততই আমরা বুঝতে পারছি যে, একমাত্র তিনিই এই তরীর কর্ণধার হয়ে আমাদের দিক নির্ণয় করে দিতে পারবেন। আমরা দেখি, শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের লীলা-সহচরী রূপে এসে নারী-জাতিকে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কঠিন তপস্যা করেছিলেন। বিশ্বের নারীশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য তিনি নারীসুলভ লজ্জা ও সেবা-ধর্ম বজায় রেখে অতি গোপনে নহবতে বসে কঠিন তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। ঠাকুরের তো ডঙ্কামারা তপস্যা কিন্তু মায়ের তা ছিল না, অতি সঙ্গোপনে এবং গৃহস্থালীর সকল কর্তব্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে লোক-লোচনের অন্তরালে তাঁর সাধনা। এতটুকুও তাঁহার বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না। কখনও কোনও ভক্তের চোখে তাঁর ঈশ্বরীয় ভাবের সামান্যমাত্রও ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তা সংবরণ করে ফেলেছেন। এই তো প্রকৃত নারীশক্তির বিকাশ,—মহাশক্তিকে অনায়াসে ধারণ ও প্রকাশ করতে পারা।

(দুই)

প্রথম দর্শন ও কৃপালাভ

শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার

খ্রীঃ ১৯১০ সালে আমার বেলুড়মঠ দর্শনের সুযোগ ঘটে এবং তথাকার আবহাওয়ায় মুগ্ধ হই। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী (রাখাল মহারাজ) তখন মঠের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। যদিও মহারাজকে তখন আমি দেখি নাই, তবু আমার মনে হইল তিনি যদি আমাকে কৃপা করেন তবে আমি কৃতার্থ হইব।

১৯১৩ সালে, (বাঙ্গলা ১৩২০ সন) আমি রাঁচি একাউন্টেন্ট্ জেনারেল আফিসে অস্থায়ী-ভাবে কেরানীর কাজ করি। বয়স ২৪।২৫ বৎসর হইবে। মন্ত্র-দীক্ষার জন্য আমার প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতা আসিল। কেবল মনে হইত গুরু-কৃপা না পাইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। তখন আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন (শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্তান) আমাকে শ্রীশ্রীমায়েব শ্রীচবণে আশ্রয় ভিক্ষার জন্য উপদেশ করেন। তাঁহার উপদেশ আমার চিত্ত আকর্ষণ করিল না। আমি কিসে রাখাল মহারাজের কৃপা লাভ করিতে পারি সেই কথাই ভাবিতে লাগিলাম। পবে ইন্দুবাবুরই উপ-দেশানুযায়ী জ্যৈষ্ঠ মাসেব শেষভাগে এক সুদীর্ঘ পত্রে মহারাজের কৃপা প্রার্থনা কবিলাম। প্রায় তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু মহারাজের নিকট হইতে কোন উত্তব আসিল না। আমি পাগলপ্রায় হইয়া উঠিলাম।

আষাঢ় মাসেব মধ্যভাগে এক গভীবা রজনীতে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম ঘর স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত, আর জগন্মাতা কালীঘাটের মহাকালীরূপে চারিহস্তে আমায় কোলে তুলিয়া লইয়া, "ভয় কি বাবা, আমিত রয়েছি" বলিতে বলিতে এক নারী-মূর্তিতে রূপান্তরিতা হইলেন। তাঁহার পরিধানে লাল চুলপেড়ে কাপড়, হাতে বালা। তিনি আমাকে একটি বীজসহ নাম ১০৮ বার জপ করিতে আদেশ করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি ইহা করিয়া যাও, আর যাহা করিতে হয় আমিই করিব।"

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে আমি 'মা' 'মা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠি। পরে শান্ত হইয়া বাকী রাতটুকু ঐ নাম জপ করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইয়া যাই। এই ঘটনা কাহাকেও বলিলাম না। এমন কি ইন্দুদাদাকেও নয়। শুধু এই চিন্তাই প্রবল হইল কোথায় কিভাবে আমার এই মাতৃমূর্তির দর্শন পাইব।

রাঁচিতে তখন প্রতি শনিবারে কথামৃত পাঠ ও ঠাকুরের কীর্তন হইত এবং আমি ইহাতে যোগদান করিতাম। এক শনিবার এই পাঠ ও কীর্তনে ৺সুরেন্দ্র নাথ সরকার উপস্থিত হন। তিনি ছুটিতে ছিলেন এবং ফিরিয়া আসার পথে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট মায়ের বহু কথা শুনিতে শুনিতে আমার চিত্ত আনন্দে নাচিতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল এই মাই কি আমার স্বপ্নদৃষ্টা সেই মা? তাঁহার নিকট হইতে মায়ের দেশে যাওয়ার রাস্তা-ঘাট সব জানিয়া লইলাম। কিছুদিন পরে আমার মায়ের দেশে যাওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইল। সামান্য কিছু বেলা থাকিতে জয়রামবাটী পৌছিলাম। কোয়ালপাড়া মঠ হইতে একটি ছেলে সঙ্গে গিয়াছিল। সে সোজা মায়ের বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। আমি মুখ হাত ধুইবার জন্য প্রসন্ন মামার পুকুরঘাটে গেলাম। তথা হইতে যেন শুনিতে পাইলাম, ছেলেটি বলিতেছে, "একজন ভক্ত আসিয়াছে। হাত মুখ ধোওয়া হইলে আমি মায়ের বাড়ীর সদর দরজা পার হইয়া উঠানে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম বারান্দায় কতিপয় মহিলা বসিয়া আছেন, আর একজন বঁটিতে তরকারী কুটিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই উক্ত মহিলারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন আর যিনি তরকারী কুটিতেছিলেন তিনি সেই কাজেই লিপ্ত রহিলেন। পরে যখন আমি উঠানের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলাম তখন দেখি তিনি আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

সেই মা! সেই চাহনি! সেই ভাব! মুহূর্তে আমার সব উলট্-পালট্ হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল মা-ই জগজ্জননী, বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্বেশ্বরী। নির্বাক, নিস্পন্দ হইয়া জড়ের মতো

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মা তখন বঁটিখানা কাত করিয়া উঠিলেন এবং ঘরের দরজার শিকল খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া হাতের ইশারায় আমাকে ডাকিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত অগ্রসর হইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। সমস্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁগা, আমায় কি করে চিন্‌লে?" এই আমার জীবনে মায়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রথম বাণী শোনা। আমি সাশ্রু-নয়নে রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলাম.—"মা, তোমাকে চিনিবার মত আমার কি সাধ্য আছে? তবে কৃপা করিয়া যতটুকু চিনিয়েছ ঠিক ততটুকুই চিনিয়াছি।" মা হাসিলেন। সে হাসিতে আমার জড়ত্ব দূর হইয়া গেল। আমি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইলাম, আর অমনি তাঁহার শ্রীচরণতলে পতিত হইয়া দুই হাতে চরণ দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলাম। মা আমাকে তাঁহার পদ্মহস্তে ধরিয়া তুলিলেন এবং বারান্দায় আনিয়া একখানি আসনে বসাইলেন, পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া এক গ্লাস ঠাকুরের প্রসাদী মিশ্রির সরবৎ লইয়া আসিয়া তাহা হইতে নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট আমাকে দিলেন। আমি সানন্দে তাঁহার ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গ্লাসটি রাখিতেই মা নিজে উহা তুলিয়া ধুইয়া রাখিলেন এবং পুনরায় বঁটি দিয়া তরকারী কুটিতে বসিলেন। আমার সঙ্গে নানা কথা হইতে লাগিল। প্রসঙ্গ-ক্রমে মা তাঁহার রাঁচির সন্তানদের নাম করিয়া কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি যতটুকু জানি বলিতে লাগিলাম। তাহার পর মা যেন কাহাকেও বলিলেন, —"ছেলে কৃতী থাবে।" পরে আমাকে বলিলেন,— "এবার তুমি একটু ফাঁকায় যাও।" আমি সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করিয়া আনন্দে ভরপুর হইয়া বাহিরে আসিলাম। রাত্রে মা স্বয়ং পরিবেশন করিলেন এবং নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। কালী-মামার বৈঠকখানায় আমার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরের দিন কামারপুকুর দর্শন করিয়া আসিবার সঙ্কল্পের কথা বলিলে মা সম্মতি দিলেন।

পরদিন প্রাতে (৩০শে আষাঢ়) স্নান করিয়া আসিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলে মা বলিলেন, "ওর জন্যে ভাবনা নেই। ওর জন্যে ভাবনা নেই। তুমি কামারপুকুর ঘুরে এস। আজই চলে আসবে। ওখানে থেকো না।" আমি মাকে প্রণাম করিয়া রাস্তার সব বিবরণ জানিয়া লইয়া মহানন্দে শ্রীধাম কামারপুকুর রওনা হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুস্মৃতি-জড়িত কামারপুকুরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে জয়রামবাটী ফিরিয়া আসিলাম। এক হাঁড়ি জিলিপি আনিয়াছিলাম। মা উহা নামাইয়া লইলেন। পরে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বারান্দায় বসিলাম। মা ঠাকুরের এক গ্লাস প্রসাদী মিশ্রির সরবৎ আনিয়া উহা হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট আমাকে দিলেন। এদিনও তিনি নিজে গ্লাশটি ধুইয়া তুলিয়া রাখিলেন। পরে আমার সঙ্গে শ্রীধাম কামার-পুকুর সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল। পরে মা আমায় বলিলেন,—"কাল তোমার দীক্ষা হবে।"

পরদিন প্রাতে (১৩২০।৩১শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, দ্বাদশী তিথি। ইংরেজী ১৯১৩।১৫ই জুলাই) আমি বাঁড়ুজ্যেপুকুরে স্নান করিয়া অপর একটি পুকুর হইতে অনেক সাদা পদ্ম সংগ্রহ করিয়া মায়ের কাছে আনিলাম। মা ঐ পদ্ম হইতে সিংহবাহিনীর জন্য কিছু, ভানুপিসীর জন্য কিছু এবং নিজের পূজার জন্য কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট আমার জন্য রাখিয়া দিলেন। পরে বলিলেন,—"এখন একটু ফাঁকায় যাও। আমি সময় মত তোমায় ডেকে পাঠাব।" আমি মাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।